

দেশ কাল পাত্র

জগন্নাথ প্রসাদ দাস

অনুবাদ

সুবোধ কুমার বসু



দেশ কাল পাত্র

আদান-প্রদান

দেশ কাল পাত্র

জগন্নাথ প্রসাদ দাস

অনুবাদ

সুবোধ কুমার বসু



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-3966-4

2002 (শক 1924)

Desh Kaal Patra *(Bangla)*

মূল্য : **95.00** টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
এ-5 গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

এ দেশ বিজিত হবার নয় : মনুষ্যের আকাঙক্ষার উর্ধ্বে এ দেশ। দেবতাদের দেশ এটি।

—ওড়িশা আক্রমণের সময় আকবরের সেনাধ্যক্ষ জয়সিংহ

বিদেশীরা বলে ওড়িয়াদের বুদ্ধি এতই স্থূল যে অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও এরা কোনও মতে কোনও বিষয়ে সুশিক্ষিত হতে পারে না। কিন্তু গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এ ধারণা নিতান্ত অমূলক।

—উৎকল দীপিকা, সেপ্টেম্বর ১, ১৮৬৬

শেষ হল ঘোর তামসী যামিনী।

—রাধানাথ রায়, ১৮৯২

ভূমিকা

ভারতীয় সাহিত্যে কথাসাহিত্যের পরম্পরা সুপ্রাচীন। বৈদিক উপাখ্যান, 'কাদম্বরী', 'কথাসরিৎসাগর' বা 'দশকুমারচরিত'-এর মত কথাসহিত্য, পাশ্চাত্য জগতে ছিল না। কিন্তু আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্প সেই পরম্পরার জৈবিক বিবর্তনে নয়, সময়ের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন থেকেই এসেছে। সনাতন ব্যবস্থা ও শাশ্বত মূল্যবোধের প্রতি একান্ত রক্ষণশীল মনোবৃত্তি সম্পন্ন সমাজের ঘেরাটোপ উন্মোচন করে দেওয়াই নব্য উপন্যাস সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

সময়ের চলমান স্রোতে জীবন ও জগতের সমস্যা, সঙ্কট, মান্যতা বদলে গেছে। সেই স্রোতে ভাসমান মানুষের নতুন নতুন স্থিতিকে উপলব্ধি করা এবং উপস্থাপন করাই ঔপন্যাসিকের কর্তব্য।

সাহিত্যের বিভিন্ন রচনা বিভাগের মধ্যে উপন্যাসের একটি প্রমুখ বৈষম্যসূচক অভিলক্ষণ হচ্ছে, এখানে সময়চেতনার প্রতিফলন। অবশ্য সাহিত্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছে শাশ্বত সত্য। কিন্তু উপন্যাসেই এই সত্য সমসাময়িক যথার্থ পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সত্য বা আদর্শ সংস্থাপনের জন্য কথা কল্পনা করা যায় না। বরং যথার্থ স্থিতি থেকেই সত্য বা আদর্শের অন্বেষণ করা যায়। চিরন্তন মানব নয়, ঐতিহাসিক মানব—অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট দেশ ও সময়ে বিধৃত পাত্রই উপন্যাসের উপজীব্য। তাৎকালিক সময়চেতনা আধুনিক কথাসাহিত্যের ভিত্তি তথা প্রধান প্রবৃত্তি।

উপন্যাস রচনার মূল উপাদান তিনটি : দেশ, কাল, পাত্র। লেখকের বক্তব্য এই তিনটি আস্তরণে পরিবেশিত হয়। Space বা দেশ হচ্ছে ধরাতল, Time বা কাল হোল Frame, দু'টির ভেতর প্রতীত বক্তব্যকে রূপায়িত করে পাত্র বা চরিত্র (Personae)। এই হচ্ছে দেশ-কাল-পাত্র উপন্যাসের ভাববস্তুর ত্রিবিধ আয়তন। দেশ ও কালের ভিন্নতা অনুসারে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যাবরণ ভিন্ন ভিন্ন; কাল ভেদে একই দেশে এরকম পার্থক্যও দেখা যায়। তাই এই দুই আয়তনের ভেতরেই পাত্রদের অবস্থান এবং আসা যাওয়া। একটি নির্দিষ্ট দেশ ও কালের আয়তন একেকটি নির্দিষ্ট স্থিতির সূচক এবং তার মধ্যে বিধৃত পাত্রগণ কর্তাবাচক। কালানুক্রমিক ভাবে হোক বা ফলানুক্রমিক ভাবে, ইতিহাসের গতিক্রম পাত্রদের কার্যকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই অবতরনিকার আলোকে ড: জগন্নাথ প্রসাদ দাসের উপন্যাস 'দেশ কাল পাত্র'-এর সার্থকতা অনুধ্যেয়।

ড: জগন্নাথ প্রসাদ দাস (জন্ম ১৯৩৬) ওড়িয়া সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান লেখক—কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, গবেষক, শিশুসাহিত্যিক—এবং তাঁর উপন্যাস 'দেশ কাল পাত্র' (১৯৯২) ওড়িয়া উপন্যাসের একশ বছরের ধারাপ্রবাহে একটি সুদৃশ্য শঙ্খ। ওড়িয়া ভাষায় প্রথম উপন্যাস জাতীয় রচনা ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী দুই দশকের ভেতর মোটামুটি পাঁচটি সেই জাতীয় উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে—'সৌদামিনী' (১৮৭৮), 'অনাথিনী' (১৮৮৫), 'পদ্মমালী' (১৮৮৮), 'বিবাসিনী' (১৮৯১) এবং 'উন্মাদিনী' (১৮৯২)। উন্মেষকালীন এই উপন্যাসগুলি কথাবস্তুর দৃষ্টি থেকে প্রধানতঃ ছিল কাল্পনিক ইতিবৃত্ত। কিংবা রোমান্সধর্মী সংরচনার দৃষ্টিতে আখ্যানধর্মী; ভাষাশৈলীর দৃষ্টিতে কাব্যধর্মী। এরপর যথার্থ উপন্যাসের বিকাশ আরম্ভ হ'ল ১৯০১ সালে, যখন পত্রিকা পৃষ্ঠায় ১৮৯৮ থেকে প্রকাশিত ফকির মোহন সেনাপতির 'ছ মান আট গুণ্ঠ' আকারে আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর সৃষ্টি অল্প, মাত্র চারটি উপন্যাস ও একটি গল্পসংগ্রহ। তবুও কথাসংগঠন, চরিত্রচিত্রন ও ভাষাবিন্যাসে তাঁর কারিগরী একটি বিশেষ সাহিত্যিক রচনাশৈলী তৈরী করে নতুন উদ্ভব ওড়িয়া উপন্যাস ও ছোটগল্পকে একটি নির্দিষ্ট প্রারূপ প্রদান করেছিল। তাঁর স্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধে সূচনাত্মকভাবে বলা যেতে পারে যে তিনি ডিকেন্স, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রেমচাঁদ প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তুলনীয়।

ফকির মোহনের তিরোধানের (১৯১৮) সঙ্গে তাঁর যুগের ক্রমাবসান হয়। কিছু কিছু লেখক তাঁকেই অনুসরণ করে তাঁর সাহিত্যাদর্শকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। কিছু কিছু লেখক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন। বিকাশের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে মুকুর—উপন্যাসমালা, আনন্দলহরী—উপন্যাসমালার মত সংঘবদ্ধ সংস্থাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় ওড়িয়া উপন্যাসের গুণাত্মক তথা পরিমাণাত্মক অভিবৃদ্ধি ঘটল। এই সময়ের যে সমস্ত লেখকদের অভ্যুদয় বিশেষ স্মরণীয় তাঁরা হলেন নন্দকিশোর বল, চিন্তামণি মহান্তি, গোদাবরীশ মিশ্র, কুণ্ডলাকুমারী সাবত, দিব্যসিং পাণিগ্রাহী, উপেন্দ্রকিশোর দাস, হরেকৃষ্ণ মহতাব, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী গোদাবরীশ মহাপাত্র, কাহ্নুচরণ মহান্তি প্রমুখ। তাঁদের রচনায় যেসব সামাজিক প্রসঙ্গ ও সমস্যা প্রতিফলিত, মূলতঃ ভারতীয় সহিত্যে সর্বত্র তা পরিলক্ষণীয়। ব্রিটিশ শাসনের নিষ্পেষণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার কুপ্রভাব, নব্যধনতান্ত্রিক বর্গের অভ্যুদয়, পারম্পরিক মূল্যবোধে সংশয়, নগরজীবনের বিকাশ ইত্যাদি ঘটনার প্রতিপক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন, ভারতীয়তা বোধের পুনর্জাগরণ, সাম্যবাদী ভাবধারার প্রসার, গ্রাম্যসমাজের পুনর্গঠন ইত্যাদি পরিকল্পনা সেই যুগের সমস্ত সচেতন সাহিত্যকারদের প্রভাবিত করেছিল। জাতিপ্রথালোপ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, অস্পৃশ্যতা নিরাকরণ, ধর্মান্ধতার অপসারণ, যৌতুকপ্রথার দূরীকরণ, নারীর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ, আধুনিক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি ভারতীয় সমাজের কতকগুলি মুখ্য সমস্যা সে যুগের ওড়িয়া কথাসাহিত্যের আলোচনার বিষয় ছিল।

সমাজ চেতনার বিবিধ পরিপার্শ্ব—সামাজিক সমস্যার উপলব্ধি ও তার উপস্থাপনা—সেই সময়ের লেখকদের কৃতিত্বের মাপকাঠি ছিল।

ওড়িয়া উপন্যাসের বিকাশক্রমে তৃতীয় পর্যায়ের সূত্রধর হলেন গোপীনাথ মহান্তি। 'পরজা' (১৯৪৫) উপন্যাসের প্রকাশনার সঙ্গে একজন দৃষ্টিআকর্ষক লেখক হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আধুনিকতা, ভারতীয়তা ও মানবিকতা—এই তিনটি প্রবৃত্তির সমন্বয় করে তিনি অপূর্ব শৈলীতে তাঁর উপন্যাসগুলি যেভাবে সংরচনা করেছিলেন তা তাঁর সমসাময়িক বহু প্রতিভাশালী লেখকদের প্রভাবিত ও অনুপ্রেরিত করেছিল। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন নিত্যানন্দ মহাপাত্র, কমলাকান্ত দাস, রাজকিশোর পট্টনায়ক, প্রাণকৃষ্ণ সামল, জ্ঞানেন্দ্র বর্মা, সুরেন্দ্র মহান্তি, বসন্তকুমারী পট্টনায়ক আদি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং কনিষ্ঠ প্রজন্মের মহাপাত্র নীলমণি সাহু, বামাচরণ মিত্র, কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র, শান্তনু আচার্য, চন্দ্রশেখর রথ, বিভূতি পট্টনায়ক, প্রতিভা রায় প্রমুখ লোকপ্রিয় লেখকরা। এঁদের মধ্যে মাত্র একটি উপন্যাস 'দেশ কাল পাত্র' রচনা করে সামনের সারিতে আসন করে নিয়েছেন জগন্নাথ প্রসাদ দাস।

জগন্নাথ প্রসাদ প্রথমে কবি হিসেবেই সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। 'প্রথম পুরুষ' (১৯৭১) নামে তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন প্রচ্ছদ (সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত) ও অন্তর্গুণে ছিল অনন্য। এরপর থেকে তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক অভিযাত্রা চলছে। অদ্যাবধি তাঁর দশটি কবিতা সংকলন, ছয়টি গল্প সংকলন, পাঁচটি নাটক, একটি শিশুসাহিত্য এবং কয়েকটি গবেষণাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরিজীতেও তিনি গবেষণাত্মক গ্রন্থসমূহ লিখেছেন। তাঁর রচনাবলী ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বস্তুতঃ ভারতীয় সাহিত্যে বর্তমানে তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে সমাদৃত। ভারতীয় প্রশাসন সেবা থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে গবেষণা, সাহিত্যসর্জনা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তিনি বোধহয় প্রশাসন অপেক্ষা অধিক মর্যাদা সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক স্তরে লাভ করে নিজের কলানুগত জীবনকে সার্থক করেছেন।

'দেশ কাল পাত্র'—জগন্নাথ প্রসাদের একমাত্র উপন্যাসোপম রচনা। এই উপন্যাসের দেশ : ওড়িশা; কাল : ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ (ডিসেম্বর ১৮৫৯ থেকে জুলাই ১৯০৭); পাত্র : সেই সময়ের বহু নামী লোক (রাজা, মহারাজা, বিদেশী ও দেশী প্রশাসক, লেখক-সম্পাদক-সমাজসেবী প্রমুখ) যাঁরা সেই সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কর্তা ও ভোক্তা। এইসব ঘটনাবলীর মধ্যে আছে—পুরীর ঠাকুররাজার ক্রমপতন, 'নঅংক' দুর্ভিক্ষ, ওড়িয়া ভাষা সুরক্ষা আন্দোলন, কেন্দুঝড়ের ধরণীধর মেলি, সামন্ত চন্দ্রশেখরের সিদ্ধান্তদর্পণ প্রকাশ, গৌরীশংকর—প্যারিমোহন—বিচিত্রানন্দ—হরিহর—মধুবাবু প্রমুখের নবজাগরণে ভূমিকা, রাধানাথ—ফকিরমোহন—মধুসূদন—গঙ্গাধর প্রমুখের সাহিত্যিক—সামাজিক—বৈক্তিক জীবনের নানাকথা, ব্রিটিশ প্রশাসক র‍্যাভেনশ, বীম্‌স্‌, আমস্ট্রং, ককবার্ন, বার্লো প্রমুখের শাসননীতি ও জীবনধারা ইত্যাদি

বহু জানা ঘটনার অজানা পৃষ্ঠপট। এই সব ঘটনা প্রমাণিত ইতিহাস, কিন্তু বইটি কেবল প্রামাণিক পাদটীকায় ভারাক্রান্ত তথ্যপঞ্জী নয়। তাই ইতিহাস এখানে উপন্যাসোপম অথবা উপন্যাস ইতিহাসোপম।

সাহিত্য বিদ্যাবিদদের পক্ষে সমস্যা হয় বইটির রচনা প্রকার নিরূপণ বা শ্রেণীকরণ করা। এটা কোন্ সাহিত্যিক বিভাগের রচনা সেই লেবেল দেওয়া কঠিন। সাধারণতঃ প্রথানুগত উপন্যাসে পাঁচটি স্তর পরিলক্ষিত হয়—কথাবস্তু, চরিত্র, পরিবেশ, ভাষাশৈলী এবং জীবনদর্শন। এই পঞ্চাঙ্গ ব্যাতিরেকে যা কিছু প্রত্যঙ্গ উপন্যাসে থাকে সেগুলি পরস্পরাভিমুখী হয়ে থাকে। কোন বই-এর সার্থকতা নিরীক্ষার জন্য প্রতিটি প্রত্যঙ্গের স্বতন্ত্রভাবে এবং সবগুলির সমন্বিতভাবে পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু দেশ কাল পাত্র উপন্যাসে এই নির্ধারিত উপাদানগুলির অভাব লক্ষ্য করে কয়েকজন সমালোচক বইটিকে উপন্যাস বলতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। এমন অপারম্পরিক পরীক্ষামূলক রচনার বিচারে সেই আলোচকদের অনুভব করা উচিত যে এই উপন্যাসে একটি মহাকাব্যের সংগঠন আছে। এখানে আয়তনের বিস্তার বা ব্যাপ্তি এবং ঘটনাবলীর গহন ঘনঘটা বা সান্দ্রতা এবং বহুবিচিত্র ও বিবিধ চরিত্রবৃন্দের সমাবেশ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের এইটি যেন মহাভারত! ঘটনা পারম্পর্যে পরস্পর সম্পর্কিত প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান সম্বলিত এই মহাগ্রন্থে দ্রষ্টব্য—Life by values নয়, Life by time (E. M. Foster)। সময়ই এই উপন্যাসের মহানায়ক, মুখ্য পাত্র।

বইটি পুরাণ বা ইতিহাস নয়, কেবলমাত্র একটি সরস গদ্য ন্যারেটিভ। লেখক ও একজন সাহিত্যকার, কবি, গল্পকার, নাট্যকার, কলাতত্ত্ববিদ, চিত্রকর গবেষকরূপে অতি সুখ্যাত। সাহিত্য ভাষার শিল্প। সুতরাং এখানে দ্রষ্টব্য হচ্ছে লেখকের ভাষাশৈলী। এই উপন্যাসে জগন্নাথ প্রসাদের সহজ ও স্পষ্ট বাক্য, বার্তালাপধর্মী বচনিকা ও প্রাত্যহিক প্রয়োগসিদ্ধ প্রচলিত শব্দপ্রয়োগ তাঁর বাণীভঙ্গীর বিশেষত্ব। কবিতা, গল্প ও নাটকে প্রথম থেকেই তাঁর লেখায় যা দেখা যাচ্ছিল, এখনও এই বিবরণীগর্ভক গদ্য গ্রন্থেও তাই দেখা যায়। ফলে এখানে তথ্যপুঞ্জ গল্পের মত সাবলীল, নাটকীয় ও চিত্রধর্মী।

অন্যদিকে ভাষাশৈলীর আরও একটি বিশেষত্ব বিশেষণের অকারণ ব্যবহার পরিবর্জন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমস্ত বড়লোকদের সোজা মূল নামে উল্লেখ করা হয়েছে—তিনি 'গজপতি'ই হন বা 'কবিবর', তিনি কেবল 'বীরকিশোর' বা 'রাধানাথ'। এভাবে পাত্রদের সাধারণ এবং সমতলাসীন করা হয়েছে। তাৎকালিক ওড়িশার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভেতরে তাঁরাও এক একজন সাধারণ মানুষের মত প্রতিপন্ন হয়েছেন। এইভাবেই ঘটনাবলীর অনাসক্ত বর্ণনা। নিজের ভাবাবেগ বিনির্মুক্তভাবে একজন প্রত্যক্ষদর্শী নিরপেক্ষ ব্যক্তির মত লেখক কেবল বয়ান করেছেন এবং রসনিষ্পত্তি শুধু পাঠকের মনে আকাঙ্খিত হয়েছে। জগন্নাথ প্রসাদীয় ভাষাশৈলীর এই ধরণ একটি উপভোগ্য কলা।

সমগ্র গ্রন্থটিতে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির ভিড়ের মধ্যে একটি অখ্যাত পাত্রী হচ্ছে 'খণ্ডী'—যার চরিত্রটি অদ্ভুত! পুরী: মে ১৮৯৭ শীর্ষক পরিচ্ছেদে তার প্রথম আবির্ভাব। সে ছিল একজন ভিখারিণী। রাজা মুকুন্দদেবের খেয়ালী মনে সে রেখাপাত করেছিল। তারপরে সে আর রাজপ্রাসাদের বন্দিনী চাকরানী হয়েই রইল না। ক্রমশঃ সে শক্তিমতী হোল এবং তার কথায় উঠে বসে রাজা ও আনন্দিত হ'তে লাগলেন। তিনি খণ্ডীর বিয়ে দিলেন, 'পাটমা' পদবী দিলেন, তার স্বামী ও ছেলেমেয়েদের দাঁড় করালেন। শেষপর্যন্ত খণ্ডী রাজপ্রাসাদের, পুরীর এবং ওড়িশা সরকারের এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ওড়িশার ইতিহাসে এই রিবল ব্যক্তিটি বাস্তবে এক উপন্যাসসুলভ পাত্রের মত প্রতীত হয়। খণ্ডী কি লোকবৃত্তের শ্তানদেঈ মালিনীর এক নতুন উত্তরাধিকারী?

'দেশ কাল পাত্র' ঊনবিংশ শতাব্দীর দলিল। ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কালপরিধি। এই সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংযোগের ঊষাকাল। একটি সনাতন সভ্যতার সঙ্গে আরেকটি সম্পূর্ণ নূতন ও বহিরাগত সভ্যতার সংঘাতের ফলে কিভাবে সভ্যতার পার্শ্বপরিবর্তন ঘটে, তার একটি বিশদ চিত্র বিশ্ব ইতিহাসে মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারানিরূপণের জন্য এই সময়ে উপলব্ধ। ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে, প্রত্যেক ব্যবস্থায় কিভাবে এই সংঘাত ঘটেছিল এবং তার প্রক্রিয়া ও ক্রমপরিণতি কি হয়েছিল, তা' আজকের ঐতিহাসিকদের কাছে অতি তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যযুগে মোগল মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে ভারত একটি নবজাগরণের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। সেই সময় প্রাচ্যের দু'টি সভ্যতা ও সমাজের সমন্বয় ঘটে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পুনর্জাগরণ হোল একটি সম্পূর্ণ অভিনব অধ্যায়। বহু বিরোধের মধ্যে সালিশ ও সমীকরণের ইতিহাস প্রদান করে ঊনবিংশ শতাব্দী। এই দৃষ্টিতে ড: জগন্নাথ প্রসাদের বইটি অবশ্য পাঠ্য।

খগেশ্বর মহাপাত্র



এক

পুরী : ডিসেম্বর ১৮৫৯

হঠাৎ শেয়ালের দল সমবেত চিৎকার করে উঠল যেন তারা পুরী শহর দখল করতে বদ্ধপরিকর। এই কোলাহলে আর ভোরের মৃদু হাওয়াতে বীর কেশরীর নিদ্রাভঙ্গ হল। সারারাত জ্বরে ছটফট করেছেন, ঘুম আসেনি। মাত্র ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল। কক্ষে টিম টিম করে জ্বলছে একটি প্রদীপ, সকালের আলোতে আরও নিষ্প্রভ লাগছে সেটি। বীর কেশরীর মনে হল এই দীপটির সঙ্গে তাঁর জীবনের অদৃশ্য বন্ধন আছে, দীপটি নিভে গেলে তাঁর জীবনেও যবনিকা নেমে আসবে। পাটরানী সূর্যমণি সারা রাত্রি দীপটি ও বীরকেশরীর প্রাণ আগলে ছিলেন, এখন পাশের কেদারায় গভীর ক্লান্তিতে নিদ্রামগ্ন।

রাত্রি কেটেছে শঙ্কায় ও দুশ্চিন্তায়। এখন বীর কেশরীর মন ধীর ও শান্ত। এই ভেবে তিনি নিজেকে আশ্বাস দিলেন যে জগন্নাথের কৃপায় তিনি মাত্র পুরী এবং খুর্দার রাজাই নন, সারা উৎকল তাঁকে রাজসম্মান দেয়। নিজের যে উপাধি মুখস্থ করতে অনেক সময় লেগেছিল সেটি মনে মনে আবৃত্তি করলেন : বীরশ্রী গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটকোৎকল বর্গেশ্বরাধি রায় ভূতভৈরব দেব সাধুশামনোৎকীর্ণ রাওতরাজ অতুলবলপরাক্রমী সংগ্রাম সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়কুলধূমকেতু মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী শ্রী বীরকেশরী দেব। আবৃত্তি করে কিন্তু মনোবল একটুও বৃদ্ধি পেল না। চার বছর আগে রাজা হয়েছেন, এখন পঁচিশ বছর বয়সে মৃত্যুর মুখোমুখি, আশ্বস্ত হওয়া কঠিন।

রাত্রে যে সকল চিন্তা মনকে পীড়া দিয়েছে সেগুলি এক এক করে মনে পড়ল। শৈশব কেটেছে রোগে আর ভয়ে। শিক্ষালাভের আগ্রহ ছিল কিন্তু অসুস্থতার জন্য আশাপ্রদ প্রগতি হয়নি। তার উপর পিতা রামচন্দ্রের কঠোর শাসন। যদিও চার বছর আগে তাঁর দেহাবসান হয়েছে, বীরকেশরীর আজও মনে হয় পিতা যেন আশে পাশে বিরাজমান থেকে তাঁর উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। রামচন্দ্র তাঁকে কোনও দিন রাজবাড়ির বাইরে যেতে দেননি; তাই যেদিন রামচন্দ্রের মৃতদেহ নিয়ে বীরকেশরী পুরী শহরে প্রথম পা দিলেন সেদিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর কাছে।

পিতার স্মৃতি মনে পড়াতে একটু ত্রাস ও ক্রোধের সঞ্চার হল। চোদ্দ বছর বয়সে রাজা হয়ে প্রায় চল্লিশ বছর সিংহাসনে ছিলেন রামচন্দ্র। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন, জগন্নাথের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাঁর, মন্দিরে প্রথম বল্লভ ভোগ না হওয়া পর্যন্ত জলস্পর্শ করতেন না। পিতার প্রতি বীরকেশরীর মনে যে তিক্ততা ছিল তা জগন্নাথের

প্রতি তাঁর মনোভাবকেও প্রভাবিত করেছিল। ধর্মীয় আচরণবিধি পালন করেও বীরকেশরী যেন জগন্নাথের থেকে একটু দূরেই রয়ে গেলেন। সারারাত যতবারই জগন্নাথ ধ্যানের চেষ্টা করেছেন ততবারই পিতার কথা মনে এসেছে। তখনই মনশ্চক্ষে প্রবল পরাক্রমী রামচন্দ্র শাসকের ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়েছেন। মনে পড়ল পিতার অনুশাসনের নানা কথা।

প্রাসাদের পাঁচিল ঘেঁষা স্তূপীকৃত পাথর বীরকেশরীকে দেখিয়ে রামচন্দ্র বলতেন এগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনার্ক মন্দির থেকে ভেঙে আনা মূর্তি। তাঁর ইচ্ছা এগুলি শ্রীমন্দির মেরামতের কাজে লাগাবেন। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে রামচন্দ্র কোনার্ক মন্দির ভাঙার কাজে এমনই তৎপর হলেন যে শেষ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিবাদ করতে বাধ্য হল এবং ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতি প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের লোকজন মন্দির শিখর থেকে বেশ কিছু মূর্তি ভেঙে নিচে ফেলে দিয়েছিল। অধিকাংশ মূর্তি পুরী আনা হয়েছিল। সেসব মূর্তি আর পাথর দেখিয়ে রামচন্দ্র বীরকেশরীকে বলতেন, কমিশনার রিকেট্‌স্ বাধা না দিলে কোনার্ক মন্দিরের অর্ধেক মূর্তি তিনি পুরী নিয়ে আসতেন। রামচন্দ্রের বিশেষ আপশোষের কারণ নবগ্রহ খোদিত প্রস্তরটি আনতে পারেন নি। নিচে পড়ে অনেক মূর্তি চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রামচন্দ্র তাঁর লোকজনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন নবগ্রহ প্রস্তরটির যেন কোন বিকৃতি না ঘটে। তাঁর ইচ্ছা ছিল পুরী মন্দিরের এক উপযুক্ত স্থানে এটিকে প্রতিস্থাপিত করবেন। তা আর হয়ে ওঠেনি।

রামচন্দ্র সাহেবদের সম্পর্কে নানা কথা বলতেন। সাহেবরা সর্বদা তাঁর ত্রুটি ধরতেন, পান থেকে চুন খসলে জরিমানা দিতে হত। বছর কয়েক আগে মন্দিরের প্রাঙ্গণে কয়েকজন যাত্রী দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। এজন্য রামচন্দ্রকে বিশেষ দুর্ভোগে পড়তে হয়েছিল।

রাজা হবার পর বীরকেশরী নিজেও কম হয়রাণ হননি সাহেবদের কাছে। পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকটিয়র নানা হুকুমনামা জারী করেন তাঁর উপর। প্রতিবাদ উপেক্ষা করেন। বিশেষ জোর দিয়ে বলেন তিনি কমিশনার ককবার্ণের নির্দেশে কাজ করেছেন। ভাবটা এমনি যে ককবার্ণ ঈশ্বর, তাঁর উপরে আপীল নেই। একবার রাজার স্বাক্ষরের জন্য এক খালি দলিল পাঠালেন ম্যাজিস্ট্রেট। এতে লেখা ছিল মন্দির পরিচালনার জন্য সরকারী অনুদান বন্ধ করে পরিবর্তে তিনি সমপরিমাণ ভূমি রাজস্ব আদায় হবার মত জমি দেবেন খুর্দায়। মোক্তাররা দলিলে স্বাক্ষর না করার পরামর্শ দিল, তাদের মতে স্বাক্ষরের অর্থ হবে রাজা মেনে নিলেন খুর্দার জমির মালিক সরকার—তিনি নন। বীরকেশরী স্বাক্ষর করলেন না। এবার ম্যাজিস্ট্রেট খবর পাঠালেন যে ১৮৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে মন্দিরের অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়; রাজা মন্দিরের সুপারিণ্টেডেণ্টের পদও হারাবেন। এর পরেও বীরকেশরী অটল থাকলে বিরক্ত হয়ে

ককবার্ণ আদেশ দিলেন রাজাকে ধরে এনে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হোক। শেষ পর্যন্ত দলিলে স্বাক্ষর করতেই হল তাঁকে। সেইদিন থেকে ককবার্ণের নাম শুনলে ত্রাসের সৃষ্টি হয় বীরকেশরীর মনে। ককবার্ণকে তিনি দেখেননি, কিন্তু তাঁর কথা উঠলেই বীরকেশরীর মনে পিতার স্মৃতির উদয় হয়।

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থেকে মন ফেরানোর জন্য নিদ্রিত সূর্যমণির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন বীরকেশরী। মন উদাস হয়ে গেল। রোগাক্রান্ত হয়ে কোনও সুখ দিতে পারেননি স্ত্রীকে। নিঃসন্তান থাকার দুঃখ পীড়া দেয়। ভেবে ব্যাকুল হলেন তাঁর মৃত্যুর পরে কেমন করে সবদিক সামলাবেন সোজাসরল সূর্যমণি।

খুল্লতাত পদ্মনাভ সৎ হলে তাঁর উপর সূর্যমণির দায়িত্ব দেওয়া যেত। কিন্তু তিনি খল ও দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ, সর্বক্ষণ নানা চক্রান্তে লিপ্ত। রামচন্দ্রের আস্থাভাজন হয়ে জমিজমা দেখাশুনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু প্রায়ই কিছু না কিছু বিভ্রাট সৃষ্টি করেন। সত্যবাদী মন্দিরের সুপারিণ্টেডেণ্টের পদের সুযোগ নিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন। সব থেকে বড় কথা রামচন্দ্রের উপর কুপ্রভাবের জন্য পদ্মনাভ ছিলেন সূর্যমণির দু চোখের বিষ।

অপুত্রক বীরকেশরী স্থির করেছিলেন খেমন্তির রাজ পরিবার থেকে দত্তক নেবেন। অনেক রাজা তাঁদের পুত্রকে দত্তক দেবার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু তিনি খেমন্তির রাজপুত্রকে নির্বাচন করলেন কারণ এই রাজপরিবারের অনেক খ্যাতির কথা তিনি শুনেছিলেন। দত্তক গ্রহণ উপলক্ষে কিছু দিন হল খেমন্তির রাজা তাঁর চার বছরের দ্বিতীয় পুত্রকে নিয়ে সমুদ্রকূলে এক বাসা বাড়িতে অবস্থান করছেন। সূর্যমণি দত্তক নেবার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। তাঁর ধারণা এই দত্তক নেবার সঙ্গে বীরকেশরীর জীবনের অদৃশ্য যোগ আছে। অনুষ্ঠানের বিলম্ব হচ্ছে বলে খেমন্তির রাজাকে অগত্যা প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে। দত্তক প্রসঙ্গ সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে। তাঁর আশঙ্কা, জানতে পারলে পদ্মনাভ গোলমাল সৃষ্টি করতে পারেন।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে বীরকেশরীর কাশি এল। কাশির শব্দে সূর্যমণি জেগে উঠলেন। বীরকেশরীর কপালে হাত দিয়ে মনে হল জ্বর নেই, মুখখানিও একটু সজীব লাগল। বীরকেশরী তাঁকে বললেন, আজ দত্তক যজ্ঞের ব্যবস্থা কর। সূর্যমণি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বীরকেশরীর চোখে চোখ পড়তে বুঝতে পারলেন, আর টালবাহানা চলবে না।

রাজা জেগেছেন শুনে দাসী নানীমা এসে জানাল রাজপুরোহিত এসেছেন। আজকাল রাজবাড়িতে পূজা অর্চনা করা তাঁর একটি বিশেষ কৃত্য। রাজা অসুস্থ হয়ে পড়ায় জগন্নাথের শালগ্রাম বিগ্রহ এনে রাজার শয়নঘরের পাশের ঘরে স্থাপনা করা হয়েছে। সেখানেই প্রত্যহ পূজা দেখেন রাজা। আজ পূজার পরে রাজাকে এনে শুইয়ে দিয়ে মনে হল তিনি আরও ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। সেই অবস্থায় তিনি রাজগুরুকে

দত্তক নেবার কথা বললেন। তাছাড়া সূর্যমণিকে বললেন দেওয়ান মহাদেব লালকে ডেকে আনতে।

সম্প্রতি পাটরানী প্রায় সর্বক্ষণ রাজার কাছে থাকেন। ফলে ভৃত্যরা রাজার কাছে অবাধগতি নয়। রানীর সমক্ষে কোনও পরপুরুষের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। যাকে দরকার হয় বাইরে গিয়ে তাকে ডেকে আনে নানীমা। ইদানীং তাদের দাপট বেড়ে গেছে, কারণ বহির্জগতের সঙ্গে রাজবাড়ির একমাত্র যোগসূত্র এখন তারাই।

ডাকা মাত্র মহাদেব লাল উপস্থিত হলেন। বীরকেশরী শয্যাশায়ী হওয়ার পর থেকে মহাদেব প্রতিদিন প্রত্যুষে রাজবাড়ি চলে আসেন এবং গভীর রাত্রে চলে যান। সূর্যমণি কক্ষান্তরে গেলে মহাদেব এসে রাজার শিয়রের কাছে দাঁড়ালেন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, কোনওক্রমে রাজা বললেন, আজই দত্তক যজ্ঞ করা হোক, ম্যাজিষ্ট্রেটকে একটু আসতে বলুন, দত্তক নেবার কথা তাঁকে বলে রাখা ভাল।

রবিবার সকালে ম্যাজিষ্ট্রেট জে. বি. ম্যাকটিয়র ছোট হাজিরী অর্থাৎ প্রাতঃরাশ সেরে বারান্দায় বসে পাইপ টানছেন, পায়ের কাছে বসে একজন সিপাহী বন্দুক পরিষ্কার করছে। সেরেস্তাদার পুরুষোত্তম পট্টনায়ক এক তাড়া ফাইল নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে। বাইরে কাহাররা পাল্কি নিয়ে প্রস্তুত, সাহেব ভ্রমণে যাবেন। এমন সময়ে দেউড়ির সামনে আর একখানি পাল্কি এসে থামল, তার থেকে নামলেন দেওয়ান মহাদেব লাল। ম্যাকটিয়র দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন, ভাবলেন আজ রওনা হতে বিলম্ব হবে।

পুরী এসে অবধি ম্যাকটিয়র ভাবেন পুরী না হয়ে তাঁর বদলী কটকে হলে ভাল হত। সাহেবদের জন্য কটক একটি বড় ষ্টেশন তো বটেই, পুরীতে অনেক বাড়তি ঝামেলা রাজা ও মন্দির নিয়ে। পাণ্ডারা গোলমাল করে, তীর্থযাত্রীরা নাকাল হয়। মাঝে মাঝে বেশ বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে, যেমন ১৮৫৩ সালে পাণ্ডাদের অসাবধানতার জন্য পদদলিত হয়ে প্রাণ হারায় বাইশজন তীর্থযাত্রী। সেদিন মন্দিরে যারা নিযুক্ত ছিল—পাণ্ডা, জমাদার, বরকন্দাজ—সকলকে জরিমানা করা হয়েছিল। রাজাকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। একবার গঞ্জামের এক রাজা অর্থ দিতে অস্বীকার করার জন্য তিন মাস পূজা দিতে পারলেন না। এবার রাজাকে দুশ টাকা জরিমানা করা হল।

নেটিভরা যখন খুশি সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে না। কিন্তু মহাদেব সাধারণ ব্যক্তি নন। অধিকাংশ সাহেব জানতেন যে মহাদেব কটকের ডেপুটি কালেক্টর রামপ্রসাদ রায়ের আত্মীয়। তাছাড়া ম্যাকটিয়র যখন কুজঙ্গে বন্দোবস্তের কাজ করতেন তখন রামপ্রসাদ ছিলেন তাঁর সহকর্মী। সেই সুবাদে তিনি মহাদেবকে চেনেন। ম্যাকটিয়র পুরী আসার পর থেকে মাঝে মাঝে মহাদেব সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং রাজার অপারগতার কথা শোনান। এখন মহাদেব জানালেন রাজার অবস্থা সঙ্কটজনক, তিনি ম্যাকটিয়রের সঙ্গে দেখা করতে চান।

রাজা যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী সে কথা সকলের জানা। পুরীর দারোগা

প্রায়ই বলে রাজার অন্তিম সময় আসন্ন কিন্তু প্রত্যেকবার তিনি আশ্চর্যজনকভাবে সামলে ওঠেন। ম্যাকটিয়র বললেন, এ আর নতুন কি খবর। মহাদেব উত্তর দিলেন, না। এবার অবস্থা সত্যই সঙ্গীন। বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে। অন্যদিন হলে ম্যাকটিয়র হয়ত বলতেন আমার সময় নেই, কিন্তু আজ তাঁর মন প্রসন্ন। কাল রাত্রে স্ত্রীর দুখানি প্রেমপূর্ণ পত্র পেয়েছেন, আজ সকালে সে দুটি আর একবার পড়েছেন। বললেন, আচ্ছা তুমি যাও আমি আসছি। যাবার সময় ডাক্তার কেণ্ডালকে ডেকে নিয়ে যাও।

বীরকেশরীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে ম্যাকটিয়রের মনে হল রাজার অবস্থা সত্যই উদ্বেগজনক, রাজা নির্জীবের মত পড়ে আছেন, তাঁর পদধ্বনি শুনেও চোখ মেললেন না। নিঃশ্বাস পড়ছে অতি মন্থর গতিতে, বোঝা যাচ্ছে তাঁর দেহে এখনও প্রাণ আছে। ভৃত্য রাজাকে ধরে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করলে ম্যাজিষ্ট্রেট ইশারায় তাকে নিষেধ করলেন এবং নিজে একটি চেয়ারে বসলেন। একটু পরে সিভিল সার্জন কেণ্ডাল ঢুকলেন দেওয়ান মহাদেব লালের সঙ্গে। কেণ্ডাল রাজার বুক ও নাড়ী পরীক্ষা করে ম্যাকটিয়রের দিকে চেয়ে হতাশাসূচক মাথা নাড়লেন।

এই সময়ে বীরকেশরী চোখ মেললেন। তা দেখে ম্যাকটিয়র রাজার শিয়রের কাছে এলেন। রাজা উঠে বসতে চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে নিবৃত্ত করলেন, বললেন, সব ঠিক আছে, আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। বীরকেশরী কিছু বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু শ্বাস নিতে এতই তাঁর কষ্ট হচ্ছিল যে কিছু বলতে পারলেন না। তখন মহাদেব লাল বললেন, রাজা মহাশয় বলতে চান যে তেনি খেমন্তির রাজকুমারকে দত্তক নিতে চান।

ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেলেন। চাকুরি জীবনে তাঁর অভিজ্ঞতা নেটিভরা কখন কী ভেবে কী বলে বোঝা কঠিন, তাদের প্রত্যেক উক্তির কিছু প্রচ্ছন্ন অর্থ থাকে। মনে পড়ল ১৮৪০ সালের দশ নম্বর আইনটির কথা। পুরীর রাজা ও মন্দির নিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দেয়। তখন এই আইনের আশ্রয় নিতে হয়। এটি তাঁর কণ্ঠস্থ। এই আইনে দত্তক পুত্রের উল্লেখ নেই। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, একখানি আর্জি পাঠান, দেখি কী করা যায়।

ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যরা চলে যেতেই সূর্যমণি এলেন, দেখলেন রাজা নির্জীবের মত পড়ে আছেন, চক্ষু মুদ্রিত। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। রাজার হাতের উপর হাত রেখে নানীমাকে বললেন, শিবদাস বাবাজীকে খবর দাও এবং দেওয়ান আর রাজগুরুকে দত্তক যজ্ঞের আয়োজন করতে বল।

রাজগুরুকে খবর দেবার দরকার হল না, এই নির্দেশের জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তাড়াহুড়ো করে দত্তক যজ্ঞ করা তার মনঃপুত নয়। ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়ে খেমন্তি গিয়ে রাজপুত্রকে বরণ করে আনলে ভাল হত। অগত্যা পুরীর এক ভাড়াবাড়িতে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

মহাদেব লালের উপরে এখন অনেক দায়িত্ব। দত্তক নিতে হলে কেবল যজ্ঞ করলেই হয় না অনেক কাগজপত্র তৈরি করতে হবে। মহাদেব আদা জল খেয়ে লেগে গেলেন। মোক্তার, দলিলপত্র তৈরি করল, তাতে রাজা স্বাক্ষর করলেন। রাজারহাত কাঁপছিল; সুতরাং তাঁর টিপচিহ্নও নেওয়া হল। একটি উইলে লেখা হল সূর্যমণি যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব ও তাঁর উপর ন্যস্ত হল। এও লেখা হল যে যদি কোনও কারণে দত্তক পুত্রটির অকাল মৃত্যু হয় তবে সূর্যমণি ইচ্ছা করলে অন্য একটি দত্তক নিতে পারবেন। যজ্ঞবেদী নির্মাণ হল এবং শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হল। বৈকুণ্ঠতে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হল। মহাদেবকে সাবধান করা হল, পদ্মনাভ যেন কিছু জানতে না পারেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হল। হোমের সময় বীরকেশরীর উপস্থিতি প্রয়োজন হলেও তাঁকে ছাড়াই কাজ হল কারণ এত ধকল তিনি সহ্য করতে পারবেন না। পূর্ণাহুতির সময় অবশ্য তাঁকে আনা হল; শপথ আদান প্রদান এবং সংকল্প পর্বে তিনি অংশ নিলেন। বীরকেশরী এবং খেমন্তির রাজপুত্র—সকলে তাকে জেনামণি সম্বোধন করতে আরম্ভ করেছে—একত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তার পরে বীরকেশরীকে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল।

শিবদাস বাবাজী যখন এলেন তখন রাত্রি হয়ে গেছে। ততক্ষনে বীরকেশরী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছায়ার মতো সমস্তদিন তাঁর আশেপাশে ছিলেন সূর্যমণি। শিবদাস প্রবেশ করতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সামনে তিনি যান না। কথাও বলেন অন্যদের সঙ্গে। কিন্তু শিবদাসের কথা আলাদা। তিনি সন্ন্যাসী, তাছাড়া ঔষধ প্রস্তুত করতে সিদ্ধহস্ত। এজন্য মাঝে মাঝে তাঁকে ডাকা হয়। আজ তিনি সোজা গিয়ে রাজার নাড়ী পরীক্ষা করলেন। মুদ্রিত চক্ষু মুদ্রায় কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। 'আর ঔষধের প্রয়োজন নাই, রাজাকে জগন্নাথ দর্শন করিয়ে আনুন। এবার আমি আসি', বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

রাজাকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়, এর জন্য নীতি নিয়ম মানতে হয়। তাছাড়া রাজার দর্শনের সময় অন্যদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। সকলকে খবর দিয়ে দুখানি পাল্কি করে রাজা রানী মন্দিরে গেলেন। সিংহদ্বারে কয়েকজন সেবক রাজার প্রতীক্ষা করছিল। রানীর পাল্কি কল্পবট পর্যন্ত গেল কিন্তু রাজাকে দোলায় নেওয়া হল সিংহদ্বার থেকে। জয় বিজয়ের কাছে 'মণিমা' বলতেই পূজা আরম্ভ হল অবশ্য জগন্নাথ দর্শনের শেষ অধ্যায় রত্নবেদী পরিক্রমা করতে পারলেন না বীরকেশরী।

ইতিমধ্যে রাজার মন্দিরে আগমনের খবর পেয়েছেন শহরের অনেক লোক। একে শীতের দিন তারপরে রাত্রিবেলা, অনেকে ঘুমিয়ে, তবুও রাজা ঘোরার সময় দেখা গেল অনেক বাড়িতে প্রজ্বলিত দীপ এবং পূর্ণকুম্ভ। এসব কিন্তু বীরকেশরীর অগোচর রয়ে গেল, তিনি তখন পাল্কির ভিতরে অচেতন।

শুইয়ে দিলে রাজা সূর্যমণিকে কিছু বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু বাক্য স্ফূরণ হল না। রানী মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লে অনেক কষ্টে বললেন, 'নতুন জেনামণির ভার তোমার উপর রইল, তুমি তাকে খুব কড়া শাসন করবে না।' কি মনে হতে সূর্যমণি দৌড়ে পাশের ঘরে গেলেন। গঙ্গাজল নিয়ে ফিরে আসার আগেই বীরকেশরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কান্নার শব্দ শুনে মহাদেব প্রথম কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। মশাল জ্বালিয়ে পাল্কি চড়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে খবর দিতে তার বাংলোয় গিয়ে শুনলেন, আজ সকালে রাজবাড়িতে ফিরে তিনি ফতেপুরে সফরে গেছেন।

ফতেপুর : ডিসেম্বর ১৮৫৯

ফতেপুর চিল্কা অঞ্চলের সাধারণ একটি গ্রামমাত্র নয়। এখানে লবণের আড়ত ছাড়া তাঁবু গাড়ার উপযুক্ত একটি ময়দান আছে। জায়গাটি শহর থেকে দূরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে; কিন্তু সাহেবদের কাছে একটি বিশেষ স্থান আছে। ১৮০৩ সালে যখন ইংরেজরা গঞ্জাম থেকে ওড়িশা অভিযান শুরু করে তখন এটি ছিল তাদের প্রথম সোপান। ওড়িশা তখন মারাঠাদের অধীন আর ফতে মহম্মদ মালুদ ইত্যাদি পরগণার জমিদার। ওড়িশা আক্রমণের প্রায় একমাস আগে ফতে মহম্মদের সঙ্গে একটি চুক্তি করে ইংরেজরা। চুক্তির শর্ত ফতে মহম্মদের ভাই ওয়াজ মহম্মদ ইংরেজদের অভিযানে যোগ দেবেন এবং নিজে ফতে মহম্মদ সর্বপ্রকারে ইংরেজদের সহায়তা করবেন এবং রসদ জোগাবেন।

কর্ণেল হারকোর্টের নেতৃত্বে ইংরেজরা গঞ্জাম থেকে অভিযান শুরু করে ১৫ই সেপ্টেম্বর মালুদ পরগণার মিঠাকুয়া পৌঁছাল। মারাঠারা বাধা দিল না, বরং তাদের দ্বারা উৎপীড়িত জনসাধারণ ইংরেজদের স্বাগত জানাল। এ অঞ্চলের অন্যতম জমিদার পারিকুদের রাজাও ফতে মহম্মদের মতো ইংরেজদের সহায়তা করতে পারতেন। কিন্তু একটি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ঘটনাবলী থেকে দূরে রইলেন। তিনি শুনেছিলেন, ইংরেজরা কিম্ভূতকিমাকার জন্তুবিশেষ, তাদের মুখাকৃতি শূকরের মতো এবং কানদুটি এত বড় যে তার একটির উপরে তারা শোয় এবং অন্যটির দ্বারা দেহ আবৃত করে। ইংরেজরা লঙ্কার রাক্ষসদের মতো ভেবে তিনি গৃহান্তরালে প্রচ্ছন্ন রইলেন। মিঠাকুয়া থেকে মাণিক পাটনার রাস্তাধরে অনায়াসে ইংরেজরা পুরীর দিকে অগ্রসর হল। জগন্নাথ মন্দিরের ব্রাহ্মণরা তাদের প্রত্যুদ্গমন করল এবং ১৮ই তারা পুরীতে ছাউনী ফেলল। ভীত মারাঠারা পালিয়ে গেল। এক সপ্তাহ পুরীতে বিশ্রাম করে ইংরেজবাহিনী কটক অভিমুখে অগ্রসর হল।

সেইদিন থেকে চিল্কা অঞ্চলের ফতেপুর মিঠাকুয়া ইত্যাদির স্থানের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারা প্রায়ই এখানে এসে তাঁবু ফেলে। জমিজমা সংক্রান্ত গোলমালের অজুহাতে তারা এখানে আসে। মজার কথা যে শীতে এ ধরণের কাজ বৃদ্ধি পায়। সময়টি চিল্কাতে শিকারের জন্য প্রশস্ত।

ম্যাকটিয়র দুদিন এখানে তাঁবু পাতলেন। সঙ্গে পুরী থেকে অনেক লোকজন এসেছে। তাঁর পাল্কির জন্য ষোলজন কাহার, জিনিসপত্র বহনের জন্য ছজন লোক। তাছাড়া বাবুদের জন্য হাতি ও গোরুর গাড়ি। দ্রুত চললেও পুরী থেকে আসতে দুদিন লাগে। ম্যাজিস্ট্রেট যেখানে ক্যাম্প করেছেন সে স্থানটি একটি ছোট জনপদের মতো লাগছে। শিকার ছাড়াও চিত্তবিনোদনের অঢেল ব্যবস্থা হয়েছে। সাহেবদের আপ্যায়নের জন্য পারিকুদের রাজা ও মালুদের জাগীরদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বজন বিদিত। মারাঠাদের আমলে পারিকুলের নাম ছিল কিন্তু ইংরেজদের অভ্যুত্থানের পর থেকে মালুদের জাগীরদারের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। কারুরই পূর্বের ন্যায় বৈভব নেই কিন্তু ইংরেজ-তোয়াজের বহর দেখলে তা বোঝা যায় না।

সাহেব আসতেই দুজনের কাছ থেকে ফল ও মিষ্টান্নের ডালা পৌঁছে যায়। কার ডালা কত বড় তা নিয়েও প্রতিযোগিতা। মিষ্টি সাহেবদের তেমন পছন্দ নয়। সেগুলি সাধারণত চাকরদের বিলিয়ে দেওয়া হয়। সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যগীতেরও আয়োজন করতেন এঁরা দুজন। কটক থেকে আনা হয় বাজি মদ্য ও ভোজ্য আর রম্ভা থেকে বারবনিতা। খোলা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে এসব করা হয়। আমোদ প্রমোদ গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে এবং শেষ হয় আতস বাজি দিয়ে। এমন একটি সন্ধ্যায় অর্থ ব্যয় হয় প্রচুর।

আর একটি বিষয়েও মিল আছে মালুদ ও পারিকুদের। সেটি তাদের জমিদারী সংক্রান্ত সমস্যা। পারিকুদের রাজার এক আত্মীয় তার জমিদারি দাবি করে মামলা করেছে। মালুদের জাগীরদারের বিমাতা তাঁর জামাতাকে জাগীরদার করার দাবি পেশ করেছেন। ফতে মহম্মদের নাতি জামালুদ্দিন প্রায়ই সাহেবের কাছে আসে। যে কাগজখানি সে সযত্নে আঁকড়ে রেখেছে সেটি ১৮০৩ সালে হারকোর্টের স্বাক্ষর করা সনদ, যাতে লেখা আছে ফতে মহম্মদ ও তার বংশধরগণ নিষ্কর জমির জাগীর উপভোগ করবেন। সনদটি দেখিয়ে জামালুদ্দিন বার বার তাঁর বদনসীবের বয়ান করেন।

এবার কোনো কাজে মন দেবার আগেই ম্যাকটিয়র পুরী রাজার মৃত্যুসংবাদ পেলেন। এ সংক্রান্ত এক তাড়া চিঠিপত্র নিয়ে সেরিস্তাদার পুরুষোত্তম পট্টনায়েক পুরী থেকে এসেছে। এক খানি পত্রে পুরীর দারোগা জানিয়েছে ১১ই রাজা দেহত্যাগ করেছেন এবং তার পরের দিন রানী খেমন্তির রাজকুমারকে রাজা বলে ঘোষণা করেছেন। ডেপুটি কালেক্টর সবিস্তারে ঘটনাবলী বর্ণনা করে লিখেছেন রাজার মৃত্যুর

পরে তিনি রাজার চাবিগুলি পাটরানী সূর্যমণির হাতে তুলে দিয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে মন্দির পরিচালনা করা যায় সে বিষয়ে মত ব্যক্ত করেছেন। কাগজপত্রের মধ্যে একখানি আর্জি আছে সূর্যমণির। তাঁর আবেদন দিব্যসিংহ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত জমিজমা ও মন্দিরের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হোক।

সব কাজ রেখে ম্যাকটিয়র এই চিঠিগুলির জবাব লিখতে বসলেন। প্রথম কাজ ডেপুটি কালেক্টর যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছেন তার অনুমোদন। তিনি তাই করলেন একটি হুকুমনামা জারি করে। একখানি দীর্ঘপত্রে তিনি রাজার মৃত্যু সংবাদ দিলেন কমিশনারকে এবং কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বর্ণনা করলেন। মন্দির পরিচালনা একটি জটিল ব্যাপার; সে বিষয়ে বিশেষ ভেবে পরে লিখবেন মনে করে বিষয়টি বাদ দিলেন। অনেক চিন্তা করে অপরাহ্নে নিম্নোক্ত পত্রখানি লিখলেন কমিশনারকে :

পুরী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্যাম্প
ফতেপুর, ১৩ই ডিসেম্বর

কমিশনার, কটক ডিভিশন
কটক
সমীপেষু
মহাশয়

১) এই পত্রের সহিত একটি আর্জির নকল সংলগ্ন করছি, যার থেকে জানা যাবে যে মন্দিরের সুপারিণ্টেডেণ্ট বীরকেশরীর মৃত্যু হয়েছে।

২) আরও জানা যাবে যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি খেমন্তির রাজপুত্রকে পোষ্য নিয়েছিলেন।

৩) বালকটির মন্দির পরিচালনার কোনও অভিজ্ঞতা নেই; বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজে লাগে এমন কোনও বিধান ১৮০৩ সালের আইনে নেই। সুতরাং শহরে শান্তিরক্ষার জন্য একজন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা হোক।

৪) এই পদের জন্য যাঁর দাবি সর্বাধিক তিনি হলেন রাজার খুল্লতাত পদ্মনাভ রায়। পদ্মনাভের পিতা মৃত রাজার পিতামহের ভ্রাতা। কিন্তু সত্যবাদী মন্দির পরিচালনায় তিনি গোলমাল করেছিলেন। তাছাড়া তিনি রাজার পোষ্য নেবার বিরোধী। সুতরাং তাঁকে যোগ্য বিবেচনা করি না। তাছাড়া জনসাধারণ পদ্মনাভকে মেনে নেবে বলে মনে হয় না।

৫) এ কাজের যোগ্য অন্য দুই ব্যক্তি আছেন। একজন কিল্লা রোড়ঙ্গের জমিদার খুর্দা বক্সীর বংশজ গোপীনাথ বিদ্যাধর এবং অন্যজন কটকের জমিদার রাধাশ্যাম নরেন্দ্র। দুজনকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। দুজনই নিষ্ঠার সঙ্গে এ কর্তব্য পালন করবেন বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য রাধাশ্যাম অধিক উপযুক্ত, কারণ তিনি শুধু যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাই নয়, তাঁর জমিদারি পরিচালনা লক্ষ্য করলে জানা যায় যে তাঁর বিষয়বুদ্ধি প্রখর। সাধু স্বভাবের জন্য নেটিভ ও ইউরোপীয়রা তাঁকে সম্মান দেয়। তিনি মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব নিলে মন্দিরের অর্থের সদ্ব্যবহার হবে এবং পালাপার্বনের সময় পুলিশের বাধা নিষেধগুলি পালিত হবে। সব মিলিয়ে আমার ধারণা নিরশেষ নেটিভরা তাঁকেই সমর্থন করবে।

৬) আপাতত আমি পুরীর দারোগাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে পুরী মন্দিরের সম্পত্তি যাতে হস্তান্তর না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

৭) সরকারের আদেশ আসতে সময় লাগবে। সুপারিণ্টেডেণ্ট নিযুক্তিতে দেরী করা অবশ্য সমীচীন হবে না। সরকারের আদেশ না আসা পর্যন্ত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা করার অধিকার আপনার আছে বলে আমার ধারণা।

আপনার অনুগত সেবক
জে. বি. ম্যাকটিয়র
ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট

পত্রখানি সঙ্গে সঙ্গে ডাকহরকরাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। পরে কি ভেবে সেখানির একটি নকল প্রস্তুত করিয়ে পুরুষোত্তম পট্টনায়ককে দিয়ে বললেন, 'কটক গিয়ে কমিশনারের হাতে দেবে এবং আদেশ নিয়েই ফিরবে।'

ডাকহরকরাদের ঘণ্টায় ছ মাইল গতিতে চলার নির্দেশ। কত ঘণ্টার পরে কতক্ষণ বিশ্রাম নির্দ্ধারিত। কিন্তু তারা মর্জিমত চলে এবং চিঠি পৌঁছাতে প্রায়ই দেরি হয়। তাদের হাতে কমিশনার চিঠি পেলেন তিনদিন পরে, তার আগেই পুরুষোত্তম পৌঁছে গিয়েছিল।

কটক : ডিসেম্বর ১৮৫৯

কমিশনার ককবার্ণ কড়া মেজাজের রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ। অফিসার হিসাবে রক্ষণশীল এবং নীতিবাদী। তিন বছর হল কটকে এসেছেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছেন। বোর্ড অফ্ রেভেনিউ-এর সচিব হিসেবে ওড়িশায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। তিনি ককবার্ণের মিত্র। সে জন্য কটক কমিশনারের প্রস্তাবগুলি বোর্ডে সহজে গৃহীত হয়।

মাঝে মাঝে পুরোন নথীপত্র পড়ে দেখেন ককবার্ণ। সম্প্রতি পুরী মন্দির সংক্রান্ত একটি ফাইল তাঁর হাতে এসেছে। একবার তিনি পুরী থেকে কোনার্ক গিয়েছিলেন। রাস্তা খারাপ, যাত্রা কষ্টসাধ্য ছিল। সেখানে গিয়ে ক্ষয়িষ্ণু মন্দিরের দেওয়ালে অশ্লীল মূর্তিগুলি দেখে তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল। কে কী কারণে এমন একটি মন্দির নির্মাণ করেছে তার থেকে তিনি বেশি বিচলিত হলেন কেন কেউ আজ পর্যন্ত এটিকে ধূলিসাৎ করে দেয়নি।

পাতা উল্টাতে উল্টাতে জানতে পারলেন তৎকালীন কমিশনার অন্তরায় না হলে কুড়ি বছর আগে রাজা রামচন্দ্র এটিকে ধ্বংস করে ফেলতেন। কিন্তু রিকেটসের মতো অফিসার মন্দির ভাঙা বন্ধ করেই ক্ষান্ত হন না, ভগ্নাবশিষ্ট রক্ষার জন্যও তৎপর হন।

ভাগ্যক্রমে সে সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাবই কার্যকর হয়নি। মন্দিরের ক্ষয় অব্যাহত আছে। এক বছর পূর্বে পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট মন্দিরটির সংস্কারের প্রস্তাব করেন। ককবার্ণের জবাব : কালো প্যাগোডার দুর্গতি দেখে দুঃখ না করে বরং খুশি হবার কথা। এর দেওয়ালে যে পাশবিক মূর্তি খোদাই করা হয়েছে তার জন্য এটিকে ভেঙে ফেলাই ভাল। মন্দিরের ঘৃণিত অবশেষ রক্ষার জন্য এক কপর্দকও অপব্যয় করা গর্হিত কাজ হবে।

ককবার্ণ এও জানলেন যে কুড়ি বছর আগে সরকার নবগ্রহ প্রস্তরটি কলকাতায় পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে নির্দেশ আজও পালিত হয়নি। সেটি এখনও সেখানেই পড়ে আছে যেখানে রামচন্দ্রের লোকেরা সেটিকে খসিয়ে ফেলেছিল। ককবার্ণ স্থির করলেন মন্দিরের অবশিষ্ট অংশও ভাঙা হবে এবং সকল মূর্তি ও পাথর কলকাতা পাঠানো সম্ভব না হলেও অন্তত নবগ্রহটি কলকাতা পৌঁছে দেবেন।

এই মর্মে সঙ্গে সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করতেন; কিন্তু ততক্ষণে পুরী ম্যাজিস্ট্রেটের জরুরি পত্রখানি হস্তগত হল। মৃত রাজার স্থানে গোপীনাথ বিদ্যাধরকে মন্দিরের সুপারিণ্টেডেণ্ট করার প্রস্তাব নিতান্ত হাস্যকর। গোপীনাথের পিতা জগবন্ধু ইংরেজদের বেশ নাজেহাল করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এই পরিবারকে লোকে বিস্মৃত হয়েছে। এখন গোপীনাথকে সুপারিণ্টেডেণ্টের পদে বহাল করলে অজানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সব কাজ ছেড়ে পুরাতন নথীপত্র ঘেঁটে, আইনের দিকটি খতিয়ে দেখে বোর্ড অফ রেভেনিউকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখলেন ককবার্ণ। পত্রের সারমর্ম এরকম : মন্দির পরিচালনার ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। রাজার ইচ্ছাপত্রের শর্ত অনুসারে রানীর উপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত। মন্দিরের নামে যে সাতশো হাজার মহল এবং খুর্দাতে যে লাখরাজ জমি আছে, সিভিল কোর্টে দরখাস্ত করে রানী তার সার্টিফিকেট নেবেন। অন্য জমিজমা কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের হেপাজতে থাকবে। পোষ্যপুত্রটি রানীর তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউটে পড়বে।

ককবার্ণ দিনের কাজ শেষ করে চলে গেলে, নব্য কেরাণী গৌরীশংকরও কাজ শেষ করে কালেক্টর অফিসে কার্যরত বিচিত্রানন্দ দাসকে খুঁজতে গেলেন। দিনের শেষে তাঁরা একসঙ্গে ঘরে ফেরেন। যদিও গৌরীশংকরের থেকে দশ বছরের বড়ো বিচিত্রানন্দ এবং চাকুরি শুরু করেছেন পনেরো বছর আগে। তিনি গৌরীশংকরের সঙ্গে মিত্রের মতো আচরণ করেন, কারণ গৌরীশংকর তীক্ষ্ণধী এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। আজ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন পুরীর সেরিস্তাদার পুরুষোত্তম পট্টনায়েক।

কাছারীর বাইরে এসে বিচিত্রানন্দ গৌরীশংকরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'কি হে সব জান্তা, পুরীর খবর কি?'

গৌরীশংকর বললেন, 'সব ঠিক আছে, কেবল খেমন্তির রাজকুমারকে পোষ্য নেওয়াতে কেমন খটকা লাগছে।'

বিচিত্রানন্দ বললেন, 'কেন খেমন্তির রাজা তো ভালো লোক।'

গৌরীশংকর বললেন, 'সব গোলমালের সূত্রপাত হয় একশ বছর আগে।'

বিচিত্রানন্দ ভাবলেন একটি লম্বা বক্তৃতা না শুনে রেহাই নেই, প্রকাশ্যে বললেন, 'এস বসি, পুরো কাহিনী শুনি।'

পুরুষোত্তম বললেন, তাঁর সময় নেই, তাঁকে ফতেপুর ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

গৌরীশংকর বললেন, 'আরে মশাই বসুন না, যা বলব তার সঙ্গে ফতে মহম্মদেরও সম্বন্ধ আছে।'

সকলে কাছারীর সামনে মাঠে বসলে গৌরীশংকর শুরু করলেন :

১৭৬০ সালে খেমন্তির রাজা খুর্দা আক্রমণ করলেন। তখন খুর্দার রাজা প্রথম বিক্রম কেশরী দেব। তিনি মারাঠা সুবেদার শিবভট্ট সাঠের সাহায্য চাইলেন। পরিবর্তে এক লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মারাঠারা খেমন্তির রাজাকে পিছু হটতে বাধ্য করল। বিক্রম কেশরী অর্থ দিতে অসমর্থ হয়ে বাধ্য হয়ে চারটি পরগণা মারাঠাদের বন্ধক দিলেন।

১৮০৩ সালে ওড়িশা অভিযানের আগে ইংরেজরা খুর্দা রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সাহায্য চাইল। নাবালক রাজার উকিল গঞ্জাম গিয়ে সাহায্যের শর্ত আলোচনা করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, বিনিময়ে ইংরেজরা খুর্দার রাজাকে এক লক্ষ টাকা দেবে এবং চারটি পরগণা মারাঠাদের থেকে ছিনিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেবে। হারকোর্ট অর্থ দিতে রাজি হলেন, দশ হাজার টাকা অগ্রিমও দিলেন কিন্তু চারটি পরগণা ফিরিয়ে দিতে রাজি হলেন না।

ইংরেজদের অভিযানে খুর্দার রাজার ভূমিকা নগণ্য, কারণ ভীত মারাঠারা প্রতিরোধ না করেই পালিয়ে গেল। ইংরেজরা যখন বিজিত অঞ্চলের শাসন পরিচালনা শুরু করল তখন রাজার অমাত্য জয়ী রাজগুরু কটক গিয়ে রাজার প্রাপ্য অর্থ দাবি করল। কমিশনার চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন রাজা একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলে বাকি অর্থ পাবেন। চারটি পরগণা ইংরেজরা নিজেদের দখলেই রাখল। এগুলি উদ্ধার করার জন্য রাজা এবার মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তিনি নাগপুরের পেশোয়াকে খবর পাঠালেন যে তিনি অধিক বলশালীর পক্ষ নেবেন। বর্ষার ছাট যেদিক থেকে আসে লোকে সেদিকেই ছাতা ধরে।

এ প্রচেষ্টা ফলবতী হল না। মরিয়া হয়ে খুর্দার রাজা এবার পিপিলি অঞ্চলে ইংরেজদের অধীন কয়েকটি গ্রাম আক্রমণ করলেন। জবাবে ইংরেজরা তাঁকে গদিচ্যুত করে খুর্দাকে ইংরেজ শাসনভুক্ত করে নিল। বানপুরের পাইকরা যাতে গোলমাল না করে তা সুনিশ্চিত করতে ওয়াজ মহম্মদকে বানপুরের আমীল নিযুক্ত করল। ডিসেম্বরে রাজার অধীনস্থ বরুণেই গড় দখল করলেন হারকোর্ট। অবশ্য রাজা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। ১৮০৫ সালে ওয়াজ মহম্মদ রাজাকে বন্দী করে ইংরেজদের হাতে

সমর্পণ করল। ইনাম পেলেন তিন হাজার টাকা। ইংরেজরা রাজাকে প্রথমে বারবাটি এবং পরে মেদিনীপুরে বন্দী করে রাখল। একখানি আর্জি পেশ করে রাজা জানালেন, তিনি নির্দোষ, রাজগুরুই ত' নষ্টের মূল, সে তাকে খুর্দাতে বন্দীর মতই রাখত। ১৮০৭ সালে ইংরেজরা রাজাকে মুক্ত করে দিল কিন্তু খুর্দাতে ফিরতে দিল না, স্থির হল তিনি পুরীতে বসবাস করবেন। সেইদিন থেকে তিনি পুরীর রাজা বলে পরিচিত হলেন। বলা বাহুল্য তাঁর কোনও রাজ্য থাকল না।

বিচিত্রানন্দ বললেন, জয়ী রাজগুরুর বিরুদ্ধে বলা রাজার অনুচিত হয়েছে। গৌরীশংকর বললেন, পাইক বিদ্রোহের সময় এ কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। বক্সী জগবন্ধু রাজাকে পুনরায় খুর্দায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু স্বয়ং রাজা বক্সীকে ক্ষমা প্রার্থনা করে পেনশন স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলেন। ওয়াজ মহম্মদ বুঝিয়ে সুজিয়ে বক্সীকে কটকে কমিশনারের কাছে নিয়ে গেলেন। এবার তাঁর পুরস্কার এক হাজার টাকা।

ইতিহাস শুনে বিচিত্রানন্দ ও পুরুষোত্তম উঠে দাঁড়ালেন। পুরুষোত্তমকে তাঁদের সঙ্গে যেতে পীড়াপীড়ি করলেন বিচিত্রানন্দ ও গৌরীশংকর। তিনি রাজি হলেন না, তাঁর ফতেপুর ফেরার তাড়া। তাছাড়া মদ্যপানে বা বক্সী বাজারের নৃত্যগীতে আর রুচি নেই।

কোনার্ক : ফেব্রুয়ারি ১৮৬০

এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রেনার বালির উপর বসে খাতায় লেখা হিসাবগুলি মিলিয়ে দেখছেন। চারিদিকে ঝোপ ঝাড়। পাশে দাঁড়িয়ে বাঙালি ওভারশিয়ার নিবিষ্ট মনে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে রেনার নিম্ন স্বরে আউড়ে যাচ্ছেন :

নবগ্রহ প্রস্তর : ৩৬১ ঘন ফুট

ওজন ৬১৯৯৭.২৫ হন্দর অর্থাৎ ২৬.৬৭ টন অথবা প্রায় ৭২৩ মন।

ভোর বেলায় পুরী থেকে যাত্রা করে রেনার যখন কোনার্ক পৌঁছান তখন রৌদ্রের তাপ প্রখর। কর্তব্য ভিন্ন অন্য কিছুতে তাঁর আগ্রহ নেই। অন্য কেউ হলে আরও একটু কাছে গিয়ে মন্দিরটি নিরীক্ষণ করত। রেনার কিন্তু সোজা গিয়ে নবগ্রহের পাশে বসলেন ফিতা নিয়ে এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে ওজনের হিসাবে মন দিলেন।

কাজটি যত সহজে সম্পন্ন হবে ভেবেছিলেন তত সহজে হল না। স্থানটি অসুবিধাজনক। পুরী থেকে কোনার্কের রাস্তা ভাল নয়। তাছাড়া মন্দিরের আশে পাশে ছোটো ছোটো গাছপালা, ঝোপঝাড়ে দুর্গম, মাঝে মাঝে পাহাড় পরিমাণ বালির স্তূপ। বন্যজন্তু চলাফেরা করে। লোক পারতপক্ষে এদিক মাড়ায় না। ককবার্ণের

নির্দেশে রেনার এসেছেন নবগ্রহ প্রস্তরটি কলিকাতা পাঠাবার উপায় নির্দ্ধারণ করতে।

প্রস্তরটি সমুদ্রকূল পর্যন্ত নিয়ে যেতে একটি রাস্তা দরকার। সেই রাস্তার উপরে কাঠের পাটাতন বিছিয়ে তার উপর রোলার বসিয়ে প্রস্তরখানি দড়ি দিয়ে টেনে অথবা হাতির সাহায্যে কূলে নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামের মধ্যে আছে:

১) বারখানা চারহাতি তকতা, রোলারের জন্য আটটি শালকাঠের গুঁড়ি, পঞ্চাশটি পেরেক, পঁচিশ খানা শাবল, দুটি মোটা ১০০ ফুট লম্বা দড়ি এবং পঞ্চাশজন মজুর। মন্দির থেকে প্রস্তরখানি সমুদ্রকূল পর্যন্ত নিতে চারদিন লাগবে।

২) সমুদ্রকূল থেকে জাহাজ পর্যন্ত নিতে ভেলার প্রয়োজন। যাতে ৬৫০০ গ্যালন বা ততোধিক জল রাখা যায় এতগুলি পিপের উপর ভেলাটি তৈরী হবে এবং কয়েকটি নৌকা টেনে সেটিকে জাহাজের কাছে নিয়ে যাবে।

এর জন্য মজুরী ও সাজসরঞ্জামের খরচ পড়বে ২২৫ টাকা। এই পর্যন্ত পড়ে খাতার পাতা উল্টালেন রেনার। পরের পাতা জুড়ে একটি বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন। ভেলা থেকে কেমন করে প্রস্তরটি জাহাজে উঠাবেন তার সমাধান খুঁজে পাননি তিনি। সাধারণ মাল উঠানো নামানোর যে বন্দোবস্ত আছে তা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া প্রস্তর খণ্ডের ওজন জাহাজের একদিকে পড়লে জাহাজ ডুবে যেতে পারে। কিছুক্ষণ আগে রেনার জাহাজের ডেকের মাপ নিয়েছেন। তিনি ঠিক করলেন পুরী ফিরে এ সমস্যার সমাধান খুঁজবেন। খাতা বন্ধ করে উঠে দাড়াতেই সম্মুখে ছ'জন ঘোর দর্শন লোকের উপর নজর পড়ল। ঘাবড়ে গেলেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখেন ওভারশিয়ার উধাও। ভাল করে দেখে বুঝতে পারলেন এই কৃষ্ণকায়, সিন্দুর চর্চিত ললাটের লোকগুলি ব্রাহ্মণ। তারা নবগ্রহের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। প্রস্তরটির দিকে দৃষ্টি যেতে দেখলেন এর স্থানে স্থানে সিন্দুরের প্রলেপ লেগেছে।

মহাবিপদে পড়লেন রেনার। বেগতিক দেখে চম্পট দিয়েছে ওভারশিয়ার। পাণ্ডারা কি করবে কে জানে। রেনার তাদের ঘাঁটালেন না এক পা এক পা করে পাল্কির দিকে অগ্রসর হলেন। একটু পরে পিছন ফিরে দেখেন পাণ্ডারা তাঁর অনুসরণ করছে না। রেনার স্থির করলেন পুরী ফিরে প্রথম কাজ হবে ওভারশিয়ারকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া। আর রিপোর্টে উল্লেখ করবেন যে নবগ্রহ প্রস্তরটি স্থানান্তর করার চেষ্টা করলে স্থানীয় লোকেরা বাধা দিতে পারে।

জগন্নাথ সড়ক : জুন ১৮৬০

ভোর হতেই নাথ খুন্টিয়া চিৎকার করে তীর্থযাত্রীদের জাগিয়ে দিল। কাল অধিক রাত্রে দলটি পুরীর কাছে এই চটিতে পৌঁছে ছিল, ক্লান্তিতে সকলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নাথ

কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে বলল, ওঠ শালীরা, দেরী করলে রথযাত্রা দেখা তোদের ভাগ্যে নেই। শুনে সকলে ধড়ফড় করে উঠে পড়ল। দেখলে মনে হয় সকলেই নিষ্প্রাণ, কোনও ক্রমে দেহ টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তবুও সকলে আর একদিনের যাত্রার জন্য ব্যস্তভাবে প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মন আজ প্রসন্ন। আজ কঠিন যাত্রার শেষ দিন।

অন্য হাজার হাজার যাত্রীদের মত এই দলটি দশ দিন আগে যাত্রা শুরু করে ছিল। দলে দশজন, সকলে মহিলা। প্রতিদিন প্রায় ত্রিশ মাইল চলে তারা। সকলের পায়ে ফোস্কা পড়েছে, অনেকের পায়ে পট্টি বাঁধা। এমনটি যদিও আকছার হয়, ভাগ্যক্রমে নাথের দলের কেউ অসুস্থ হয়ে আধা রাস্তায় যাত্রা সমাপ্ত করেনি বা কারুর মৃত্যু হয়নি। জগন্নাথ দর্শনের অভিলাষ তাদের এত রাস্তা কষ্টে কিন্তু নির্বিঘ্নে টেনে এনেছে।

অন্য বছরের মতো এ বছরও চৈত্র মাসে নাথ খুন্টিয়া বর্ধমানের কাঞ্চনপুর এবং আশে পাশের গ্রামে এসেছিল। পুরীতে সে গামছা পরে খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এখন তার বেশভূষা অন্য রকম। মাথার সামনের আধা ভাগের চুল কামানো, ছোট ধুতি ও ছোট আচকান পরেছে, কাঁধে একটি বোঁচকা এবং হাতে পানদান। বাংলার গ্রামে গ্রামে এমনই অদ্ভুত পোশাকে পুরীর পাণ্ডারা বছরের এই সময়ে একটি দর্শনীয় বস্তু।

আসলে গ্রামের অলস ঘটনাবিহীন জীবনে পাণ্ডাদের আগমন একটি উত্তেজক ঘটনা। নাথ অনেক বছর তীর্থযাত্রী সংগ্রহ করতে এ অঞ্চলে আসছে। এখানকার জনসাধারণের চালচলন, হাবভাবের সঙ্গে সে পরিচিত। সে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতে পারে। সকলকে জগন্নাথ মন্দিরের শুকনো প্রসাদ একটু একটু দিয়ে মন জয় করে নেয়। গ্রামের বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা নাথকে জগন্নাথের অবতার ভাবে। নির্লজ্জের মতো নাথ এই স্তুতি উপভোগ করে।

সকালে একটু দেরীতে নাথ গ্রামে হাজির হয়। ততক্ষণে পুরুষেরা চাষের কাজে বেরিয়ে যায়। কাঞ্চনপুরে সে সোজা চলে আসে গোবিন্দ সামন্তের বাড়ি। এ পরিবারকে সে অনেকদিন থেকে চেনে। গোবিন্দের বিধবা মা সুন্দরী তার বিশেষ খাতির যত্ন করে। তার দেওর দয়ারামের স্ত্রী আদুরী বৈষ্ণবী। সে নিয়মিত পুরী যাতায়াত করে। তার কাছে জগন্নাথের কাহিনী বারংবার শুনে সুন্দরী জগন্নাথের ভক্ত হয়ে গেছে। জগন্নাথ দর্শনের প্রবল বাসনা তার মনে। কিন্তু গোবিন্দ রাজি হয় না। তার জেঠিমা পুরী থেকে ফেরার সময় কলেরায় মারা যান রাস্তাতেই।

নাথ খুন্টিয়া এলে পাড়াপড়শি স্ত্রীলোকদের ভিড় লেগে যায় গোবিন্দের বাড়ি। সুন্দরীর হাতের জলখাবার খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাথ বারান্দায় জাঁকিয়ে বসে এবং মহিলাদের প্রলুব্ধ করতে সত্যমিথ্যা মিশিয়ে জগন্নাথ ও পুরীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। পুরীর চতুর্দিকে দশক্রোশ রাস্তা পবিত্র। পুরীর সমুদ্রকূলের বালিতে গড়াগড়ি দিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষয় হয়। মহাপ্রসাদ স্বয়ং মা লক্ষ্মী রন্ধন করেন, রাঁধুনে ব্রাহ্মণ চাল

ডাল তরিতরকারি রাত্রিকালে রন্ধনশালায় রেখে আসে আর কি আশ্চর্য সকালে দেখে মহাপ্রসাদ প্রস্তুত! পুরীর সকল পুকুরের জল অমৃত, একবার অবগাহন করলে মোক্ষ অবধারিত। ইত্যাদি, ইত্যাদি। অভিভূত মহিলাগণ মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করে, সাময়িকভাবে তারা মেনে নেয় যে নাথ খুন্টিয়া জগন্নাথের প্রতিনিধি এবং তার উপস্থিতি গোবিন্দের আঙ্গিনা বড়দাণ্ডতে রূপান্তরিত করেছে।

নাথ খুন্টিয়ার ভাষণ শুনে অনেক মহিলা পুরী যাত্রার জন্য মনস্থির করে ফেলল। কিন্তু বাড়ি ফিরে পুরুষদের রাজি করানো সহজ কথা নয়। গোবিন্দ মাকে যেতে দিতে চায় না, কারণ সুন্দরী বৃদ্ধা, এত রাস্তা পায়ে চলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া রাস্তায় চোর বদমায়েস কলেরার ভয় তো আছেই। অবশ্য সুন্দরী এবং অন্য বিধবারা এতে ঘাবড়ায় না। তাদের অভিশপ্ত জীবনের একঘেয়েমির থেকে সাময়িক মুক্তির একমাত্র উপায় তীর্থযাত্রা।

যাত্রার পূর্বরাত্রে সুন্দরী কাপড়চোপড় বেঁধে চাল ডাল গুছিয়ে বেতের বাক্সে রাখল। কিছু টাকাপয়সা গাঁটে গুঁজে নিল। রাত্রে তার ঘুম এল না। প্রত্যুষে নাথ জয় জগন্নাথ জয়ধ্বনি দিতেই সুন্দরী বাক্সটি নিয়ে বাইরে চলে এল। গ্রামের প্রান্তে সুন্দরী দেখল আরও অনেকে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে জড় হয়েছে। সকলে স্ত্রীলোক এবং বেশির ভাগ বিধবা। মাত্র চারজন বিধবা নয়। তাদের দুজন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে, একজন স্বামীকে না বলে পালিয়ে এসেছে আর একজন যে স্বামী পরিত্যক্তা এবং বাপের বাড়ি থাকে।

জয় জগন্নাথ বলে নাথ খুন্টিয়া গ্রাম ছেড়ে পা বাড়াল। প্রথমে দলটির চলার গতি ও ভঙ্গিতে অসামঞ্জস্য দেখা গেল কিন্তু কিছুদূর যেতে একটি সমন্বয় এসে গেল তাদের চলার মধ্যে। নাথ কখনও কথা বলে কখনও বেসুরো গলায় জগন্নাথের ভজন গেয়ে তাদের পরিশ্রম লাঘব করতে লাগল।

উলুবেড়িয়া আসতেই নাথ খুন্টিয়ার ভাবভঙ্গি আমূল বদলে গেল। যে লোকটি এতদিন শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছিল, সে হঠাৎ খাঁটি ওড়িয়াতে বলতে আরম্ভ করল। যাদের এতদিন মা বলে ডেকেছে তারা হয়ে গেল শালী কিংবা রাঁড়ি। তার চলার গতি এমন বেড়ে গেল যে অন্যরা তার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল। এমন কি তার বোঁচকাটিও বইতে হল একজনকে। কোনো সরাইখানা আসতেই নাথ শুয়ে পড়ে। পরিশ্রান্ত মহিলারা বাজার থেকে চাল ডাল হাঁড়ি কিনে রান্না করে তাকে ডেকে খাওয়ায়। সরাইখানায় ঠাসাঠাসি করে শুতে হয়। নাথ তাদের ঠিক মাঝখানে শুয়ে অল্পবয়স্কা মেয়েটিকে হাত পা টিপে দিতে বলে। সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে নাথ বলে, 'যা তুই শুয়ে পড়গে, অন্য মেয়েটিকে পাঠিয়ে দে।' চটিতে স্থানাভাব হলে সে অন্য দলের সঙ্গে মিশে শোয় আর মহিলারা গাছতলায় রাত কাটায়। প্রথমে এত কষ্ট সহ্য হত না, অনেকে কান্নাকাটি করত। এখন সব গা সওয়া হয়ে গেছে।

মেদিনীপুর পৌঁছে দেখা গেল হাজার হাজার যাত্রীর ভিড়। তাদের মধ্যে বাঙালি আছে, বিহারী আছে, পশ্চিমা আছে। এমন দলও আছে যারা কয়েক মাস আগে ঘর ছেড়েছে। কিছু যাত্রী গোরুর গাড়ি চড়ে যাচ্ছে, অধিকাংশ অবশ্য পায়ে চলার যাত্রী। এক দিনে তারা ত্রিশ চল্লিশ মাইল এগিয়ে যায়। রৌদ্রবৃষ্টির ভ্রূক্ষেপ নেই, ক্ষতবিক্ষত পায়ে তাদের চলার শেষ নেই, একমাত্র লক্ষ্য যাত্রা শেষে জগন্নাথের দর্শন।

নারায়ণগড় পৌঁছে নাথ বলল, এ জায়গাটি ভাল নয়, চোর ডাকাতের ভয় টাকাপয়সা আমাকে দাও আমি সামলে রাখব। কিন্তু কেউ তার পরামর্শে কান দিল না বরং পয়সার পুঁটুলিগুলি আরও একটু ভালো করে কোমরে গুঁজল। নাথ ভাবল, টাকা আদায় করার উপায় আমি জানি, আগে পুরী আসুক। সে ভালোই জানে এই বিদেশ বিভুঁই-এ তার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই এদের।

জগন্নাথ সড়কে ভয়ের উদ্রেক হয় এমন অনেক কিছু আছে। সাপ, শিয়াল কুকুর প্রায় দেখা গেছে, তাই সকলের হাতে এখন একখানি করে লাঠি। মাঝে ডাকহরকরা দেখা যায়, হাতের লাঠিতে বাঁধা ঝুমুরের শব্দ করে তারা দৌড়ে চলে, কখনও বা গ্রামের চৌকিদার দেখা যায়। এরাও পয়সা দাবি করে। হঠাৎ কোনো ঘোড়সওয়ার দেখলে সকলে ভয়ে সিটিয়ে যায় কারণ বর্গীদের ভয় এখনও শেষ হয়নি। এমন সময় তাদের একমাত্র ভরসা নাথ খুণ্টিয়া। যে রাস্তাটি জগন্নাথ সড়ক বলে পরিচিত তার অবস্থা অতি শোচনীয়। ওড়িশা জয় করে ইংরেজরা রাস্তাটির নির্মাণ শুরু করে কিন্তু সে কাজ আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। যদিও কলিকাতার জমিদার সুখময় রায় পরে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন রাস্তাটি সম্পূর্ণ করার জন্য। এখন এটি খানাখন্দে ভর্তি এবং ধূলিময়। বর্ষা হয়েছে, অতএব রাস্তায় এখন কাদা গোরুর গাড়ির চাকায় যেখানে গর্ত হয়েছে সেখানে জল জমেছে।

চটিগুলির দুরবস্থা অবর্ণনীয়। অনেক চটিতে জায়গা মেলে না। দেরিতে পৌঁছলে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, দোকানদার চড়া দাম হাঁকে। এমন দোকানদারও আছে যারা দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে মিশে খাবার জিনিসে বিষ মিশিয়ে দেয়। মাঝিরা নদী পার করতে নাজেহাল করে। যে বছর কলেরার মহামারী হল সে বছর হাজার হাজার যাত্রী রাস্তায় প্রাণ হারায়। শবসৎকার করে মুদ্দফরাস।

ভাগ্যক্রমে এ বছর কলেরা হয়নি। নাথের দলকে কোনো বড়ো ধরণের বিপদেও পড়তে হয়নি। এক জায়গায় দেখা গেল এক বৃদ্ধা গাছতলায় বসে কাঁদছে। পড়ে গিয়ে তার হাত ভেঙেছে। দলটি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লে নাথ তাগাদা দিল, 'চল চল, জগন্নাথের কৃপায় এও পুরী পৌঁছে যাবে।' এক জায়গায় শেয়াল একটি শব ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখে নাথ মন্তব্য করল, 'জগন্নাথের কৃপায় এর স্বর্গ প্রাপ্তি হয়ে গেছে।'

পুরী নিকটেই, তবুও যাত্রীদের বিশেষ উৎসাহ নেই। শরীর ক্লান্ত, পা চলছে না। কোনোক্রমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলছে তারা। সান্ত্বনা যে এ দলের কেউ

রাস্তায় রয়ে যায়নি। এমন কি বৃদ্ধা সুন্দরীও সবার সঙ্গে চলছে। পুরী যত কাছে আসছে নাথের গতি ততই বাড়ছে। হঠাৎ একটি মোড় ঘুরতেই মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সমবেত হরিবোল ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হল। সেই ধুলিময় রাস্তায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল সকলে। নাথ তার দলের উদ্দেশে বলল : 'তোমরা এবার স্বর্গের দ্বারস্থ। জীবনে যত পাপই করে থাক, এবার মুক্তি। একটি কথা মনে রাখবে, এই পুরীধামে যা দেখবে সব গোপন রাখবে। যদি কথা এক কান থেকে দু কান হয় তবে সকল পুন্য ক্ষয় হবে।'

পুরী শহরে পৌঁছে দেখা গেল লোকে লোকারণ্য। নাথ তার দলটিকে নরেন্দ্র পুকুরে স্নান করিয়ে বেলিয়া গুরুর আশ্রমে নিয়ে এল। এবার মহিলাদের মুখে স্বস্তির আভাস। অনেক পুন্যের ফলে একা পুরী এসে জগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য হয়।

রথ যাত্রার দিন নাথ খুণ্টিয়া ধোপদুরস্ত কাপড় পরে তার দলটিকে মন্দির ঘুরিয়ে দেখাল। প্রত্যেক জায়গায় তাদের পয়সা দিতে বাধ্য করল। বরকন্দাজের গালাগালি, ধাক্কাধাক্কি অশ্লীল ইঙ্গিত সয়ে যখন দলটি বাইরে এল তখন তারা প্রসন, যাত্রা সফল হয়েছে। নাথও খুশি, আয় ভালো হবে। মন্দিরের পাণ্ডারা এবং লজিং হাউজের মালিক তাকে কমিশন দেবে। তাছাড়া দলটির থেকে যতটা সম্ভব আদায় করে নিয়েছে। আর একটি কারণেও তার মন প্রসন্ন। আরতি মেয়েটি এখন তার বশে, সব কথা শোনে। এ মেয়েটিকে সে রেখে দেবে। পাটনার পাঠানের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। তার সঙ্গে দামে না পোষালে তেলেঙ্গাবাজার তো আছেই। সব মিলিয়ে আমদানি মন্দ হবে না।

রথের কাছে এসে সকলে রথ টানা শুরু হবার প্রতীক্ষা করছে এমন সময় কলরব উঠল। নাথ বলল, 'দেখ মহারাজা!' সকলে রথের দিকে চোখ ফেরাল, রথের উপর যাদের দেখা গেল তাদের কেউ মহারাজা বলে মনে হল না! ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডাদের সামনে জরির পোশাকে দাঁড়িয়ে কাঁদছে একটি চার পাঁচ বছরের বালক, তার হাতে সোনার পাতে মোড়া একখানি ঝাড়ু। সকলে তাকে চুপ করানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু তার কান্না থামে না। তার দলের লোকেরা এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে দেখে নাথ বলল, 'আরে হা করে কোথায় চেয়ে আছ, রথের দিকে তাকাও। প্রণাম কর। রথের উপর যে ছেলেটিকে দেখছ সেই তো আমাদের ঠাকুর রাজা দিব্যসিংহ দেব।'

পুরী : মার্চ ১৮৬৩

পিতার সঙ্গে পুরী এসে দিব্যসিংহ আনন্দে কাটাচ্ছিল। পুরী নতুন জায়গা, তাছাড়া সমুদ্র দেখার উত্তেজনা। দত্তক যজ্ঞের সময়ও সে খুশি ছিল। পিতামাতা সঙ্গে আছেন। যজ্ঞের সময় সে প্রায় ঘুমিয়ে কাটাল। যজ্ঞের পরে রাজগুরু যখন তাকে

নতুন পাল্কিতে বসিয়ে চামর দুলিয়ে মন্দিরে নিয়ে গেল তখনও সে বিচলিত হয়নি। মন্দিরে তাকে রাজসম্মান দেওয়া হল। মন্দিরের আচার আচরণ বেশ মজাদার লাগল। ফেরার সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙলে দেখল সে এক অপরিচিত স্থানে এবং খুব শোরগোল হচ্ছে। ততক্ষণে বীরকেশরীর মৃত্যু হয়েছে এবং তার মরদেহ সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়ল পিতা সেখানে উপস্থিত। আশ্বস্ত হয়ে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে পিতা এসে কোলে তুলে আদর করে বললেন, 'এখন যাচ্ছি, আবার আসব।' কিন্তু অপরাহ্নে পিতা এলেন না। কিছুক্ষণ গেলে দিব্যসিংহ কেঁদে ফেলল। কেঁদে কেঁদে সূর্যমণি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। চাকরেরা হাজার চেষ্টা করেও দিব্যসিংহকে শান্ত করতে পারল না, তার এক গোঁ, বাবার কাছে যাব। সে রাত্রে দিব্যসিংহ খেল না, কাঁদতে কাঁদতে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিনও একই অবস্থা। কোনও কথা শোনেনা ছেলে। খেতে দিলে থালা ছুঁড়ে ফেলে দিল। অগত্যা সূর্যমণিকে খবর দিতে হল। তিনি শয্যা ছেড়ে অশ্রু মুছে দিব্যসিংহের কাছে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তার কান্না বেড়ে গেল, বাবার কাছে যাবার জন্য জিদ করল। সূর্যমণি যতই চেষ্টা করুন না কেন দিব্যসিংহের কান্না থামে না, ধরতে গেলে দৌড়ে পালায়। শোক সামলে উঠতে পারেননি সূর্যমণি, বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না, চাকরাণীর কাছে দিব্যসিংহকে দিয়ে চলে গেলেন।

এবার চাকররা তাকে ধমক দিলে দিব্যসিংহ দ্বিগুণ চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে ঘরে বন্ধ করে দিল তারা। দিব্যসিংহ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। এবার একজন একখানি ছড়ি হাতে নিয়ে দরজা খুলে দিল, শাসাল আর কাঁদলে পিটিয়ে মাথা ভেঙে দেবে। এবার দিব্যসিংহ চুপ করল।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ঘরের বাইরে এলেন সূর্যমণি। এ সময়টা দিব্যসিংহের চাকরদের তত্ত্বাবধানে কাটল। চাকররা বুঝতে পেরেছিল তাকে ভয় দেখালে কাজ হয়। কিন্তু কাছে গেলেই চিৎকার ও কান্না শুরু করে। একবার এক চাকরাণীর হাত কামড়ে দিল। খেমণ্ডির রাজা আরও কয়েকটিদিন পুরীতে কাটালেন। ছেলে দেখার জন্য রোজ রাজবাড়িতে আসেন কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পান না। সূর্যমণি ভৃত্যদের এ বিষয়ে কোনোও নির্দেশ দেননি বলে তারা তাঁকে ঢুকতে দেয় না। শেষে নিরাশ হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন তিনি।

এদিকে পদ্মনাভ রায় আর্জি দিয়ে জমিজমার দায়িত্ব চাইলেন, তাঁর মতে তরুণী সূর্যমণি এ কাজের অযোগ্য। তাঁর দেখাদেখি খেমণ্ডির রাজা একটি আবেদন করলেন। তাঁর বক্তব্য দিব্যসিংহের জন্মদাতা হিসাবে সম্পত্তির উপর তাঁর অধিকার বর্তায়। বিরক্ত হয়ে সূর্যমণি হুকুম দিলেন খেমণ্ডির রাজাকে আর রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে দেবেন না।

কমিশনারের আদেশ অনুযায়ী সূর্যমণি সিভিল কোর্টে আবেদন করলেন এবং সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের অধিকার পেলেন। কিন্তু তিনি রাজবাড়ির বাইরে যান না, সম্পত্তি দেখাশুনার কোনও অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং গোমস্তাদের দাপট বাড়ল।

দিব্যসিংহ সূর্যমণির এক বড়ো সমস্যা। সে তাঁকে স্বীকার করেনি। হাজার স্নেহ করলেও তাঁর কাছে আসে না, সর্বদা গালি দেয়। একদিন কি নিয়ে দিব্যসিংহ এমন জিদ ধরল যে সূর্যমণি তাকে এক থাপ্পড় মারলেন। রেগে দিব্যসিংহও তাঁকে চড়চাপড় মারল এবং হাত কামড়ে দিল। সূর্যমণি কেঁদে ফেললেন, পতিকে স্মরণ করে বললেন, 'একে কড়া শাসন করতে মানা করে ছিলে এখন বলে দাও কেমন করে এই দস্যি ছেলেকে সামলাব।'

সত্যই সূর্যমণি দিব্যসিংহকে সামলাতে পারলেন না। আজকাল গোঁ ধরলে সূর্যমণি তাকে চাকরদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। তার শিক্ষক নিযুক্ত হল কিন্তু দিব্যসিংহ তার কাছে ঘেসল না। ক্রমে চাকরদের উপরই তার দেখাশুনার ভার ন্যস্ত হল। গোড়ার দিকে তারা দিব্যসিংহের ভাষায় গঞ্জামী টান নিয়ে তাকে ক্ষেপাত। কিছুদিন যেতে না যেতে দিব্যসিংহ তাদের মারধোর করতে শুরু করল। সূর্যমণির মহলে ক্বচিৎ যায় সে। তার অধিকাংশ সময় কাটে চাকরদের সঙ্গে। তাদের থেকে সে যত অশ্লীল গালি রপ্ত করে ফেলল, এমন কি ভাঙের নেশাও ধরল। চাকররা বুঝেছে যে তার উৎপাত বন্ধ করার সহজ উপায় তাকে একটু ভাঙ খাইয়ে দেওয়া।

কালক্রমে এ সব কথা খেমণ্ডির রাজার কানে গেল। সম্পত্তি বিষয়ক মামলার যাই হোক, ছেলে কি ভাবে মানুষ হচ্ছে দেখতে তিনি পুরী চলে এলেন। রাজবাড়ি পৌঁছে তিনি খবর দিলেন সূর্যমণিকে। সূর্যমণি জবাবে জানালেন দত্তক দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিব্যসিংহের উপর সকল দাবি হারিয়েছেন; সুতরাং তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। রাজা হাল ছাড়লেন না প্রত্যহ রাজবাড়ি আসেন। একদিন নিরাশ হয়ে ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছেন এমন সময় দেখলেন। দিব্যসিংহ বাইরে আসছে। তার দিকে হাত বাড়ালে দিব্যসিংহ ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বাপু কে হে?' খেমণ্ডির গোমস্তা বলল, 'মণিমা, ইনি আপনার পিতা।' ভেংচি কেটে দিব্যসিংহ বলল, 'যা শালা, আমার পিতা ফিতা নেই।'

খেমণ্ডির রাজা মনস্থ করলেন কালেক্টরের কাছে নালিশ করবেন। জি. এন. বার্লো এখন কালেক্টর। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে সব কথা বললেন। বার্লো সব জানতেন। এও জানতেন যে সূর্যমণির পরিচালনায় সম্পত্তি বরবাদ হচ্ছে। তার অবশ্য করণীয় নেই কিছুই। কারণ সিভিল কোর্টের সার্টিফিকেট আছে সূর্যমণির কাছে। চালু ব্যবস্থার কোনোও পরিবর্তন করার অধিকার সেই কোর্টেরই আছে। পোষ্যপুত্র নেওয়ার ব্যাপারেও সরকারের কোনোও ভূমিকা নেই। সুতরাং খেমণ্ডির রাজাকে বার্লো

পরামর্শ দিলেন তিনি চাইলে ছেলেকে পাবার জন্য কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করতে পারেন।

মন্দির সংক্রান্ত অন্য এক বিষয়েও বার্লো চিন্তিত। সরকার একটি দলিল করতে চায়, কিন্তু সূর্যমণি ধরাছোঁয়া দিচ্ছেন না। ইতিমধ্যে আর. এন. শোর ককবার্ণের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেন। দলিলটির বিষয়বস্তু সরকারের সঙ্গে মন্দির পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা। খৃষ্টান পাত্রীদের মতে মন্দির পরিচালনার সঙ্গে জড়িত থেকে সরকার পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন। অতএব সরকার মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে এই দলিলটি প্রস্তুত করেছে। এটির মুখ্য ধারাগুলি নিম্নরূপ :

সরকার জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার কথা অনেকদিন দিন বিবেচনা করছে। এবং এই মর্মে কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। ওড়িশা জয় করে মন্দিরের জমিজমা ক্রমান্বয়ে সরকারি দখলে নেওয়া হয়েছে। মন্দির পরিচালনার খরচ চালানোর জন্য যাত্রীকর আদায় করে ৫৩০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই কর প্রত্যাহার করা হয় ১৮৪০ সালে কিন্তু অনুদান অব্যাহত আছে।

১৮৪৩ সালে সাতাশজন হাজারীমহল রাজাকে জমিজমা হস্তান্তর করা হল এবং মন্দিরের অনুদানের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হল। এই পরিমাণ আরও কমিয়ে দেওয়া হল দুই কিস্তিতে ১৮৪৫ এবং ১৮৪৬ সালে। ১৮৪৮ সালে অনুদান পুরোপুরি বন্ধ করে সম পরিমাণ আয়যোগ্য জমি দেওয়া হল। এই মর্মে একখানি দলিলে রাজা বীরকেশরী এবং ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকটিয়র স্বাক্ষর করেছিলেন।

নতুন দলিলে বলা হয়েছে জমি রাজার থাকবে, তবে রাজা হিসাবে নয়, মন্দিরের পরিচালক হিসাবে। জমিতে ফসল কেমন হয়েছে সরকার তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না। এ দলিলে দস্তখত হলে সরকার আর কোনো অনুদান দেবে না বা মন্দির পরিচালনা এবং আয় ব্যয়ের হিসাবের সঙ্গে কোনো প্রকারে যুক্ত থাকবে না। পরিচালক হিসাবে রাজাই এখন সকল বিষয়ে দায়ী হবেন। সূর্যমণি দলিলে স্বাক্ষর করতে টালবাহনা করছেন। বারবার তাঁর কাছে নোটিশ পাঠিয়ে কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত বার্লো স্বয়ং গিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন। সরকারের সঙ্গে মন্দিরের সম্পর্ক শেষ হল।

বালেশ্বর : মে ১৮৬৪

প্রত্যুষে স্নান করে পূজা করল রাধানাথ। জামাকাপড় পরে বালেশ্বর জেলা স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দিতে যাবে আজ। তারই প্রস্তুতি চলছে। শরীর ছিপছিপে,

বয়স মাত্র ষোল বছর। তাকে শিক্ষকের থেকে ছাত্রই বেশি মনে হয়। অবশ্য শিক্ষকতার দায়িত্ব নেবার মতো মনোবল তার আছে। রাধানাথ সাধারণ ছাত্রদের একজন নয়। বালেশ্বর জেলা স্কুল থেকে সেই প্রথম এনট্রান্স পাশ করেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, এমন সময় পিতা ডাকলেন পাশের ঘর থেকে। মনটা দমে গেল, কে জানে কি কারণে বকুনি শুনতে হবে। ধীরে ধীরে পিতার সামনে গিয়ে নতমস্তকে দাঁড়াল। পিতা সুন্দরনারায়ণ তার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে ভালো করে যাচাই করলেন। নিজের বাড়িতেও তিনি সদর কানুনগো। রাধানাথের পোশাকে কোনো খুঁত পেলেন না। বলার মতো কিছু না পেয়ে বললেন, 'নিযুক্তিপত্র নিয়েছ?' রাধানাথ পকেট থেকে সেটি বার করে দেখাল। 'রুমাল?' রাধানাথ রুমাল দেখাল। কোনো ত্রুটি না পেয়ে রাধানাথ মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন, 'কটা বাজে?' দ্রুত ভেবে রাধানাথেব মনে হল এ ঘরে আসবার আগে ঘড়ি দেখা উচিত ছিল, এখন আর কিছু করার নেই। জবাব দিল, 'ন'টা হবে।' পিতা এবার সুযোগ পেলেন। কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'সব কথা ভেবেচিন্তে বলবে, তুমি এখন দায়িত্বজ্ঞানহীন ছাত্র নও, সুশিক্ষক হবার চেষ্টা কর।'

পিতার ঘর থেকে এসে রাধানাথ বিমর্ষ হল, নতুন চাকরিতে যোগ দেবার উৎসাহ উবে গেল। তার জীবনের সব থেকে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা পিতার নির্মম শাসন। সে জানে পিতা তাকে স্নেহ করেন তাই পিতার বিরুদ্ধে যখনই মনে কোনো চিন্তা আসে তার অনুশোচনা হয়।

শৈশবেই মাকে হারিয়েছে রাধানাথ। তখন থেকে পিতার স্নেহ ও শাসন এক হারে বেড়েছে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে সামান্য দেরি হলে পিতা বেরিয়ে পড়তেন, রাস্তায় পেয়ে তিরস্কার করতেন এবং সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসতেন। সুন্দরনারায়ণের ভয়ে রাধানাথের কোনো বন্ধু তার বাড়ি আসতে সাহস করত না। এমনই নিঃসঙ্গ আতঙ্কিত ছিল তার ছেলেবেলা।

রাধানাথ যখন সোরোর ভার্ণাকুলার স্কুল থেকে এসে বালেশ্বর জেলা স্কুলে ভর্তি হল তখন প্রথম কয়েকদিন সুন্দরনারায়ণ রোজ সঙ্গে নিয়ে যেতেন স্কুলে। রাস্তায় বেশ্যাপাড়া পড়ে। সেখান দিয়ে যাবার সময় তার উপরে শ্যেন দৃষ্টি রাখতেন। ফলে সে ভীষণ সংকুচিত হয়ে যেত। তিনি বলতেন এখানে স্খলনের সম্ভাবনা, এদিকে সেদিকে তাকাবে না, সামনে নজর রেখে চলবে।

রাধানাথের এক সহপাঠী যদু কাটিয়া। সে মাঝে মাঝে রাধানাথকে তার বেশ্যাবাড়ির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। সত্য মিথ্যা যাই হোক রাধানাথ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলে না বাবা, তোকে বলব না, তুই তো যা শুনবি, বাড়ি গিয়ে বলবি আর আমায় পিটানী খেতে হবে। রাধানাথ অবশ্য পিতার উপ্রদেশ উপেক্ষা করে বেশ্যাপাড়া দিয়ে যাবার সময় কয়েকবার এদিকে সেদিকে তাকিয়েছে, রাস্তার দুপাশে যে স্ত্রীলোকদের

দেখেছে তাদের অন্যদের থেকে ভিন্ন মনে হয়নি। রাস্তায় জল কাদা নেই। সুতরাং স্খলনের বিষয়ে ধাঁধাঁ রয়ে গেল।

স্কুলে পৌঁছে প্রধান শিক্ষক গঙ্গাধর আচার্যের সঙ্গে দেখা করল রাধানাথ। তিনি খুব খুশি হলেন, উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'আরে দাঁড়িয়ে কেন, বসো বসো। তুমি এখন আর ছাত্র নও, আমার সহকর্মী।'

যোগদান পত্রে স্বাক্ষর হয়ে গেলে গঙ্গাধর বললেন, 'আমার ইচ্ছা ছিল কলকাতা থেকে এফ.এ. পাশ করে এসে সেকেণ্ড মাস্টার হও।' রাধানাথেরও তাই ইচ্ছা ছিল। অনেক চেষ্টার পরে সুন্দরনারায়ণ ছোটোভাই জাহ্নবীর সঙ্গে তাকে কলকাতা পাঠিয়েছিলেন। শহর দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের বাতাবরণ, কেশবচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের চর্চা, মাইকেল মধুসূদনের কবিতা—সব মিলিয়ে এক উদ্দীপনাময়ী অনুভূতি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে স্বাস্থ্য ভালো থাকল না বলে বাড়ি ফিরে যেতে হল।

শিক্ষক হিসাবে জীবনে প্রথমবার ক্লাস নিয়ে বাইরে আসতেই দেখল যদু কাটিয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সে বার বার ফেল করে এখনও স্কুল পার হতে পারেনি। যদু জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হল ক্লাস? নতুন মাস্টার পেলে সব ছাত্রই একটু হয়রান করে, এই আমিই কি কম করেছি? একমাত্র গৌরীশংকর রায় আমাকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। পারিস তো তার মতো হ।'

রাধানাথের মনে পড়ল পাঁচ ছ বছর আগে গৌরীশংকর কিছুদিন জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে। তাঁর ব্যক্তিত্ব রাধানাথকে প্রভাবিত করেছিল। তার মতো হওয়া কি সহজ কথা!

স্কুল থেকে ফেরার সময় মিশন স্কুলের হেডমাস্টার ফকিরমোহন সেনাপতির সঙ্গে দেখা হল। তিনি রাধানাথের খোঁজেই আসছিলেন। তাঁর বয়স রাধানাথের থেকে পাঁচ বছর বেশি। তারা আলাদা স্কুলে পড়েছে। অবশ্য পণ্ডিত সদাশিব নন্দ জেলাস্কুলে যোগ দিলে দুজনেই তার কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছে। রাধানাথ অধিক মেধাবী। ফকিরমোহন যখন রঘুবংশমের পঞ্চম অধ্যায়ে রাধানাথ তখন রঘুবংশম শেষ করে কুমারসম্ভবমের পঞ্চম সর্গ ধরেছে। এই অসম প্রতিযোগিতা ফকিরমোহনের ভালো লাগল না। সে অন্য পণ্ডিতের কাছে গেল। রাধানাথ যখন এনট্রান্স পরীক্ষা দিল তখন ফকিরমোহন বারবাটী স্কুলে শিক্ষক। বেতন আড়াই টাকায় শুরু পরে বেড়ে হয়েছিল চার টাকা। বালেশ্বর মিশন স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ খালি হলে রেভারেণ্ড মিলার দশটাকা বেতনে তাকে এই পদে নিযুক্ত করলেন। রাধানাথকে তিনি বললেন, 'ভালো হয়েছে আপনি তৃতীয় শিক্ষকের পদটি পেয়ে গেলেন, তা বেতন কত?' 'ত্রিশ টাকা', বললেন রাধানাথ। ফকিরমোহন বললেন, 'বেশ মোটা বেতন, এমন একটি চাকরি যদি আমি পেতাম!' কিছু দূর একসঙ্গে চলে ফকিরমোহন

বললেন, 'চলুন গড়গড়িয়ার ঘাটে বসে গল্প করা যাক।' পিতার ভয়ে রাধানাথ রাজি হল না, বাড়ির পথ ধরল।

পুরী : ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫

এমন পণ্ডিত কেউ কোনওদিন দেখেনি পুরীধামে। সেকালে কাছা দিয়ে ধুতি না পরলে ধর্মত্যাগী মনে করা হত, ব্রাহ্মণেরা কাগজ স্পর্শ করত না, ইংরেজি পড়া আর খৃষ্টান হওয়া এক কথা ছিল। তেমন সময়ে পণ্ডিত হরিহর দাস ইংরেজদরে মত কোট প্যাণ্ট জুতা পরতেন এবং ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতেন। এমন অদ্ভুত পোশাক পরিচ্ছদ ও চালচলন সত্ত্বেও কেউ তাঁর মুখের উপর কিছু বলতে সাহস করত না কারণ সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সকলে জানত। তিনি নবদ্বীপ এবং কলকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেছেন এবং মাতৃভাষার মতো সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারেন। বয়স মাত্র তেইশ বছর কিন্তু ঝানু পণ্ডিতেরাও তার সঙ্গে জ্ঞানের লড়াই-এ ভয় পান। ইংরেজি, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায়ও তাঁর ভালো দখল। জনসাধারণ তাঁকে সমীহ করে কারণ সাহেবদের সঙ্গে তাঁর অবাধ মেলামেশা। তিনি সাহেবদের ভয় করেন না এবং তাদের সঙ্গে সমান ভাবে কথাবার্তা বলেন। সাহেবরা তাঁর বাড়ি আসেন কিছু শেখার জন্য।

হরিহর দাস সংস্কৃতের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার প্রসার করতে চান ওড়িশায়। নিজের গ্রামে তিনি একটি স্কুল খুলেছেন। এখানে ছাত্ররা ছাপা বই পড়ে, তালপাতা ও লেখনীর বদলে কাগজ কলম ব্যবহার করে। ছাত্ররা সকলে অব্রাহ্মণ। রক্ষণশীল পরিবারগুলি ছেলেদের এ স্কুলে পাঠায় না। পুরী এলে হরিহর গ্রামেও যান, নিজে ছাত্রদের পড়ান এবং সঙ্গে আনা নতুন বইগুলি তাদের দেন।

তাঁকে প্রায়ই ওড়িশার বাইরে যেতে হয়। নিজের জীবিকা নির্বাহের সম্বল দরকার তার উপর স্কুল চালানোর খরচও জোগাড় করতে হয়। পৌরোহিত্য করে কিছু অর্থপান এবং তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে রাজারাজড়ারা কিছু দেয়। ওড়িশার রাজন্যবর্গ তাঁকে তেমন সম্মান দেয় না যেমনটি তিনি ওড়িশার বাইরে পান। কারণ হরিহর ঘোর নাস্তিক, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই।

অনেক লোক অবশ্য তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করে। ম্যাজিস্ট্রেট বক্সওয়েল তাঁর প্রিয় মিত্র। তিনি সংস্কৃত শিখতে আসেন। বাইরের রাজারা তীর্থ করতে পুরী এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ইংরেজিতে কিছু লেখার থাকলে লোকে তাঁর কাছে আসে।

হরিহর পুরী এলে সে ছেলেটি তার সঙ্গে দেখা করতে ভোলে না সে হল পুলিশ জমাদার ভাগীরথী রাওয়ের বার বছরের পুত্র মধু। ভাগীরথী ভুবনেশ্বর থানায় কাজ

করে। অতএব মধু তার মিত্র বলরামজীর বাড়িতে থেকে জেলাস্কুলে পড়ে। পাঁচ বছর বয়সে মধু মাকে হারায়। সেদিন থেকে তার ধর্মপ্রবণতা। তিন বছর আগে পুরী এসে অবধি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে মধু মন্ত্রপাঠ করে। পাথুরিয়া পাড়ার বানাশ্বর মহাদেবের দর্শন না করে জলস্পর্শ করে না। বলরামজী পুরী মন্দিরে আটা জোগান দেয়। তার বাড়িতে অনেক আটা চাকী। রোজ সকালে স্ত্রীলোক কর্মচারীরা আটা পেষে। চাকীর ঘর্ঘর শব্দে মনোযোগ দেওয়া কঠিন। এ সময়টা মধু রাস্তায় ঘুরে অথবা সমুদ্রকূলে বালিতে বসে কাটায়। বেলাভূমিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মধু অসীম জলরাশির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকে। সন্ধ্যায় বালির উপর শুয়ে আকাশে কোনো উজ্জ্বল তারকা চোখে পড়লে তার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়।

মধু মাঝে মাঝে স্বপ্নে মাকে দেখে। রাত্রি শেষে স্বপ্ন মিলিয়ে যায় কিন্তু একটি মধুর রেশ সারাদিন তাকে পুলকিত করে রাখে। সে অবশ্য আরও অনেক রকম স্বপ্ন দেখে। কখনও কখনও মসীময় আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জ ভেসে যেতে দেখে। সকালে সেই স্বপ্ন মনে পড়লে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

একদিন মধু এমন একটি স্বপ্ন দেখল যা ঘুম ভাঙার পরেও স্মৃতি থেকে মুছে গেল না। সব যেন স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে। সমুদ্রতটে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল এক বিরাট পুরুষ ওঁকার উচ্চারণ করতে করতে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। তার ইঙ্গিতে মোহগ্রস্তের মতো মধু তাঁর অনুসরণ করল। শহরের প্রান্তে এসে সেই আশ্চর্য পুরুষ অন্তর্হিত হলেন।

এই স্বপ্ন দেখার পরের দিন রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ মধু দেখল তার আগে চলেছেন পণ্ডিত হরিহর দাস। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল তার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ আর কেউ নন—ইনিই। মনে হয় হরিহর তো নাস্তিক তিনি কেন ওঁকার জপ করবেন। মধু হাজার চেষ্টা করেও কিন্তু স্বপ্নে দেখা দিব্যপুরুষ এবং হরিহরকে পৃথক ভাবতে পারল না।

অন্য একটি বিষয়ও আজকাল মধুকে বিচলিত করে। যদিও তাকে কেউ কিছু বলেনি মধু জেনে গিয়েছিল বলরামজীর দ্বিতীয়া কন্যা চম্পার সঙ্গে তার বিবাহের একটি পরিকল্পনা চলছে। বাড়িতে চম্পার সঙ্গে মেলামেশা হয় কিন্তু আজকাল চম্পা কাছে এলেই মনে এক বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি হয় এবং মধুর মুখ রক্তিম হয়ে যায়। চম্পাকে সে আজকাল এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে।

হরিহর বারান্দায় বসে কয়েকজন ছাত্রকে ইংরেজি পড়াচ্ছেন এমন সময় মধু এল। পড়ানো শেষ করে তিনি মধুকে বললেন, 'চল, আজ তোমাকে বক্সওয়েলের কাছে নিয়ে যাই।' মধু এ নামের সঙ্গে পরিচিত। পুরী জেলা স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে তিনি একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। চারটি বিষয়ে পাঁচটি করে প্রশ্নের যে

সঠিক উত্তর দিতে পারে সে পারিতোষিক পায় একশ টাকা। মধু এ প্রতিযোগিতা জিতেছে পর পর তিন বছর।

আজ হরিহর একটি বিশেষ কাজে বক্সওয়েলের কাছে যাবেন। তিনি পুরীতে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় খুলতে ইচ্ছুক যেখানে সংস্কৃত এবং দর্শনের সঙ্গে ইংরেজী, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শেখানো হবে। এছাড়া গণিত, ইতিহাস এবং জ্যোতিষশাস্ত্রও পড়ানো হবে। উত্তর ভারত ভ্রমণের সময় বলরামপুরের রাজা এ বিষয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন বক্সওয়েলের সহযোগিতা চাই।

দুজনে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোতে পৌঁছে দেখলেন তিনি ফাইলপত্রের কাজ করছেন। তাঁদের দেখে সাহেব খুশি হলেন, হরিহরকে বসতে বলে মধুকে জিজ্ঞাসা করলেন পড়াশুনা কেমন চলছে। স্কুলের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হল। প্রসঙ্গক্রমে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার কথা উঠতে বক্সওয়েল বললেন, 'এ বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, পূর্ণিয়ার কালেক্টর জন বীমস্ ভাষাতত্ত্বে বিদ্বান, আপনি তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারেন।'

তাঁদের যাবার সময় হলে, 'একটু দাঁড়ান' বলে বক্সওয়েল ভিতরে গেলেন। গ্রীক ভাষায় একখানি পুস্তক এনে বললেন, 'এটা আমি পড়িনি, আপনাকে দিলাম, পড়ে দেখবেন।' পুস্তকখানি সফোক্লিসের 'ইতিহাস'। রাস্তায় চলতে চলতে হরিহর পড়তে শুরু করলেন, বললেন, 'সুন্দর বই, ভাবছি এটি ওড়িয়াতে অনুবাদ করব।'

কটক : জুন ১৮৬৫

বিচিত্রানন্দ এখন কমিশনারের সেরিস্তাদার। সাহেবের সঙ্গে প্রায়ই সফরে যেতে হয় তাঁকে। যখন কটকে থাকেন তখন সন্ধ্যায় গৌরীশংকরের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর তুলসীপুরের বাগানবাড়ি, কটকের ভদ্রব্যক্তিদের মিলনস্থান। বহিরাগত রাজন্যবর্গও নিয়মিত এখানে আসেন। যে রাজারা কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন তাঁরাও ফিরে যাবার আগে বিচিত্রানন্দের সঙ্গে দেখা করতে ভোলেন না। সন্ধ্যায় মদ্যপান হয়। মাঝে মাঝে তেলেঙ্গাবাজারের ছোটো তারার বাড়ি, গানের আসর বসে। ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্রানন্দ ও গৌরীশংকর ওড়িশার নানা বিষয় আলোচনা করেন।

কটকে একটি ছাপাখানা বসানো ইদানিং তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মিশন প্রেস অনেকদিন থেকে চলছে। কিন্তু দেশীয় লোকদের জন্য কোনো প্রেস নেই ওড়িশায়। ১৮৫৯ সালে মাইহারে উইলিয়াম লেসী দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকা প্রবোধচন্দ্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে কি করে একখানি ওড়িয়া পত্রিকা প্রকাশ করা যায় ভাবতে আরম্ভ করলেন বিচিত্রানন্দ। মিশন প্রেসের ব্রুকস সাহেবের পত্রিকা প্রকাশনের বিষয় সব থেকে বেশি অভিজ্ঞতা। ছোটোবেলায় প্রেসের কাজে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পরে

কলকাতার মিশন প্রেসে কাজ করেছেন অনেক বছর। প্রায় পঁচিশ বছর আগে কটক এসেছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে বিচিত্রানন্দ প্রেসের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলেন এবং প্রেসের কাজ ভালো করে লক্ষ্য করলেন। খোঁজ নিয়ে খরচের যে হিসাব পেলেন তাতে বোঝা গেল এত অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে একটি সুযোগ এসে গেল। ঢেঙকানলের রাজা ভাগীরথী মহীন্দ্র নানা সমস্যা নিয়ে প্রায়ই কমিশনারের কাছে আসতেন। তখন যথারীতি বিচিত্রানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। এই বিপুলবপু রাজাকে দেখলে মনে হয় না তিনি বিদ্যানুরাগী, প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর মহলে পণ্ডিত সভা হয়। কাশী, নবদ্বীপ এবং ওড়িশার পণ্ডিতগণ এই সভায় যোগ দেন। তাঁরা ওড়িয়া ও সংস্কৃত কাব্যগুলি পর্যালোচনা করেন। ন্যায় শাস্ত্রের চর্চাও হয়। বিচিত্রানন্দ ছাপাখানার প্রসঙ্গ আলোচনা করলে তিনি সাহায্যের আশ্বাস দিলেন।

এবার বিচিত্রানন্দ ও গৌরীশংকর কটকের সকল ধনী মানী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ কাব্য প্রেসের বিষয় আলোচনা করলেন এবং সহায়তা চাইলেন। ১৮৬৪ সালে 'কটক প্রিণ্টিং কোম্পানি' রেজিষ্ট্রী করা হল। ভাগীরথী মহীন্দ্র ১০৫০ টাকা মূল্যের বিয়াল্লিশটি পঁচিশ টাকার শেয়ার কিনলেন। কোম্পানির মূলধন নির্দ্ধারিত হল ৭৫০০ টাকা। কটকের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি শেয়ার কিনলেন। বছর শেষহবার আগে ভাগীরথী মহীন্দ্র তাঁর দেয় সব টাকা জমা করলেন। অন্যদের থেকে প্রথম কিস্তির অর্ধাংশ পেতেই কোম্পানির কাজ শুরু হল। গৌরীশংকর কোম্পানির প্রথম কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক।

কোম্পানীর প্রথম কাজ হলে কম দামে একটি ছাপাখানা কিনে, কটকে এনে চালু করা। কলকাতায় অনুসন্ধান করে জানা গেল ছাপাখানা পাওয়া যাবে কিন্তু ওড়িয়া হরফ মিলবে না, ইংরেজি হরফ নিতে হবে। যাই হোক অনেক খোঁজার পর ইংরেজি, অক্ষরসহ একটি পুরাতন প্রেস আনা হল। কোম্পানির বাড়ি নেই। সুতরাং মেশিনপত্র রাখা হল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জগমোহন রায়ের আলমবাজারের বাড়ির বারান্দায়। প্রেস চালাতে জানে এমন লোক কটকে নেই। তাছাড়া ইংরেজি ছাপা কাজে লাগবে না। সুতরাং প্রেসটি নিষ্ক্রিয় পড়ে রইল।

জুন মাসে বিচিত্রানন্দ পুরী গেলেন। সেখানে খবর পেলেন একজন বাঙালি ভদ্রলোকের একটি লিথো প্রেস আছে। বাংলায় ছাপানোর চাহিদা নেই পুরীতে; সুতরাং সেটি অকেজো পড়ে আছে। দুশ টাকা দিয়ে প্রেসটা কিনে নিলেন বিচিত্রানন্দ এবং গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে কটকে নিয়ে এলেন। এটি এখন জগমোহন রায়ের বৈঠকখানার শোভাবর্ধন করছে। জরুরি সভায় এসে পরিচালকরা এটিকে খুঁটিয়ে দেখছেন।

বিচিত্রানন্দ ও গৌরীশংকর ব্যতীত আর যাঁরা আজকের সভায় উপস্থিত আছেন

তাঁরা হলেন কেন্দ্রপাড়ার জমিদার রাধাশ্যাম নরেন্দ্র, তাঁর ভাই গৌরীশ্যাম জেনা, জমিদার গোলকচন্দ্র বসু, বনমালী সিংহ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট জগমোহন রায়। মাথার উপর একটি পাখা সরবে দুলছে, জুন মাসের গরম এত যে সকলের হাতে একখানি করে হাতপাখাও আছে। চাপরাশি শেখ জমীর সরবত পরিবেশন করছে।

সকলের নজর গৌরীশংকরের উপর। এই কলটি কেমন করে কাগজের উপর ছাপার অক্ষরে লিখবে কেউ জানে না। প্রেস বসানোর কাজে কি কি পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে তার বর্ণনা দিলেন গৌরীশংকর। কটকে একটি লিথো মেশিন চলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইরিগেশন কোম্পানির অফিসে। গৌরীশংকর তার কাজ দেখে এসেছেন। ছাপানোর প্রথম স্তর কাগজের উপর হাতে লেখা। এ কাজের জন্য সুন্দর হস্তাক্ষর যার এমন লোক দরকার। ইরিগেশন কোম্পানিতে যে এ কাজ করে তার সঙ্গে গৌরীশংকর কথা বলেছেন। সে ১লা জুলাই থেকে কটক প্রিন্টিং প্রেসে কাজ করতে রাজি।

গৌরীশংকরের ছোটো বক্তৃতাটি শুনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হল। ইরিগেশন কোম্পানির লোককে সাহায্য করার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত হল। সে যথাশীঘ্র কাজ শিখে নিয়ে নিজে সব কাজের দায়িত্ব নেবে। ভাগীরথী সাঠিয়া কোম্পানির প্রথম মুদ্রক এবং ভাগবত দাঁ প্রথম রাইটার। তাদের মাসিক বেতন ধার্য হল যথাক্রমে বার এবং পাঁচ টাকা। জগমোহন রায়কে অনুরোধ করা হল কোম্পানির নিজের বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বৈঠকখানায় প্রেসটি চালাতে দিন।

সবশেষে গৌরীশংকরকে অনুরোধ করা হল যত শীঘ্র সম্ভব ওড়িয়া ভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাবেন।

পুরী : জুলাই ১৮৬৫

সোমবার ৩রা জুলাই কমিশনার টি. ই. রেভেনশার স্টীমার পুরীর সমুদ্র তটের কাছে নোঙর ফেলল। রবিবারে তিনি কলকাতা থেকে যাত্রা করেছিলেন। পুরীতে বন্দর নেই। সুতরাং বেশ একটু দূরে জাহাজ থামে এবং যাত্রীরা নৌকা করে কূলে আসে। রেভেনশা আসার খবর এসে গিয়েছিল তার যোগে। কটক থেকে বিচিত্রানন্দ এসেছেন তাঁকে নিতে। তটে পাল্কি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন পুলিশ সুপার লেসী এবং ডেপুটী কালেক্টর রামাক্ষয় চ্যাটার্জী। তাঁরা নৌকা নিয়ে জাহাজের কাছে গিয়ে রেভেনশাকে নিয়ে এলেন।

রেভেনশা চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, মুখে তাঁর বিরক্তির ছাপ। ওড়িশা আসতে চাননি তিনি। ষোল বছর চাকরি জীবন কেটেছে বাংলায়। স্বল্পকালের জন্য পাটনায়

বদলী হয়েছিলেন। সেখান থেকে বীরভূম গেলেন সেসন জজ হয়ে। তার কিছুদিন পরেই পদোন্নতি হল এবং তাঁকে কটকের কমিশনার নিযুক্ত করা হল। তিনি কলকাতা গিয়ে বোর্ড অফ্ রেভেনিউ-এর কাছে প্রতিবাদ জানালেন। কটকে যেতে অনিচ্ছা তো ছিলই তার প্রতিবাদের অন্য কারণ জমিজমার কাজ তাঁর অপছন্দ, তিনি বিচারকের কাজ ভালোবাসেন। রাজস্ব এবং জমিজমা সংক্রান্ত কাজই কমিশনারের মুখ্য দায়িত্ব।

বোর্ড অফ্ রেভেনিউ কিন্তু তাঁকে অতি শীঘ্র কটকে গিয়ে কার্যভার গ্রহণ করতে বলল। কারণ, পুর্বতন কমিশনার ততদিনে কটক থেকে চলে গেছেন। পরামর্শ দেওয়া হল কার্যবাহক কমিশনার হিসাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের অফিসে যোগ দিন। তিনি আশ্বাস পেলেন যে অতি শীঘ্র তাঁকে বাংলায় ফিরিয়ে আনা হবে। শ্রীমতী রেভেনশা কটক যেতে রাজি হলেন না, বিলাত চলে গেলেন। বোর্ডের অফিসে ওড়িশা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে কিছুদিন পরে তিনি ওড়িশা এসেছেন।

ওড়িশার বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সীমিত। ওড়িশায় কাজের অভিজ্ঞতা আছে এমন যাঁরা বোর্ডে কাজ করছেন তারা ওড়িয়াদের সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা শোনাল। বোর্ডের সদস্য ককবার্ণ কটকে কমিশনার ছিলেন। তিনি অনেক উপদেশ দিলেন ওড়িশার বিষয়ে। সব শুনে রেভেনশার দৃঢ় বিশ্বাস হল ওড়িয়ারা ভালো লোক নয়। পুরাতন নথিপত্রেও এ মতের সমর্থন পেয়েছেন। ১৮১৮ সালে তৎকালীন কালেক্টর এক রিপোর্টে লিখেছেন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনাধীন সকল লোকের মধ্যে ওড়িয়ারা সবথেকে নির্বোধ ও অভদ্র। ষ্টার্লিং-এর ওড়িশা সংক্রান্ত বিবরণীতে উল্লেখ ছিল : আবুল ফজল সত্যই লিখেছিলেন যে ওড়িয়ারা ক্লীব, এদের পুরুষসুলভ স্ফূর্তির অভাব।

সবকিছু মিলিয়ে ওড়িয়া ও ওড়িশার বিষয়ে এক বিকৃত ধারণা নিয়ে ওড়িশা মাটিতে পা দিলেন রেভেনশা। তাঁর মাথায় এখন এক চিন্তা করে ওড়িশা থেকে বিদায় নেবেন। একদিন পুরীতে কাটিয়ে কটক যাবার কথা। থাকবেন কালেক্টরের বাংলোতে। এ সময় পুরীতে গ্রীষ্মের উত্তাপ বেশি, তাই জুলাই থেকে অক্টোবর পুরীর কালেক্টর কটকে থেকে কাজ করার রীতি ছিল। সেই অনুযায়ী কালেক্টর বার্লো ১লা জুলাই কটক চলে গেছেন এবং তাঁর বাংলো খালি।

সন্ধ্যায় শহর ঘুরে দেখলেন রেভেনশা। বর্ষায় রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়। সর্বত্র কাদা ও দুর্গন্ধ। জগন্নাথের মন্দিরে এসে তিনি ভিতরে যেতে চাইলেন। তাঁকে বলা হল ভিতরে যাবার অধিকার নেই তাঁর। একজন পাণ্ডা কিন্তু কাছে এসে পয়সা চাইল। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হল এবং তিনি ভিজে গেলেন। বড়দাণ্ডে একজন কুষ্ঠরোগী তাঁর পা ছুঁতে চেষ্টা করল। বাংলোতে ফিরে খবর পেলেন পুরীর রাজা সাক্ষাৎ করতে চান। কিছুক্ষণ পরে মিষ্টি ও ফলের ডালা নিয়ে যে উপস্থিত হল সে আটদশ বছরের এক কিশোর।

এমনিভাবে পুরীতে একটি দিন কাটিয়ে রেভেনশা কটকে এলেন ৫ই জুলাই। এবং অভদ্র নির্বোধ ওড়িয়াদের বাপান্ত করলেন মনে মনে।

কটক : জুলাই ১৮৬৫

পুরীর অসহনীয় গরম থেকে কটকে এসে বার্লো ভাবলেন চারটি মাস আরামে কাটাবেন সার্কিট হাউজে। কিন্তু রেভেনশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, আপনি আমার সঙ্গে থাকুন, আমিও তো একা আছি। বার্লোর মনঃপুত হল না এ প্রস্তাব। কিন্তু উপায় নেই বড়োসাহেবের অনুরোধ আদেশের সমান। অগত্যা তাঁকে কমিশনারের বাংলোতে এসে উঠতে হল।

কমিশনারের বাংলোতে থাকার অনিচ্ছার এক কারণ চাকরদের সামলানোর ঝামেলা। সাহেবদের সরকারি কাজের সঙ্গে আর একটি কাজও করতে হয়। সেটি হল চাকরদের শান্তি বজায় রাখা এবং তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। বাংলোতে পেয়াদা, চাপরাশি, সইস, দারোয়ান, খানসামা, ভিস্তি মশালচি ইত্যাদি পদবীধারী একদল লোক। বার্লোর অসুস্থ স্ত্রী বিলাতে আছেন। সেজন্য বার্লোকেই চাকরদের ঝামেলা পোয়াতে হয়। তাদের বাজারের পয়সা দেওয়া। তার হিসেব নেওয়া, সকলকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া এবং সর্বোপরি তাদের ঝগড়া মেটানো। চারটি মাস এর থেকে মুক্তি ভেবেছিলেন বার্লো, কিন্তু কমিশনারের বাংলোতে আবার সেই উৎপাত বরদাস্ত করতে হবে।

রেভেনশা ভদ্র মিশুকে এবং শান্ত প্রকৃতির লোক। বার্লোকে তিনি সাদরে অতিথি করে নিলেন। প্রথম কটি দিন অফিস না গিয়ে বাড়িতে ফাইলপত্র দেখতে লাগলেন তিনি। ঘর গোছানোর কাজ করেন। বসার ঘর, শোবার ঘর ছেড়ে নিজের যন্ত্রপাতি রাখার জন্য একটি ঘরের দিকেই তাঁর বেশি আগ্রহ। পিছনে বাগানের পাশে একটি কুঠরিতে একখানি টেবিল রাখলেন। তার উপর সাজিয়ে রাখলেন কাজের সরঞ্জামগুলি, ছুরি সাঁড়াশি, হাতুড়ি, করাত ইত্যাদি। পরে একটি ছোটো লেদ মেশিন এনে বসাবার কথাও চিন্তা করলেন। অনেক সময় কাটান এই ঘরে। এখন একটি বই রাখার শেল্‌ফ কেটে ছোটো করায় মন দিয়েছেন।

বার্লো লক্ষ্য করলেন সরকারি কাজে কোনো আগ্রহ নেই রেভেনশার। হয়তো ভেবেছেন কটকে বেশিদিন থাকতে হবে না। সুতরাং ওড়িশা নিয়ে বেশি মাথা না ঘামালে চলবে। তাঁর আচরণ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিন পরে রেভেনশা বার্লোর সামনে ওড়িশার একখানি মান চিত্র খুলে হিসাব করলেন ওড়িশা ছেড়ে যাবার আগে কত কম সময়ে দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে আসতে পারবেন। স্থির হল সেসন্স কোর্ট

করতে প্রথমে যাবেন বালেশ্বরে। সেখানে জজ নেই, সুতরাং কটকের কমিশনারকে এ দায়িত্ব বহন করতে হয়। ২২শে জুলাই রেভেনশা তিন সপ্তাহের জন্য বালেশ্বর গেলেন।

এখন বার্লোর উপর কাজের চাপ কম। তাঁর দিনের কার্যসূচি সাধারণত এ প্রকার : সকাল পাঁচটায় কাটবোড়ী কূলে দুঘণ্টা ঘোড়সওয়ারী, সেখান থেকে ফিরে কলকাতা থেকে আসা ইংলিশম্যান পত্রিকা পড়া, তারপর স্নান করে ছোটো হাজিরী, দশটায় পুরী থেকে আনা ডেসপ্যাচ বাক্স খুলে ফাইলপত্র দেখে আদেশ লেখা এবং বারটায় মধ্যাহ্নভোজন করে বিশ্রাম। চারটে বাজলে টেনিস খেলতে বারবাটি কেল্লায় যান এবং সন্ধ্যায় ষ্টেশন ক্লাবে যোগদান করেন।

কটকে অনেক সাহেবের বাস। পাত্রী, সিভিল অফিসার, পি.ডব্লু.ডি. বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার, ইরিগেশন কোম্পানির কর্মকর্তা ইত্যাদি। ওড়িশার তিনটি জেলার কমিশনারের মুখ্যালয় এখানে। সেজন্য অন্য জেলা থেকে সাহেবরা মাঝে মাঝে এখানে আসেন। এ ছাড়া মাদ্রাজ, ইনফ্যান্ট্রির একটি রেজিমেণ্টে মোতায়েন এখানে যার ছ সাত জন অফিসার সপরিবারে কটকে থাকেন। এজন্য কটক সাহেবদের কাছে আকর্ষক স্থান। কটকের বিষয়ে অজ্ঞানতার জন্য কলকাতা থেকে অনেকে এখানে আসতে কুণ্ঠা বোধ করে। কিন্তু কিছুদিন এখানে কাটালে কেউ আর ফিরে যেতে চায় না।

বসবাসের জন্য কটক উপযুক্ত স্থান, বেশ খোলামেলা। চাউলিয়াগঞ্জে একটি রেসকোর্স আছে। সেখানে ঘোড়দৌড় হলে বিজয় নগরের মহারাজা তাঁর ঘোড়া পাঠান। পাশে একটি কুচকাওয়াজের ময়দান। সন্ধ্যায় সেখানে ব্যাণ্ড বাজে। রাত্রে সাহেবরা সপরিবারে ষ্টেশন ক্লাবে মিলিত হন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত মদ্যপান ও নৃত্যগীত চলে। আরও দু জায়গায় সাহেবরা মিলিত হন। একটি ফ্রিম্যাসন মতাবলম্বীদের লজ ষ্টার অফ্ ওড়িশার ভবন। অন্যটি জোব্রাস্থিত ইরিগেশন কোম্পানির ক্লাব। এই সকল সুবিধার জন্য পুরী থেকে কটকে এসে মনে হয় মফঃস্বল থেকে শহরে এলাম।

বার্লোর কাছে পুরী থেকে যে কাগজপত্র আসে তার মধ্যে কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেখানকার বড়ো ঘটনা রথযাত্রা কিছুদিন আগে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। পুরীর নাবালক রাজা ও রাজমাতা আর বিশেষ ঝামেলা সৃষ্টি করছেন না। তাছাড়া পুলিশ সুপার লেসী এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রামাক্ষয় দক্ষ লোক। তাঁদের দায়িত্বে পুরী সুরক্ষিত আছে ভেবে বার্লো নিশ্চিন্ত।

বালেশ্বর : আগষ্ট ১৮৬৫

মোতিগঞ্জ বাজারের শেষে গড়গড়িয়া পুকুর। এর ঘাট বন্ধুমিলনের উত্তম স্থান। পুকুরের পূর্বে সদর কানুনগোর বাড়ি। পশ্চিমদিকে একটু দূরে ফকির মোহনের।

রাধানাথ ও ফকির মোহন প্রায় এই ঘাটে আড্ডা দেয়। ইদানীং একজন নূতন সঙ্গী জুটেছে তাদের। নাম মধুসূদন দাস। রাধানাথের সমবয়সী এই যুবক কটক জেলা স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করে বালেশ্বর জেলা স্কুলে শিক্ষক হয়েছে। সে থাকে গড়গড়িয়ার সামনে এক ভাড়াবাড়িতে।

স্কুলের ছুটি হতেই ফকির মোহন ও মধুসূদন মিলিত হয়। রাধানাথ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। এ নিয়ে ফকির মোহন ও মধুসূদন তাকে ঠাট্টা করে। এ প্রসঙ্গে মধুসূদন নিজের কথা উত্থাপন করে। পিতার ইচ্ছা ছিল সে এনট্রান্স পাশ করে কটক কালেক্টরের অফিসে কেরাণি হোক। সে অবশ্য রাজি হল না। তার পণ সে এফ.এ. পড়বে। পিতা তার বন্ধু সেরিস্তাদার বিচিত্রানন্দের কাছে কয়েকবার তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন চাকরি পাইয়ে দেবার জন্য। কিন্তু শিক্ষকের পদ পেয়ে সে বালেশ্বর চলে এসেছে। তার উদ্দেশ্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করে কলকাতা যাবে এফ.এ. পড়তে।

মধুসূদনের মাথায় সর্বক্ষণ বড়ো বড়ো চিন্তা ঘোরে। ফকির মোহন ও রাধানাথ যখন জল্পনা করে কবে পদোন্নতি হবে এবং বেতন বৃদ্ধি হবে তখন মধুসূদন তাদের থামিয়ে দিয়ে বলে, 'এ সব ছোট চিন্তা ছাড়ো তো দেখি কেমন করে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করবে তাই ভাবো।'

যে বিষয় নিয়ে প্রায় তাদের মধ্যে আলোচনা হয় তা হল ওড়িয়া-বাঙালি সম্পর্ক। নিজে বাঙালি হয়ে রাধানাথ নিঃসঙ্কোচে এই আলোচনায় যোগ দিতে পারে না। এ বিষয় মধুসূদন বেশি মুখর। এবং তার একটি বিশেষ কারণ আছে।

মধুসূদন যখন কটক জেলা স্কুলে পড়ে তখন ওড়িয়া ছাত্রের সংখ্যা কম ছিল, বাঙালিই বেশি। বাঙালি ছাত্রদের কাছে সে একটি গ্রাম্য বালক, দেশী জামাকাপড় পরে, গ্রাম্য মেরজাই গায়ে দেয় এবং লম্বা চুল ও টিকি রাখে। অন্যদিকে বাঙালি ছেলেরা মিলের ধুতি ও শার্ট পরে, ছোটো করে চুল কাটে। তারা মধুসূদনের পিছনে লাগে। একদিন একটি বাঙালি ছেলে তার লম্বা টিকি কেটে দিল। ফকির মোহনও বাঙালিদের উপর বিরক্ত। তিনি যখন বারবাটি স্কুলের ছাত্র তখন স্কুলটি পরিচালনা করত বাঙালিরা। তারা নানাভাবে তাকে নাজেহাল করেছিল। এ সকল ব্যক্তিগত কারণ ছিল, মূল কারণ হল তখনকার দিনে ওড়িয়ারা কম সংখ্যায় স্কুল কলেজে যেত। সুতরাং শিক্ষক সরকারি কর্মচারি উকিল মোক্তার প্রায়ই সকলেই ছিল বাঙালি। তারা ওড়িয়াদের হেয় জ্ঞান করত।

ফকির মোহন ও মধুসূদন যখন ওড়িয়াদের শিক্ষান্তর আলোচনা করে তখন রাধানাথ চুপ থাকে। যখন সাহিত্যের বিষয় আসে তখন তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাতৃভাষা বাংলা হলেও সে প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্য পাঠ করেছে, মৌলবী গোলাম রসুলের কাছে উর্দু শিখেছে এবং সদাশিব নন্দের কাছে সংস্কৃতে শিক্ষা পেয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দশপদী কবিতাগুলি তার কণ্ঠস্থ। সংস্কৃত কবিতাগুলি সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে। রাধানাথ বন্ধুদের সঙ্গে একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রস্তাব আলোচনা করে। সৌভাগ্যবশত সুনাহাটের ব্যবসায়ী দামোদর দাস তাঁর বাড়িতে একটি পাঠাগার খুলেছেন। রাধানাথ নিয়মিত সেখানে যায়।

নতুন কমিশনার রেভেনশা সেরিস্তাদার বিচিত্রানন্দ দাসকে সঙ্গে নিয়ে আগষ্ট মাসে বালেশ্বর এলেন। কালেক্টরের অফিসে একটি সভা আহ্বান করলেন তিনি। উদ্দেশ্য জমিদারদের সঙ্গে কৃষি মেলা নিয়ে আলোচনা। মধুসূদন বিচিত্রানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি কেরাণির চাকুরি করতে পরামর্শ দিলেন। মধুসূদন অবশ্য চাকরির জন্য যায় নি। তার প্রার্থনা বিচিত্রানন্দ একখানি পত্র লিখে দিন যেটি নিয়ে সে কলকাতায় নীলমাধবের কাছে যাবে। বিচিত্রানন্দ তাকে অনেক বুঝিয়ে বালেশ্বরের রেজিষ্ট্রেশন অফিসে একটি চাকুরিতে লাগিয়ে দিলেন। মধুসূদন চাকরিতে যোগ দিল বটে, কিন্তু পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে বিচিত্রানন্দের থেকে বাঞ্ছিত পত্রখানিও লিখিয়ে নিল।

পুরী : সেপ্টেম্বর ১৮৬৫

এখন আর চাকররা দিব্যসিংহকে ভয় দেখাতে পারে না। দশ বছরের সুস্থ সবল কিশোর এখন তাদের থেকেও অশ্লীল গালিগালাজ করতে পারে। রুপোর হাতল দেওয়া একখানি ছড়ি দিয়ে যখন যাকে খুশি মারে। চাকররা এখন রীতিমত ভয় করে তাকে। মার খেয়ে কার মাথা ফাটল, কার হাত ভাঙল এ অভিযোগ নিত্য শুনতে হয় সূর্যমণিকে।

দিব্যসিংহকে লেখাপড়া শেখানোর অশেষ চেষ্টা করে হাল ছাড়লেন সূর্যমণি। রাজবাড়িতে রাজকুমারকে তালিম দেবার রীতি বিচিত্র। ছাত্র চেয়ারে বসে আর বেচারা মাষ্টার দাঁড়িয়ে থাকে। বর্ণপরিচয় করাতে মাষ্টার বলে মণিমার শ্রীঅঙ্গ সাবধান, শ্রীমুখে 'ক' বলতে আজ্ঞা হোক ইত্যাদি। দিব্যসিংহের শ্রীমুখ থেকে 'ক' 'খ' নয় গালিগালাজ নির্গত হয় অনর্গল। বালককে শেখাতে না পারার জন্য রাণিমার ভর্ৎসনা শুনতে হয়। এ পরিস্থিতিতে কোনো শিক্ষকই বেশিদিন টেকে না। যেদিন দিব্যসিংহ শিক্ষককে ছড়ি দিয়ে মারল সেদিন থেকে বেতন বৃদ্ধির প্রলোভন দেখিয়েও কোনো শিক্ষককে রাজবাড়ি এসে রাজকুমারকে প্রশিক্ষণ দিতে রাজী করানো গেল না।

সূর্যমণিকেও আর গ্রাহ্য করে না দিব্যসিংহ। সে বুঝে নিয়েছে সেই রাজা, রথযাত্রা এবং অন্যান্য পর্বের সময় সর্বসাধারণ তাকে রাজসম্মান দেয়। শহরে কোনো বড়ো সাহেব আসলে তাকে ডাকা হয়। এইসব আনুষ্ঠানিক ঘটনায় সে যোগ দেয়

জরীর পোশাক পরে। বেশ গর্ব অনুভব হয়। রাজবাড়িতে সে বুক ফুলিয়ে চলে, কারো তোয়াক্কা করে না।

চাকরের দল তার একমাত্র সাথি। এদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে বলবান হওয়া দরকার। সে ব্যায়ামে আকৃষ্ট হল এবং রাজবাড়ির সব ছেলেদের নিয়ে কুস্তি কসরত আরম্ভ করল। হিন্দুস্তানী চাকর উপাধ্যায় তার গুরু। তার পরামর্শে পাঁচিলের কাছে একটি জায়গা খুঁড়ে কুস্তির আখড়া তৈরি হল। স্থির হল এক শুভদিনে দিব্যসিংহ কুস্তি অভ্যাস শুরু করবে।

কিছুদিন পরে ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন 'সুনিয়া' পড়ল এবং নতুন অংক কাটা হল। রেশমী বস্ত্র পরে দিব্যসিংহ পূজায় বসল। পূজা অর্চনা শেষ হলে একটি তালপত্রে লিখে রাজগুরু ঘোষণা করলেন আজ থেকে বীরশ্রী গজপতি ইত্যাদি ইত্যাদি দিব্যসিংহ দেবের অংকের শুভারম্ভ হল। সুনিয়ার দিনগুলিতে দিব্যসিংহের মন খুশিতে ভরে যায় কারণ সে রাজ সম্মান পায়।

সেদিন বিকালে দিব্যসিংহ লেঙ্গট পরে কুস্তির আখড়ায় নামল। একটি ছেলে নিমেষে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। শুকনো মাটিতে পড়ে দিব্যসিংহ আহ্ করে উঠল এবং উঠে ছেলেটিকে সজোরে এক থাপ্পড় লাগাল, উপাধ্যায়কে গালি দিল। উপাধ্যায় ঢপ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে বলল মণিমা, মাটি আর একটু নরম করতে হবে। দিব্যসিংহ হুকুম দিল, যা শালা জল নিয়ে আয়, কাদা বানা। কাজটি এড়িয়ে যাবার জন্য উপাধ্যায় বলল, এ কাজের জন্য বর্ষার জল উত্তম। দুজনে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল ছোটো ছোটো মেঘ ভেসে যাচ্ছে। তারা বর্ষার প্রতীক্ষায় রইল কিন্তু বর্ষা হল না, সেদিন না, পরের দিন না, তারপরের দিনও না।



দুই

কটক : অক্টোবর ১৮৬৫

কয়েকদিন পরে পুরী ফিরে যেতে হবে ভেবে বার্লোর মন খারাপ হয়ে গেল। অনেকদিন হল স্ত্রীর পত্র পাননি। তার উপর পুরী থেকে উদ্বেগজনক খবর আসছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা, বাজারে ধান চাল আসা কমে গেছে এবং মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। অন্য বছর এ সময়ে টাকায় ত্রিশ সের চাল পাওয়া যেত, এখন খুর্দার বাজারে মাত্র দশ সের পাওয়া যাচ্ছে। গোপ থানার গ্রামাঞ্চলে চাল দুষ্প্রাপ্য। পান এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ফলমূল খেয়ে বেঁচে আছে। এমনকি রাগির মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে টাকায় বার সের। ভদ্রলোকেরাও রাগি খেতে আরম্ভ করেছে। গোপ অঞ্চল থেকে অনেক লোক জীবিকার সন্ধানে কটক চলে যাচ্ছে। থানা ইনস্পেক্টর শ্রীচন্দপুরে কিনবার জন্য এক সের চালও পেল না। লতাহরণ হাটে ধানচালের কারবার হয় কিন্তু সে হাটে চাল আসেনি গত পনেরো দিন। পুরীর অনেক লোক আর্জি দিয়েছে শহরে চাল মিলছে না।

এসব রিপোর্ট ছাড়াও বাবু রামাক্ষয় একখানি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। সেটি নিম্নরূপ :

মহাশয়,

সসম্মানে জানাচ্ছি যে গতকাল আপনাকে একখানি দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম তাতে অনেক লোক অভিযোগ করেছে যে শহরে চালের অভাব। দরখাস্তের বক্তব্য সত্য, একথা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি মফঃস্বলের অনেক লোক ফল মূল খেয়ে জীবনধারণ করছে। কটকে ইরিগেশন কোম্পানিতে কাজ পাবার আশায় অনেক দরিদ্র লোক সপরিবারে ভিটে মাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কাল আমার কোর্টে একটি চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। দুজন আসামী। তারা স্বীকার করল যে তিনদিন সপরিবারে অনাহারে থেকে তারা প্রতিবেশীর ঘর থেকে চাল চুরি করেছে। তার বাড়িতে প্রচুর চাল কিন্তু সে কিছু দিয়ে রাজি হয়নি। এখনও পর্যাপ্ত চাল আছে শহরে, গ্রামাঞ্চলের কোনও কোনও হাটে এখনও চাল আসছে কিন্তু দাম এত চড়া যে লোকের কেনার ক্ষমতা নেই। কাল পুরীতে তিন আনায় একসের চাল বিক্রি হল। আগামী চার পাঁচ দিনের মধ্যে বর্ষা না হলে দোকানদাররা দাম আরও বাড়াবে এবং জেলায় দুর্ভিক্ষ ছেয়ে যাবে। এই বিষম পরিস্থিতিতে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

আশিজনের অধিক কয়েদীদের জন্য কেমন করে চাল সংগ্রহ করব ভেবে পাচ্ছি না। আজ কয়েকজন কয়েদীকে কটকে স্থানান্তরের আদেশ হয়েছে। কিন্তু অন্যদের কি হবে? তাছাড়া অনটনের সময় কয়েদীর সংখ্যা বাড়ে। আমি জানি মঠাধ্যক্ষ ও জমিদারদের কাছে

চাল সঞ্চিত আছে। তার পরিমাণ এত যে দু বছর জেলার চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু সরকারী নির্দেশ না পেলে তারা বাজারে চাল ছাড়বে না।

সকল ঘটনা আপনাকে জানালাম। আশা করি এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকার সত্বর পদক্ষেপ নেবেন।

আপনার অনুগত ভৃত্য,
রামাক্ষয় চ্যাটার্জি

পুনশ্চ :

এই পত্র লেখার সময় এখানকার বাসিন্দা ও পুলিশ অফিসার আমাকে তিনখানি দরখাস্ত দিল। এতে দুটি তালিকা আছে যাতে যে মঠাধ্যক্ষদের কাছে চাল আছে তাদের নাম আছে। জনসাধারণ অতি করুণভাবে তাদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করেছে। আমার মতে এক সঙ্কটময় সময় উপস্থিত হয়েছে এবং আপনার হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ইনস্পেক্টর সাধু সিংহ জানিয়েছে যে আজ সকালে মণিরামপুর হাটে শান্তিরক্ষার জন্য তাকে যেতে হয়েছিল। সেখানে চাল কিনতে অনেক লোক জমা হয়েছিল।

রেভেনশা প্রস্তুত হয়ে বাইরে আসতেই বার্লো তাঁকে সংক্ষেপে পুরী জেলায় চালের অভাবের কথা বললেন। মনে হল না তিনি মন দিয়ে সব কথা শুনলেন। তিনি বার্লোকে তাঁর বালেশ্বর সফর ও কৃষিমেলার কথা শোনালেন। রামাক্ষয়ের চিঠিখানি বাড়িয়ে দিতে বললেন, 'এক কাজ কর, একটি রিপোর্ট তৈরি করে দাও, আমি বোর্ড অফ্ রেভেনিউকে পাঠিয়ে দেব।'

রেভেনশার সঙ্গে কথা বলে নিরাশ হয়ে রামাক্ষয়ের চিঠির জবাব লিখতে বসলেন বার্লো। সেদিন তিনি ক্লাবে গেলেন না গেলেন রেভারেণ্ড জন বাকলীর সঙ্গে দেখা করতে। বাকলী কুড়ি বছরের বেশী সময় ওড়িশায় কাটিয়েছেন, সুন্দর ওড়িয়া বলতে পারেন। রাশভারী স্বল্পবাক এই লোকটি ওড়িশা মিশনের সেক্রেটারী। তিনি বার্লোর কথা মন দিয়ে শুনলেন। বাকলীর মিশনে প্রায় তিনশ চাষী আছে। তাদের সঙ্গে তার নিজ যোগাযোগ হয়। এক মাস হল তিনি ক্রমাগত ফসল হানির কথা শুনছেন। এখন আর সন্দেহের অবকাশ রইল না যে এক ঘোর বিপত্তি দেখা দিয়েছে। সেদিনই সকালে তিনি লণ্ডনস্থিত মিশনের সদর কার্যালয়ে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন।

বাকলীর বাড়ি থেকে ফিরে বার্লো ক্লাবে গেলেন। সেখানে কটকের কালেক্টর ডব্লু. জে. মণি এবং পুলিশ সুপার ক্যাপটেন জি. বি. ফিশার উপস্থিত ছিলেন। বার্লো ভেবেছিলেন কটক জেলায় ফসলের পরিস্থিতি বিষয়ে কিছু জানা যাবে তাদের কাছ থেকে। কিন্তু এই দুই খুশমেজাজী লোক বিনা দ্বিধায় বলে দিলেন ক্লাবে তাঁরা সরকারী বিষয়ে আলোচনা করতে চান না।

পরদিন অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে বার্লো জানতে পারলেন কটকের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। চালের দর বেড়ে হয়েছে টাকায় আট সের। চাল ক্রেতাদের এত ভীড় হয় যে ২৩শে জুলাই চালের বাজার বন্ধ হয়ে গেল। একটি মাত্র দোকান খোলা

পেয়ে লোকে চাল লুট করল। যেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে সেখানে তারা আপনজনদের চাল পাইয়ে দিল, অন্যরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। কটক ক্যাণ্টনমেণ্টে সেনাদের জন্য চাল নেই। উকিলেরা চালের দুষ্প্রাপ্যতা জানিয়ে আর্জি দিয়েছে জেলা জজের কাছে।

প্রকৃতপক্ষে কটকের অবস্থাও উদ্বেগজনক।

পুরী : অক্টোবর ১৮৬৫

রামাক্ষয় অফিসে এসে দেখলেন সামনে একটি ভীড় জমেছে। ভীড়ের মধ্যে তিনি চালের ব্যবসায়ী এবং এমার মঠের দুঃখীশ্যামকে চিনতে পারলেন। কিছু লোক তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর কামরায় ঢুকে এল। তিনি বসতেই দুঃখীশ্যাম একগোছা চাবি তাঁর টেবিলে রাখল। তার দেখাদেখি আরও অনেকে চাবি রাখল। সমস্বরে সকলে বলল, 'আপনি নাকি বলেছেন আমাদের গুদামে চাল আছে, নিজে এসে যাচাই করুন না?'

তিনি অনেক মানা করলেন, কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা, অগত্যা তাঁকে যেতে হল। প্রথমে গেলেন এমার মঠের গুদামে, সেখান থেকে রাঘবদাস মঠের গুদামে এবং তারপর শ্রীরামদাস মঠের গুদামে। তিনি দেখলেন চাল আছে বটে তবে পরিমাণ বেশী নয়। এবার দুঃখীশ্যাম বলল, 'যতটা চাল আমাদের কাছে আছে তা আমরা ন্যায্য দামে বিক্রি করতে রাজী আছি কিন্তু পুলিশ মোতায়েন করলেই তা সম্ভব হবে।'

রামাক্ষয় বললেন, 'আমি দাঁড়িয়ে আছি, কোনও ভয় নেই, আপনারা বিক্রি শুরু করুন।' তাঁর উপস্থিতিতে বড়দাণ্ড গুদাম থেকে চাল বিক্রি শুরু হল, টাকায় চোদ্দ সের। তার আগের দিন বাজারে দাম ছিল টাকায় পাঁচ সের। মুহূর্তে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে ক্রেতাদের ভীড় জমে গেল, বিক্রি চালু রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। রামাক্ষয় সাধু সিংহকে খবর পাঠালেন, সে যেন পুলিশ নিয়ে সত্বর চলে আসে। পুলিশ এসে ভীড় একটু আয়ত্ত্বে আনলে পুনরায় বিক্রি শুরু হল। যতটা চাল গুদাম থেকে বার করা হয়েছিল দু ঘণ্টায় তা শেষ হয়ে গেল। সেদিনকার মত বিক্রি বন্ধ হল। যারা চাল পায়নি তারা চেঁচামেচি করল এবং একজন একজন করে চলে গেল।

অফিসে ফিরে রামাক্ষয় সাধু সিংহের সঙ্গে বসে চাল বিক্রির জন্য কি ব্যবস্থা করা যায় তা স্থির করলেন। সিদ্ধান্ত হল পরের দিন সব মঠ থেকে একসঙ্গে চাল বিক্রি হবে এবং সব জায়গায় পুলিশ উপস্থিত থাকবে।

এই সময় রামাক্ষয় বার্লোর চিঠি পেলেন। তিনি লিখেছেন :

কটক
অক্টোবর ২৬, ১৮৬৫

প্রিয় বাবু,

চালের দাম সংক্রান্ত আপনার পত্র পেয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিচ্ছি। অবস্থা সংকটময় এবং কটকেও একই অবস্থা। এখানে বরং একটি বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সব আড়তদার জোট বাঁধার ফলে খুচরা দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও দামেই এখানে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। সেনাদের চাল জোগানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

আপনার চিঠি থেকে আমার মনে হয়েছে এখান থেকে পুরীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। দাম বেশী হলেও পুরীতে চাল পাওয়া যাচ্ছে। এটা অস্বস্তিকর যে জুগিয়ে দেবার মত যথেষ্ট চাল মজুদ আছে যদি অবশ্য আমরা তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি। আমার ইচ্ছা আপনি স্বয়ং মোহান্ত ও ব্যাপারীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের চাল বিক্রির জন্য অনুরোধ করুন। দাম বাড়লেও বাজার থেকে চাল একেবারে উধাও হয়ে যাবার থেকে শ্রেয়। পুরীতে আন্দাজ কত ধান আছে তা যদি জানাতে পারেন ভাল হয়। সর্বদা আমাকে পরিস্থিতির বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখবেন। দর দামের ওঠা নামা, বাজারে চাল মিলছে কিনা (যত দামেই হোক) আর এ অবস্থা কতদিন চলবে বলে মনে হয়—সব কিছু আমাকে বিশদভাবে জানাবেন। সাধু সিংহকে শান্তিরক্ষা করতে বলবেন এবং নিয়মিত আমাকে রিপোর্ট পাঠাতে বলবেন। লোকেদের মনোভাবও আমাকে জানাবেন।

মফঃস্বল থেকে যে চাল আসছে সেটা কোথায় যাচ্ছে? এর জবাব হয়ত ব্যাপারীদের দালালরা সব কিনে জমা করছে। সাধু সিংহকে জিজ্ঞাসা করবেন যদি বড়দাণ্ডে হাট বসাই এবং সকলকে তাদের দামে চাল বিক্রির সুযোগ দিই তবে মোটামুটি কত চাল বাজারে আসতে পারে বলে তার ধারণা।

যাই হোক্, বাবু, আপনি এদিকে কড়া নজর রাখবেন। বিচলিত হবেন না, মাথা গরম করবেন না, চোখ কান খোলা রেখে সবদিক বিচার করে কাজ করবেন এবং আমাকে নিয়মিত অকপটে সব জানাতে থাকবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
জি. এন. বার্লো।

পুনশ্চ :

এ সংক্রান্ত সকল সংবাদ আমাকে অর্ধশাসকীয় পত্রে লিখবেন। যদি কোনও সময় মনে হয় যে ব্যাপারীরা চাল বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দেবেন। লোকদের পরামর্শ দিন যে মফঃস্বলে গিয়ে চাল কিনে আনবে। আশ্বাস দেবেন যে পুলিশ রাস্তায় ছিনতাই হতে দেবে না।

চিঠিখানি সাধু সিংহকে পড়ে শোনালেন রামাক্ষয়। বড়দাণ্ডে হাট বসাবার প্রস্তাবটি মন্দ নয় তবে সেটি সফল হতে পারে যদি দুটি পদক্ষেপ আগে থেকে নেওয়া হয় : তেলুগু ব্যাপারীরা এসে চাল কিনে নিয়ে যাচ্ছে সেটা বন্ধ করতে হবে এবং মফঃস্বল থেকে যে চাল আসে তা যাতে ব্যাপারীরা রাস্তা থেকে কিনে নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধু সিংহের মত এতটা করতে পারলে মফঃস্বল থেকে চাল

আসবে। প্রতিদিন কত চাল আসছে তা মোটামুটি জেনে ব্যাপারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিদিনের দর ধার্য করতে হবে। হাট যাতে সুচারুভাবে চলে এবং দাম যাতে ন্যায্য হয় তার জন্য সরকারকে মধ্যস্থের ভূমিকা নিতে হবে। এই মর্মে বার্লোকে চিঠি লিখতে বসলেন রামাক্ষয়।

পুরীতে বর্ষার নামগন্ধ নেই। সন্ধ্যাবেলায়ও গরম হাওয়া বয়। জানলা দিয়ে আকাশ দেখে নিয়ে রামাক্ষয় আরও লিখলেন এখান বাতাসে আগুনের ঝলক, লোকে জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে।

রামাক্ষয় ধার্মিক লোক। চিঠিখানি বন্ধ করে পরমেশ্বরকে স্মরণ করে প্রার্থনা করলেন, বার্লো যেন শীঘ্র ফিরে এসে সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন।

বালেশ্বর : অক্টোবর ১৮৬৫

ওড়িশা বিভাগের অন্যতম জেলা বালেশ্বরের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। অনাবৃষ্টির জন্য ফসল নষ্ট হয়েছে, বাজারে চাল আসছে না। সারা দিন লোক চালের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যায় খালি হাতে ঘরে ফেরে। এর উপর মাদ্রাজ থেকে ৬৯টি জাহাজ এসেছে চাল কিনতে। গত বছ্র ফসল ভাল হয়েছিল। কুমুচীরা প্রচুর চাল কলকাতা ও মাদ্রাজ চালান করে ছিল। কিন্তু সে ফসলের কিছু আর অবশিষ্ট নেই। বালেশ্বর থেকে বছরে দু লক্ষ মন চাল বাইরে চলে যায়, গত বছ্র রপ্তানী হয়েছে আট লক্ষ মন। গুদামগুলি এখন খালি।

যদিও চালের দাম বেড়ে টাকায় ষোল সেরে দাঁড়িয়েছে, তেলেঙ্গা ব্যাপারী এই চড়া দামেও যা চাল পাচ্ছে কিনে নিচ্ছে। তারা টাকায় দশ সের দামেও কিনতে প্রস্তুত। কিন্তু চাল এখন দুষ্প্রাপ্য। তারা এখন সমুদ্রে জোয়ার আসার প্রতীক্ষা করছে। এবার তারা ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চলে যাবে চাল কেনার জন্য।

চালের দর বাড়তেই আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা এক বড় সমস্যা হল। রাস্তায় কারুর কাছে চাল দেখলে লোকে লুটে নিচ্ছে। ঘরে চাল থাকতেও যদি কেউ বিক্রী করতে রাজী না হয় তবে লোকে তার ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আউলদায় এমন একটি বড় ঘটনা ঘটে গেছে। দলে দলে লোক রাস্তায় চলাচল করতে দেখা যায়। কেউ বা রোজগারের সন্ধানে কেউ বা চালের। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারা। ভিখারীদের সংখ্যা বাড়ছে।

২৫শে অক্টোবর জমিদারদের তরফ থেকে পদ্মলোচন মণ্ডল কালেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই দরখাস্তটি দিলেন :

মহাশয়

বালেশ্বর জেলার জমিদাররা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করছি যে ৮ই নভেম্বর দেয় খাজনার কিস্তি জমা দেবার জন্য দয়াপূর্বক এক মাস সময় দিন। অনাবৃষ্টি ও প্রখর গ্রীষ্মে এবার ফসল হানি হয়েছে। আমরা ফসলের আশা ত্যাগ করেছি। দ্বিতীয় কারণ, যে মহাজনদের থেকে দাদন নিয়ে রায়তরা খাজনা দেয় তারা এবার দাদন দিচ্ছে না এবং এ কথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। তৃতীয় কারণ, ভাল দাম পেয়ে চাষীরা ঘরে যা ধান ছিল সব বিক্রি করে দিয়েছে, এখন কারুর কাছে ধান নেই। এ অবস্থায় গরীব চাষীরা খাজনা দিতে পারবে না। সে কারণে আমরা নির্দিষ্ট তারিখে রাজপ্রাপ্য জমা করতে অক্ষম। অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে অন্তত এক মাস সময় তো লাগবেই।

বশম্বদ,

বালেশ্বরের জমিদারগণ।

কালেক্টর মসপ্রাট দরখাস্তখানি কমিশনারকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর মন্তব্য জমিদারদের আবেদন সঙ্গত। সেটি পেয়ে কমিশনার তার উপরেই লিখলেন ফসল ষোল আনা নষ্ট হয়নি, আট আনা উঠবে এবং খাজনা দেবার সামর্থ্য জমিদারদের আছে।

অন্য একটি পত্রে মসপ্রাট কমিশনারকে জানিয়েছিলেন যে যাদের কাছে চাল আছে তাদের তিনি চাল বিক্রি চালু রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। উত্তরে রেভেনশা লিখলেন :

আপনার জেলায় যে পরিমাণ চাল আছে বলে আপনার অনুমান আমার মনে হয় তার থেকে অনেক বেশী আছে। তাছাড়া এ বছরের ফসল অন্তত জেলার চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট হবে। কোনও কারণেই আপনি ন্যায্য কারবারে হস্তক্ষেপ করবেন না। মূল্যবৃদ্ধির ফলে রপ্তানী নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। দাম যদি আরও বাড়ে তাহলে দেখবেন রপ্তানী না করে ব্যাপারীরা আমদানী করতে আরম্ভ করেছে।

পত্র পেয়ে মসপ্রাট চুপ হয়ে গেলেন। এদিকে যাদের কাছে চাল আছে তাদের বাড়ি ডাকাতি শুরু হল। এ সমস্যা কি করে সামলাবেন ভেবে পুলিশ সুপার শাটলওয়ার্থ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ধরা পড়লে ডাকাতরা বিনা দ্বিধায় দোষ স্বীকার করে আর নির্বিকার জেলে চলে যায়। বালেশ্বরের জেলখানা ভরে গেছে।

বটেশ্বরের নেত্র সেনাপতি দুপুরের গরমে বিছানায় ছটফট করছিল কিন্তু সে উৎকর্ণ, কারণ তার বাড়িতে কিছু চাল আছে। সম্প্রতি চুরি ডাকাতি বেড়ে গেছে। হঠাৎ বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখল জনমানবের চিহ্ন নেই। দরজা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় চোখে পড়ল পায়ের কাছে এক টুকরো কাগজ, তাতে আঁকা বাকা অক্ষরে লেখা, 'চাল বিক্রি না করলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেব।'

গঞ্জাম : ১৮৬৫

সর্বপ্রকারে গঞ্জাম ওড়িশার অপরিহার্য অঙ্গ হলেও জেলাটি মাদ্রাজের অধীন। ওড়িশার বিশেষ করে পুরীর সঙ্গে এ জেলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। চিল্কার রাস্তায় ওড়িশা থেকে গঞ্জাম জেলায় চাল চালান হয়। এ বছর কিন্তু ওড়িশা থেকে চাল আসা বন্ধ হয়ে গেছে। যে জাহাজগুলি সমুদ্রপথে ওড়িশা থেকে চাল আনতে গিয়েছিল সেগুলি এখনও ফেরে নাই। গঞ্জাম সাধারণ বছরেও ঘাটতি জেলা, তার উপরে এবার ফসল হানি হয়েছে। রম্ভা ও গঞ্জামের ব্যাপারীরা কালেক্টরকে এক আর্জিতে আবেদন করল বাংলা সরকার চাল রপ্তানী নিবিদ্ধ করে যে আদেশ জারী করেছে সেটি প্রত্যাহার করানোর প্রয়াস করা হোক।

আসলে বঙ্গ সরকার এমন কোনও আদেশ জারী করেনি। তথাপি গঞ্জামের কালেক্টর জি. থর্নহিল কটক কমিশনারকে এ বিষয়ে একখানি পত্র লিখলেন। রেভেনশার কাছ থেকে অনতিবিলম্বে জবাব এল যে চাল রপ্তানী নিষিদ্ধ হয়নি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কোনও রকম নিয়ন্ত্রণ চালু হয়নি। তিনি এও লিখেছেন যে চালের দাম বাড়াবার জন্য ব্যাপারীরা জোট বেঁধে কেনা বেচা বন্ধ করেছে।

রেভেনশার পত্র পেয়ে থর্নহিল বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের কাছে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠালেন :

> কটক থেকে চাল আসা বন্ধ হয়ে যাবার জন্য গোটা গঞ্জাম জেলায় চালের অভাব সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মপুর চালের দর টাকায় সাত সের এবং অন্যান্য শস্যের দামও তদনুপাতে। তাও সহজলভ্য নয়। দয়া করে ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দিন যে তারা যদি জাহাজ যোগে গোপালপুর অথবা গঞ্জামে চাল পাঠায় তবে এই মূল্যে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাবে। যদি ব্রহ্মদেশে প্রচুর চাল থাকে তবে সেখানেও এ খবর পাঠিয়ে দিন।

কটক : নভেম্বর ১৮৬৫

রামাক্ষয়ের চিঠি পেতেই সত্বর পুরী ফেরার কথা ভাবলেন বার্লো। দিন দিন পুরীর অবস্থার অবনতি হচ্ছে। অনেক চেষ্টার ফলে চাল বিক্রির বন্দোবস্ত হতে পেরেছিল কিন্তু ক্রেতার ভীড় এত বেশি যে বিক্রি চালু রাখা অসম্ভব হল। মঠগুলির গুদাম থেকে সকাল সাড়ে ছটা থেকে দশটা পর্যন্ত চাল বিক্রি হচ্ছিল কিন্তু ক্রেতারা আগের রাত্রি থেকেই জমা হতে শুরু করে। পুলিশের অনুপস্থিতিতে বিক্রি করা অসম্ভব। বিক্রিস্থানের সকল বন্দোবস্ত স্বয়ং রামাক্ষয় তদারক করেন। মঠাধ্যক্ষরা, আজ গুরুবার, কাল পূর্ণিমা ইত্যাদি নানা অজুহাতে বিক্রি বন্ধ করে দেয়। রামাক্ষয় বার্লোকে লিখলেন এই অবস্থার তাঁর উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কিছুদিন চেষ্টা করে রেভেনশার সঙ্গে পুরীর পরিস্থিতি আলোচনা করার সুযোগ পেলেন বার্লো। রেভেনশার এখনও বিশ্বাস গ্রামাঞ্চলে ধান চাল আছে। বার্লো বড়দাণ্ডে হাট বসিয়ে চাল বিক্রির ব্যবস্থা করার কথা বললে তিনি তাঁকে দুখানি কাগজ দেখালেন। একটি ২১শে অক্টোবর বঙ্গ সরকারকে পাঠানো তারবার্তা। তাতে লেখা আছে : ফসল হানির জন্য আজ সকালে বাজার খুলতেই চালের দাম দাঁড়াল টাকায় আট সের। তবুও দুপুর নাগাদ চাল শেষ হয়ে গেল এবং দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেল। সদর ও গ্রামাঞ্চলে এখনও শান্তি বজায় আছে। আমি মুখ্য ব্যবসায়ীদের একটি সভা আহ্বান করেছি, চেষ্টা করব যাতে ন্যায্য দামে চাল বিক্রি বজায় থাকে।

২৩শে সেপ্টেম্বর বঙ্গ সরকারের তরফ থেকে এস. পি. বেইলীর জবাব এল : ছোট লাটের ইচ্ছা নয় যে স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কোনও রকম সরকারী হস্তক্ষেপ হয়। অথবা ব্যাপারীদের কম দামে চাল বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়।

এ বিষয়ে এটি অন্তিম নির্ণয়। কমিশনারের উপর বোর্ড অফ্ রেভিনিউ। সবার উপরে ছোট লাট। তিনিই বঙ্গ সরকারের হর্তাকর্তা। বার্লো বুঝলেন চালের দর ধার্য করা অথবা ব্যবসায়ের উপর কোনও রকম নিয়ন্ত্রণ সরকারের সমর্থন পাবে না। তিনি পুরী ফিরে গেলেন।

ওড়িশা বিভাগের কমিশনারের অন্যতম পদবী ট্রিবিউটরী মাহালের সুপারিণ্টেডেণ্ট। এই পদের সুবাদে সকল দেশীয় রাজ্যের উপর তাঁর কর্তৃত্ব আছে। রেভেনশা কটক এসেছিলেন চার মাস আগে। তিনি আশা করেছিলেন অচিরে বদলীর আদেশ পাবেন। ভেবেছিলেন কটক ছেড়ে যাবার আগে যতটা সম্ভব দেশীয় রাজ্যগুলি ঘুরে দেখবেন। শীতকাল ভ্রমণের উপযুক্ত। স্থির করলেন প্রথম বাঁকী যাবেন। তারপর নয়াগড় হয়ে দাশপাল্লার রাস্তার মহানদীর দক্ষিণে যাবেন। নদী পার হয়ে নরসিংহপুর, সেখান থেকে হিন্দোল হয়ে অনুগুল। তারপর তালচের, কেন্দুঝর ও ময়ূরভঞ্জ হয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে কটকে ফিরবেন। এই মর্মে ভ্রমণসূচী তৈরি করে সরকারের সচিবের কাছে পাঠালেন। সচিব বেইলী লিখেছেন তাঁর প্রস্তাবিত ভ্রমণসূচি অনুমোদিত হয়েছে। ছোট লাট অবশ্য আশা ব্যক্ত করেছেন, আপনি নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সহায়তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন।

এ চিঠি যখন এল তখন রেভেনশা কটক ছেড়ে সফরে গেছেন। ভ্রমণসূচী পাঠানোর দুদিন পরে তিনি বাঁকী যাত্রা করেছিলেন।

কলকাতা : নভেম্বর ১৮৬৫

রেভেনশা, বোর্ড অফ্ রেভিনিউ এবং ছোট লাট ওড়িশার পরিস্থিতি নিয়ে বিচলিত ছিলেন না সত্য কিন্তু কলকাতায় এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা খবর রাখতেন এবং তাঁরা উদ্বিগ্ন হলেন। গঞ্জামের কালেক্টরের তারবার্তা পেয়ে বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্সের প্রেসিডেণ্ট আর্ স্কট মনক্রিপ স্থির করলেন, এ বিষয়ে কিছু করতে হবে। তিনি ডিস্‌বার্ণ এণ্ড কোম্পানির অংশীদার। এই কোম্পানির তরফ থেকে তিনি ছোট লাটকে এই পত্রখানি পাঠালেন ৩রা নভেম্বর :

মন্বন্তরগ্রস্ত অঞ্চলে চাল আমদানি করা আবশ্যক। কোথায় এবং কত শীঘ্র চাল মিলবে তার সন্ধান করা দরকার। ব্রহ্মদেশে প্রচুর চাল মজুদ আছে। সেখান থেকে চাল কিনে ছোট ছোট জাহাজ যোগে বাংলা এবং ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা আগে থেকে জানতে পারলে হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিসবার্ণ কোম্পানির বাজারে সুনাম আছে, তারা চাল কিনলে কেউ সন্দেহ করবে না। তাদের এ দায়িত্ব দিলে তারা নিজেদের খরচ ও লাভ না নিয়ে ছয় সপ্তাহের মধ্যে এক হাজার টন চাল কলকাতায় আনতে পারবে।

এ প্রস্তাবের উপর বোর্ডের মত চাইলেন লাট সাহেব। বোর্ডের সেক্রেটারী আর. টি. চ্যাপম্যান লিখলেন যে মনক্রিপের লোকহিত চিন্তা প্রশংসার্হ, কিন্তু পরিস্থিতির যে বিবরণী তিনি দিয়েছেন তা অতিরঞ্জিত। বোর্ডের মত কোনও কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে সরকারের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। এমন করলে লাভের থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। দেশের অবস্থা যদি সত্যই এমন যে ব্রহ্মদেশ থেকে চাল আমদানি করা আবশ্যক হয় তবে ব্যবসায়ীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সরকারের তুলনায় সুচারুভাবে এ কাজ করতে পারবে। এছাড়া জনসাধারণের এমন ধারণা হওয়া উচিত নয় যে সরকারই সবকিছু করবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সরকারের অনেক ক্ষতি হয়েছে। যে জমিদার গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়ে তাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

ছোট লাট সেসিল বীডন বোর্ডের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি মনক্রিপকে জানালেন যে তিনি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে অক্ষম। পত্রখানির এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের প্রতিলিপি তিনি ভারত সরকারকে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে জবাব পেলেন যে গভর্নর জেনেরাল ইন্ কাউন্সিল তাঁর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।

সেকালের সাহেবদের একজন অদৃশ্য পরামর্শদাতা ছিলেন—জন ষ্টুয়ার্ট মিল। এক সময় তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে চাকুরি করতেন। তিনিই ইউটিলিটারিয়ান সোসাইটির পুরোধা। ইদানীং তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য। রাজনীতি অর্থশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁর লেখা শিক্ষিত সমাজকে নাড়া দিয়েছে। ভারতে কার্যরত

সাহেবরা তাঁর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। মিলের এই উক্তির সঙ্গে সকলে পরিচিত :

দূর থেকে সরকারী খরচে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা মাত্র একটি পরিস্থিতিতে যুক্তিযুক্ত হতে পারে। সেটি হল যখন কোনও বিশেষ কারণে মুনাফার উদ্দেশ্যে বেসরকারী উদ্যোগে এ কাজ না হয়। অন্য সময় এমন উদ্যোগ বিরাট ভুল। সরকার বাণিজ্যে হাত দিলে ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতা করতে সঙ্কোচ করবে। তাছাড়া সরকার একজন ব্যবসায়ীর থেকে বেশী করতে পারলেও ব্যবসায়ীদের সমবেত চেষ্টায় যা সম্ভব সরকার কোনও সময়েই তা পারবে না।

পুরী : নভেম্বর ১৮৬৫

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বার্লো পুরী ফিরে এলে স্বস্তি পেলেন রামাক্ষয়। কিছুদিন হল তিনি নাজেহাল হচ্ছিলেন। কোর্ট কাছারীর কাজ মাথায় উঠেছিল। চাল বিক্রির ব্যবস্থা করা, দোকানের সামনে ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি কাজে সারাক্ষণ কাটাচ্ছিল। যেখানেই যান ঝুড়ি বস্তা নিয়ে দলে দলে লোক চাল কিনবার আশায় তাঁর পিছনে পিছনে আসে।

পালকি থেকে নেমে বাংলোর ভিতরে যেতে যেতে বার্লো রামাক্ষয়কে ডেকে পাঠালেন। দিন দিন অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে। আজকাল মঠগুলির সামনে ভীষণ ভীড় লেগে থাকছে। যাদের শরীরে শক্তি আছে তারা ধাক্কাধাক্কি করে আগে যাচ্ছে এবং চাল পাচ্ছে। দুর্বলেরা পিছনে থেকে যাচ্ছে এবং দিনের শেষে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরছে। ব্যাপারীদের দালালরা পরিস্থিতি আরও জটিল করে দিয়েছে। তারা গুজব রটিয়ে দিয়েছে যে পুরীতে চাল বেচতে গেলে সরকার টাকায় বার সের দরে বিক্রি করতে বাধ্য করবে। এই ভয় দেখিয়ে তারা রাস্তার থেকে সব চাল কিনে নিচ্ছে। পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য গরীব স্ত্রীলোকদের এ কাজে লাগিয়েছে। তারা চালের উপর ঘুঁটে চাপা দিয়ে আনে যাতে কেউ সন্দেহ না করে যে তারা চাল নিয়ে যাচ্ছে।

শহরের তো এই অবস্থা। গ্রামাঞ্চল থেকেও লোকের দুর্দশার খবর আসছে। নবপাটনা থেকে খবর এসেছে যে কৃষ্ণপ্রসাদের লোকদের যথাসাধ্য সাহায্য করা সত্ত্বেও লোকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এমন কি অনাহারে মৃত্যুর খবরও আসছে। রণপুরে চালের দাম বেড়ে হয়েছে টাকায় সাড়ে সাত সের। ভূষণ্ডপুরে পুলিশের সাহায্যে চাল বিক্রি হচ্ছিল, কিন্তু চাল আর পাওয়া যাচ্ছে না। বিয়াল্লিশ বাটি ও বলরামপুর গ্রামের লোক নাগপুর গ্রামের হাট থেকে চাল কেনে। সে হাটে চাল আসা বন্ধ। বউলানি থেকে খবর এল, দুটি ছেলে অনাহারে মারা গেছে। পিপিলিতে

চালের দাম টাকায় আট সের। লোক চাল না পেয়ে ফলমূল, শালুক, তেঁতুলপাতা ইত্যাদি খেয়ে কোনও রকমে বেঁচে আছে।

সবথেকে মর্মন্তুদ খবর আসছে চিল্কা অঞ্চল থেকে। বিশেষ করে পারিকুদ ও মালুদ থেকে। মালুদের লবণের আড়তের কাছে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। লবণ তৈরির কাজ বন্ধ, লোকের রোজগার নেই। তার উপর ফসলহানির জন্য লোকের দুর্দশার সীমা নেই। আয়ের সন্ধানে লোক দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ছে। স্ত্রীলোক ও বাচ্চাকাচ্চা ঘরে রয়ে যাচ্ছে। তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়।

পুলিশ কনেস্টবলরা আর্জি জানিয়েছে শুধু বেতনে তাদের সংসার চলছে না, তারা মহার্ঘ ভাতা চায়।

বার্লো পুরী ফিরে দিন রাত কাজে ডুবে রইলেন. শহর ঘুরে কিভাবে চাল সুচারুভাবে বিক্রি চালু রাখা যায় তা বিচার করলেন। রেভেনশাকে জানালেন তাঁর ধারণা যে প্রচুর চাল মজুত আছে তা ঠিক নয়। আমদানি না করলে অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়বে। আরও জানালেন যে পারিকুদ মালুদ অঞ্চলে কলকাতা থেকে জাহাজযোগে চাল না পাঠালে লোক অনাহারে মরবে।

পত্র লিখতে পারঙ্গম রেভেনশা। তার উত্তর সত্বর এসে গেল :

কটক ১৪ই নভেম্বর, ১৮৬৫

প্রিয় বার্লো,

পারিকুদ ও মালুদের দুর্দশা বর্ণনা করে আপনি তের তারিখে যে পত্র লিখেছেন তা পেয়েছি। আপনাকে যারা খবর দেয় তারা মনে হয় বেশ রংঢং চড়িয়ে বলে। সবদিক থেকে আকালের খবর আসছে; যদিও আমার মনে হয় উঁচু জমির ফসল হানি হলেও অন্য জমি থেকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ফসল উঠবে। পারিকুদের দুদিকে লবণাক্ত জল, তাই এ অঞ্চল সম্পূর্ণ বর্ষানির্ভর। সেখানে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্দশা স্বাভাবিক। সরকারকে এ বিষয়ে আমি অবগত করিয়েছি। অর্থের অনুমোদন পাওয়া এবং অর্থ পেলে চাল ক্রয় করে জাহাজ যোগে পাঠানো সহজ নয়। এক উপায় আছে; কিছুদিনের জন্য লোক অন্যত্র যেতে পারে। যারা সক্ষম তারা কাজ করতে পারে। অবশ্য বৃদ্ধ ও শিশুরা কাজ করতে পারবে না।

আপনি জমিদারদের বলুন তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করুন। প্রজাদের তাঁরা যেন সরকারের উপর নির্ভর হতে না দেন। আপনি সব সময় সব জিনিসের উজ্জ্বল দিকটি দেখবার চেষ্টা করবেন। জনসাধারণকে হতাশ হতে দেবেন না। আট আনা ফসল হলে দুর্ভিক্ষ হবে না। সবাইকে ভরসা দেবেন আর চেষ্টা করবেন যাতে তারা পরস্পরের সহায়তা করে। তাদের বোঝাবেন, কাজটি সহজ না হলেও হিম্মত থাকলে সব কিছু সম্ভব।

দেশে যে খাজনা আদায় হয় তার একটা বড় অংশ লোকহিতে খরচ হয়। যদি চাল বেশী মাত্রায় রপ্তানি হয়ে থাকে তবে আরও অধিক হয়ে থাকবে। দাম দিলে চাল মিলবে। দেশের কোথায়ও যদি চাল থাকে তবে যেখানে দাম বেশি সেখানে আসবে। গরীব লোকদের পক্ষে সময়টি সংকটজনক কিন্তু কি করা যাবে?

এখানে বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা আশা করছি শীঘ্রই বর্ষা নামবে। ভাল করে

খোঁজ নিলে দেখবেন চিল্কা অঞ্চলের অবস্থা যতটা সঙ্গীন ভাবছেন ততটা নয়। প্রার্থনা করছি তাই যেন সত্য হয়।

আপনার বিশ্বস্ত
টি. এ. রেভেনশা।

বার্লো ভাবলেন এই রেভেনশা নামধেয় লোকটি একটি আজব প্রাণী। লোকটি নির্বোধের দুনিয়ায় থাকে। চিঠিখানি রেখে বার্লো জানলা দিয়ে আকাশ দেখলেন, দেখলেন মেঘ আছে, কিন্তু বর্ষার নামগন্ধ নেই। কাল রাত্রে মেপে মেপে দু চামচ বৃষ্টি হয়েছিল।

ইতিমধ্যে চালের দাম আরও বেড়েছে। এখন একটাকায় সাড়ে ছয় সের চাল মিলছে।

মিঠাকুয়া : নভেম্বর ১৮৬৫

পুরীর পুলিশ সুপার লেসী দশদিন আগে ট্যুরে বেরিয়েছেন। গন্তব্য ফতেপুর। এবার অবশ্য পাখি শিকার উদ্দেশ্য নয়। এ অঞ্চলের অবস্থা সরেজমিনে সমীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে হবে।

খুর্দা অঞ্চলে ফসলের অবস্থা বিশেষ মন্দ নয়। গত সপ্তাহে আকাশ মেঘলা ছিল। অবস্থার আর অবনতি হয়নি। বোলগড়ের দিকে অবস্থা অন্যরকম। জঙ্গিয়া আর টাঙ্গীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ফসল জ্বলে গেছে। ছোট ছোট এক এক ফালির ফসল চাষীরা কোনক্রমে বাঁচিয়ে জল সেচন করে। লেসী তাঁবু খাটিয়েছেন জঙ্গিয়াতে। তাঁর লোকেরা বাজারে গিয়ে চাল কিনে আনল। তারা জানাল, নতুন চাল টাকায় দশ সের এবং পুরাতনের দর টাকায় আট সের।

চিল্কা অঞ্চলে ক্যাম্প করে লেসী সুনাখালা গেলেন। এখানে প্রায় ষোল আনা ফসল নষ্ট হয়েছে। কোথায়ও একটিও সবুজ ধানগাছ দেখা গেল না। সব ক্ষেতে গোরু চরছে। সরবরাকর খবর দিল যে এ এলাকার অধিকাংশ পুরুষ জীবিকার খোঁজে গঞ্জাম অথবা কটক চলে গেছে।

বালুগাঁ থেকে লেসী বানপুর গেলেন ঘোড়ায় চড়ে। এক ব্যক্তি তার জমি দেখাতে নিয়ে গেল। দশমানের* একখানি ধড় ক্ষেত, কোথাও একটি ধানগাছ নেই। লোকটি ভিখারী হয়ে যাবে। তার উপর খাজনার জন্য নিত্য তাগিদ। এভাবে জবরদস্তি করলে তাকে লাঙল গোরু বেচতে হবে, আগামী বছর চাষের সম্বল থাকবে না।

* জমির পরিমান বিশেষ, আন্দাজ বিঘা।

পারিকুদ মালুদ অঞ্চলে এসে লেসী ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে চললেন। নবপাটনা এবং কৃষ্ণপ্রসাদগড় ঘুরে দেখলেন। কোথায়ও ফসলের চিহ্ন নেই। মাত্র কয়েকটি গ্রামে ব্রাহ্মণেরা অল্প ফসল কোনও ক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ অঞ্চলের বিশ ত্রিশ জন অনাহারে মরেছে। এ সংখ্যা বেড়ে যাবার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বড়চুর একটি বড় গ্রাম। এটি এখন জনশূন্য। অবশ্য কিছু স্ত্রীলোক ও বাচ্চা কাচ্চা আছে। লেসী কয়েকটি ঘরে ঢুকলেন। আকালের ছায়া ঘনিয়ে আসতে এক গৃহকর্তা দুমাস আগে পুত্র পরিবার ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার ছিন্নবাস স্ত্রী মেঝেতে পড়ে আছে। উঠে তার দুটি সন্তানকে এনে লেসীর সামনে ধরল সে। কন্যাটি কঙ্কালসার, উঠে বসার শক্তি নেই। আরও কয়েক বাড়িতে এমনি পরিত্যক্তা স্ত্রীদের করুণ কাহিনী শুনলেন লেসী। এক বাড়ির তিনটি সন্তান কদিন আগে মারা গেছে। অন্য এক বাড়িতে একটি। এক পরিবারের স্বামী স্ত্রী অনাহারে অথবা অখাদ্য খেয়ে মারা গেছে।

পারিকুদের রাজা প্রশংসনীয় কাজ করছেন। লেসী তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর কাছে ধান আছে এবং কয়েকমাস তার সাহায্যে কয়েকটি পরিবার বেঁচে আছে। তাছাড়া পনেরোটি ছেলেকে নিজের বাড়িতে রেখেছেন। সতেরোটি মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন অন্য এক জায়গায়। একটি অন্নসত্র চালাচ্ছেন তিনি।

এই কয়েকদিনের ভ্রমণে এক মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা হল লেসীর। গোটা অঞ্চলে মৃত্যুর ছায়া। লোকের আর্তনাদ আকাশ স্পর্শ করছে। মিঠাকূয়াতে একরাত্রি কাটালেন লেসী। সেখান থেকেই নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন। ২৪শে নভেম্বর ক্লিষ্ট হৃদয়ে সমুদ্রের রাস্তায় পুরী ফিরে এলেন তিনি।

কলকাতা : নভেম্বর ১৮৬৫

২৫শে নভেম্বর সকালে বোর্ডের সচিব চ্যাপম্যান বার্লোর কাছ থেকে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পেলেন :

পারিকুদ মালুদ অঞ্চলে আকাল লেগেছে। মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। এস. পি. স্বচক্ষে লোকের দুর্দশা দেখে এসেছেন। পুরুষরা ঘর ছেড়ে চলে গেছে। স্ত্রী ও নাবালকগুলি নিঃসহায়। স্থানীয়ভাবে সহায়তার চেষ্টা চালাচ্ছি কিন্তু সর্বব্যাপী অন্নাভাবের মধ্যে এ কাজ কষ্টকর। সরকার সর্বভারতীয় স্তরে সহায়তার আবেদন করুন। মিঠাকূয়াতে অর্থের পরিবর্তে চাল পাঠানো দরকার। পারিকুদের রাজা যথাসম্ভব লোকদের সহায়তা করছেন।

অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে এটিও অধস্তনদের কাছে চলে গেল। দুদিন বাদে তার উপরে নোট এল চ্যাপম্যানের কাছে। চ্যাপম্যান জবাবী তারবার্তায় লিখলেন : মালুদের

খবর আরও বিস্তারিত জানাবেন। কতজন মারা গেছে? কত পরিবার পরিত্যক্ত? পারিকুদ ও মালুদ অঞ্চলের জনসংখ্যা কত? সেখানে কি একজনও ধনী ব্যক্তি নেই? অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এমন লোকের সংখ্যা কত?

এ বার্তার জবাব আসবার আগেই পারিকুদে কি করে চাল পাঠানো যায় সে বিষয়ে মনক্রিপের মত চাওয়া হল। তিনি বললেন চাল কিনবার পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁকে দেওয়া হলে চারদিনের মধ্যে ৮০০ টন চাল আরাকান থেকে কিনে পারিকুদে পাঠাতে পারবেন। তিনি এও জানালেন যে সরকারের সিদ্ধান্ত যদি ২৮শে নভেম্বর সকালে এমনকি বিকেল চারটা নাগাদও জানিয়ে দেওয়া হয় তবে ১লা ডিসেম্বরে যে জাহাজ ছাড়বে তাতে পারিকুদের জন্য ২৫০ বস্তা চাল পাঠাতে পারবেন। এই স্তরে এসে বাগড়া দিলেন এ. গ্রোট, বোর্ডের সিনিয়র সদস্য। তিনি ফাইলে লিখলেন মিঠাকুয়াতে সাহায্য পৌঁছবার আগে সেখানকার লোক কাজ ও খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র চলে যাবে। সুতরাং চাল পাঠিয়ে লাভ হবে না। তাছাড়া জাহাজে চাল পাঠালে এবং সে চাল মাগনা দিলে, সরকার অসুবিধায় পড়বে।

একজন সদস্য এমন নেতিবাচক মত লিখিতভাবে প্রকাশ করলে সমস্ত সম্পৃক্ত কাগজপত্র ছোট লাটকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিনি ফাইলে লিখলেন এ বিষম পরিস্থিতিতে ২৫০ বস্তা চাল মিঠাকুয়াতে পাঠালে ভাল হবে। এ চালের খরচ রিলিফ কমিটি বহন করবে। চাল মিতব্যয়িতার সঙ্গে বিতরণের দায়িত্ব তারাই নেবেন। এ কাজ অবশ্য মালুদের জাগীরদারও করতে পারেন। সব থেকে ভাল হয় যদি বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তিনি বোর্ডের সেক্রেটারীকে লিখলেন : পুরীর দক্ষিণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে আমার মনে হয় হস্তক্ষেপ না করার নীতি ত্যাগ করার সময় এসেছে। মিঠাকুয়াতে চাল পাঠানো উচিত। এ চাল ন্যায্য দামে বিক্রি হবে এবং যারা কায়িক পরিশ্রমে অক্ষম রিলিফ কমিটি চাইলে তাদের বিনামূল্যে দিতে পারে। সুতরাং আপনি ১লা তারিখে ২৫০ বস্তা চাল পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

সেদিন বোর্ড থেকে রেভেনশাকে এই তারবার্তাটি পাঠানো হল : মিঠাকুয়াতে চাল পাঠালে কিছু লাভ হবে কি? চাল আপনি ক্রয়মূল্যে, ধরুন টাকায় বার সের দরে, বিক্রি করতে পারবেন কি?

অন্য একটি তারবার্তা গেল পুরীর কালেক্টর বার্লোর কাছে। তাতে লেখা হল : কলকাতা থেকে ১লা ডিসেম্বর যে জাহাজ রওনা হবে তাতে মিঠাকুয়ার জন্য ২৫০ বস্তা চাল পাঠানো হবে। এ চাল মিতব্যয়িতার সঙ্গে বিতরণ করার জন্য একজন সতর্ক এবং কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসার পাঠাবেন। সম্ভব হলে টাকায় বার সের দরে চাল বিক্রি করবেন। সরকার আশা করে স্থানীয় রিলিফ কমিটি চালের মূল্য সরকারকে দেবে। যাদের চাল কেনার সামর্থ্য নেই তাদের মাগনা দেওয়া যেতে পারে।

তার বার্তা পেয়ে বার্লো খুশি হলেন। ২৯শে তিনি চ্যাপম্যানকে এই তারবার্তাটি পাঠালেন যদিও তার আর প্রয়োজন ছিল না : তদন্ত করে জানা গেছে যে ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৯৯২ জন গৃহত্যাগী। মালুদ পারিকুদ ও সাতপাড়ার লোকসংখ্যা বার হাজার। কোনও ধনী লোক নেই। পারিকুদের রাজা তাঁর রায়তদের কিছু কিছু সাহায্য করেন। আনুমানিক আট হাজার লোক দুর্দশার কবলে।

দাশপাল্লা : ডিসেম্বর ১৮৬৫

কটক থেকে ২০শে বেরিয়ে ডমপাড়া, বাঁকী, খণ্ডপাড়া, নয়াগড় ঘুরে দাশপাল্লায় এসে রেভেনশা তাঁবু খাটালেন একটি আমবাগানে। তার সঙ্গীদের জন্য ছোট ছোট তাঁবু খাটানো হল। বাগানের চারপাশে হাতি ঘোড়া বাঁধা হল এবং পাল্কি রাখা হল। চাপরাশী, খানসামা, সিপাই বেহেরা ইত্যাদি চলাচল করতে লাগল। অনেকে এসেছে সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে। সব মিলিয়ে মনে হবে একটি ছোট মেলা বসেছে।

তাঁবুর বাইরে চেয়ারে বসে রেভেনশা হুঁকো টানছেন এবং দাশপাল্লা সংক্রান্ত যে সব কাগজপত্র সঙ্গে এনেছিলেন সেগুলি নেড়ে চেড়ে দেখছেন। ওড়িশায় এসে প্রথম দু মাস তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি. এতদিনে ওড়িশার বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছেন। তাছাড়া শীতের আবহাওয়া আরামদায়ক। একটি বড় কৃষি মেলার আয়োজন করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেশে আকাল পড়াতে সকলে কৃষিমেলা স্থগিত রাখতে পরামর্শ দিল। এখন একমাত্র কাজ কেমন করে দুর্ভিক্ষ জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। যদিও কটকের অবস্থা পুরীর তুলনায় সন্তোষজনক এবং কটকের কালেক্টর দুর্ভিক্ষ নিয়ে তাঁকে উদ্ব্যস্ত করেন না পুরীর কালেক্টর বার্লো চিঠির পর চিঠি লিখে পাগল করে ছেড়েছেন। কিছু লোক আছে যারা সহজেই ঘাবড়ে যায়, রেভেনশার মনে হয় বার্লো তাদের একজন।

এবার সফরে যাবার আগে রেভেনশা স্থির করেছিলেন তিনি নিজে ফসলের অবস্থা যাচাই করবেন। কটকে যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে তাদের কথায় মনে হয়নি যে অবস্থা সঙ্গীন। পুরীর একজন জমিদার বলেছিলেন যে তাঁর এলাকায় ষোল আনা ফসল হবে। কটকের একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জেলাতে এখন অনেক চালু মজুদ আছে। খণ্ডপাড়ায় ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক কিন্তু নয়াগড়ে চার আনার বেশী আশা করা যায় না।

নয়াগড়ে একটি নতুন জিনিস লক্ষ্য করলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকে কন্ধদের থেকে সলপ গাছ কিনে, কেটে টুকরো করে ঢেঁকিতে কুটে গুঁড়ো করে ছেঁকে নিয়ে রান্না করে খাচ্ছে। লোকে একটি নতুন খাদ্যবস্তুর সন্ধান পেয়েছে ভেবে রেভেনশা খুশি হলেন।

তিনি যখন তাদের সলপ গাছ্ লাগাতে বললেন তাদের জবাব তা হয় না, সলপ কন্ধদের গাছ, তার গুঁড়ো খাচ্ছি বলে গাছ্ লাগাতে পারি না।

সব দেখেশুনে রেভেনশা ভাবলেন অবস্থা সঙ্কটজনক নয়। এই কথা জানিয়ে বোর্ডকে একখানি পত্র লিখলেন। এও উল্লেখ করলেন যে রাস্তায় অনেক ভিখারী দেখেছেন। দাশপাল্লার কাজ শেষ করে তিনি গরীবদের সমস্যার দিকে মন দিলেন। এদের জন্য কিছু করা দরকার। অনেক ভেবে নিজের অধীনস্থ তিনজন কালেক্টরকে লিখলেন :

ক্যাম্প, দাশপাল্লা
ডিসেম্বর ৩, ১৮৬৫

মহাশয়,

আজকাল এ অঞ্চলের গরীব লোক অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সেজন্য আমার মতে দরিদ্র ও অনাহার ক্লিষ্ট লোকদের সহায়তার জন্য চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি অভিযান চালানো যাক। অন্নসত্রের জন্য যে ফাণ্ড আছে এইভাবে সংগৃহীত অর্থ তাতে জমা করা হোক।

সকল শ্রেণীর লোকের থেকে চাঁদা নেওয়া হবে এবং সরকারী কর্মচারী অগ্রণী ভূমিকা নেবে। যদি প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয় যেখানে আকালের প্রকোপ বেশি সেখানে অন্নসত্র খোলা হবে।

অন্নসত্র কমিটির বৈঠক ডেকে কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আমাকে জানালে খুশি হব। চাঁদা দাতাদের তালিকায় আমার নামে ৫০ টাকা দরজ করবেন। প্রয়োজনে আমি অধিক অর্থ দিতে প্রস্তুত।

বিশ্বস্ত
টি. ই. রেভেনশা।

পত্রখানি পাঠিয়ে রেভেনশা ভাবলেন আমার করণীয় আমি করেছি। হুঁকোর আগুন নিভে গিয়েছিল সেটি আবার জ্বালালেন। দুবার টেনে ধোঁয়া ছেড়ে ভাবলেন, একবার পিকা টেনে দেখবেন কেমন লাগে। এবার নরসিংপুর যাবার উদ্যোগ করলেন।

মিঠাকুয়া : ডিসেম্বর ১৮৬৫

পুরী থেকে এসে নিজগড় বলভদ্রপুরে ১লা ডিসেম্বর ক্যাম্প করলেন বার্লো। পরের দিন সাতপাড়া গেলেন। সেখানকার দলবেহেরা জনগণের দুর্দশা বর্ণনা করল। পুরো অঞ্চলে মাত্র দুটি দোকানে চাল পাওয়া যায়। দোকানদাররা বানপুর থেকে চাল এনে টাকায় সাত সের দরে বিক্রি করছে। এ দরে চাল কেনার ক্ষমতা কম লোকের আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন শুনে আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেক লোক এল। সকলে

চাষী, সকলেরই কম বেশি জমি আছে কিন্তু ফসলহানির জন্য এখন ভিক্ষা সম্বল। তারা চায় তাদের দুর্দশা এবং ফসলের অবস্থা সাহেব স্বচক্ষে দেখুন। আশা দেখলে সাহেব নিশ্চয়ই কিছু উপায় করবেন। সব গ্রামে গিয়ে সকলের ক্ষেত দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু গ্রামবাসীরা নাছোড়বান্দা। অগত্যা আশ্বাস দিতে হল যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি আবার আসবেন এবং তাদের গ্রামে যাবেন। শুনে তারা ফিরে গেল।

সকাল এগারটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত পায়ে চলে বার্লো নবপাটনা, ভুরপাটনা, নৃযাঁগা, রাজমুণ্ডা প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে দেখলেন। একবাড়িতে পাঁচটি বাচ্চা ও একটি বিড়ালের সামনে এক মুঠো ভাত। একজনের বাড়িতে সামান্য ধান আছে কিন্তু পরিবার অভুক্ত। সে জানাল দুদিন আগে সে এই সামান্য ধান কিনেছে এই ভেবে যে যদি বেঁচে থাকে তবে আগামী বছর এই ধান বীজের কাজে লাগবে।

অনেক বাড়িতে শাকপাতা শিকড় বাকড় দেখা গেল। সেগুলি বেছে শুকানো হচ্ছে। কোনও কোনও বাড়িতে বাচ্চারা সেগুলি কাঁচা খেয়ে নিচ্ছে। শিশুদের অবস্থা সবথেকে করুণ। কঙ্কালসার দেহে নির্জীবের মত পড়ে আছে। কয়েকটি শিশুকে তুলে ধরলে কাঁদবার চেষ্টা করল কিন্তু স্বর বার হল না। সাত বছরের একটি ছেলের মৃতদেহ পড়ে আছে। সকালে সে অন্যদের সঙ্গে শাক তুলতে বেরিয়েছিল। মৃত্যু তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে।

অনেক গ্রামে অনেক বাড়িতে লোক নেই। কাজের আশায় পুরুষেরা কটক অথবা চব্বিশকুদ চলে গেছে, পরে স্ত্রীলোকগুলি এদিকে সেদিকে চলে গেছে। অনেক ঘর খোলা পড়ে আছে অনেকে দরজার সামনে শুকনো কাঁটাগাছ্ রেখে গেছে। চুরি যাবার মত কোনও বস্তু ঘরে নেই।

সকলে সর্বস্বান্ত। টাকা পয়সা তো দূরের কথা বিক্রিযোগ্য বা বন্ধক দেবার মত কোনও জিনিস অবশিষ্ট নেই। পঞ্চাশটি বাড়ি ঘুরে বার্লো মাত্র ছখানি কাঁসার বাসন দেখতে পেলেন। গোরু বাছুর আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। যা দু একটি রয়ে গেছে তার ক্রেতা নেই। সন্ধ্যায় যখন বার্লো ক্যাম্পে ফিরলেন, কেন জানে তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল এবং তিনি কেঁদে ফেললেন। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ডায়ারিতে লিখলেন :

এই জনসাধারণকে দেখে আমার ধারণা হয়েছিল অবস্থা এমন কিছু উৎকট নয়। লোকেদের মুখে দৈন্যের তেমন ছাপ তো দেখছি না। পরে হৃদয়ঙ্গম হল এদের সহনশক্তি অসীম, নীরবে অনেক দুঃখ এরা সইতে পারে। ইউরোপীয়দের অনাহার বিষয়ে যে ধারণা এ ছবি তার থেকে একেবারে ভিন্ন। এখানকার লোক হয়ত ভাবে, বেশ তো শাকপাতা ছাড়া অন্য খাদ্য নেই, যতদিন এগুলি আছে খেয়ে বাঁচি, তার পরে ভাগ্যে যা থাকে ঘটবে। এ কারণে আমার মনে ভুল ধারণা হয়েছিল। এখন স্বচক্ষে সব দেখে বুঝেছি অধিকাংশ লোকই অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। যাদের সবল মনে হচ্ছে তারাও বেশিদিন বাঁচবে না।

স্টীমার থেকে চাল আনার জন্য মিঠাকুয়াতে ছোট ছোট নৌকার ব্যবস্থা করা হল। দিকে দিকে রটে গেল যে মিঠাকুয়াতে চাল আসছে। পাঁচ তারিখে চাল আসবার কথা। সেদিন সকাল থেকে ডাকবাংলার কাছে লোকের ভীড়। সকলের হাতে থালা, মাটির পাত্র অথবা ভাত খাবার জন্য কলাপাতা। অনেকদিন তারা ভাত দেখেনি। সকাল দশটা নাগাদ ভীড় বেড়ে প্রায় দশ হাজার হয়ে গেল।

বার্লো নিজে মিঠাকুয়া যাবেন ভেবেছিলেন কিন্তু পুরী ছাড়বার আগেই একটি টেলিগ্রাম পেলেন যাতে জানানো হয়েছে যে স্টীমারে চাল পাঠানো সম্ভব হল না, অবশ্য চাল নিয়ে একটি জাহাজ গোপালপুর যাচ্ছে। তথাপি বার্লো মিঠাকুয়া গেলেন এবং সকলকে জানালেন যে মিঠাকুয়াতে চাল আসছে না। কেউ এ কথা বিশ্বাস করল না, অনেক রাত্রি পর্যন্ত কেউ সেখান থেকে নড়ল না।

ফতেপুর : ডিসেম্বর ১৮৬৫

সকালে বার্লো বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য কাছের গ্রামগুলি ঘুরে দেখবেন। যেখানেই যান লোকের ভীড় জমে যায়। গুরুবাই অঞ্চলের অবস্থা আপেক্ষিক ভাল, এখানে ধানের জমি কম কিন্তু মাছ্ ধরার সুযোগ আছে। তাছাড়া পারিকুদের রাজা টাকায় ষোল সের দরে চাল বিক্রি বজায় রেখেছেন। আরও কিছুদিন পরে যখন জল শুকিয়ে যাবে তখন মাছ্ ধরা বন্ধ হয়ে যাবে, কলমীশাকও মিলবে না।

এখানকার লবণ দারোগা হিসাব রাখার জন্য প্রতিদিন দুই পয়সা মজুরী দিয়ে আঠাশজন লোক রেখেছিল। মজুররা এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে আগে যারা একদিনে দু হাজার মণ লবণের কাজ করেছে তারা এখন পাঁচশ করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া মজুরী এতই নগণ্য যে মজুরী ছেড়ে শাকপাতা তুললে অধিক লাভ। বার্লো নির্দেশ দিলেন মজুরী চার পয়সা করা হোক।

চেচুড়ীর পাণ্ডব সাহুর ছেলে অনাহারে মারা গেল কাল। বার্লো তার বাড়ি গেলেন, দেখলেন বাকি চারটি সন্তানও আর বেশিদিন বাঁচবে না। অলন্দার এক পরিবারের তিনজন অনাহারে মরেছে। সে পরিবারের অন্য বাচ্চাগুলিরও শেষ অবস্থা। দরজার সামনে যে বৃদ্ধা বসে আছে তার হাত পা অস্থিচর্মসার, চোখ পাথর হয়ে গেছে।

পারিকুদের রাজা এসে বললেন আপনি এসেছেন, আশা করি এবার আমাদের দুর্দশা ঘুচবে। আসলে নিজেকে ভরসা দিচ্ছিলেন তিনি। তাঁর নিজের অবস্থাও ভাল নয়। মালুদের জমিদারের প্রাপ্য চুকিয়ে তাঁর বাঁচত মাত্র ৪৫০০ টাকা। এর উপরে সম্প্রতি মামলা মোকদ্দমাতে খরচ হয়েছে প্রায় আট হাজার টাকা। এখন তাঁর হাত খালি। তবু যথাসাধ্য লোকেদের সাহায্য করে যাচ্ছেন।

ফতেপুরের অবস্থা আরও সঙ্গীন। স্ত্রীলোকেরা বাচ্চাদের নিয়ে বার্লোর তাঁবুর সামনে জড় হল। তাঁবুর বাইরে এসে প্রথমে নজরে পড়ল যে মহিলা তার কোলে একটি বাচ্চা আর দুটির হাত ধরে আছে। মনে হল না কোনওটি বেঁচে আছে। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

অস্থিচর্মসার স্ত্রীলোকগুলি বাচ্চাদের নিয়ে 'বাবু ভাত দে' বলে তাঁকে ঘিরে ধরল। কোনও ক্রমে ভীড় থেকে বেরিয়ে বার্লো গ্রামে গেলেন। চল্লিশ পরিবারের মৌজা ফতেপুরে দশজন অনাহারে মারা গেছে। প্রায় চল্লিশটি বাচ্চা বড়জোর আর দু সপ্তাহ বাঁচবে বলে বার্লোর মনে হল। তাদের মধ্যে অনেক এমন আছে যারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে। তাঁবুর সামনে যে স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলেন বার্লো সে তার পিছু পিছু চলছিল, ততক্ষণে কোলের ছেলেটি মরে গেছে যদিও তার মন এ কথা মানতে প্রস্তুত নয়।

বার্লো রামাক্ষয়কে একখানি পত্র লিখলেন :

ডিসেম্বর ৮, ১৮৬৫

প্রিয় বাবু,

আমার মাথায় হঠাৎ একটি বুদ্ধি এল সেটা কার্যকর করতে পারলে দেশের মঙ্গল হবে। কাজটি সঙ্গে সঙ্গে হাতে নেবেন। আমি ফিরে যেন দেখতে পাই কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। আপনাকে বলেছি কিনা ঠিক মনে নেই, কিছুদিন আগে পুরীর কয়েকজন লোক নরেন্দ্র পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁদের মতে এ কাজ শুরু করলে ত্রিশহাজার টাকা চাঁদা পাওয়া যেতে পারে।

খুব শীঘ্র এ কাজ হাতে নিলে লোকের রুজি রোজগারের একটি পথ খুলে যাবে। তাই আমার ইচ্ছা আপনি উঠে পড়ে লেগে যান।

নরসিংহ বাবু এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি পুরীতে নেই। মুনসিফের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। পুরীর রাজা ও মহান্তদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। রাজাকে বলুন এ কাজ যদি করা যায় তবে তাঁকে রিলিফ ফাণ্ডে এক হাজার টাকা দিতে হবে না। আমার ইচ্ছা স্থানীয় লোকেরা এ কাজের তদারক করেন। আমি কিছু সরকারী অনুদান পাইয়ে দেব। নিজেও কিছু চাঁদা দেব। সব দায়িত্ব একটি কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। তারাই চাঁদা আদায় করবে হিসাব রাখবে। আপনি এমনভাবে সবদিক দেখবেন যে আমি ফিরে যেন দেখতে পাই কাজ চলছে। রঘুনাথ চৌধুরী মোটা টাকা চাঁদা দিতে পারেন। তিনি আমাকে এ বিষয়ে বলেছিলেন এবং লিখেছিলেন যে পুরী এসে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন আমার সঙ্গে। আমি ফেরার আগেই যদি তিনি আসেন তবে সব কথা বিশদভাবে তাকে বলবেন। নরসিংহ বাবু চেতকানলের রাজার কাছে এ কাজের জন্য কিছু অর্থ চাইতে পারেন। পুরীর লোকেরা সমবেতভাবে আবেদন করলে তিনি অধিক অর্থ দিতে পারেন।

কাজ শুরু হলে আপনি সরে দাঁড়াবেন। অবশ্য সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কাজ দেখে যেন মনে হয় এ কাজ জনসাধারণের উদ্যোগেই হচ্ছে। কটকের রাধাশ্যাম নরেন্দ্রকে

এ উদ্যোগে সামিল করবেন, এক সময় এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এবার কাজে লেগে যান।

আপনার বিশ্বস্ত
জি. এন. বার্লো।

পত্রটির সঙ্গে একখানি তারবার্তার চিঠাও পাঠালেন যেটি বোর্ডকে পাঠাতে হবে :

সাতপাড়া, মালুদ, পারিকুদ অঞ্চলে সাত দিন ঘুরে দেখেছি। যে সব রিপোর্ট আগে পাঠিয়েছি তা অবস্থার সঠিক চিত্রণ ছিল। দুর্গতি সম্পূর্ণ এবং সর্বব্যাপী। সাতপাড়ায় পুষ্করিণী খননের জন্য ৫০০০ টাকা মঞ্জুর কার হোক। লোক কাজের আশায় আছে এবং যারা গৃহত্যাগী তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। এ কাজ ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না। টেলিগ্রামে জবাব পাঠাবেন। আমি সাতপাড়ায় অপেক্ষা করছি।

সেদিন রাত্রে বার্লো তার ডায়ারিতে লিখলেন :

অনাহার ও দুর্গতি যে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে তা দেখলে কষ্ট ও ভীতির সঞ্চার হয়। এ নির্মম সত্য আমাদের মানতেই হবে যে এ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধ বনিতা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এবং দুর্দশা থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই। এখন কেবল অপেক্ষা করে থাকা কবে শেষ লোকটির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

পুরী : ডিসেম্বর ১৮৬৫

সেদিন মিঠাকূয়াতে চাল এল না কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ১১ই সন্ধ্যায় চাল বোঝাই একটি জাহাজ পুরীর সমুদ্রকূলে এসে ভেঙে গেল। ফরাসি জাহাজ 'ফিলানিম্' এর মালিক কলকাতার রবার্ট এণ্ড শারিয়েল কোম্পানি। অন্য একটি কোম্পানির চাল নিয়ে জাহাজটি গোপালপুর ও মাদ্রাজ যাচ্ছিল। জাহাজটি যখন ভেসে এসে কূলে লাগল এবং নাবিকরা তীরে এল তখন এসব কথা কেউ জানত না। খবর পেয়ে রামাক্ষয় ভাবলেন জাহাজটি ভুল করে মিঠাকূয়া না যেয়ে পুরী এসে গেছে। নাবিকরাও সঠিক কিছু বলতে পারল না। রামাক্ষয় কলকাতায় তারবার্তা পাঠালেন : 'ফিলানিম' জাহাজ সোমবার সন্ধ্যায় নোঙর টেনে পুরীর সমুদ্রকূলে এসে লেগেছে। জাহাজে চাল বোঝাই। জাহাজের মালিক কলকাতার 'রবার্ট এণ্ড শারিয়েল কোম্পানি'।

জাহাজ থেকে প্রায় দু হাজার বস্তা চাল খালাস হল এবং সেগুলি ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হল। জাহাজ থেকে চাল নামানো হচ্ছে দেখে কিনবার জন্য লোক জমা হল। তাদের অনেক বোঝানো হল যে এ চাল এখানে বিক্রির জন্য আসেনি, তারা মানতে রাজী নয়, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত চাল রক্ষা করতে এবং ভীড় সামলাতে পুলিশ মোতায়েন করা হল।

আঠার তারিখে পুরী ফিরলেন বার্লো। সাতপাড়ায় থেকেই তিনি জানতে পেরেছিলেন পুকুর কাটবার জন্য বোর্ড ৫০০০ টাকা মঞ্জুর করেছে। এ খবর আসবার আগেই তিনি মাত্র একশ টাকায় অলুপাড়াতে একটি জীর্ণ পুকুরের সংস্কারের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। প্রায় পাঁচশ লোক কাজ পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে জীবনের সামান্য লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই ভূমিহীন লোকগুলি মজুরী দিয়ে অল্প চাল কিনতে পারছে। ইতিমধ্যে খুর্দা পুরী রাস্তার কাজ শুরু করার অনুমতি এসে গেল। এতে আরও অনেক লোকের রোজগারের রাস্তা খুলে গেল।

সমুদ্রকূলে যে চাল পড়ে আছে তার সম্পর্কে কোনও নির্দেশ এল না কলকাতা থেকে। বাইরে থেকে চাল এসেছে জানবার পরে বাজারে চালের দর একটু কমে গেল। কদিন পরে অবশ্য আবার দাম চড়তে আরম্ভ করল। কয়েকদিন পরে জানা গেল এ চাল পুরীতে বিক্রি হবে না এবং সরকার এ চালের মালিক নয়। তাছাড়া জাহাজের মালিক এবং ইনস্যুরেন্স কোম্পানির মধ্যে ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিবাদ চলছে। সুতরাং পুরীতে এ চাল মিলবার কোনও সম্ভাবনা নেই। সমুদ্রকূলে পড়ে থাকা চালের আশে পাশে বুভুক্ষু লোকের ভীড় লেগে রইল।

বার্লো এবার বোর্ডকে অনুরোধ করলেন ওড়িশার জন্য অন্য চাল পাঠানো হোক। বোর্ড কটক-গঞ্জাম ও কটক-পুরী রাস্তার কাজের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেছিল; চালের বিষয়ে কিন্তু তাদের মত বাইরে থেকে আমদানী করা অনাবশ্যক।

কটক : ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬

রাজন্যশাসিত অঞ্চল (গড়জাত) ঘুরে ৩১শে জানুয়ারি রেভেনশা কটক ফিরে এলেন। হঠাৎ কাজের চাপ বেড়ে গেল। দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কাজই বেশি।

রেভেনশা ভেবেছিলেন প্রতি জেলায় রিলিফ কমিটি গঠন করে চাঁদা আদায় করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। মসপ্রাট জানালেন রেভেনশার দেওয়া পঞ্চাশ টাকা মিলিয়ে জমা হয়েছে মাত্র ৫৪৪ টাকা। কটকের রিলিফ কমিটির মিটিং-এ বেশি লোক এল না সুতরাং কাজও এগোল না। পুরী থেকে বার্লো জানালেন তিনি রিলিফ কমিটির সভা আদৌ ডাকেননি, তাঁর মতে এতে কোনও লাভ হবে না।

নিজের তরফ থেকে বার্লো প্রস্তাব দিলেন চিল্কা অঞ্চলের লোকদের কাজ জুগিয়ে দেবার জন্য লবণের কাজ পুনরায় শুরু করা হোক। পুরী এবং কটক জেলায় অনেকে রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং রেভেনশা বোর্ডকে লিখলেন লবণ তৈরির কাজ চালু করার আবশ্যকতা নেই। তিনি বার্লোকে নিজের মত জানিয়ে লিখলেন : চারদিকে কাজ আরম্ভ করবেন না, অভুক্ত লোক কাজের সন্ধানে দশ মাইল যেতে দ্বিধা করবে

না। যে গ্রামে আকাল সেখানেই কাজ পাইয়ে দিতে হবে এ ধারণা ভুল। কাজ যেখানে লোক সেখানে, লোক যেখানে কাজ সেখানে এমন হতে পারে না।

পুরী জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তো আছেই, এবার শুরু হল কলেরা। কলেরা হওয়া কিছু নতুন জিনিস নয় তবে এ বছর লোকে অখাদ্য কুখাদ্য খাচ্ছে বলে অবস্থার অবনতি হবার সম্ভাবনা। খবর এল গোপ থানার সোরডা ও নাগপুর গ্রামে কলেরার শিকার হয়েছে ১৬৩ জন। অন্যবারের মত এবারও যদি তীর্থ যাত্রী আসে তাহলে কলেরায় আরও অনেক প্রাণহানি হতে পারে। রেভেনশা সরকারকে লিখলেন যেন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরীতে কলেরার প্রকোপের বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়। এবং ইস্তাহার বানিয়ে রেললাইন এবং রাস্তায় রাস্তায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়। সরকার এ খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিল, বাংলা ও উর্দুতে হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে থানা ও রেলষ্টেশনে টাঙিয়ে দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে ৫০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে নরেন্দ্র পুকুরের কাজ আরম্ভ করেছিলেন বার্লো। লোকে মজুরী পায় কিন্তু কিনবার জন্য চাল নেই বাজারে। কটক পুরী রাস্তায় কাজ করে অনেক লোক কিন্তু চালের সরবরাহ নেই। দিনের শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত লোকগুলি চাল কিনবার জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। তাদেরও অনাহারে দিন কাটে। রাস্তা নির্মাণের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার নোলান বার্লোর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে মজুরী খাতে কুড়ি হাজার টাকা তিনি বার্লোকে অগ্রিম দেবেন যা দিয়ে বার্লো চাল কিনে মজুরদের জোগাবেন। বিভাগীয় সচিবের কাছে অনুমোদন চেয়ে নোলান লিখলেন : মজুরী দিয়েই আমাদরে দায়িত্ব শেষ হয় না। চাল জুগিয়ে না দিলে মজুরদের জীবনসংশয়। তার যোগে জবাব এল : চাল জোগানো এ বিভাগের কাজ নয়। অগত্যা নোলান বার্লোকে জানালেন যে তিনি অগ্রিম দিতে অক্ষম। ফলে কুলিরা আর কাজ করতে এল না। চালের অভাবে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি হল। যেমন করে হোক পুরীতে বাইরে থেকে চাল আসা দরকার। এ কথা রেভেনশাকে বুঝিয়ে বলতে বার্লো কটকে গেলেন। অনেক চেষ্টায় রেভেনশাকে মানানো গেল। তিনি বোর্ডকে টেলিগ্রাম করলেন : দুর্ভিক্ষ রিলিফের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। পি.ডব্লু.ডি. চাল কিনতে অগ্রিম টাকা দিতে নারাজ। পুরীতে চাল আমদানী করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমি কি পি.ডব্লু.ডি.কে আদেশ দেব যে তারা কালেক্টরকে চাল কেনার জন্য টাকা অগ্রিম দেবে?

পরের দিন তার যোগে যখন জবাব এল তখন বার্লো রেভেনশার অফিসে উপস্থিত ছিলেন। রেভেনশা কাগজখানিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বার্লোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমাকে এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না। বোর্ডের সংক্ষিপ্ত বার্তা : সরকার পুরীতে চাল আমদানী করবে না। যদি সেখানে চালের অভাব থাকে তবে আপনিই চাল এসে যাবে বাইরে থেকে। সরকার নাক গলালে বরং ক্ষতিই হবে। রিলিফের কাজের মজুরী অর্থের আকারে দেওয়া হবে।

পুরী : ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬

বার্লো হিমসিম খাচ্ছেন দুর্ভিক্ষ সামলাতে। এর মধ্যে খবর এল ছোট লাট সার সেমিল বীডন আসছেন। পূরী থেকে কটক যাবেন। সঙ্গে আসছেন বোর্ডের অন্যতম সদস্য ককবার্ণ এবং পূর্ত বিভাগের সচিব কর্ণেল নিকল্‌স। কটকস্থিত ইরিগেশন কোম্পানির কাজ দেখা তাঁর উদ্দেশ্য। ওড়িশার রাজন্যবর্গের সঙ্গে এক দরবারে মিলিত হওয়াও তাঁর সূচির অন্তর্ভুক্ত। কোনও ছোট লাট ইতিপূর্বে কটকে আসেননি। সুতরাং বন্দোবস্তে যাতে খুঁত না থাকে তা নিশ্চিত করতে সকলে ব্যস্ত। কিছুদিন বার্লোর এ ব্যাপারে কাটল। অন্য কাজের সময় রইল না।

ছোট লাট পুরীতে মাত্র একদিন তাকবেন তথাপি বন্দোবস্তের ঝামেলা কম নয়। অভ্যর্থনার জন্য একটি বিধিবদ্ধ কমিটি গঠিত হল এবং তার সদস্য মনোনয়ন করা হল। রাস্তায় কটি তোরণ হবে কমিটি স্থির করল এবং কোন কোন স্থানে হবে তাও ঠিক হল। স্কুলগুলিকে বলা হল ছাত্রদের বিশদভাবে বোঝাবে কিভাবে ছোট লাটকে স্বাগত করতে হবে যদি তিনি হঠাৎ এসে পড়েন। রাস্তাঘাট ও তটবর্তী স্থান পরিস্কার করা হল। ছোট লাট থাকবেন বলে কালেক্টরের বাংলো রং করা হল।

বার্লো যতটা সম্ভব দুর্ভিক্ষ সংগ্রান্ত কাজের দিকেও নজর রাখলেন। কলেরা ছড়িয়ে পড়ছিল। সুতরাং সকল থানায় কলেরা নিবারক ঔষধ পাঠানো হল। নরেন্দ্র পুষ্করিণী এবং কটক পুরী রাস্তার কাজ চলছে। সমুদ্রকূলে ভাঙা জাহাজের চাল পড়ে আছে। বার্লো টাকায় তের সের দরে সে চাল কিনতে চাইলেন কিন্তু জাহাজের মালিক রাজী হল না। ইতিমধ্যে সরকারী সিদ্ধান্ত এসে গেল যে সরকার চাল কিনবে না। সুতরাং এ প্রসঙ্গের এখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল।

ছোট লাট পুরী এলেন ১৩ই ফেব্রুয়ারি। কথা ছিল রেভেনশা তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন। কিন্তু দরবার আয়োজনের কাজে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে আসতে পারলেন না। অতএব পুরীর সব কিছু বার্লোর দায়িত্বে রইল। সমুদ্রকূলে জাহাজ এলে অভ্যর্থনার ত্রুটি রইল না। পনেরো বার তোপ দাগা হল, মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজল। অভ্যর্থনা সমিতির অনুরোধে একজন পণ্ডিত একটি স্বাগতসূচক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করল। ঘোড়ায় টানা খোলা পাল্কি চড়ে ছোট লাট পুষ্পসজ্জিত রাস্তা দিয়ে কালেক্টরের বাংলোতে গেলেন। রাস্তার দুধারে দর্শনার্থীদের ভীড়। স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনায় বীডন প্রীত হলেন। জাঁকজমকের নিচে চাপা পড়ে গেল এই ভয়াবহ সত্য যে ভীড়ে মধ্যে অধিকাংশ লোক ভিখারী। ছোট লাট বুঝতে পারলেন না যে আওয়াজকে তিনি জয়ধ্বনি মনে করলেন তা আসলে বুভুক্ষুর হাহাকার। ইচ্ছা করলে তিনি বালুতটে পড়ে থাকা চালের বস্তাও দেখতে পারতেন।

১৪ই সকালে ছোট হাজিরী শেষ করে বীডন শহর পরিক্রমা করতে গেলেন।

মন্দিরের সিংহদ্বারে অরুণস্তম্ভ দেখলেন। চারজন বাহক তাঞ্জামে বসিয়ে মন্দিরের চতুর্দিক ঘুরিয়ে দেখাল। রাধাবল্লভ মঠের ছাদে গিয়েও মন্দির দেখলেন। এবার বার্লোর সঙ্গে কাছারী গেলেন।

ছোট লাটকে দুর্দশার কাহিনী শোনাতে জড় হয়েছে আশেপাশের গ্রামের লোক। চাল দুষ্প্রাপ্য, জঙ্গলের ফলমূল পাতা ইত্যাদি খেয়ে তারা বেঁচে আছে। সেগুলি দেখাবার জন্য সঙ্গে এনেছে।

ছোট লাট তাদের উপেক্ষা করে সোজা কালেক্টরের চেম্বারে গিয়ে পুরী জেলার রাজস্ব নিয়ে আলোচনা করলেন। ককবার্ণ অসুস্থ বোধ করলেন, তিনি ভিতরে না গিয়ে বাইরে বারান্দায় বসলেন। লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল। চারদিক তাকিয়ে ককবার্ণ সেরিস্তাদার পুরুষোত্তমকে দেখতে পেলেন এবং কাছে ডাকলেন। তিনি কটকের কমিশনার থাকা কালে পুরুষোত্তমকে জেনেছিলেন। পুরুষোত্তম শাক পাতা এনে দেখাল, বলল অন্নের অভাবে লোকে এগুলি খেয়ে বেঁচে আছে। এমন সময় বীডন বাইরে এলে ককবার্ণ তাকে শাকপাতা দেখালেন। সুযোগ পেয়ে বার্লো পরিস্থিতি এবং তার মোকাবিলা করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।

অপরাহ্নে পুরীর ভদ্রব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বীডন। তাঁদের মধ্যে আছেন পুরীর রাজা, কোট দেশের জমিদার, এমার মঠের মহান্ত ও প্রমুখ।

এইভাবে পুরী পরিদর্শনে তৃপ্ত হয়ে সন্ধ্যায় ছোট লাট কটকের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কটক : ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬

১৫ই ফেব্রুয়ারি ছোট লাট কটক এলেন। সেদিনটি বিশ্রাম করে পরের দিন শহর ভ্রমণে গেলেন। যে রকম আশা করা যায় কটকের বন্দোবস্ত পুরী অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হয়েছে। শহরের সকল মুখ্যস্থানে তোরণ নির্মাণ হয়েছে, চৌমাথাগুলি পুষ্পশোভিত, সেখানে গীতবাদ্যের আয়োজন, চলার সময় যেন ছোট লাটের চিত্তবিনোদন হয়। রাস্তার পাশের ছোট ছোট দোকান উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দুদিন ধরে রাস্তাগুলি ধুয়ে সাফ করা হয়েছে। সরকারী অফিসগুলিতে নতুন রঙের চমক। মনে হচ্ছে শহর উৎসবমুখর, নয় তো মেলা বসেছে। মাত্র একটি অসামঞ্জস্য, 'মা, একটু ফেন দাও', বলে ভিখারীর দল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কমিশনারের অফিস পরিদর্শন করে জেলখানা দেখতে গেলেন বীডন। পুলিশ জেলের বাইরে সালামী দিল। জেলের ভিতরে পা দিতে যাবেন এমন সময় কিছু লোক পুলিশের বাধা না মেনে তাঁর খুব কাছে চলে এল। এরা ভিখারী নয়—সাধারণ

নাগরিক। তাদের দাবী সরকার চালের ন্যায্য দাম ধার্য করে দিন। ছোট লাট বললেন দরবারে তিনি তার নিষ্পত্তি শোনাবেন।

সেদিনের অপরাহ্ন দেশীয় ভদ্রব্যক্তিদের ছোট লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট আছে। ওড়িশার প্রায় সকল রাজা মহারাজা জমিদার ও ধনী লোকদের নাম আছে তালিকায়। বক্তারা সকলে আকালের কথা উল্লেখ করলেন। মালুদের জাগীরদার সকলের তরফ থেকে খাজনা মাফ করার আবেদন করলেন। রাধাশ্যাম নরেন্দ্র বললেন, চালের উৎকট অভাব, সুতরাং সরকার চাল আমদানীর ব্যবস্থা করুন। সকলকে ছোট লাটের এক জবাব : দরবারে তিনি সব কিছু স্পষ্ট করবেন।

একটি লিখিত ভাষণ সঙ্গে এনেছেন বীডন। রাত্রে সেটি সংশোধন এবং মার্জনা করে সম্পূর্ণ এবং সুপাঠ্য করে নিলেন।

জোব্রস্থিত ইরিগেশন কোম্পানির ভবনে দরবার বসল ১৯শে। রং বেরঙের কাগজ ও ফুলে সুসজ্জিত দরবার কক্ষের মেঝে কার্পেটে মুড়ে দেওয়া হয়েছে, মনে হবে কোনও রাজপ্রাসাদের অন্তর্ভাগ। একদিকে মাচান তৈরি করে তার উপর ছোট লাট ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য চেয়ার পাতা হয়েছে। তার সামনে পঙক্তিবদ্ধ চেয়ার, আমন্ত্রিত ভদ্রব্যক্তিদের জন্য। রাজা মহারাজা ছাড়া স্থানীয় সরকারী পদাধিকারীও আছে আমন্ত্রিতদের মধ্যে। বিশেষ আকর্ষণের পাত্র দুজন—পুরী এবং কেন্দুঝরের রাজা—দুজনই নাবালক। ঝকমকে পোশাকে তাঁরা দ্বিতীয় পঙক্তিতে আসীন। সকলে বার বার দেখছে তাঁদের। কোনও অস্বস্তির লক্ষণ নেই তাঁদের মধ্যে বরং মনে হল পরিবেশ বেশ উপভোগ করছেন দুজনে।

এমন বিশেষ অনুষ্ঠান কটকে আর কোনদিন হয়নি। প্রায় একশ জন রাজা মহারাজার সঙ্গে এসেছে তাঁদের চেলা চামুণ্ডা, পাইক, সিপাহী ঘোড়া ইত্যাদি। সব মিলিয়ে সারা শহর জুড়ে উৎসবের পরিবেশ। দরবারের সময় জোব্রা অঞ্চলে লোকারণ্য, ঘোড়সওয়ার পুলিশ তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। ইরিগেশন কোম্পানির বাইরে শ্রেণীবদ্ধ রাজারাজড়াদের পাল্কিগুলি এবং সেগুলি ঘিরে রং বেরঙের পোশাকে তাঁদের অনুচরবৃন্দ।

দরবারের কাজ শুরু হতেই একজন ব্রাহ্মণ ছোট লাটের দীর্ঘ জীবন কামনা করে স্বস্তিবাচন করলেন। একটি অভ্যর্থনা গান করল তিনজন বারবনিতা। অতঃপর নগরবাসীদের তরফ থেকে একটি স্বাগতপত্র পাঠ করা হল। এতে আছে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ইংরেজ সরকার এবং ছোট লাটের গুণগানের লম্বা ফিরিস্তি। শেষে দুটি আবেদন : বর্তমান পরিস্থিতিতে খাজনা ছাড় এবং চালের দর ধার্য করা হোক।

ছোট লাট দণ্ডায়মান হতেই সভা করতালিতে মুখর হয়ে উঠল। দিব্যসিংহ পাশে উপবিষ্ট বালক রাজা ধনুর্জয়কে খোঁচা দিয়ে বলল, 'আমার রাজবাড়ির কাছে একটি লালমুখো বাঁদর আছে, এই লোকটি দেখতে ঠিক তার মত!'

ভাষণে ছোট লাট বললেন,

বন্ধুগণ, এক খোলা দরবারে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ লাভ করছি। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাদের শুভ কামনা সর্বদা আমার ধ্যেয় হবে, কেমন করে আপনারা ন্যায্য অধিকার ভোগ করবেন এবং কেমন করে দিন দিন আপনাদের সমৃদ্ধি ও উন্নতি হবে সে বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করি। দুঃখের বিষয় নানা কারণে আগে কটক আসতে পারিনি। যখন এলাম তখন আপনারা অনাবৃষ্টিজনিত দুর্দশাগ্রস্ত। এরকম দৈব দুর্বিপাকে সরকার আপনাদের ক্লেশ লাঘব বা নিবারণ করতে অক্ষম। বর্ষা হওয়া না হওয়া ভগবানের হাতে—মনুষ্যের নিয়ন্ত্রণের অতীত।

এই পর্যন্ত বলে একটু দম নিলেন, কারণ পরের বাক্যটি অতি দীর্ঘ :

তথাপি লোকে যদি উত্তম শাসনের আশীর্বাদ পায়, যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপভোগে বাধা না জন্মায়, যদি অপরাধীদের শাস্তি হয়, সবল দুর্বলদলনের সুযোগ না পায়। যদি সহজে সত্বর নিরপেক্ষ বিচার পায়, যদি ব্যবসা বাণিজ্য অধিক ও অনাবশ্যক বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত থাকে। যদি সকলে শিক্ষার সুযোগ পায়, যদি স্থানীয় উন্নতির রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য সড়ক নির্মাণ করা হয় এবং সর্বোপরি শাসন চালাবার জন্য করভার স্বল্প এবং ন্যায্য হয় তবে অন্য সব কিছু নির্ভর করবে জনসাধারণের উদ্যম পরিণামদর্শিতা ও আত্মসংযমের উপর; বিশেষ করে তাদের উপর যারা ধনী এবং সমাজে যাদের মর্যাদা আছে, যাদের দৃষ্টান্ত অন্যদের পথ দেখায়।

এইভাবে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব রাজা জমিদার ও জনসাধারণের উপর ছেড়ে দিয়ে বীডন বর্ণনা করলেন কিভাবে সরকার জনহিতে কাজ করছে, কিভাবে কমিশনার, কালেক্টর এবং অন্যান্যরা নিরলস পরিশ্রম করছেন। এবার এলেন জনসাধারণের নির্দিষ্ট দাবীর উপর :

কটক আসার আগে আমাকে বলা হয়েছিল এই অভাবের অবস্থায় এবং খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ বলে চাল একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা হোক ব্যবসায়ীদের। এমন কাজ করলে চোর ডাকাতের সমান হব আমি।

এ কথা শুনে সভা হতাশায় ছেয়ে গেল। নিজের ভাষণে ছোট লাট এতই মশগুল যে এ হতাশা তিনি লক্ষ্য করলেন না ভাষণ চলতে থাকল :

অনেক সময় লোকেরা চালের ব্যাপারীদের জনশত্রু মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা জনতার বন্ধু; এরা না থাকলে নতুন চাল ঘরে উঠতেই লোকে খেয়ে ফেলত এবং সামান্য অনাবৃষ্টি হলেও অন্নাভাব সৃষ্টি হত। যেমনটি এবার হয়েছে।

তারপর ছোট লাট রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল সেচন ও জমিজমা বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করলেন। কটকে একটি সরকারী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব উল্লেখ করে বললেন, যখন ছাত্রসংখ্যা বেড়ে এমন দাঁড়াবে যে ফি আদায় করে কলেজের অধিকাংশ খরচ

চালানো সম্ভব হবে তখন এ বিষয়ে বিচার করা হবে। সভায় যে ভাগে রাজন্যবর্গ বসেছেন সেদিকে তাকিয়ে ভাষণের সমাপ্তির দিকে এলেন :

হে গড় জাতের প্রমুখগণ! এই কিছুদিন আগে কটকের কমিশনার মি. রেভেনশা আপনাদের অঞ্চল ঘুরে দেখে এসেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে আপনারা নিজ নিজ এলাকার শাসনে মন দিয়েছেন। শুনে খুশি হয়েছি। আপনাদের অনেক অধিকার দেওয়া হয়েছে যার জন্য আপনাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় আপনারা ইংরেজ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। কয়েকজন সরকারকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন যাঁদের মধ্যে কেন্দুঝরের পরলোকগত মহারাজা ছিলেন। এই সেবার জন্য সরকার তখন পুরস্কার দিয়েছিলেন আর আমি এখন ব্যক্তিগতভাবে তা স্বীকার করছি।

ইরিগেশন কোম্পানির ভবনে দরবার হয়েছে, সুতরাং তিনি তাদের ধন্যবাদ দিতে ভুললেন না আর বললেন যত ভাল দরবারে তিনি পৌরোহিত্য করেছেন কটক দরবার তার অন্যতম।

পরের দিন রবিবার। ছোট লাট বিশ্রাম ছাড়া আর কিছু করলেন না।

সন্ধ্যায় রাস্তা থেকে তোরণ ইত্যাদি খোলা হল, রাজা মহারাজারা তাঁদের অনুচরদের নিয়ে চলে গেলেন, শহরের অবস্থা পূর্ববৎ হল।

সোমবারে ইরিগেশন কোম্পানির ভবনে—যেখানে দরবার বসেছিল—ছোট লাটের সম্মানে এক বড় মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করল কোম্পানি। ওড়িশায় তাঁর অন্তিম কার্যক্রম তালদণ্ডা গিয়ে কোম্পানির কাজ পরিদর্শন করা। সেখান থেকে ফিরে ছোট লাট বীডন তার ওড়িশা সফর সফল হয়েছে ভাবলেন। সেদিন সন্ধ্যায় সমবেত অফিসারদের কাছে বিদায় নিয়ে বীডন বাতিঘর থেকে জাহাজে চড়ে বিদায় নিলেন।



তিন

পুরী : মার্চ ১৮৬৬

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে পুরীতে কলেরা মহামারীর আকার ধারণ করল। গঞ্জাম থেকে শুরু হয়েছিল ক্রমে পারিকুদ মালুদ হয়ে কলেরা পুরী এসে গেল। কলেরার সংহার মূর্তি দেখা গেল সত্যবাদী, পিপিলি, বালিয়ণ্ডা, অন্তরঙ্গ কাকটপুর অঞ্চলে। অনেক প্রচার সত্ত্বেও দোল যাত্রায় পুরীতে যাত্রীর ভীড় হল এবং কলেরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

পুরীর রাস্তার আশে পাশে প্রতিদিন দশ পনেরোটি কলেরায় মৃত শব পড়ে থাকতে দেখা গেল। এগুলি সৎকারের পাকা ব্যবস্থা কিছু নেই। প্রথম দিকে শবগুলি অনেকদিন একই স্থানে পড়ে থাকত। শেষপর্যন্ত বার্লো ঠিক করলেন ছ'জন ঠিকা মেথরকে শব সৎকারের কাজে লাগাবেন। চারটি ঠেলাগাড়ি দেবেন তাদের। প্রথমে চেষ্টা হল শবগুলি শ্মশানে নিয়ে দাহ করা হবে। পরে যখন জেল হাসপাতাল এবং কুমোরপাড়া থেকে বেশি সংখ্যায় শব আসতে লাগল তখন মেথররা কোনক্রমে সেগুলিকে টেনে শ্মশানে নিয়ে ফেলে আসতে লাগল। শ্মশানে এত শব জমা হল যে পূতিগন্ধে কাছে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে কাঙালদের মৃতদেহ শেয়াল কুকুরেও ছোঁয় না।

মেথরদের উপর নির্দেশ ছিল রাস্তায় মুমূর্ষু লোক দেখলে দোলায় করে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। রোগীরা কিন্তু মরণাপন্ন হয়েও হাসপাতালে যেতে রাজী নয়। কারণ দুটি, এক সাহেব ডাক্তারের ভীতি এবং দ্বিতীয় মেথরে ছুঁলে জাতিভ্রষ্ট হতে হবে। তার থেকে রাস্তায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা শ্রেয়।

শহরে প্রতিদিন কাঙাল ও ভিখারীদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। কোমরে এক টুকরো ছিন্নবস্ত্র তাদের একমাত্র পরিধেয়। তা সে স্ত্রীলোক হোক বা পুরুষ। গ্রামাঞ্চলে ভিক্ষা মেলে না, তাই কঙ্কালসার লোকগুলি শহরে এসে ভীড় করছে। শুধু বড়দাণ্ডে নয়, হাতে মাটির পাত্র নিয়ে গলিতে গলিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'মা, একটু ফেন দাও' বলে কেঁদে ফিরছে। এই আর্তস্বরের বিরাম নেই, কানে আসতেই গৃহস্থ দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

পুরী শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে ধানের ডাকাতি শুরু হল। চাল নিয়ে কেউ রাস্তায় যেতে সাহস করে না। কারোর বাড়ি ধান আছে জানতে পারলে পাড়াপড়শীরা জবরদস্তি ঢুকে যা পাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে। আইনের চোখে এ কাজ ডাকাতি এবং ধরা পড়লে বিনা দ্বিধায় অপরাধ মেনে নিচ্ছে এবং জেলে যাচ্ছে। পুরী জেলে আর স্থান নেই।

বার্লো অন্তত একটি ব্যাপারে সন্তুষ্ট, সবদিকে রিলিফের কাজ চলছে। সরকার থেকে আরও দশ হাজার টাকা পেয়ে একটি নতুন কাজ হাতে নিয়েছেন—খুর্দা পিপিলি রাস্তা। খুর্দার এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের উপর এর তত্ত্বাবধানের ভার। এখানে কাজ করতে দূর দূরান্তর থেকে লোক আসছে। জঙ্গিয়া থেকে বড়কুলের মধ্যে পি.ডব্লু.ডি. কাজ করছে। কুলিরা মজুরী পায় দু আনা থেকে তিন আনা। সাতপাড়ায় পুকুর কাটার কাজে নিযুক্ত হয়েছে প্রায় আটশ জন। বাচ্চারাও কাজ করে তিন পয়সা থেকে দু আনা রোজগার করছে।

বার্লোর সামনে এখন প্রধান সমস্যা চালের সরবরাহ বজায় রাখা। কোথায়ও চাল মিলছে না। গ্রামাঞ্চল থেকে পুরী শহরে চাল আসা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজ তো সরকার জুটিয়ে দিচ্ছে কিন্তু মজুরী নিয়ে তারা চাল কিনবে কোথায়? দিনের শেষে চালের খোঁজে ফিরে নিরাশ হচ্ছে লোক। বার্লো ঠিক করতে পারছিলেন না রেভেনশাকে পুনর্বার চাল আমদানি করতে অনুরোধ করবেন কি না।

সরকার চাল কিনবে না জেনে ফিলানিসের মালিক ৬০০ বস্তা চাল মাদ্রাজ নিয়ে গেল। অভুক্ত লোক এ চাল পেল না এবং ক্ষতি হল সকলের—জাহাজের মালিকের, বীমা কোম্পানির এবং ব্যবসায়ীদের।

কলকাতা : এপ্রিল ১৮৬৬

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র ৫ই মার্চ সংখ্যায় রামাক্ষয় চ্যাটার্জির এই দীর্ঘ পত্রখানি প্রকাশিত হল :

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার ২৯শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় কটকের কমিশনারের প্রতিবেদনের অংশবিশেষ প্রকাশ করেছেন যাতে পুরী জেলার মন্বন্তরের কথা লেখা হয়েছে। কমিশনারের পরামর্শে সরকার এবার জনসাধারণকে পুরীতে তীর্থে না আসতে বলেছেন। এ প্রতিবেদনের আধার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ডিসেম্বর মাসের প্রতিবেদন। সে সময়ের পরে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। অন্নাভাব এবং মহামারী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। জেলার সর্বত্র অন্নাভাব। ফসল কাটার অব্যবহিত পরে এই অবস্থা, পরে কি হবে কল্পনা করা কষ্ট। আগে যে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল তা দিয়ে কি করা হবে বিচার করার জন্য কালেক্টর আজ এক সভা ডেকেছিলেন সেখানে মত প্রকাশ হল যে সরাসরি পরিবার পিছু সহায়তা দেবার সময় এসে গেছে। যে সকল পরিবার অত্যন্ত কষ্টে দিনাতিপাত করছে তাদের আগামী ছ মাসের জন্য সাহায্য করার প্রস্তাব আছে। কিন্তু কমিটির সম্বল সীমিত, অতএব সাহায্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত হবে না। কমিটি সর্বসাধারণের কাছে চাঁদার জন্য আপীল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিটিতে কয়েকজন ইউরোপীয় সদস্য আছেন। তাঁরা কলকাতা নিবাসী

ইউরোপীয়দের কাছে চাঁদার জন্য আবেদন করবেন। আপনার কাছে অনুরোধ আপনি ভারতবাসীদের এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করুন। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং বঙ্গদেশ যখন বাত্যা বিধ্বস্ত হয়েছিল তখন এই গরীব জেলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল।

পুরী ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের হেড কেরাণী বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু রিলিফ কমিটির সেক্রেটারি এবং জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে।

আপনার বিনীত
রামাক্ষয় চ্যাটার্জী

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রখানি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হল না, সম্পাদকীয়তে ছোট লাটের দরবারে দেওয়া বক্তৃতার কঠোর সমালোচনা করল। লোক যখন অনাহারে মরছে তখন ছোট লাট সুশাসনের আশীর্বাদ বিষয়ে তাদের বিশদভাবে বোঝালেন। লোকের প্রাণ সংশয়, কিন্তু ছোট লাট তাদের সম্পত্তি রক্ষার কথা বললেন। প্রলয়কারী আকালের কবলে লোকদের তিনি অপরাধ নিবারণ এবং ত্বরান্বিত বিচার ব্যবস্থা তুলে ধরলেন। জঠরে যাদের অন্ন নেই সেই মানুষগুলিকে মানসিক পুষ্টির কথা শোনালেন। অন্নাভাবে চতুর্দিকে হাহাকার ছোট লাটের কর্ণগোচর হল না, তিনি উল্লেখ করলেন স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজের কথা। লক্ষ লক্ষ অভুক্ত লোকদের কি যায় আসে শাসন ব্যবস্থা উদার ও ন্যায়সঙ্গত কি না?

কলকাতার যুব ব্যবসায়ী জি. এম. সাইকস্ দুর্ভিক্ষের বিষয়ে আগে পড়েছিলেন বটে কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দেননি। ছোট লাটের বিষয়ে হিন্দু প্যাট্রিয়টে পড়ে তাঁর মনে হল ইংরেজ সরকার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। ভাবলেন তিনি স্বয়ং কিছু করবেন। নিজে ওড়িশায় যাননি কিন্তু আমেরিকান ও ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিনিধি হিসাবে ওড়িশার মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সাইকস্ বড় লাট ও ছোট লাটকে দুখানি পত্র লিখলেন এবং একটি বিজ্ঞপ্তি লিখে সকল সংবাদপত্রের অফিসে স্বয়ং দিয়ে এলেন। ইংলিশম্যানের ১৮ই এপ্রিল সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হল :

বিজ্ঞপ্তি : ওড়িশা দুর্ভিক্ষ তহবিল

ওড়িশা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের সাহায্যের জন্য তহবিলে চাঁদা দিন ও দান দিন। নিম্নলিখিত দ্বারা ইহা গৃহীত এবং বিতরিত হইবে।

—মেসার্স সাইক্স এণ্ড কোম্পানি,
১, ভ্যান্সিটার্টরো, কলকাতা

কটক : এপ্রিল ১৮৬৬

বিচিত্রানন্দ ও গৌরীশংকর আজকাল বাড়িতে অথবা বিচিত্রানন্দের তুলসীপুরের বাগান বাড়িতে মিলিত হন না, এখন তাঁরা যান আলমবাজারে জগমোহন রায়ের বৈঠকখানায় যেখানে ছাপাখানার দপ্তর। স্ত্রী ও পরিবারবর্গ কলেরায় মারা গেলে জগমোহন বালেশ্বর থেকে চলে এসেছেন। আজকাল কটকে থাকেন। ইদানীং তাঁদের আলোচনার মুখ্য বিষয় দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতি। সব থেকে বড় সমস্যা চালের অভাব। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ ন্যায্য দামে চাল বেচতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। বৃন্দাবন মাড়োয়ারীর কাছে যে চাল গচ্ছিত ছিল তিনদিনে তা শেষ হয়ে গেল। রঘুনাথ দাস, রামনাথ রায়চৌধুরী, গোলক চন্দ্র বসু প্রমুখ জমিদাররা নিজের নিজের বাড়িতে চাল বিক্রি শুরু করলেন; কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশি দিন চলল না। ছোট লাটের বক্তৃতার পরে চালের ব্যবসায়ীরা বেপরোয়া হয়ে ইচ্ছামত দাম বাড়াতে লাগল। কটকে এখন চালের দাম টাকায় সাড়ে পাঁচ সের।

বিচিত্রানন্দের ইচ্ছা ছাপাখানাও চাল কিনে বিক্রি করুক। কিন্তু গৌরীশংকরের অমত, তাঁর ইচ্ছা ছাপাখানা মাত্র ছাপার কাজই চালিয়ে যাক। ইতিমধ্যে ছাপাখানার কাজ একটু এগিয়েছে। ইরিগেশন কোম্পানির দুজন লোককে লাগিয়ে লাভ হল না কিন্তু ভাগীরথী সাঠিয়া ছাপার কাজ ভাল করে রপ্ত করে নিয়েছে। কলকাতা থেকে আনা অক্ষর প্রেসটি অকেজো পড়ে আছে, সেটি চালানোর জন্য উটিন নামক একজন সাহেবকে নিযুক্ত করা হল। কিছুদিনের মধ্যে সে কলটি চালু করে দিল। এটি এখন ইংরেজিতে ছাপায়। ওড়িয়া অক্ষর নেই, সুতরাং ওড়িয়াতে কিছু ছাপানো হয় না। শোনা গেল কলকাতায় ওড়িয়া অক্ষর পাওয়া যাবে, কিন্তু কিনবার সামর্থ্য নেই। কোম্পানির অনেক অংশীদার বাকি কিস্তির টাকা দেয়নি।

চাল বিক্রির ব্যাপারে মতভেদ আছে; সুতরাং প্রস্তাবটি বিচার করার জন্য কোম্পানির একটি বিশেষ সভা ডাকা হবে। এ সভায় জমিদার অফিসার এবং ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ করা হবে। ১লা এপ্রিল প্রেসের অফিসে সভা বসল। আজকের উপস্থিতি সন্তোষজনক। বিচিত্রানন্দ দাস সভাপতিত্ব করলেন। অনেক বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল :

চাল বিক্রয় কোম্পানি নামে একটি আলাদা কোম্পানি খোলা হবে। এই কোম্পানি সারা বছর নির্দিষ্ট দামে চাল বিক্রি করবে। কাজ শুরু হবে ১লা বৈশাখ অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল। কোম্পানির মূলধন হবে কুড়ি হাজার টাকা। শহরের বিভিন্ন স্থানে পনেরোটি দোকান থেকে প্রতিদিন দশ মণ হিসাবে মাসে বিক্রি হবে ৪৫০০ মণ চাল।

এভাবে প্রতিদিন প্রায় আট হাজার লোক কোম্পানির দোকান থেকে চাল কিনতে পারবে। বালু বাজার অথবা চৌধুরী বাজারে ঘর ভাড়া নিয়ে গুদাম খোলা হবে। প্রতি

রবিবার অন্তত তিনজন পরিচালক একত্রে চালের দাম ধার্য করবেন। বক্সি বাজার, বালু বাজার তেলেঙ্গা বাজার ও মহম্মদিয়া বাজারে ঠিক কোন স্থানে দোকানে খোলা হবে তা তো স্থির হয়ে গেল। কোম্পানির কর্মকর্তা হলেন :

সচিব	বাবু গৌরীশংকর রায়।
কোষাধ্যক্ষ	বাবু দীননাথ সরকার।
তত্ত্বাবধায়ক	বাবু বৃন্দাবন মাড়োয়ারী।

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে কত টাকা দেবেন হিসাব করে ৮২০০ টাকা প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

সভায় পরের দিন বিচিত্রানন্দ ও গৌরীশংকরের যৌথ স্বাক্ষর যুক্ত একটি নোটিশ গেল আটবট্টিজন জমিদার ও ভদ্রলোকের কাছে যাঁদের কাছে ধান চাল আছে। কোম্পানি জানাল কার থেকে কতটা ধান আশা করা যাচ্ছে। জবাব দিলেন মাত্র তিনজন— রাধাশ্যাম নরেন্দ্র, ঢেঙ্কানলের রাজা ভাগীরথী মহীন্দ্র এবং জমিদার রঘুনাথ দাস। তাঁদের প্রতিশ্রুত ধানের পরিমাণ সামান্য। অন্য সকলে জানালেন তাঁদের কাছে ধান নেই।

অতঃপর গঞ্জাম থেকে চাল কেনার প্রয়াস হল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্থ সংগ্রহ হল না। অন্য কোনও উপায় চিন্তা করার আগেই ১১ এপ্রিল বিচিত্রানন্দ কমিশনারের সঙ্গে সফরে গেলেন। চাল বিক্রয় কোম্পানির অকাল মৃত্যু হল।

বালেশ্বর : এপ্রিল ১৮৬৬

কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ তো আছেই, এবার শুরু হল ডাকাতি। আগে বছরে যত ডাকাতি হত এখন এক সপ্তাহে ততগুলি ডাকাতির রিপোর্ট আসছে। পুলিশের প্রধান কাজ হয়েছে ডাকাতির ঘটনা তদন্ত করা। ডাকাতদের গ্রেপ্তার করে চালান করা। কাজ এত বেড়েছে যে অতিরিক্ত পঞ্চাশজন কনেস্টবল নিযুক্ত করতে হয়েছে।

এখনকার ডাকাতি সাধারণ ডাকাতির মতো নয়। কারো বাড়িতে চাল আছে জানতে পারলে ক্ষুধার্ত লোকগুলো জবরদস্তি ঘরে ঢুকে চাল নিয়ে যাচ্ছে। গৃহস্বামী চিনে ফেলতে পারে তার পরোয়া করে না। ধরা পড়লে তখনও পর্যন্ত যে ধান চাল বাকি থাকে তা ফিরিয়ে দেয় এবং আদালতে অপরাধ স্বীকার করে। এক বাড়িতে ঢুকে ডাকাতরা দেখল রান্নাঘরে ভাত আছে। তারা গৃহস্বামীকে বেঁধে আগে ভাত খেল তার পরে চাল লুট করল।

বালেশ্বরের এমন উদ্বেগজনক খবর পেয়ে ছোট লাট বিচলিত হলেন, রেভেনশাকে নির্দেশ দিলেন বালেশ্বর যেয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে যত শীঘ্র সম্ভব রিপোর্ট পাঠান।

রেভেনশা বালেশ্বর গেলেন ১২ই এপ্রিল। এদিকে কলকাতার গরম থেকে রেহাই পাবার জন্য ছোট লাট গেলেন দার্জিলিং।

কালেক্টর মসপ্রাটের সঙ্গে আলোচনা করে রেভেনশা জানতে পারলেন এপ্রিল মাসের প্রথম বার দিনে তিপান্নটি ডাকাতি হয়েছে। এবং সংশ্লিষ্ট ডাকাতের সংখ্যা সাতশ এক যাদের মধ্যে পাঁচশ ছেষট্টি জন ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে আট জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কারাদণ্ড হয়েছে একশ ছয় জনের। অন্যদের বিষয়ে তদন্ত শেষ হয়নি অথবা তাদের বিচার এখনও চলছে। বিচারকার্যে বিলম্বের কারণ, জেলার একজন মাত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জগমোহন রায় ছুটিতে আছেন।

রেভেনশা বালেশ্বর আসার দুদিন পরে জেলখানায় কলেরা আরম্ভ হল। সিভিল সার্জন জ্যাকম্যানের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েদীদের একটি অস্থায়ী জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হল। সেদিন রাত্রে প্রায় একশজন কয়েদী পালাবার চেষ্টা করল। তাড়া করে কয়েকজনকে ধরে ফেলল পুলিশ। গোলমালের মধ্যে একজন আহত হল এবং অন্য একজনের গুলি লাগল। যার গুলি লেগেছে তার পা কাটতে হল। খবর পেয়ে রেভেনশা ভাবলেন তাঁর রিপোর্টে সুপারিশ করবেন জেলদণ্ডের সঙ্গে চাবুক মারাও হোক।

বালেশ্বরের লোকের দুর্গতি রেভেনশা চাক্ষুষ দেখলেন। জমিদার শ্যামানন্দ দে প্রমুখের উদ্যমে লোক অন্নসত্রে খেতে পাচ্ছিল। অন্নসত্রে এত ভীড় হয় যে ভাত পরিবেশন শুরু হতেই অপেক্ষাকৃত সবল লোকগুলি ধস্তাধস্তি করে সামনে চলে আসে এবং ভাত পায় আর কমজোর লোক, স্ত্রীলোক, ও বাচ্চাদের ভাগ্যে কিছু জোটে না। ভাতের জন্য কাড়াকাড়ি মারপিট হয়। ভাত না পেয়ে অনেক মহিলা ডুকরে কাঁদে।

এরকম একদল লোককে পয়সা দিতে কাছে গেলেন রেভেনশা। পুলিশ বন্দোবস্ত সত্ত্বেও লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল এবং ধাক্কাধাক্কির মধ্যে কেউ তাঁর হাত থেকে পয়সার থলিটি ছিনিয়ে নিল। এমন কি তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা পেল নিয়ে নিল। কোনও ক্রমে রেভেনশা ভীড় থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন। একটি অন্নসত্রে লোকের ধস্তাধস্তি দেখে রেভেনশা নিজে ভীড় নিয়ন্ত্রণ করতে গেলেন কিন্তু ঠেলাঠেলির মধ্যে নিচে পড়ে গেলেন। সব দেখে শুনে রেভেনশার মনে হল বালেশ্বরের অবস্থা কটক অপেক্ষা শোচনীয়।

প্রতিবেদন লেখার আগেই বামনঘাটির থেকে খবর এল যে বিদ্রোহীরা রাজার লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। বাধ্য হয়ে রেভেনশা ময়ূরভঞ্জ যাত্রা করলেন ২০শে। সারা রাস্তায় আকালের করাল ছায়া, সর্বত্র কাঙালদের আর্ত চিৎকার, 'ভাত দাও'।

রাস্তায় এক ক্যাম্প থেকে বালেশ্বরের কালেক্টরকে এই পত্রখানি লিখলেন রেভেনশা :

প্রিয় মসপ্রাট,

আমার এখানে পৌঁছাতে অনেক বিলম্ব হল, বারটা প্রায়। হাতির হাওদা ঠিকভাবে বাঁধা হয়নি বলে খসে পড়ল এবং আমি পড়ে গেলাম। এখানের মন্বন্তর বালেশ্বর অপেক্ষা ভয়ংকর। আমার চার পাশে কাঙালদের ভীড়। একজন ব্রাহ্মণকে দিয়ে ভাত রান্না আরম্ভ করিয়েছি। অন্তত একবার হতভাগ্য লোকগুলি পেট ভরে খেতে পাবে।

যাত্রা করার আগে আপনার কাছ থেকে বামনঘাটি অঞ্চলের মানচিত্র আনতে ভুলে গেছি। যদিও তা থেকে সকল স্থান ভাল জানা যায় না, আমার কাজ চলে যাবে। এই পত্র পেয়েই মানচিত্র খানি পাঠিয়ে দেবেন। সেটা না পেলে অসুবিধায় পড়ব। মানচিত্রটি রোলার থেকে বার করে ভাঁজ করে পাঠালে ভাল হবে। সন্ধ্যা হতে যাচ্ছে কিন্তু এখনও ডাক আসেনি। মিষ্টার নবীন অথবা অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেখবেন আমার ডাক যেন নিয়মিত আসে। সরকারের কাছ থেকে তারবার্তা এলে তাও ডাকের সঙ্গে পাঠাবেন।

কেমনা ফাঁড়ির কাছে এসে দেখলাম একটি লোক নরমাংস খাচ্ছে। সকলে বলছে সে পাগল। তাকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। তা না হলে প্রচার হয়ে যাবে যে ক্ষুধার তাড়নায় লোক নরমাংস খেতে আরম্ভ করেছে।

আপনার বিশ্বস্ত
টি. ই. রেভেনশা।

কলকাতা : মে ১৮৬৬

বড়লাট এবং ছোট লাট সাইক্স কোম্পানিকে টাকা পাঠালেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখে আনেকে চাঁদা পাঠাল। এতটুকুতে খুশি হলেন না সাইক্স; আর একখানি আবেদন পত্র লিখে চাঁদার বই-এর সঙ্গে পরিচিত সকলকে পাঠালেন। এই আবেদনপত্রে তাঁর প্রাপ্ত দুখানি পত্র থেকে উদ্ধৃতি ছিল। রেভারেণ্ড বাকলী এবং বালেশ্বরের রেভারেণ্ড মিলার অনাথ আশ্রমের সমস্যা তাকে জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য অনাথ আশ্রমের লোকদের দেখা তাঁদের কর্তব্য কিন্তু আরও অনেকের ক্রন্দন তাদের কানে আসছে যারা যীশুখৃষ্টের নাম শোনেনি। চালের দর বাড়ার জন্য অনাথ আশ্রমের খরচ বেড়ে গেছে। অথচ তাঁদের সম্বল সীমিত। মিলার লিখেছেন সত্বর যথেষ্ট সাহায্য না পেলে অনাথ আশ্রম থেকেই অনেককে শ্মশানে পাঠাতে হবে।

এদিকে মনক্রিপও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ছোট লাট দার্জিলিং-এ অবসর বিনোদন করছেন; তাঁকে মনক্রিপ এক দীর্ঘ পত্র পাঠালেন ১৫ই মে। পত্রের মর্ম : ওড়িশায় চাল আসছে না। আরাকানে প্রচুর চাল আছে আর এখানে লোক অনাহারে মরছে। চাল আমদানির খরচ ইংরেজ নাগরিকরা দিতে পারে কিন্তু চাল কিনে এনে বিতরণ করা সরকারের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে সরকার যদি ব্যর্থ হন তবে এক মণ চালও পুরীতে পৌঁছাবে না। ছোট লাট আদেশ দিলে দশ দিনে চাল কেনা যেতে

পারে এবং এক মাসে সে চাল ওড়িশায় আনা যায়।

বড় লাট সিমলায় ছিলেন। তাঁকেও লিখলেন মনক্রিপ। তিনি পত্রখানি ছোট লাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এবার ছোট লাট বোর্ডকে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন, ওড়িশাতে চাল আমদানি করা হবে কি না। ২২শে বোর্ড ছোট লাটকে জানাল ওড়িশাতে যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী মজুদ আছে, চাল আমদানি করার প্রয়োজন নেই।

২৫শে মে রেভেনশা কটকে ফিরে এলেন। ময়ূরভঞ্জের গণ্ডগোল মেটাতে বেশি ঝামেলা হয়নি। বামনঘাটির আদিবাসীদের সঙ্গে কোনও কালেই রাজার সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। সেখানে জমিজমা বন্দোবস্তের কাজ চলছিল এবং জরীপ কর্মীরা লোকদের হয়রান করছিল। অত্যাচার যখন সীমা অতিক্রম করল তখন লোকেরা একজোট হয়ে রাজার সিপাহীদের তাড়িয়ে দিল। এবং সে অঞ্চলে অরাজকতা ছেয়ে গেল। রেভেনশা মুঠাদারদের সঙ্গে কথা বলে একটি আপোশ করিয়ে দিলেন। ঠিক হল যে যে সকল কর্মচারী উৎপীড়ন করত তারা বরখাস্ত হবে, বামনঘাটিকে সিংহভূমের কালেক্টরের অধীনে রাখা হবে এবং পাহাড়ী অঞ্চলের শাসন রাজার পরিবর্তে তার ভ্রাতুষ্পুত্র চালাবেন। আদিবাসীরা প্রতিশ্রুতি দিল তারা আর গোলমাল করবে না।

এ সবের মধ্যেও রেভেনশা ময়ূরভঞ্জের খাদ্যাভবের সমীক্ষা করলেন। ক্যাম্পের চারপাশে কাঙালদের ভীড়। চারশর বেশি লোক রেভেনশার দেওয়া চালের উপর নির্ভর করে আছে। প্রতিদিন কাঙালদের দেখেন তিনি। রেভেনশার উপলব্ধি হল অবস্থা নিতান্ত সঙ্গীন। এই সফর তাঁর চোখ খুলে দিল। এক মাসের অধিক কটকের বাইরে ছিলেন, রিলিফের কাজে মন দিতে পারেন নি।

কটকে ফিরে রেভেনশা দেখলেন সংকট উৎকট আকার নিয়েছে। আপাতকালীন পরিস্থিতি বর্ণনা করে পুরী ও বালেশ্বরের কালেক্টর প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। পুরী শহরে কাঙালে ভরা। তাদের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও নাবালক। অনাহারে পুরুষদের মৃত্যুর পরে পরিবার ভেঙে গেছে এবং অসহায় স্ত্রীরা বাচ্চাদের হাত ধরে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এপ্রিল মাসে যে পঁচাশিটি পরিবার রিলিফ তালিকায় ছিল তার তেরটি এখন বেপাত্তা। এমন হতে পারে যে সে পরিবারগুলির কেউই জীবিত নেই। কাঙালদের দল খাবারের খোঁজে লোকের বাড়ি ঢুকে পড়ে! তারা সরকারী কর্মচারীদের বাড়ি ঘিরে রেখেছে। বার্লো লিখেছেন রাজনীতি এবং অর্থনীতির পুস্তকে সরকারের দায়িত্বের পরিভাষা কি তাতে তাঁর রুচি নেই, তিনি এটুকু জানেন যে কাঙালদের মাগনা খইয়ে বাঁচিয়ে রাখার সময় এসে গেছে। বালেশ্বরের এস.পি. লিখেছেন যে হারে চুরি ডাকাতি বেড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে অতি শীঘ্র দেড় হাজার কয়েদীর জন্য স্থান দরকার হবে, এখন জেলখানায় একশ তেতাল্লিশজনের জায়গা আছে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহ। মেথররা এগুলি সরিয়ে নিয়ে যেতে হিমসিম খাচ্ছে। সুপারিন্টেডিং ইঞ্জিনিয়ার নিকলস্ জানিয়েছেন ষাট হাজার টাকায় কাজ হবে

না, চাল দরকার। কিনবার জন্য চাল নেই বাজারে। সুতরাং কুলিরা কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জেলের অবস্থা জানাতে কটকের কালেক্টর নিজে এলেন। ডব্লু. কর্ণেল এখন কটকের কালেক্টর। তাঁর পূর্বতন কালেক্টর কাজ করতেন না আর ইনি অপারগ। তাঁর মতে কটকের পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে। জোব্রাতে দোকানদার চাল বিক্রি করতে চায়নি, ইরিগেশন কোম্পানির কুলিরা তার দোকান লুট করে নিল। ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকার দোকানদার টাকায় সাড়ে তিন সের দরে চাল বিক্রি করছিল, এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। সেনাদের চাল মিলছে না, তারা বিদ্রোহ করতে পারে।

এতদিনে রেভেনশা বুঝলেন চাল আমদানি করা ছাড়া উপায় নেই। ২৮শে তিনি কলকাতায় টেলিগ্রাম পাঠালেন : অতি কষ্টে যা সামান্য চাল পাওয়া যাচ্ছে তার দাম টাকায় সাড়ে চার সের। অর্ধেক বাজার বন্ধ। সেনাদের জন্য একদিনের রসদ আছে। তাদের মধ্যে অসন্তোষ। কমিসারিয়েট সাহায্য করতে নারাজ। অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্যাভাবে পূর্তবিভাগ এবং রিলিফের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মতে সেনাবাহিনী, জেল, রিলিফ কাজের কুলি এবং রিলিফ কমিটির উপর নির্ভর কাঙালদের জন্য অতি শীঘ্র ওড়িশায় চাল আমদানি করা অপরিহার্য। বালেশ্বরের নদীকূলে, বাতিঘরে এবং ধামরার মোহনায় চাল খালাস করা সম্ভব। আমি সে ব্যবস্থা করব।

২৯শে কটকের দুর্ভিক্ষ কমিটি ছোট লাটের কাছে দার্জিলিঙে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানাল কটকে চাল মিলছে না, সুতরাং এক লক্ষ টাকার চাল কিনে কটকে পাঠানো হোক।

সেইদিন ছোট লাট বীডন ওড়িশায় চাল পাঠাতে আদেশ দিলেন।



চার

কটক : জুন ১৮৬৬

৪ঠা জুন চাল বোঝাই দুটি জাহাজ বাতিঘরে নোঙর ফেলল। একটিতে আট হাজার বস্তা এবং অন্যটিতে তিন হাজার বস্তা চাল আছে। জাহাজ দুটি কূলে আসতে পারবে না। সুতরাং চাল খালাস করতে নৌকা দরকার। কিন্তু নৌকার ব্যবস্থা করা হয়নি। অগত্যা বেশ কিছুদিন চাল বোঝাই জাহাজ দুটি বঙ্গোপসাগরে দাঁড়িয়ে রইল।

শেষ পর্যন্ত যখন নৌকার ব্যবস্থা হল তখন দেখা গেল কুলিরা এমনই দুর্বল যে তাদের দ্বারা কাজ হবে না। প্রথমে তাদের খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করা হল এবং তারপরে আবার কাজ আরম্ভ হল। ছোট জাহাজের চাল খালাস হল ১৩ই। বড় জাহাজের চাল নামাতে সময় লাগল এক মাস।

ইতিমধ্যে ১২ই সেনাদের জন্য চার হাজার বস্তা চাল নিয়ে আর একটি জাহাজ এল। কেমন করে বাতিঘর থেকে চাল কটকে আনা যাবে সে আর এক সমস্যা। বাতিঘর থেকে তালদণ্ডা পর্যন্ত নৌকায় আনা যায়, কিন্তু তারপরে গোরুর গাড়ি দরকার। তালদণ্ডা পর্যন্ত সাতদিন তারপর গোরুর গাড়িতে আরও পাঁচদিন। নানা কারণে কটকে চাল আনতে অনেকদিন লেগে গেল। কলকাতা থেকে বাতিঘরে চাল এল ত্রিশ ঘণ্টায় আর বাতিঘর থেকে কটকে পনেরো দিনে। আমদানির চাল কটকে এল ২০শে জুন।

জাহাজ থেকে কটকে চাল আনার কাজে বিশেষ তদারকের প্রয়োজন কিন্তু রেভেনশা তিন তারিখে পুরী চলে গেলেন এবং ফিরলেন উনিশে। বাতিঘর থেকে চাল আনার অসুবিধা দেখে রেভেনশা বোর্ডকে জানালেন যে বাতিঘরে আর চাল পাঠানোর দরকার নেই। এ খবর পৌঁছাবার আগেই আরও চারটি জাহাজ ২৮৬৩০ বস্তা চাল নিয়ে কলকাতা বন্দর থেকে রওনা হয়েছিল।

ওড়িশার আকাল কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টি করল। এখন সরকার একটু সচেতন। চাল পাঠানো হল, ওড়িশার তিন জেলায় রিলিফের কাজে সহায়তা করার জন্য তিনজন এসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর নিযুক্ত হলেন। পুরী গেলেন জি. এ. কারী, বালেশ্বরে আর. কে. রাম্পিনী এবং কটকে টি. এম. কর্কউড।

কর্কউড এসেই কাজে ডুবে গেলেন। ছটি ত্রাণ কেন্দ্র থেকে কটক শহরে চাল বিতরিত হয়। এ.এস.পি., ক্রাউটকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তালদণ্ডা ত্রাণ কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলেন। কালেক্টর অফিসের নাজির এখানে চাল বিক্রি ও বিতরণের দায়িত্বে আছেন। সেখানকার দৃশ্য বীভৎস ও করুণ। স্থানটি কর্দমাক্ত, কয়েকটি শব এখানে সেখানে

পড়ে আছে। যে চালাঘর থেকে চাল বিতরণ হয় সেখানে একদল কাঙাল হট্টগোল করছে। মায়েরা বাচ্চাদের থেকে চাল ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলছে কাঁচাই, বাচ্চাগুলি কাঁদছে। অতি দুর্বল লোকগুলি নিচে পড়ে 'চাল দাও' বলে আর্তনাদ করছে।

কর্কউড পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করলেন। নিমেষে তিনি স্থির করে ফেললেন চাল নয় ভাত দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হল। ভীড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাঁশের 'ব্যারিকেড' লাগানো হল। রান্নার ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হল।

বিকেল চারটায় ভাত রাঁধা শেষ হল, কিন্তু কেমন করে ভাত পরিবেশন করা হবে? সকলে চেষ্টা করল কেমন করে সামনে যাবে, ঠেলাঠেলি শুরু হল, যারা একটু সবল তারা সামনে গিয়ে ভাত পেল, অনেকের ভাত অন্যরা কেড়ে খেল। অনেক চেঁচামেচি গালাগাল হল। দুর্বল লোকগুলি নিচে পড়ে গেল, অন্যরা ভ্রূক্ষেপ না করে তাদের মাড়িয়ে গেল। অবস্থা দেখে কর্কউড ভাত দেওয়া বন্ধ করলেন। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে অন্যদিকে গেলে অপেক্ষাকৃত সবল লোকগুলি তার পিছনে গেল। যারা দুর্বল তারা রয়ে গেল এবং এবার তাদের ভাত দেওয়া হল।

ত্রাণশিবির থেকে যাবার আগে কর্কউড আদেশ দিলেন পরের দিন থেকে শিবিরের দায়িত্ব নেবেন কাঙালী মহাপাত্র ওরফে জন নামক একজন স্থানীয় খৃষ্টান। সে ত্রাণের কাজে সাহায্য করত।

কলকাতা : জুন ১৮৬৬

দু মাস দার্জিলিঙে কাটিয়ে ১৬ই জুন ছোট লাট কলকাতায় ফিরে এলেন। দুর্ভিক্ষের অবস্থা সমীক্ষা করার জন্য ১৮ই বোর্ডের বৈঠক ডাকলেন। তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল এই সাপ্তাহিক বৈঠকটিকে একটি কমিটিতে পরিবর্তিত করা হোক। এতে অফিসারগণ ছাড়াও কয়েকজন ইউরোপীয় এবং দেশীয় ভদ্রলোককে এর সদস্য মনোনীত করা হোক। কিন্তু ছোট লাট অফিসার নন এমন মাত্র দুজনকে এ সভায় আমন্ত্রণ করলেন, জমিদার দিগম্বর মিত্র এবং বেঙ্গল চেম্বারের মনক্রিপ। বোর্ডের অফিসে সভা বসল এবং আকাল সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি পেশ হল। মনক্রিপের মনে হল ছোট লাট বা বোর্ড ওড়িশার পরিস্থিতি সঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি বিচলিত হলেন এইজন্যেও যে বীডন এখনও জিদ ধরেছেন যে চালের কেনাবেচা করে সরকার ক্ষতি সহ্য করবে না এবং তিনি মানতে রাজী নন যে ওড়িশার পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়েছে।

মনক্রিপ সভায় প্রতিবাদ করলেন না বটে, কিন্তু চুপ করে বসেও রইলেন না। একুশে তিনি বোর্ডের সেক্রেটারীকে একখানি কড়া চিঠি লিখলেন :

প্রিয় চ্যাপম্যান,

সরকারি মহলের বাইরে সকলের দৃঢ় ধারণা যে যদিও আকালের কাল ছায়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সরকার এখনও দুর্দশার ব্যাপকতার বিষয়ে সচেতন নন। যেটুকু মানছেন তারও উপশমের যথেষ্ট প্রয়াস হচ্ছে না।

রেঙ্গুন থেকে ওড়িশায় চাল আমদানি করতে হবে। চাল সমুদ্রতটে এলেই কাজ হবে না, সে চাল ভেতরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন কোন গুদাম থেকে চাল পাওয়া যাবে তার ব্যাপক প্রচার দরকার। খুচরা বিক্রেতাদের পাঁচ দশ মনের বেশি চাল দেওয়া হবে না। চাল টাকায় দশ সের দরে ক্রেতারা পাবে।

কেনা এবং বেচার দরের মধ্যে যে ফারাক তা রিলিফ কমিটি পূরণ করুক। ছোট লাট বলেছেন কেনা দামের কমে চাল বিক্রি হবে না। আমার মতে অনাহার ক্লিষ্ট লোকদের সঙ্গে এটি একটি ক্রুর পরিহাস। বোর্ডের উচিত এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ লক্ষ মন চাল কিনে তিন সপ্তাহের মধ্যে বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে দেওয়া। এ কাজে একটুও বিলম্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আর এক মাস দেরী হলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

পত্রখানি আপনি বোর্ডের সদস্য গ্রোট অথবা আর যাকে চান দেখাতে পারেন। সরকার যেমন ভাবছেন অবস্থা তার দশগুণ খারাপ ধরে নিয়ে ব্যবস্থা না নিলে ইউরোপীয় এবং দেশীয় লোকেরা খোলাখুলি প্রতিবাদ করতে বাধ্য হবে।

আর কেউ কিছু না করলেও আমি চুপ থাকব না, শেরিফকে অনুরোধ করে বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য এক সভা ডাকব।

আপনার বিশ্বস্ত
আর. স্কট. মনক্রিপ।

বালেশ্বর : জুন ১৮৬৬

নেমেসিস জাহাজ আড়াই হাজার বস্তা চাল নিয়ে বালেশ্বর এল ৯ই জুন। এর আগে ব্যবসায়ীরা মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলা থেকে কিছু কিছু চাল বলদের পিঠে করে এনেছিল কিন্তু বর্ষা নামতে রাস্তাঘাটের অবস্থা এত খারাপ হল যে এই সরবরাহ চালু রাখা সম্ভব হল না। তারা মাদ্রাজ থেকে চাল আনতে চায় কিন্তু বর্ষায় সমুদ্রে নৌকা চলাচল নিরাপদ নয়। সুতরাং তারা আবহাওয়ার উন্নতির অপেক্ষায় আছে।

চাল এসে গেছে জানা গেলে বাজারে চালের দাম একটু কমল। হাসপাতালে আজকাল সাতশ' জন রুগ্ন অক্ষম লোককে খাওয়ানো হয়। ধর্মশালার নিকট অন্নসত্র খুলে পাঁচশ লোককে খেতে দেওয়া হয়। তাছাড়া ত্রাণের কাজে নিযুক্ত দুই হাজার কুলিকে মজুরীর পরিবর্তে চাল দেওয়া হয়।

প্রথমদিকে অন্নসত্রে কাঙালীদের সামলানো কঠিন হত। তারা জানত না কতদিন মাগনা খেতে পাবে। তাই যত পারে ভাত খায়, ভয় পাছে অন্নসত্র বন্ধ হয়ে যায়! সুস্থ সবল লোকও আসত। তাদের অবশ্য ফিরিয়ে দেওয়া হত। সবলেরা দুর্বলদের

ভাত ছিনিয়ে খেত। একবার একজন একটি স্ত্রীলোকের ভাত কেড়ে নিতে গেলে তার কোলের বাচ্চাটি পড়ে মরে গেল।

কেবল অক্ষম দুর্বল লোক স্ত্রীলোক ও নাবালক ব্যতীত অন্যরা যাতে অন্নসত্রে ভীড় না করে তার জন্য টোকেনের ব্যবস্থা হল। পরে জানা গেল কেউ কেউ দু পয়সায় টোকেন বিক্রি করে নতুন টোকেনের জন্য লাইনে দাঁড়ায়। কাঙালরা দূর দূরান্তর থেকে এসেছে, কেউ তাদের চেনে না। সুতরাং কে টোকেন বেচে আবার লাইনে দাঁড়াচ্ছে ধরা সহজ নয়। তাছাড়া টোকেন চুরি হয়, ছিনতাই হয়। এমন কি জাল টোকেনও চালু হয়েছে। অনুসন্ধান করে জানা গেল ছাত্র এমনকি পুলিশও এই জালিয়াতিতে জড়িত। নানা কারণে সক্ষম লোকও টোকেন নিয়ে লাইনে দাঁড়ায়। অগত্যা টোকেন প্রথা বাতিল করতে হল।

বালেশ্বরের একটি সমস্যা আছে। সেটি হল আবর্জনা পরিষ্কার করা। মেথররা সকলে শব সৎকারে ব্যস্ত; অন্য শ্রেণীর লোক এ কাজ করবে না। হাসপাতালের আশে পাশে এত জঞ্জাল জমে আছে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

কাঙালদের থাকবার জন্য চালাঘর বানানো হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক সেখানে থাকে না, পথে পথে ঘুরে বেড়ায় ভিক্ষা করে এবং যা পায় তাই খায়। তারা অন্নসত্রের কাছাকাছি কোনও বাড়ির বারান্দায় না হলে গাছতলায় রাত কাটায়। তাদের কাপড় ও তালপাতার ছাতা দেওয়া হয়েছিল। অনেকে সে সব বেচে আফিম কিনে খেয়েছে।

ফকীর মোহনরা আজকাল গড়গড়িয়ার ঘাটে আসেন না। তার চারপাশে কাঙালের ভীড়। ঘাট নোংরা। মাঝে মাঝে ফকীর মোহন ও রাধানাথের দেখা হয়ে যায় রাস্তায়। মধুসূদন কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। লোকে বলাবলি করে যে সে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে ফেরার হয়েছে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে বাড়ির সামনে বমি করল রাধানাথ। রাস্তাঘাটে কাঙালের ভীড় এবং তাদের করুণ স্বর এতদিনে গা সহা হয়ে গেছে কিন্তু আজ বাড়ি ফেরার সময় দেখল একটি ছেলে একটি মানুষের হাত নিয়ে কাঁচা মাংস কামড়ে খাচ্ছে। এ কথা শুনে সুন্দর নারায়ণ তাকে তিরষ্কার করলেন আর বললেন, 'বাইরে ঘুরে বেড়াবে না, সোজা বাড়ি চলে আসবে।' বাড়ি ঢুকে উঠোনে একটি কঙ্কালসার ছেলেকে দেখে আঁতকে উঠল রাধানাথ। আনন্দ নামে এই অনাথ বালককে আজ সকালে রাস্তা থেকে নিয়ে এসেছেন সুন্দর নারায়ণ।

পুরী : জুলাই ১৮৬৬

পুরীতে আমদানির চাল এল সবশেষে। ৩০শে জুন একখানি স্টীমার এল যাতে ২৫৮৯ বস্তা চাল আছে। আরও ১২৪৭৬ বস্তা চাল নিয়ে অন্য একটি স্টীমার এল একদিন পরে। এখন ভরা বর্ষা, আবহাওয়া প্রতিকূল। স্টীমার বোট আছে, তবুও চাল খালাস করা সম্ভব হল না। ছোট নৌকা করে স্টীমার থেকে অল্প অল্প চাল আনার কথা কিন্তু সেরকম নৌকা পুরীতে কমই আছে। ১২ই জুলাই চল্লিশ বস্তা চাল জলে পড়ে গেল, ১৬ই একখানি নৌকা ডুবে গেল। তারপরে আবহাওয়া এতই খারাপ হল যে কিছুদিনের জন্য চাল নামানো বন্ধ রাখতে হল। ১৯শে দুটি দুর্ঘটনা ঘটল, একখানি নৌকা ভেঙে গেল এবং একখানি ডুবে গেল। নুলিয়ারা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যেতে সাহস করল না। নৌকা ভাঙা এবং নৌকাডুবির জন্য বস্তা বস্তা চাল অতলে তলিয়ে গেল। বার্লো গ্রামাঞ্চল থেকে কয়েকজন দক্ষ মাঝি এনে তাদের খাইয়ে সবল করিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা করলেন।

জুলাই মাস শেষ হল কিন্তু জাহাজ থেকে হাজার বস্তা চালও খালাস হয়নি। ইতিমধ্যে উনিশটির মধ্যে পনেরোটি নৌকা ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। দুজন নুলিয়ার জল সমাধি হয়েছে, আর তিনজন আহত হয়ে হাসপাতালে। স্টীমারগুলি কয়েকদিন আগে এলে এমন অবস্থা হত না। এখন কূলের অদূরে চাল আর শহরে অনাহারে লোক মরছে।

জুন মাস পর্যন্ত তেলুগু বেপারীরা গোপালপুর থেকে কিছু কিছু চাল এনে বিক্রি করছিল, বর্ষা আরম্ভ হতে তাও বন্ধ হয়ে গেল। এই সময়ে গোপালপুর থেকে পনেরোশ বস্তা চাল নিয়ে একখানি স্টীমার এল কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য তার এক অংশ ভেঙে গেল। চাল নামানোর জন্য জাহাজে বোট ও কুলি থাকা সত্ত্বেও কিছু করা গেল না, জাহাজটি ফিরে গেল।

রেভারেণ্ড মিলার সাইকস্ ফাণ্ড থেকে পাঁচশ টাকা পেয়ে পুরীতে অন্নসত্র খুললেন। প্রায় তিনশ কাঙাল এখানে রোজ খেতে পায়। জুলাই-এর শেষের দিকে এ সংখ্যা হাজার পেরিয়ে গেল। রিলিফ কমিটির সদস্যদের টোকেন দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। টোকেন দেখালে মাগনা চাল দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল কমিটির অনেক সদস্য মর্জিমত টোকেন দিয়েছেন ফলে অনেকে প্রচুর, এমন কি ত্রিশ সের পর্যন্ত চাল পেয়েছে। টোকেন যারা পেয়েছে তাদের মধ্যে মন্দিরের কয়েকজন পাণ্ডাও আছে। অগত্যা কিছু টোকেন বাতিল করা হল এবং সদস্যদের অনুরোধ করা হল তাঁরা যেন ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে টোকেন দেন।

পুরীর রাস্তায় অনেক অনাথ বালক বালিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পিতামাতার মৃত্যু হয়েছে এবং দেখাশুনা করার কেউ নেই। রেভারেণ্ড মিলার তাদের নিয়ে এক জায়গায় রাখলেন।

জেলার অন্যান্য কয়েক জায়গায়ও অন্নসত্র খোলা হল। খুর্দা সাবডিভিশনে বার্টনের অধীনে ন'টি অন্নসত্র খোলা হল। বর্ষা নামতে রিলিফের এবং অন্নসত্রের কাজে বাধা এল। এমনিতেই জুন ও জুলাই মাস পুরী জেলার পক্ষে খারাপ সময়। লোকেরা বলতে লাগল আগষ্ট মাসে অবস্থা আরও খারাপ হবে।

কটক : আগষ্ট ১৮৬৬

রেভেনশা আজকাল উদ্বেগজনক প্রতিবেদনই পান। আমদানির চাল এলে সাময়িকভাবে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল বটে কিন্তু বর্ষা আর বন্যা দুর্গতি বাড়িয়ে দিল। ৬ই আগষ্ট থেকে ক্রমাগত তিনদিন ঝড়বৃষ্টি লেগে রইল; সুতরাং মফঃস্বলে চাল পাঠান সম্ভব হল না। ৯ই ভার্গবী নদীর বাঁধ ভেঙে গেল এবং অনেক গ্রাম জলে ভেসে গেল। ঠিক তার পরে লুনা নদীর বাঁধও ভেঙে গেল। চতুর্দিক জলময়। অবস্থা এমন যে কটক থেকে খুর্দায় চাল পাঠান সম্ভব হল না। সেখানকার ত্রাণ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হবার পর্যায়ে পৌঁছল। চালের অভাব টাঙ্গী ত্রাণ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেল এবং পুনরায় অনাহারের সম্মুখীন হল প্রায় এক হাজার কাঙাল।

বালেশ্বরে যে চাল এসেছিল জুলাই-এর শেষ নাগাদ তা প্রায় শেষ। আগষ্ট মাসে চাল বিক্রির সরকারী কেন্দ্রগুলি বন্ধ করতে হল। অন্নসত্র কোনওক্রমে চালু রাখা হল জেল গুদাম থেকে পাঁচশ বস্তা চাল ধার নিয়ে। ২১শে জুলাই চাল নিয়ে একখানি জাহাজ এসেছিল কিন্তু আবহাওয়া এত খারাপ যে তট থেকে আট মাইল দূরে থেমে থাকতে বাধ্য হল। অনেকদিন আবহাওয়ার উন্নতি হল না। অগত্যা জাহাজটি ফিরে গেল। মনে হল অভুক্ত লোকের মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে নিল।

একমাত্র বালেশ্বর শহরে আগষ্টের প্রথম বারদিনে অনাহারে মারা গেল ১০১৩ জন। ৮ই আগষ্ট ঝড় তুফান হল। সেই একদিনেই মারা গেল ২৪৫ জন। তার পরের দিন আরও ১৫১ জন। শবগুলি ফেলে আসা এখন পুলিশের বিশেষ কাজ। চারটি গাড়ি লাগিয়ে এ কাজ করতে তিনদিন লাগল।

বর্ষা ও নদীর জলে রাস্তাঘাটে চলাচল বন্ধ। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয়। ধামনগরে চালের দাম টাকায় এক সের। ভদ্রকে চাল নেই। ত্রাণ কেন্দ্র থেকে চালের পরিবর্তে টাকা দেওয়া হল।

বর্ষা ও বন্যায় দুর্গতি বেড়ে গেছে কটকেও। জুন মাসে এক হাজার লোককে চাল দেওয়া হচ্ছিল। আগষ্ট মাসে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল আট হাজারে। পোকামাকড়ের মতো লোক মরতে লাগল। একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর কেবলমাত্র কটক শহর থেকে দুশ শব নিয়ে আনিকটের কাছে বালিতে পুঁতেছিল।

এসিষ্ট্যান্ট কালেক্টর কর্কউড ২০শে আগষ্ট তালদণ্ডা রিলিফ কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলেন। দু মাস আগে তিনি এই কেন্দ্র পরিচালনার বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন। এবার এসে দেখলেন জল ঢুকে গুদাম ও রান্নার ঘর ভেঙে গেছে। তাছাড়া তার উপরে কেন্দ্রের কর্মীরা নানাভাবে কাঙালদের হয়রান করে। কর্কউড কেন্দ্রের কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখলেন, লোকের দুঃখের কাহিনী শুনলেন এবং সেই মুহূর্তে জনকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন। এবং সকল কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দিলেন।

বর্ষাকালে সবদিক থেকে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওড়িশা। কোনও উপায়ে চাল আনা সম্ভব হল না। মাঝ সমুদ্রে আটকে থাকা জাহাজের রসদ শেষ হয়ে গেল যে অবস্থা হয় ওড়িশারও তদ্রূপ। এই সময় এক বস্তা চাল একটি জীবন রক্ষা করতে পারত, সে চাল কেনা হোক, মাগনায় মিলুক বা চুরির হোক।

আকালের জন্য কটক প্রিণ্টিং প্রেস এক বিচিত্র উপায়ে লাভবান হল। ওড়িয়া হরফ না থাকায় ওড়িয়াতে কাজ হয় না। তারা ইংরেজীতে ছাপাতে পারে কিন্তু যেহেতু সরকারি ফর্মগুলি কলকাতায় ছাপা হয়, তাদের কাজ মিলত না। এখন দুর্ভিক্ষ ত্রাণের কাজে অনেক নতুন ফর্ম দরকার হল এবং সে কাজ পেল কটক প্রিণ্টিং প্রেস।

জগমোহন রায়ের বৈঠকখানায় এখন দিবারাত্র প্রেস চলে। অফিসে যতক্ষণ না থাকলে নেহাতই চলে না ঠিক ততক্ষণ থাকেন। গৌরীশংকর আর বাকি সর্বক্ষণ প্রেসে কাটান। প্রেসের কাজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে বনমালী সিংহের সহযোগিতায় উপেন্দ্র ভঞ্জের 'প্রেমসুধানিধি'র টীকা লিখতে আরম্ভ করলেন তিনি। বিচিত্রানন্দ এবং গৌরীশংকর স্থির করলেন শীঘ্রই একখানি ওড়িয়া পত্রিকা প্রকাশ করবেন।

আগষ্ট ৪ তারিখ অর্থাৎ ১২৭৩ সালের ২২শে শ্রাবণ 'উৎকল দীপিকা' প্রকাশিত হল। লিথো ছাপা পত্রিকার মূল্য চার আনা। কটকের সকলের হাতে ছিল সেদিনকার পত্রিকাখানি। এতে বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল এবং রিলিফের কাজে কী কী ত্রুটি রয়ে গেছে তার উল্লেখ ছিল। লোকে জানল এই পত্রিকা ওড়িশার বিবেক রক্ষার কাজ করবে।

গৌরীশংকর পত্রিকার জন্য খরচ ও লেখা সংগ্রহের কাজে জুটে গেলেন। কটকের অন্নসত্র ও চাল বিক্রির কেন্দ্রগুলি পরিক্রমা করে তিনি দীপিকায় লিখলেন :

গত রবিবার লালবাগ অন্নসত্রে আমরা দেখলাম যে রাঁধুনে ব্রাহ্মণ ও জমাদার সেখানকার মালিক হয়ে বসেছে। টোকেন হাতে নিয়ে অনেকে কিছু পেল না। একজন কর্মী আমাদের জানাল কাঙালদের তিনটের সময় আসতে বলা হয়েছে, আসছে এখন। এখন কি ভাত আছে? কোথা থেকে দেব? ঠিক সেই সময় দেখলাম দুজন বৈরাগী ভাত নিয়ে যাচ্ছে। একজন বৃদ্ধা জানাল কর্মীরা নির্মমভাবে মারে, এতে অন্নাভাবে না মরলেও, মার খেয়ে মরবে লোক। অধঃস্তনদের উপর সব ছেড়ে দিলে এমনই হবে।

কি আশ্চর্য! একটু আধটু না পিটালে কি চালের কাজ করা যায়? চাঁদনী চকের

চালের গুদাম দেখলে মনে হবে এটি একটি নিগ্রহ কেন্দ্র। ২১শে সাহেব সেখানে যাননি। প্রহরীরা ভীড় নিয়ন্ত্রণ করতে হিমসিম খাচ্ছে। সবল কালো কাপড় পরা কিছু লোক জোর করে সামনে যাচ্ছে এবং চাল পাচ্ছে। দুর্বল দুঃখী লোকগুলি কোনক্রমে গেট পর্যন্ত যেতে পারলেও চাল পাচ্ছে না, মার খেয়ে ফিরে যাচ্ছে। লোভ যে অনেক অমঙ্গলের কারণ তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এখানে দেখা গেল।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ছোট লাট পুনরায় দার্জিলিং চলে গেলেন। খবর পেয়ে দীপিকা টিপ্পনি করল :

ইংলিশম্যান পড়ে জানলাম ছোট লাট আবার দার্জিলিং গেছেন। শারীরিক অসুস্থতা এর কারণ বলে জানা গেল। এদিকে অনাহারে লোক মরছে, তাঁর উচিত আকাল পীড়িত অঞ্চল ঘুরে দেখে লোকের দুর্দশা লাঘব করা। তা তিনি করলেন না গেলেন শৈলশিখরে আরাম করতে!

কটক : নভেম্বর ১৮৬৬

সেপ্টেম্বর মাসে লোকের দুর্ভোগের সামান্য লাঘব হল। ইতিমধ্যে আরও চাল আমদানি হয়েছে, রিলিফের কাজও পূর্বের তুলনায় ভাল চলছে। অবশ্য অনেক লোক এখনও কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। চাল এখনও মহার্ঘ, টাকায় কোথায়ও পাঁচ কোথায়ও ছয় সের. তাছাড়া অনেকদিনের উপবাসে শরীর দুর্বল, একটু বেশি খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং অনেকে এভাবে মরছে এখনও। অক্টোবর মাসও এভাবে কাটল। নভেম্বরে যখন নতুন ফসল উঠতে লাগল তখন ধরা হল আকালের অবসান হয়েছে। অত্যন্ত দুঃস্থ, কাঙাল বিধবা নারী ও ছোট বাচ্চারা ছাড়া অন্যরা যে যার বাড়ি চলে গেল। যে সকল আকাল তাড়িত ভিখারী কলকাতা চলে গিয়েছিল তাদের কিছু চাল, কাপড় ও নগদ তিন টাকা দিয়ে জাহাজে ওড়িশা পাঠান হল। মনে হল ওড়িশার উপর থেকে অনাহার ও মৃত্যুর করাল ছায়া এতদিনে অপসৃত হয়েছে।

দিনরাত্রি কঠিন পরিশ্রম করেছে সরকারী কর্মচারী। এবার তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এ সন্ধ্যায় হাতে ব্রাণ্ডির গ্লাস নিয়ে ক্লাবের এক কম আলোকিত কোণে বসে আছেন খুর্দার এসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর বার্টন, মাজপুরের জে. এম. আর্মষ্ট্রং এবং কটকের কর্কউড। তিনজনই যুবক, কিছুদিন আগে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। ভারতে এসে সকলের নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভাল করে মানিয়ে নেবার আগেই দুর্ভিক্ষের কাজের চাপ পড়ল। রিলিফের কাজে এত সময় যেত যে প্রতি সন্ধ্যায় ক্লাবে আসার সময় মিলত না। মাঝে মাঝে ব্যাঙের কাছে দেখা হত। অনেকদিন পরে আজ তিনজন ক্লাবে একত্রিত হয়েছেন।

রেভেনশা এসে তাদের কাছে বসলেন এবং একটু পরে উঠে গেলেন। সেদিন তিনি কেন্দ্রপাড়া থেকে ফিরেছেন। তাঁর মন ভাল নেই। আকালের অন্ত হয়েছে কিন্তু কিন্তু তার ছাপ এখনও চোখে পড়ে। কেন্দ্রপাড়া থেকে ফেরার সময় রাস্তায় অনেক নরকঙ্কাল দেখেছিলেন। দশ মাইলের মধ্যে তেইশটি মাথার খুলি গুনেছিলেন। তাছাড়া একটি করুণ দৃশ্য তিনি ভুলতে পারছিলেন না। কেন্দ্রপাড়া সাবডিভিশনের সামনে এক নারী তাঁর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। ওঠাতে গেলে দেখা গেল বেচারীর দেহে প্রাণ নেই।

রেভেনশা চলে গেলে তিন যুবক অফিসার তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা মসকরা করলেন। তাঁর কার্যশৈলী এদের অবশ্য আলোচ্য বিষয়। রেভেনশা ভাল লোক কিন্তু তাঁর কাজ করার ধরণ অদ্ভুত। আজ কিন্তু তাদের মন অন্যদিকে। 'উৎকল দীপিকা'য় ত্রাণের কাজের সমালোচনা হয়। বিশেষ করে অফিসারদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হয়। কোনও বিষয় অথবা ঘটনা তা যত নগণ্যই হোক, দীপিকার নজর এড়ায় না। আগষ্ট মাসে কর্কউড তালদণ্ডা শিবির পরিদর্শন করেছিলেন। তার উপর দীপিকার টিপ্পনি :

আমরা অবাক হয়েছি যে তালদণ্ডা কেন্দ্রের চালের দারোগা কাঙালী মহাপাত্র ও তার অধঃস্তন কর্মচারীগন চালের অব্যবহারের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। এ মকদ্দমা এখন কেন্দ্রপাড়ার এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে। আমাদের খবর পাদ্রী মহাপাত্রকে সুপারিশ করেছিলেন কারণ সে খৃষ্টান। স্বয়ং কাঙালী যদি কাঙালদের কষ্ট না বোঝে তবে কাকেই বা দোষ দেওয়া যায়?

বালেশ্বরের ইঞ্জিনিয়ার ফেরন একজন কুলিকে নির্মম প্রহার করেছিল। বিচারে সে খালাস পেল। পত্রিকা এর সমালোচনা করেছে।

কর্কউড দীপিকার রোষের প্রধান লক্ষ্য। ২৯শে সেপ্টেম্বর তার উপর দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। ২৫শে আগষ্ট কর্কউড অন্নসত্র তদারক করতে গিয়ে জয়পুর কুঠীতে অবস্থান করছিলেন। রাত্রি তিনটায় নদী পার করিয়ে দেবার জন্য ইজারাদারকে ডেকে পাঠালেন। ইজারাদার তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল না করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কর্কউড রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে তাকে দু চার থাপ্পড় মারলেন আর চুল ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন। এতেও রাগের উপশম হল না, কর্কউড চাপরাশিকে বললেন লোকটিকে আরও উত্তম মধ্যম দিতে। তার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। ডাক্তারের সার্টিফিকেট মোতাবেক তার হাতের আঘাত গুরুতর। মামলা কোর্টে উঠলে বাদী হাজির হল না, কেস খারিজ হয়ে গেল।

এই বিবরণীর সঙ্গে দীপিকা কর্কউডের অনেক আচরণের উল্লেখ করল। যথা, তিনি চালের গুদাম পরিদর্শনে গিয়ে চালের দারোগা দুর্লভ নাথ রায়কে না পেয়ে তার বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে এমন পিটালেন যে সে ইস্তফা দিয়েছে। কদিন পরে চালের দারোগা মথুরা নাথ সেনও মার খেয়ে পদত্যাগ করল। এবার সদর ওভারসিয়র

কানুরাম চক্রবর্তীর পালা। কর্কউড তাকে এমন পিটালেন যে সে দুদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। লালবাগ অন্নসত্রে একজন রাঁধুনে ভাত রাঁধতে দেরী করেছে, সেও মার খেল। কিছুদিন পরে কর্কউড পুলিশ কনেষ্টবল মধু বেহেরাকে মারলে সে এস.পি.র কাছে নালিশ করল। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি কালেক্টরের নজরে এল, তিনি কর্কউডের কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

দীপিকা কর্কউডের নাম দিয়েছে মারমুখো ফিরিঙ্গি। পত্রিকা লিখল : কর্কউড যদি নিজের আচরণ পরিবর্তন করে শান্ত শিষ্ট না হন তবে তিনি প্রজাদের গ্রহণযোগ্য হাকিম এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারবেন না।

দুর্ভিক্ষের উপরে দীপিকাতে একটি কবিতা প্রকাশিত হল। তাতে কর্কউডের চিত্রণ এরকম :

মারে কর্কউড মানা নাহি মানে
যেখানে সে পায় যারে
দোষ কিছু হলে না ভেবে না চিন্তে
আগে তাকে ধরে মারে।

সাহেব অফিসার ভারতে পাঠাবার আগে একটি বিশেষ উপদেশ দেওয়া হত : কোনও কারণেই নেটিভদের উপরে হাত উঠাবে না, কারণ প্লীহার রোগের জন্য সামান্য আঘাতেও কেউ মরতে পারে। কর্কউড এ পরামর্শ উপেক্ষা করেছেন।

দীপিকা অবশ্য নির্বিচারে সাহেবদের সমালোচনা করে না। বার্লো যখন তিন বছর ছুটি নিয়ে স্বদেশ চলে গেলেন তখন দীপিকা লিখল : আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছি যে তিনি সকুশল এ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রেভেনশা যখন সুপারিশ করলেন যে কটকের কালেক্টর কর্ণেলকে এ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক, তখন দীপিকা তাঁকে সমর্থন করল।

যুবক অফিসাররা দীপিকায় প্রকাশিত অন্য একটি খবরের উল্লেখ করলেন না। সেটি বার্টন সম্বন্ধে। খুর্দার এক মহিলা তার দেড় বছরের কন্যার ভরণপোষণ দাবী করল বার্টনের কাছে এবং কোর্টে আবেদন করেছে। তার বক্তব্য বার্টন কন্যাটির পিতা। বাচ্চাটির রং ধপধপে ফর্সা, সুতরাং অনেকে তার কথা বিশ্বাস করল। প্রমাণের অভাবে মামলা বিফল হল।

দুজনে জোসেফ আর্মষ্ট্রঙের পিছনে লাগল। কারণ তিনি দীপিকার নিয়মিত গ্রাহক। ছয় মাসের দাম ও ডাকমাশুল অগ্রিম দিয়ে তিনি জজপুরে নিয়মিত দীপিকা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক হল তাকে দণ্ড ভুগতে হবে। দীপিকায় কার বিরুদ্ধে কি প্রকাশ পায় পড়ে সকলকে জানাতে হবে। আর্মষ্ট্রং প্রতিশ্রুতি দিলেন এ দায়িত্ব তিনি পালন করবেন। তিনি আরও জানালেন যে, 'ওড়িয়ারা নির্বোধ' এ উক্তির সত্যতা নিয়ে আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় তাও তিনি জানাবেন।

কলকাতা : নভেম্বর ১৮৬৬

দেরীতে হলেও ওড়িশার দুর্ভিক্ষের খবর বিলাত পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে উদ্বেগ ও জনমত সৃষ্টি হল। জনসাধারণের ধারণা দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা গেলেও পরিস্থিতি সংকটজনক হবার আগে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। এবং লোকের দুর্ভোগ এবং জীবনহানির এটাই প্রধান কারণ। সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট ভারত সরকারকে নির্দেশ দিলেন যে বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য একজন অফিসারকে নিযুক্ত করা হোক।

নির্দেশ পেয়ে ছোট লাট নদীয়া ডিভিশনের কমিশনার এল ডাম্বিয়ারকে এ দায়িত্ব দিলেন। একটি অভিযোগ ছিল অফিসাররা অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ করেননি। সুতরাং এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা হল। ডাম্বিয়ার নিজে রিলিফের কাজে জড়িত ছিলেন। এবার ছোট লাটের আদেশ রদ করে বড় লাট একটি দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করলেন। অধ্যক্ষ হলেন মাননীয় মি. জাস্টিস্ জর্জ ক্যাম্বেল। অন্য দুজন সদস্য হলেন ডাম্বিয়ার এবং রয়াল ইঞ্জিনিয়ার্সের কর্ণেল ডব্লু. ই. মর্টন। কমিশনের কাজের পরিধি নির্ধারিত হল : দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ কি? জনসাধারণের দুর্গতি দূর করার জন্য যথা সময়ে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল কি? আর যদি না হয়ে থাকে তবে তার কোনও সন্তোষজনক কারণ ছিল কি? ভবিষ্যতে এমন দুর্যোগ যাতে না ঘটে এবং যদি ঘটে তবে লোকের কষ্ট লাঘব করার জন্য সরকারের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

কমিশন নিযুক্ত হয়েছে শুনে ছোট লাট থেকে এসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সকলে নিজ নিজ কাগজপত্র ঠিক করতে লেগে গেলেন।



পাঁচ

পুরী : ডিসেম্বর ১৮৬৬

দুর্ভিক্ষ কমিটির সভ্যগণ ১৭ই ডিসেম্বর 'ফিরোজ' জাহাজে পুরী এলেন। সঙ্গে কমিশনের সচিব পি. ডিকেন্স। জাহাজে ন'শ বস্তা চালও আছে। কালেক্টর রাখান সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন। তাঁর অফিসে গিয়ে জজ ক্যাম্বেল কমিশনারের কার্য নির্বাহের জন্য কি কি ব্যবস্থা হয়েছে সমীক্ষা করলেন। সাক্ষীদের বয়ান লেখার জন্য পুরীতে 'রিপোর্টার' নেই। তার ব্যবস্থা করার জন্য কটকে খবর পাঠান হল। কমিশন পৌঁছানোর আগেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, ইচ্ছুক ব্যক্তি সাক্ষ্য গ্রহণের সময় উপস্থিত থাকতে পারেন। অবশ্য কমিশনের কাজ শেষ হবার আগে কোনও জবানবন্দী প্রকাশ করা চলবে না। যে কক্ষে সাক্ষ্য নেওয়া হবে তার বাইরের দেওয়ালে বিজ্ঞপ্তিটির নকল টাঙিয়ে দেওয়া হল।

কমিশনের কাজ বিধিবদ্ধভাবে শুরু হল ১৮ই সকালে। কমিশনের সভ্য এবং সাক্ষীদের জন্য চেয়ার আছে। আরও কিছু চেয়ার ও বেঞ্চ আছে দর্শকদের জন্য। সেগুলি ভরে গেছে। প্রথম সাক্ষী ডেপুটি কালেক্টর বাবু দুর্যোধন দাস। আকালের বিভীষিকা যখন চরমে, তিনি কেন্দ্রপাড়ায় কার্যরত ছিলেন। পুরী এসেছেন মাত্র তিন মাস আগে। নানা প্রশ্নের জবাবে তিনি যা বললেন তার সারমর্ম : তিনি সরকারী চাকরি করছেন পঁয়ত্রিশ বছর। ১৮২৯ এবং ১৮৪১ সালে তিনি খাদ্যাভাব দেখেছেন কিন্তু এবারের তুলনায় সেসব নগণ্য। ১৮৬৫-৬৬ সালে চার আনা ফসল উঠল এবং ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে প্রথম অনাহারে মৃত্যুর খবর এল। এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে অবস্থার দ্রুত অবনতি হল, তার উপর জুলাইতে কলেরার তাণ্ডব শুরু হল। তাঁর ধারণা কেন্দ্রপাড়ায় শতকরা পঁচিশজনের মৃত্যু হয়েছে। সেপ্টেম্বরে আউস ধান উঠতে অবস্থার আংশিক উন্নতি হল। জুলাই মাসে পিয়ন বরকন্দাজের মুখে শুনেছিলেন তারা একজনকে নরমাংস খেতে দেখেছে। নিচু জাতের একজন ব্রাহ্মণ গোবরী নদীতে ভাসমান একটি শিশুর শব তুলে এনে রান্না করে খেয়েছিল। নিচু জাতির লোক গোমাংস খেয়েছে এবং কখনও কখনও কাঁচা মাংসও খেয়েছে।

দুর্যোধন দাসের পরে সাক্ষ্য দিলেন রামাক্ষয় চ্যাটার্জী। তিনি পুরী জেলায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং মৃতদের একটি তালিকা পেশ করলেন। খুর্দাকে বাদ দিলে পুরী জেলার লোক সংখ্যা ৪০১৫০১ এবং তার মতে এদের মধ্যে ১৬৭৩৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তার উপর ভিত্তি করে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরবর্তী সাক্ষী সাব এসিস্ট্যাণ্ট সার্জন উদয় চরণ দত্ত। তিনি জানালেন অন্নসত্রে যে দেড় হাজার লোক আছে তাদের মধ্যে পাঁচ ছ জনের মৃত্যু হচ্ছে প্রতিদিন। সেদিনকার মতো কমিশনের কাজ শেষ হল।

পরের চারদিন আরও একুশজনের সাক্ষ্য নিল কমিশন। এ কটি দিন কাছারীর ভিতরে এবং আশে পাশে লোকের ভীড় লেগে রইল। তারা সাক্ষীদের জবানবন্দী শোনে। কমিশন প্রতিদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে। পুরীতে যারা সাক্ষ্য দিলেন তাদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী ছাড়া ছিলেন জমিদার রঘুনাথ চৌধুরী, বাবু শশীভূষণ মুখার্জী, মাড়োয়ারী রামবাগান রাম, কূর্মটী ব্যবসায়ী লছুয়া পাত্র, মন্দিরের সেবক গোপী পাণ্ডা এবং কোটদেশ জমিদার ক্ষেত্রবর ভগবান রায়ত সিংহ।

বিশেষ সাক্ষী এসিস্ট্যাণ্ট কালেক্টর জি. এম. কারী কমিশনকে বললেন যে ১৮ই ডিসেম্বর চিল্কা অঞ্চলের একটি গ্রামে গিয়ে দেখলেন আঠাশ পরিবারের মাত্র মাত্র দুজন জীবিত আছে। তাঁর মতে পুরী শহর সমতে সারা জেলায় শতকরা পঞ্চাশ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কমিশন কালেক্টরের অফিসে দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে কটকের উদ্দেশ্যে পাল্কিতে রওনা হয়ে গেল ২২শে ডিসেম্বর। কমিশনের সামনে দেওয়া বয়ানগুলি অনেক দিন লোকের আলোচ্য বিষয় হয়ে রইল।

কটক : জানুয়ারী ১৮৬৭

ওড়িশায় এসে অনুসন্ধান শুরু করার আগেই কমিশন জমিদার ও অন্যান্যদের কাছে একটি প্রশ্নাবলী পাঠিয়ে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। কিন্তু খাজনা বেড়ে যাবে আশঙ্কা করে কেউ তার জবাব দেয়নি।

কমিশন কটকে কাজ শুরু করল ২৪শে। কাগজপত্র পড়ে সাক্ষীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল। ২৬শে যাদের সাক্ষ্য নেওয়া হল তারা হলেন কেন্দ্রপাড়ার মুনসিফ শিবপ্রসাদ সিংহ, পুলিশ সুপার লেসী, রেভারেণ্ড মিলার, ইঞ্জিনিয়ার হেনরী ক্রেন, জমিদার রসুল বক্স এবং কটকের কালেক্টর কর্ণেল। ২৭শে মাত্র তিনজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে কমিশন চালের গুদাম অন্নসত্র এবং আশ্রম দেখতে গেল। কমিশন খবর পেল যে তাদের কাছে দেওয়া জবানবন্দীগুলো দীপিকাতে প্রকাশ পেতে পারে। সুতরাং পরের দিন কাজ শুরু করার আগে কমিশনের কক্ষের সামনের দেওয়ালে একটি নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল :

দুর্ভিক্ষ কমিটির কাছে বয়ান দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে; কিন্তু কমিশন যে জবানবন্দী গ্রহণ করবে তা কেউ লিখে নিতে বা প্রচার করতে পারবে না।

পি. ডিকেন্স
কটক, ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৬৬ সেক্রেটারী

পরবর্তী সংখ্যায় দীপিকা এর প্রতিবাদ করল : কমিশন যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে চায় তবে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি শীঘ্র প্রত্যাহার করে নিয়ে কমিশনের কাজের প্রচারের অনুমতি দেওয়া হোক।

সরকারী কর্মচারীদের বয়ান চলল কয়েকদিন। ৫ই জানুয়ারি সাক্ষ্য দিলেন রেভেনশা। রেভেনশার বিশ্বাস ছিল যে ওড়িশায় প্রচুর চাল মজুদ আছে, সুতরাং আমদানি নিষ্প্রোয়জন। এ কারণে সর্বসাধারণের চোখে লোকের দুর্দশার জন্য তিনিই দায়ী। কমিশন রেভেনশাকে অনেক প্রশ্ন করল। তার সাক্ষ্য পুরো একদিনেও শেষ হল না। তার জবানবন্দীর বিশেষ বিশেষ অংশ :

প্রশ্ন : বালেশ্বর কালেক্টরকে ১৮৬৫ সালের ৩রা নভেম্বর আপনি ২৫৫ নম্বর পত্রে লিখেছিলেন যে কালেক্টর জেলাতে যত চাল আছে বলে ভাবছেন বাস্তবে তার থেকে অধিক আছে এবং হাল সনের ফসলে জেলার চাহিদা মিটে যাবে যদিও কালেক্টর জানিয়েছিলেন যে জেলার ফসলের অবস্থা খারাপ। আপনার মতের ভিত্তি কি?

উত্তর : ঠিক কি কারণে আমার এমন ধারণা হয়েছিল এখন মনে পড়ছে না। আমার কাছে এমন কোনও কাগজপত্র নেই যা দেখে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারি। ধান ধরে রাখা লোকের অভ্যাস তাই আমি ভেবেছিলাম তাদের কাছে যত চাল আছে তা কালেক্টরের অনুমানের অধিক হবে।

২০শে নভেম্বর রেভেনশা দুই মাসের জন্য দেশীয় রাজ্যগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে :

প্রশ্ন : দেশীয় রাজ্যগুলি ঘুরে দেখতে যাবার আগে আপনার মনে হয়নি যে আপনার পুরী ও বালেশ্বর যাওয়া উচিত যেখান থেকে উদ্বেগজনক রিপোর্ট আসছিল এবং যেখানে আপনি আগে যাননি?

উত্তর : সফরে যাবার আগে আমি চিল্কা অঞ্চলের খবর পেয়েছিলাম কিন্তু সারা পুরী জেলা এবং প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ছেয়ে যাবে তা ভাবিনি। চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমি ক্যাম্প থেকে কাজ তদারক করতে পারতাম।

প্রশ্ন : ১৮৬৬ সালের জুন মাসের আগে আপনি পুরী গিয়েছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : সরকারের নির্দেশ পেয়ে আপনি এপ্রিল মাসে বালেশ্বর গিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে গেছেন?

উত্তর : না। ট্রিবিউটরী অঞ্চল থেকে ফিরে বালেশ্বর যাবার কথা ভেবেছিলাম।

কিন্তু ছোট লাট আসছেন শুনলাম। এদিকে আমার স্ত্রীও হঠাৎ বিলাত থেকে এলেন সেজন্য আর যাওয়া হল না। ছোট লাট ফিরে গেলে দেখলাম অনেক কাজ জমে গেছে। সুতরাং আর যাওয়া হল না।

ছোট লাটের ওড়িশা আগমনের বিষয়ে :

উত্তর : ছোট লাট মুখ্যত ইরিগেশন কোম্পানীর কাজ দেখতে এসেছিলেন। এই অবসরে তিনি দেশীয় রাজাদের দরবার ডেকেছিলেন। দুর্ভিক্ষের বিষয়ে তিনি জানতে চান তা আমি জানতাম না। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।

প্রশ্ন : পুরী জেলাতে চালের অনটন এবং সরকার চাল না কেনার সিদ্ধান্তের ফলে রিলিফ কাজে অসুবিধা হচ্ছিল এ কথা ছোট লাটের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল কি?

উত্তর : আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তার সময় ছোট লাট এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন; অবশ্য আমি বলেছিলাম এখনও প্রচুর চাল আছে। দাম বেশি হলেও কিনবার জন্যে বাজারে চাল আছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন রাজা জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোকের দরবার হয়েছিল কিন্তু জনসাধারণ তাদের দুর্দশার কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল কি?

উত্তর : নিশ্চয়ই। কাছারীর সামনে এবং স্কুলের নিকট ছোট লাট সমবেত জনতার সামনে কথা বলেছিলেন। রাস্তায় যেতে যেতে এক দুবার তিনি লোকের দরখাস্ত নিয়েছিলেন। তাঁর পিছনে ভীড় করার অথবা তাঁর কাছে দাবী পেশ করার কোনও নজীর আমার মনে পড়ছে না। দরখাস্তগুলিতে একটি নিবেদন করা হয়েছিল সেটি হল চালের দাম কমানো হোক।

প্রশ্ন : পুরীর জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার বিষয়ে যা শুনলেন তাতে ছোট লাট প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে আপনার মনে হয়েছিল কি?

উত্তর : তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।

প্রশ্ন : আপনি পরিষ্কার করে বলবেন কি কিসের উপর ভিত্তি করে আপনার মনে হল যে প্রদেশে প্রচুর চাল আছে?

উত্তর : জমিদার ইউরোপীয় ও নেটিভ অফিসার এবং অন্যদের সঙ্গে আমার সর্বদা যোগাযোগ ছিল। সকলের মত ছিল প্রদেশে সঞ্চিত শস্য এক বছরের জন্য যথেষ্ট।

এবার রেভেনশা তাঁর বালেশ্বর সফরের কথা বলতে গিয়ে প্রকাশ করলেন লোকের দুর্গতি চাক্ষুষ দেখলেন প্রথমবার উনিশে এপ্রিল।

প্রশ্ন : তখনও কি আপনার মনে হল না যে জরুরী পদক্ষেপ নেবার সময় এসে গেছে?

উত্তর : হাঁ, নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন : আপনি সরকার থেকে সাহায্য পাবার কি চেষ্টা করলেন?

উত্তর : আমি যা দেখলাম তা বর্ণনা করে ছোট লাটকে একখানি অর্ধশাসকীয় পত্র লিখেছিলাম। এছাড়া আর কোনও বিশেষ পদক্ষেপ নিইনি আমি।

এপ্রিল মাসে এক মাসের জন্য ময়ূরভঞ্জ যাবার বিষয়ে রেভেনশা বললেন তাঁর যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল।

প্রশ্ন : আপনি দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি ততটা গম্ভীর সমস্যা মনে করেননি?

উত্তর : অবশ্যই করেছিলাম। কিন্তু আমার বিচারে আমার যা করণীয় আমি তাই করেছিলাম।

প্রশ্ন : এমন কোনও ইউরোপীয় অফিসার ছিলেন না যাঁকে গড়জাত অঞ্চলে পাঠাতে পারতেন নিজে না গিয়ে?

উত্তর : এমন কেউ ছিলেন না।

কটক রিলিফ কমিটির সভায় প্রথম দিকে একজন মাত্র স্থানীয় লোককে আহ্বান করা হত। অন্য সকলে ইউরোপীয়। কমিশন জানতে চাইল আরও কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোককে রিলিফ কমিটিতে নিলে ভাল হত না কি?

জবাবে রেভেনশা বললেন তাঁর মতে এ প্রদেশের লোক অলস ও নিরুৎসাহী।

রেভেনশার জবাববন্দী নিয়ে শহরে অনেক আলোচনা হল। কমিশন তাঁকে যেভাবে জেরা করল লোকে তার প্রশংসা করল। এরকম গুরুত্বপূর্ণ চিত্তাকর্ষক খবর ছাপাতে না পেরে গৌরীশংকর ক্ষুব্ধ হলেন। রোজ সন্ধ্যায় বিচিত্রানন্দের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন। যেদিন রেভেনশার সাক্ষ্য শেষ হল সেদিন রাত্রে বিচিত্রানন্দ মন্তব্য করলেন, 'সাহেব এখনও ধরে বসে আছেন যে প্রদেশে প্রচুর শস্য মজুদ ছিল।'

গৌরীশংকর জানতেন যে সেরিস্তাদার বিচিত্রানন্দের সঙ্গে রেভেনশার সম্পর্ক ভাল। সোজা জবাব না দিয়ে গৌরীশংকর বললেন দেশে শস্য থাকলেও নিঃসম্বলের কি লাভ? চাঁদে অমৃত আছে বলে লোকের ধারণা, কিন্তু সেজন্য লোক অমর হয়নি।

ওড়িশায় খাদ্যান্নের অভাব শেষ হয়েছে। নতুন ফসল উঠেছে। তাছাড়া চার লক্ষ মণ চাল আমদানি হয়েছে।

কলকাতা : মার্চ ১৮৬৭

কটকের কাজ শেষ করে কমিশনের সদস্যরা ১৬ই জানুয়ারি বাতিঘর থেকে জাহাজযোগে বালেশ্বর চলে গেলেন। বালেশ্বরের কাজ শেষ হতে পাঁচ দিন লাগল। সরকারী বেসরকারী অনেকের সাক্ষ্য নেওয়া হল। এখান থেকে জলেশ্বর এবং মেদিনীপুরের রাস্তা ধরে জানুয়ারি মাসের শেষে কমিশন কলকাতা ফিরে এল। ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় যাদের সাক্ষ্য নেওয়া হল বোর্ডের সভ্য, পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল

পূর্ত বিভাগের সচিব ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষ রিলিফের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন কয়েকজনের সাক্ষ্য নেওয়া হল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনক্রিপ, দিগম্বর মিত্র, সাইকস্ প্রমুখ।

দুর্ভিক্ষের সময় নিজের কার্যকলাপ বর্ণনা করে এক দীর্ঘ লিখিত বয়ান দিলেন ছোট লাট। বিবরণী পেয়ে কমিশন সন্তুষ্ট হল না। অনেকেই অভিযোগ করেছিল ওড়িশায় সময়মত সাহায্য না পৌঁছাবার জন্য রেভেনশার মতো তিনিও দায়ী। সুতরাং তাঁকে ডাকা হল মৌখিক সাক্ষ্য দিতে। অবস্থা একটু অস্বস্তিকর, কারণ কমিশনের অন্যতম সদস্য ডাম্বিয়ার কিছুদিন আগে তাঁর অধঃস্তন কর্মচারী ছিলেন।

যাই হোক ১৫ই মার্চ অনারেবল সার সেসিল বীডনের জবানবন্দী নেওয়া হল। কিছু মুখ্য প্রশ্নোত্তর এরকম :

প্রশ্ন : ইয়োর অনার জানেন যে নভেম্বরের শেষভাগে কটকের কমিশনার দেশীয় রাজ্যগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। আপনার মতে প্রদেশে যখন দুর্ভিক্ষর মোকাবিলা করার জন্য তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল তখন রেভেনশার দেশীয় রাজ্য পরিদর্শনে যাওয়া কি ঠিক ছিল যেখানে তাঁর কোনও বিশেষ কাজ ছিল না?

উত্তর : রাজন্যশাসিত অঞ্চল পরিদর্শন কটক কমিশনারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ১৪ই ডিসেম্বর কমিশনার আমাকে জানিয়েছিল যে দুর্ভিক্ষের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম, আজও আছি।

প্রশ্ন : ময়ূরভঞ্জ ব্যতীত অন্য কোনও সমস্যার কথা আপনার মনে পড়ছে কি যার জন্য কমিশনারের সেই সময়ে দেশীয় রাজ্যে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল?

উত্তর : না।

পুরীতে চালের অভাবের বিষয়ে :

প্রশ্ন : আমরা দেখেছি জানুয়ারী ফেব্রুয়ারি মাসে পুরীতে চালের অভাব সংক্রান্ত অনেক চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়েছিল, বিশেষ করে চালের অভাবে পি.ডব্লু.ডি.র কাজে বাধা হচ্ছিল। সে বিষয়ে ১লা ফেব্রুয়ারি বোর্ড নির্দেশ দিল যে পুরীতে চাল আমদানি করা হবে না। আপনার মনে আছে কি চালের অভাবে পুরী জেলায় ত্রাণের কাজ বন্ধ করতে হয়েছিল? চাল আমদানি বিষয়ে আপনার দৃষ্টিগোচর করা হয়েছিল কি?

উত্তর : বোর্ড হয়তো এই কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে নভেম্বর মাসে মনক্রিপের চিঠির জবাবে সরকার ওড়িশার চাল আমদানি না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কথা প্রসঙ্গে কোনও বোর্ড সদস্যকে হয়তো বলেছিলাম যে সরকার জলপথে ওড়িশাতে চাল পাঠাতে চায় না। পি.ডব্লু.ডি. যখন চাল কিনতে চাইল আমি মানা করলাম কারণ এ কাজ সিভিল অফিসারের এক্তিয়ারভুক্ত। আমি বলিনি যে চালের আকারে মজুরী দেওয়া হবে না। বলেছিলাম সিভিল অফিসাররা চাল জুগিয়ে দেবে।

সুতরাং বোর্ডের আদেশ আমার নির্দেশ অনুসারে হয়নি। বরং তার বিপরীত। বোর্ড কি চিঠি লিখেছিল তা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। দেখে থাকলেও বিষয়টি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেয়ে থাকবে। তা নাহলে আমি বোর্ডের আদেশ রদ করে দিতাম।

প্রশ্ন : ইয়োর অনার বলতে চান কি যে সিভিল অফিসাররা চাল জুগিয়ে দিতে অসমর্থ হয়েছিল এ কথা আপনাকে জানানো হয়নি?

উত্তর : আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে এ বিষয়ে সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি পুরীতে মাত্র একদিন ছিলেন?

উত্তর : হাঁ, যেদিন সকালে পুরী গেলাম তার পরের দিন সেখান থেকে চলে আসি।

প্রশ্ন : বার্লো যা জানতেন এবং তিনি যা আশঙ্কা করছিলেন আপনাকে বলবার সুযোগ পেয়েছিলেন?

উত্তর : ভালভাবে। আমি সবসময় তার সঙ্গে কথা বলতাম তাছাড়া তিনি একটি বিশেষ সাক্ষাৎ করেছিলেন আমার সঙ্গে। তাঁর বাড়িতে আমি অতিথি ছিলাম।

প্রশ্ন : তখন কি জেলার বিষয়ে বার্লোর মত নিতান্ত নিরাশাজনক ছিল?

উত্তর : না, একেবারেই নয়।

প্রশ্ন : অনাহারে লোক মরছে এ কথা তিনি আপনাকে বলেননি?

উত্তর : আমি যাবার আগে এরকম ঘটনার কথা শুনেছিলাম; কিন্তু বার্লো আমাকে বললেন গোপ ছাড়া অন্যত্র অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

পুরীতে লোকে তাকে শাকপাতা দেখাতে চেয়েছিল, সে প্রসঙ্গে :

প্রশ্ন : কয়েকজন সাক্ষী বলেছে, লোকেরা আপনাকে দেখাবার জন্য যে শাকপাতা তারা খাচ্ছে নিয়ে এসেছিল এবং ককবার্ণ সেগুলি আপনাকে দেখিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আপনার কিছু বক্তব্য আছে?

উত্তর : সম্প্রতি কে যেন এ কথা বলল। এটুকু আমার মনে আছে যে পুরী শহর ঘুরে যখন আমরা কাছারীতে এলাম তখন কিছু লোক ঝুড়িতে শাকপাতা নিয়ে রাস্তার পাশে বসেছিল। তারা ওড়িয়াতে কি বলছিল বুঝতে পারলাম না। ককবার্ণকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন লোকে এ সব শাকপাতা খাচ্ছে। তিনি সেগুলি আমাকে দেখালেন। কিন্তু তিনি বলেননি যে অন্নাভাবের জন্য লোকে এসব খাচ্ছে। আমি ভাবলাম বছরের এ সময় লোকে সাধারণত এগুলি খায়। যতদূর মনে আছে এগুলি কচু জাতীয় মূল ছিল।

প্রশ্ন : কয়েকজন নেটিভ অফিসার কমিশনকে বলেছেন যে অনাহারে অনেক লোক মরছে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে এ কথা আপনাকে জানিয়েছিলেন। এ কথা সত্য?

উত্তর : অনেক স্থানীয় লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। তারা অবশ্য বলেছিল যে অনাহারে লোক মরছে, কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে সরকার যে সকল

পদক্ষেপ নিয়েছিল তাতে তারা সন্তুষ্ট ছিল। তাদের দাবী ছিল চালের দর বেঁধে দেওয়া হোক এবং চালের রপ্তানী বন্ধ করা হোক।

পুরীর সমুদ্রতটে ছ হাজার বস্তা চাল পড়ে থাকা এবং তাঁর ওড়িশা যাওয়ার উদ্দেশ্য বিষয়ে :

প্রশ্ন : 'ফিলানিম' জাহাজের চাল পুরীর সমুদ্রতটে পড়ে আছে এবং কোম্পানির এজেন্টরা এ চাল বেচতে রাজী নয় এ কথা কেউ বলেনি আপনাকে?

উত্তর : এ কথা শুনেছিলাম।

প্রশ্ন : আপনার ওড়িশা যাওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর : যদি কোনও বিশেষ কারণ থেকে থাকে তবে তা দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত। এর আগে কখনও কটকে যাইনি। সুতরাং সেখানে গিয়ে অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং ইরিগেশন কোম্পানির কাজ দেখতে গিয়েছিলাম।

এরপরে রেভেনশার রিপোর্টে ওড়িশায় প্রচুর চাল আছে বলে যে উল্লেখ ছিল তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হল। কমিশন জানতে চাইল কেন তিনি রেভেনশার রিপোর্টের উপর ভরসা করলেন যখন অন্য অনেক সূত্রে খাদ্যাভাবের খবর পাচ্ছিলেন।

প্রশ্ন : ইয়োর অনার ওড়িশা যাবার আগে অনেক অফিসার ওড়িশাতে চাল আমদানি করার পরামর্শ দিয়েছিল। বলতে পারেন তারা আপনার সামনে মুখ খুলল না কেন?

উত্তর : আমি কোনও মন্তব্য করব না। মাত্র এটুকু বলতে পারি যে ওড়িশায় অবস্থানকালে এ কথা কেউ আমাকে বলেনি।

প্রশ্ন : মিষ্টার রেভেনশা বলেছিলেন কি যদিও তাঁর অধীনস্থ অনেক অফিসার তাঁকে জানিয়েছিলেন যে ওড়িশায় চাল নেই এবং তিনি তাদের সঙ্গে একমত নন?

উত্তর : না, এ কথা তিনি বলেননি। কটকে যখন ছিলাম তখন কারো এমন দৃঢ় মত ছিল বলে আমার মনে হয়নি।

প্রশ্ন : তখন আপনি ভাবতেন কি যে রেভেনশার মত নির্ভরযোগ্য? অথবা জেলাগুলো ভাল করে ঘুরে না দেখে এরকম মত ব্যক্ত করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক?

উত্তর : মি. রেভেনশা বুদ্ধিমান স্থিতধী ব্যক্তি। তাঁর মত উপেক্ষা করার কথা মনে হয়নি।

প্রশ্ন : মি. রেভেনশা কি কানপাতলা লোক যিনি যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন?

উত্তর : আদৌ নয়।

প্রশ্ন : ইয়োর অনার মনে করতে পারেন কি দার্জিলিঙ যাবার আগে বালেশ্বরের ভীষণ আকালের বিষয়ে কেউ আপনাকে জানিয়েছিল কি না?

উত্তর : কমিশনের কাছে যে নথীপত্র আছে তার বহির্ভূত কোনও তথ্য কলকাতা ছাড়ার আগে আমার কাছে ছিল না।

প্রশ্ন : ২০শে এপ্রিল থেকে মে ২০-২১ পর্যন্ত কমিশনারের ময়ূরভঞ্জে থাকার প্রয়োজন ছিল?

উত্তর : ময়ূরভঞ্জে শান্তিশৃঙ্খলা বহাল করতে তাঁর যাওয়া বিশেষ আবশ্যক ছিল।

প্রশ্ন : আমরা দেখেছি দুর্ভিক্ষ যখন সংহার মূর্তি ধরেছে এবং অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে তখনও সরকারী পত্রালাপে অনেক সময় লাগছিল; যেমন বালেশ্বরের এস.পি.র ২৭শে মার্চের চিঠি সরকার পেল ১১ই মে। ঠিক সেইরকম পুরীর কালেক্টর তাঁর ১০ই মের পত্রে অবস্থার গম্ভীরতা বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু সরকার সেটি পেল মে মাসের শেষে।

উত্তর : চিঠিগুলি দ্রুত সরকারকে পাঠানো উচিত ছিল। কিন্তু কমিশনার ময়ূরভঞ্জের গোলমালে ব্যস্ত থাকায় তা আর সম্ভব হল না।

ছোট লাটের জবানবন্দীতে পুরো দিন লেগে গেল। তারপর আরও পাঁচজনের সাক্ষ্য নিয়ে কমিশন এ পর্যায়ের কাজ শেষ করল। সর্বমোট একশ ত্রিশ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুজন বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষ্য নেওয়া সম্ভব হল না। ককবার্ণ ছোট লাটের সঙ্গে সফরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তার কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হল। অন্যজন তৎকালীন কালেক্টর বার্লো। তিনি ছুটি নিয়ে বিলাতে গেছেন।

কটক : এপ্রিল ১৮৬৭

৬ই এপ্রিল কমিশন রিপোর্ট পেশ করল। তারা আরোপ করল সরকারী উচ্চপদাধিকারী কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। ভারত সরকার কিছু টিপ্পনিসহ রিপোর্টটি বিলাত পাঠিয়ে দিল। কয়েকটি টিপ্পনী এরকম : আপাতকালীন পরিস্থিতিতে কমিশনারের পদে কাজ করার যোগ্যতা রেভেনশার নেই; বোর্ড অফ্ রেভেনিউ পরিস্থিতি সামলাতে অপারগ হয়েছে এবং স্যার সেসিল বীডন যেভাবে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তা সন্তোষজনক নয়।

রিপোর্টটির এবং তার সংলগ্ন মন্তব্যের নকল সকল সংশ্লিষ্ট অফিসারকে দেওয়া হল। এটি পড়ে রেভেনশা বিমর্ষ হলেন। গত দেড় বছর ওড়িশায় কাটিয়ে তাঁর জায়গাটি ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে। এখন তিনি বদলীর জন্য উন্মুখ নন। তাঁর স্ত্রীও কটক পছন্দ করেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় যে ভুল ত্রুটি করেছেন তার জন্য বিবেকের দংশন বোধ করছিলেন রেভেনশা। কি কি ভাল কাজ করবেন এখন তিনি তাই ভাবছেন। রিপোর্টে তাঁর কমিশনার হবার উপযুক্ততা নিয়ে যে মন্তব্য আছে তাতে

তিনি ততটা বিচলিত হলেন যতটা লজ্জা পেলেন এই ভেবে যে তিনি ওড়িয়াদের সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

ওড়িয়াদের চরিত্র-বিচার তাঁর কাজ নয়। তবুও এ বিষয়ে সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল একটি বিশেষ কারণে। অনেকের ধারণা আকালের সময় দুর্গতির এক কারণ ওড়িয়াদের চরিত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা হল যে কাজের সুযোগ পেয়েও অনেকে কাজ না করে মৃত্যু স্বীকার করে নিল। কমিশনের মত এ ধারণা অমূলক. যারা কাজ করতে অভ্যস্ত তারা কাছাকাছি কাজ পেলে কাজে বিমুখ হত না। এমন অবশ্য হতে পারে যে কাজের খোঁজে অনেকে বেশীদূরে যেতে চায়নি। কিম্বা যারা জীবনে কায়িক শ্রম করেনি তার মজুরী করতে আসেনি। কমিশন মন্তব্য করেছে যে ইংল্যাণ্ডেও যারা কায়িক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত তারা অসহনীয় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীপরিবারকে বাড়ি থেকে দূরে রাস্তার পাশে থেকে মাটির কাজ করতে পাঠাবে না।

সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে রেভেনশা মন্তব্য করেছিলেন ওড়িয়ারা অলস ও নিরুৎসাহী। এখন সেটি ছাপার অক্ষরে পড়ে তিনি মরমে মরে গেলেন। তাঁর সমর্থনে আর কেউ কিছু বলেছে কি না তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটি তালিকা প্রস্তুত করলেন।

কেন্দ্রপাড়ার মুনসিফ বাবু শিবপ্রসাদ সিংহের মতে ওড়িয়ারা জাতি ও কুলমর্যাদার এত মাহাত্ম্য দেয় যে অনাহারে বেহাল না হওয়া পর্যন্ত অন্নসত্রে আসে না। যখন আসে তখন অন্তিম দশা। কটকের রেভারেণ্ড ডব্লু. মিলার বলেছেন যে ওড়িয়া চাষী মোটামুটি পরিশ্রম করে কিন্তু তারা মিতব্যয়ী নয়। কটকের কালেক্টর কর্ণেলের মতে ওড়িয়া চাষীকুল বাঙালিদের থেকে অধিক কুসংস্কারগ্রস্ত এবং আলস্যপরায়ণ। ভদ্রকের এম.ডি. ও টি. এস শর্টের মতে ওড়িয়া চাষী বেপরোয়া খরচ করে এবং তারা শ্রমকাতর। কটকের ডেপুটী কালেক্টর অবশ্য বলেছেন ওড়িয়া চাষী বাঙালি চাষীদের থেকে অধিক পরিশ্রমী।

কয়েকজন সাক্ষী ওড়িয়াদের স্পষ্ট ভাষায় নিকৃষ্ট বলেছিল। এদের মত এরকম : বালেশ্বরের কালেক্টর মসপ্রাটের মতে ভারতের অন্য নেটিভদের তুলনায় ওড়িয়াদের চরিত্র নিকৃষ্ট। বালেশ্বরের রিলিফ এসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর রাম্পিনীও অনুরূপ মত শোষণ করেন। বালেশ্বরের রেভারেণ্ড এ. মিলারের মতে ওড়িয়ারা একটি অধম জাতি, ঠগ এবং অলস। বালেশ্বরের অন্য পাদ্রী রেভারেণ্ড জে. ফিলিপ্স মনে করেন ওড়িয়ারা দুরাচারী এবং খল, তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুস্কিল। কটকের সুপারিণ্টেডিং ইঞ্জিনিয়ার এম. লিওনার্ড তাঁর বয়ানে বলেছিলেন ওড়িয়ারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, ভিক্ষা করবে কিন্তু পরিশ্রম করে রোজগার করবে না। জাতিভ্রষ্ট হবার থেকে মৃত্যু শ্রেয়ভাবে, তারা অন্নসত্রে খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে না। কলকাতার জমিদার বাবু দিগম্বর মিত্রের মতে ওড়িয়ারা আলস্যপরায়ণ এবং জাতির বিষয়ে বাঙালিদের চেয়ে রক্ষণপন্থী।

এমন সাক্ষীও অনেকে ছিলেন যাঁরা বাঙালিদের তুলনায় ওড়িয়াদের হেয় মনে

করতেন না। বালেশ্বরের জমিদার রহমতুল্লা খানের মতে ওড়িয়ারা অন্যদের থেকে নিকৃষ্ট কারণ এরা দরিদ্র। কিন্তু তারা বাঙালিদের অপেক্ষা ঠগ নয়। মেদিনীপুরের পাদ্রী ও. আর. ব্যাচিলর ভাবেন বাঙালিরা অধিক ধোকাবাজ এবং ওড়িয়ারা সরল, যা বোঝে তাই বলে। বালেশ্বরের মাষ্টার এটেণ্ড্যান্ট এ. বণ্ডের মতে বাঙালিদের তুলনায় ওড়িয়ারা খারাপ নয় বেশী অলস ও ধূর্তও নয়।

তালিকাটি তৈরি হ'লে রেভেনশা একটু স্বস্তি বোধ করলেন। এমন অনেক লোক আছে ওড়িয়াদের সম্বন্ধে যাদের মত তার থেকেও খারাপ। এ বিষয়ে অন্তিম রায় দিয়েছে কমিশন : ওড়িয়ারা বাঙালিদের মত চালাক চতুর এবং উদ্যমী নয়; শিক্ষা দীক্ষার অভাবে বেশির ভাগই নির্বোধ; তবে তারা কম পরিশ্রমী নয়, তাদের বুদ্ধি আছে, ঠকায় না এবং অনেকদিক দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য। এর একটি সুন্দর উদাহরণ সাহেবদের বাংলোতে কার্যরত ভৃত্যেরা।

রেভেনশা ভাবলেন তিনি কটকের সাহেবদের মত জানতে চেয়ে চিঠি লিখবেন, বোঝা যাবে ওড়িয়াদের প্রতি তাদের মনোভাব সত্যই প্রতিকূল কি না। এক দুজনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও বললেন। সঙ্গে সঙ্গে এ খবর সব সাহেব জেনে গেল। রেভেনশাকে সকলে পছন্দ করে, আবার তাঁকে নিয়ে হাসি ঠাট্টাও করে, কারণ তিনি তীক্ষ্নধী নন, সহজে লোককে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর ব্যবহার অমায়িক, এখন সাহেবদের মধ্যে কানাকানি হল যে স্বয়ং রেভেনশা ওড়িয়াদের একটি খাঁটি নিদর্শন।

কলকাতা : সেপ্টেম্বর ১৮৬৭

বড়লাট লর্ড লরেন্স দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট ব্রিটিশ সরকারকে পাঠানোর সময় সেসিল বীডনের সম্পর্কে মন্তব্য করলেন : বঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চ কর্তা দুর্ভিক্ষের অন্তিমদিন পর্যন্ত পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারেননি। এই মনোভাবের জন্য তিনি সকল সতর্কবাণী উপেক্ষা করলেন যদিও সেগুলিতে কোনও অস্পষ্টতা ছিল না। অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ নেবার সুযোগ তিনি হারিয়েছিলেন।

ওড়িশার দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে লর্ড লরেন্স নিজেও অনুতপ্ত ছিলেন। কারণ সময়মত তিনি ছোট লাটকে নির্দেশ দেননি যে তিনি এ বিষয়ে আরও সক্রিয় হন। তাঁর কাউন্সিলের অন্য সদস্যরাও অবশ্য ছোট লাটের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। লর্ড লরেন্সের কর্মময় জীবনে ওড়িশার দুর্ভিক্ষ সব থেকে দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ।

কমিশনের রিপোর্ট পেয়েই বীডন আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক দীর্ঘ নোট বড় লাটকে পাঠিয়ে দিলেন। তা সত্ত্বেও বড় লাট তাঁর সম্পর্কে এমন কটু মন্তব্য করলে তিনি পুনরায় এক দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র পাঠালেন। লিখলেন যে বড়লাটের শিমলা যাবার

তাড়া ছিল তাই মন্তব্য করার আগে কমিশনের রিপোর্টটি গভীরভাবে অনুধাবন করার সময় পাননি। লর্ড লরেন্স লিখেছিলেন বীডন পুরীতে সর্বত্র অনাহারক্লিষ্ট লোকদের দেখেছিলেন। তখনই তাঁর উচিত ছিল পরিস্থিতির অনুসন্ধান করা। সেই প্রসঙ্গে বীডন লিখলেন যে ক্ষুৎপীড়িত জনগণের কথা বড় লাট উল্লেখ করেছেন তাদের অস্তিত্ব শুধু মাত্র তাঁর কল্পনায় ছিল। আরও লিখলেন যে কমিশনের সদস্যরা অফিসারদের কাঠগড়ার আসামী ভেবে এমন সব প্রশ্ন করেছিলেন যার জবাব তাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল হবে। এবং এ সিদ্ধান্ত আগেই করে ফেলেছিলেন তাঁরা।

প্রতিবাদপত্র পাঠানো হল ৩০শে এপ্রিল। কিছুদিন পরে তার পাঁচ বছরের কার্যকাল শেষ হলে বীডন স্বদেশে ফিরে গেলেন। ২৫শে জুলাই সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট তাঁর রায় দিলেন। তিনি ছোট লাট, বোর্ড, কমিশনারকে ওড়িশার দুভিক্ষে লোকক্ষয়ের জন্য দায়ী করলেন।

ওড়িশার দুর্ভিক্ষ নিয়ে হাউজ অফ্ কমন্সে বিতর্ক হল ২রা আগষ্ট। ছোট লাটকে দোষী এবং বড় লাট ও ভারত সরকারকে দোষমুক্ত করে একটি প্রস্তাব রাখা হয়। একটি সংশোধনী প্রস্তাবে লর্ড লরেন্স এবং ভারত সরকারকেও দোষী বলা হল। তর্কের সময় বেশ উত্তপ্ততার সৃষ্টি হল কিন্তু কেউ মত বদলাতে রাজী হল না। শেষ পর্যন্ত নর্থকোট আপসের রাস্তা ধরলেন। নিজের বিবৃতিতে বললেন :

ওড়িশার দুর্ভিক্ষ চিরদিনের জন্য আমাদের বিফলতার সাক্ষ্য বহন করবে। আমাদের দেশবাসী, আমাদের সরকার এবং যে কর্মচারীদের নিয়ে আমরা গর্ব করেছি তাদের সফলের উপর এক কলঙ্কের ছাপ রেখে গেল এই সর্বনাশী দুর্ভিক্ষ।

এই স্বীকারোক্তির পরে সংশোধন প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হল; যদিও প্রসঙ্গের এখানেই ইতি হল না। সরকার থেকে নিন্দাবাদ পেয়ে বোর্ড দুশ এগার অনুচ্ছেদের এক সুদীর্ঘ স্পষ্টীকরণ পাঠাল যাতে নিজেদের দোষ স্খালন করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য ভারত সরকার এ প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করল।

কটক : ডিসেম্বর ১৮৬৭

দুর্ভিক্ষ কমিটির রিপোর্ট পেয়ে সরকার এত তৎপর হয়ে উঠল যে ওড়িশায় চাল আমদানি অব্যাহত থাকল যদিও তার প্রয়োজন শেষ হয়েছিল। ইতিমধ্যে এগার লক্ষ মণ চাল আমদানি হয়েছে যার থেকে বছরের শেষ নাগাদ খরচ হল মাত্র পাঁচ লক্ষ মণ। এ বছর ফসল ভাল হয়েছে। ফলে চালের দাম কমে দাঁড়াল টাকায় পঞ্চাশ সের। আমদানির চালের দাম আরও কম, তবুও তার চাহিদা নেই। সে চাল গুদামে পড়ে রইল।

ওড়িশার প্রতি এখন সকলে সজাগ। রাস্তাঘাট শিক্ষা বাণিজ্য—সবদিকে নজর দিল সরকার। সর্বক্ষেত্রে প্রগতির দিকে সরকারের উদ্যম দেখে দীপিকা মন্তব্য করল, এতদিনের অবহেলা সুদ সমেত পরিশোধ করছে সরকার।

অন্নসত্রের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। একটি একটি করে সেগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল সরকার। বর্ষশেষে মাত্র আঠাশ জন কাঙাল অন্নসত্রে রয়ে গেল। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতম পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে চাল দেওয়া হত। আগষ্ট মাসে প্রায় ষাট হাজার লোক মাগনা চাল পেত। এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে দু হাজার।

ওড়িশায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণ দিয়েছিল। এখন অবশ্য দুর্ভিক্ষের কোনও লক্ষণ নেই। রাস্তায় ক্বচিৎ কাঙাল দেখা যায়। এদের না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না এই কিছুদিন আগে আকালের অন্ত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রা এখন স্বাভাবিক। মাত্র দুটি সমস্যার সমাধান বাকি রয়ে গেছে। তা হল, যারা অন্নসত্রে খেয়েছে তাদের কি করে জাতিতে নেওয়া হবে এবং অনাথ বাচ্চাদের নিয়ে কী করা যায়।

প্রায় দেড় হাজার বালক বালিকার পুনর্বাসন করতে হবে। আকালের সময় অনেক পাদ্রী অনাথ বাচ্চাদের দেখাশুনা করেছিল। সরকার ঘোষণা করল, যারা এদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে তাদের মাসে ষোল টাকা করে অনুদান দেবে প্রতি বাচ্চার জন্য। তাদের বয়স ষোল বছর হলে মাসোহারা বন্ধ করা হবে। অনেকে ভাবল সরকার এদের খৃষ্টান করার চক্রান্ত করছে। কিন্তু এও সত্য যে আর্থিক সহায়তা না পেয়ে কেউ এদের ভার নিতে রাজী নয়। কটকের বেশ্যারা দশজন অনাথ বালিকাকে আশ্রয় দিয়েছিল, এখন তাদের বেশ্যাবৃত্তিতে লাগাবার প্রস্তুতি চলল।

কাঙালদের জাতে উঠাবার প্রসঙ্গ আলোচনা করার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে বিচিত্রানন্দ এক সভা ডাকলেন প্রিণ্টিং প্রেসের অফিসে। কোম্পানির অবস্থা এখন সচ্ছল। নিজেদের অফিসের জন্য কাছারীর কাছে পাল্কিখানার পাশে কোম্পানি জমি কিনেছে। দীপিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকাটি সারা ওড়িশায় পরিচিত হয়েছে। এক বছর আগে কোম্পানি একখানি ওড়িয়া পঞ্জিকা এবং উপেন্দ্রভঞ্জের 'প্রেমসুধানিধি' টীকাসহ লিথো করে প্রকাশ করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় কলকাতা থেকে ওড়িয়া অক্ষর এনে প্রেসটিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে। লিথো ছাপা বন্ধ হয়েছে। এখন অক্ষর ছাপা হয়।

বিচিত্রানন্দের আহূত সভায় কটকের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছাড়া মফঃস্বল থেকে জমিদারগণ এবং কটক, পুরী ও বালেশ্বর থেকে পণ্ডিতরা যোগ দিলেন। কাঙালরা জাতিচ্যুত হয়েছে মনে করে কেউ তাদের ছোঁয়া খায় না। গ্রামে তারা অন্যদের থেকে দূরে বাস করে। নানা পণ্ডিতের নানা মত। কটক ও বাংলার পণ্ডিদের মত এদের জাতিতে পুনঃপ্রবেশ সম্ভব। কটকের পণ্ডিতদের মন্তব্য, প্রায়শ্চিত্ত করলেই এমনটি হতে পারে।

বাংলার পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কিছু বললেন না। পুরীর পণ্ডিতরা যারা জেলে গিয়েছিল তাদের কি হবে সে প্রশ্ন তুললেন। তাঁদের মতে এদের জাতে নেওয়া সম্ভব নয়। সভায় পরাশর সংহিতার এই শ্লোকটির উদ্ধৃত হল :

দেশভঙ্গে প্রবাসে চ ব্যাদিষু ব্যসনেস্চপি
রক্ষে দেব স্বদে তাদি পশ্চাদ্ধর্মং সমাচরেৎ
আপৎকালে তু সম্প্রপ্তে শৌচাচারং ন চিন্তয়েৎ
স্বয়ং সমুদ্ধরেৎ পশ্চাৎ সুস্থোদ্ধর্মং সমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ দেশোপদ্রব, প্রবাস, রোগ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি মহাবিপত্তির সময় স্বধর্ম ত্যাগপূর্বক আত্মরক্ষা করণীয়; পরে সুস্থ হয়ে স্বধর্ম ও স্ববৃত্তি আচরণ করবে।

এ সভায় পণ্ডিতদের মতগুলি সংকলিত করে বিচিত্রানন্দ একখানি পুস্তিকা লিখলেন এবং ছাপিয়ে রাজা ও জমিদারদের পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন যেন এটিকে হাটে বাজারে বিতরণের ব্যবস্থা করেন।



ছয়

কেন্দুঝর : জানুয়ারি ১৮৬৮

দুর্ভিক্ষের ঝামেলা মিটতে না মিটতে কেন্দুঝরে নতুন সমস্যা দেখা দিল। এই দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজদের সুসম্পর্ক। সিপাই বিদ্রোহের সময় কেন্দুঝরের রাজা গদাধর ভঞ্জ ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন। কটকের দরবারে এজন্য তার প্রশংসা করেছিলেন। ১৮৬১ সনে তিনি মারা যান। তাঁর পাটরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া একজন রক্ষিতা ছিল যার নাম ফুলবাই। বিষ্ণুপ্রিয়া নিঃসন্তান, রক্ষিতার দুই পুত্র ধনুর্জয় ও চন্দ্রশেখর। গদাধরের মৃত্যুর পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি ক্রমে ধনুর্জয় রাজা হল। সে নাবালক এবং কমিশনারের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করছিল। সেই যোগ দিয়েছিল কটকের দরবারে। রাজকার্য পরিচালনা করছিল একজন দিওয়ান ও একজন তহশীলদার।

এই সময় ময়ূরভঞ্জের রাজা দাবী করলেন মৃত্যুর পূর্বে গদাধর তাঁর নাতি বৃন্দাবনকে পোষ্য নিয়েছিলেন, সুতরাং রাজগদিতে তার ন্যায্য অধিকার। পোষ্য নেবার কথা অসত্য কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া এই দাবী সমর্থন করলেন। তার মতে ধনুর্জয়ের মা রক্ষিতা নয়, সাধারণ দাসী ছিল। এ দাবী নিয়ে মামলা হল; কমিশনার, হাইকোর্ট হয়ে বিষয়টি এখন প্রিভি কাউন্সিলের বিচারাধীন।

১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বরের সুনিয়ার দিন ধনুর্জয় সাবালক হল। ইতিপূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া আর্জি জানিয়ে ছিলেন যে প্রিভি কাউন্সিলের রায় না আসা পর্যন্ত ধনুর্জয়ের রাজ্যাভিষেক স্থগিত রাখা হোক। তা যদি সম্ভব না হয় তবে ধনুর্জয় মুচলেকা দিক যে সে প্রিভি কাউন্সিলের রায় মেনে নেবে।

কেন্দুঝরের পশ্চিমভাগে ভুঁইয়া ও জুয়াঙ্গরা বাস করে। ভুঁইয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ; তাদের দাবী সিংহাসনে কে বসবে তা তারা স্থির করবে। সুনিয়ার দিনে সাত আটশ আদিবাসী কটকে এসে ধনুর্জয়কে সমর্থন করল এবং কমিশনার কটকেই তাকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া কেন্দুঝরে ছিলেন। এ খবর পেয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন যে এ ব্যবস্থা তিনি মানবেন না। তিনি আদিবাসীদের সঙ্গে মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন। ভুঁইয়া সরদার রত্না নায়েক বৃন্দাবনকে সমর্থন করল এবং রাণীর পক্ষ নিল। রাণী হুমকি দিলেন ধনুর্জয় রাজা হলে তিনি কেন্দুঝর ছেড়ে চলে যাবেন। সত্যই এমন হলে আদিবাসীরা বিদ্রোহ করতে পারে।

রেভেনশা ভাবলেন কি ভাবে ধনুর্জয়কে কেন্দুঝরে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি স্থির করলেন একজন আমলা ও আদিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ধনুর্জয় আনন্দপুর যাবে

এবং কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করবে। তদনুসারে ধনুর্জয় যাত্রা করল। সঙ্গে রাণীকে দেবার জন্য আমলাকে এক খানি পত্র দিলেন রেভেনশা। তিনি লিখলেন যে ধনুর্জয় চায় যে রাণী কেন্দুঝরে থাকুন। কিন্তু তিনি যদি কেন্দুঝর থেকে যেতে বদ্ধপরিকর তবে তাঁকে সসম্মানে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে। তিনি যেন এ কথা আদিবাসীদের বুঝিয়ে বলেন।

নভেম্বরে রেভেনশা আনন্দপুর গিয়ে দেখলেন এ অঞ্চলের জনসাধারণ ধনুর্জয়কে স্বীকার করে নিয়েছে। সেখানকার কাজকর্ম নির্বিঘ্নে চলছে। এ খবরও পেলেন যে জঙ্গল অঞ্চলে আদিবাসীরা রাণীকে সমর্থন করছে। তিনি বিচলিত হলেন না, ধনুর্জয়কে নিয়ে কেন্দুঝরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

যাত্রা সহজ হল না। রাস্তার আশেপাশের গ্রামগুলি ভুঁইয়াদের ভয় করে। তারা ক্যাম্পের জন্য রসদ দিল না। অনেকে পালিয়ে গেছে জঙ্গলে। একদল কলকাতা গেছে ছোট লাটের কাছে প্রতিবাদ করতে। ৫ই ডিসেম্বর রেভেনশা কেন্দুঝর পৌঁছে দেখলেন শহর প্রায় পরিত্যক্ত, জনহীন, রাণী চলে যাবার জন্য প্রস্তুত। রেভেনশার অনুরোধে রাণী কেন্দুঝর থেকে গেলেন না কিন্তু রাজবাড়ি ছেড়ে অন্য একটি বাড়িতে চলে গেলেন। জনতার দৃষ্টিতে এর সঙ্গে এবং রাণীর কেন্দুঝরের বাইরে চলে যাবার মধ্যে পার্থক্য নেই।

ভুঁইয়া ও জুয়াঙ্গ সরদারদের সঙ্গে আলোচনা করলেন রেভেনশা। তাদের মানানো সহজ নয়। জুয়াঙ্গরা ধনুর্জয়কে স্বীকার করতে রাজী হলেও বলল তারা ভুঁইয়াদের সঙ্গে কথা বলে পরে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে। রাণী ও তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে অস্বীকার করলেন।

ইতিমধ্যে রাজবাড়িতে ধনুর্জয়ের অভিষেক হয়ে গেল। হোমকুণ্ডের অনতি দূরে বসে উত্তাপ সহ্য করে রেভেনশা সব কিছু তদারক করলেন। পূজা চলছিল, এমন সময় হঠাৎ চাকরাণীদের নিয়ে রাণী সেখানে এলেন এবং ধনুর্জয় ও রেভেনশাকে গালি দিলেন। উত্তেজিত না হয়ে রীতি অনুসারে যা যা করণীয় সব সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন রেভেনশা। গণ্ডগোলের মধ্যে অভিষেক সম্পন্ন হল। জনসাধারণের দৃষ্টিতে অভিষেকে ত্রুটি রয়ে গেল, কারণ প্রথা অনুসারে রাজার অভিষেক করে একজন ভুঁইয়া সরদার। মুষ্টিমেয় জুয়াঙ্গ উপস্থিত ছিল অবশ্য কিন্তু ভুঁইয়া একজনও নয়।

রেভেনশার সঙ্গে মাত্র কুড়িজন সিপাহী আছে। গোলমাল আশঙ্কা করে তিনি আরও কুড়িজন আনালেন। তাদের কেন্দুঝরে ধনুর্জয়ের কাছে রেখে নিজে পাহাড় অঞ্চলে গেলেন। ছোটনাগপুরের কমিশনার কর্ণেল ডালটনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ডালটনকে আদিবাসীরা সম্মান করে। তাঁর সঙ্গে যে আদিবাসীরা ছিল তারা ধনুর্জয়কে মেনে নিল। রেভেনশা তাদের সহায়তা নিলেন। সফর শেষে কেন্দুঝর ফিরে

দেখলেন ভুঁইয়ারা ছাড়া অন্য সকলে ধনুর্জয়কে স্বীকার করে নিয়েছে। রত্না নায়েক রাণীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং তারই প্রভাবে ভুঁইয়ারা ধনুর্জয়কে মানছে না।

জানুয়ারি মাসে রাণী হঠাৎ কেন্দুঝর ছেড়ে সাত মাইল দূরে বসন্তপুর গ্রামে চলে গেলেন। এ ঘটনা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করল। রেভেনশা কটক ফেরার কথা ভাবছিলেন। অগত্যা যাত্রা স্থগিত রাখতে হল।

কটক : মার্চ ১৮৬৮

দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনকে বলা হয়েছিল তারা যেন রিপোর্টের সঙ্গে একটি তালিকাও দেন যাতে দুর্ভিক্ষের সময় জনসাধারণের সাহায্য করেছিল এমন সংস্থান এবং লোকের নাম থাকে। বেসরকারি লোকদের মধ্যে পারিকুদের রাজা, সাইকস্, মনক্রিপ এবং ইরিগেশন কোম্পানির উল্লেখ করল কমিশন আর ওড়িশায় কার্যরত মাত্র সাতজন অফিসার যথা, পুরীর কালেক্টর বার্লো, বালেশ্বরের কালেক্টর মসপ্রাট, ভদ্রকের এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শর্ট, বালেশ্বরের সিভিল সার্জন জ্যাকসন, ধামরার এসিষ্ট্যাণ্ট সার্ভেয়ার হ্যারিস, খুর্দার এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বার্টন এবং কটকের রিলিফ এসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর কর্কউড। এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে আকালের সময় কর্কউড অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। অবস্থার উন্নতি হলে তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। ওড়িশায় প্রথমে তাঁর একদম ভাল লাগেনি কিন্তু কটকে তাঁর মন লেগেছে। রিলিফের কাজ শেষ হলে তাঁকে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট করে কোর্টের কাজ দিলেন রেভেনশা। অচিরে তিনি একজন নিয়মনিষ্ঠ সুবিচারক বলে খ্যাতি পেলেন।

একটি বিষয়ে কর্কউডের কোনও পরিবর্তন হয়নি—তাঁর উগ্র মেজাজ এখনও শান্ত হয়নি। এখনও তিনি মারমুখো ফিরিঙ্গী। মার খেয়ে অনেকে তার নামে ফৌজদারী মামলা করেছিল। হিতৈষী সহকর্মীদের হস্তক্ষেপের জন্য অনেকবার রক্ষা পেয়েছেন। কয়েকবার বাদী আদালতে গরহাজির বলে মামলা খারিজ হয়েছে। ১৮৬৭ সালে একবার তাঁর পাঁচ টাকা জরিমানা হয়েছিল। অপরাধ, তিনি একজনকে পিটিয়েছিলেন।

ইদানীং তাঁর নজর পড়ল দেশীয় কর্মচারীদের পোশাকের দিকে। এটাই আজকাল তাঁর রোষের প্রধান কারণ। পোশাক সম্বন্ধে নিয়ম কানুন নেই। আমলারা পাতলুন বা পাজামা পরে এবং সঙ্গে চোগা চাপকান ও মাথায় পাগড়ি। অফিসে পৌঁছে সকলে পাগড়ি খুলে রেখে দেয়, সাহেবের কাছে যেতে হলে পরে নেয়। যাদের সাহেবদের সামনে যেতে হয় না তারা ক্রমে পাগড়ি ত্যাগ করে ধুতি পরে আসতে লাগল। বিরক্ত হয়ে কর্কউড হুকুম দিলেন তাঁর অফিসের সকলে সর্বদা নির্দিষ্ট পোশাক পরে থাকবে।

জুতো সম্বন্ধে অবশ্য একটি নিয়ম ছিল। সাহেবদের সামনে খালি পায়ে যেতে

হয়। যারা জুতো পরে তারা সাহেবের কামরায় যায় জুতো ছেড়ে। রাজা মহারাজার জন্যও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। এমন পরিস্থিতিও হয়েছে যখন রাজা মহারাজাকেও সাহেবের কামরায় ঢোকার আগে জুতো খুলতে হয়েছে অথচ তাঁদের নিজেদের গোরা কর্মচারীরা দিব্যি জুতো পরে ঢুকেছে। কর্কউড নিয়মটি কঠোরভাবে চালু করলেন। একবার একজন কেরাণী জুতো পায়ে ভিতরে এলে কর্কউড তাকে মারলেন। একজন মোক্তার জুতো পরে এলে কর্কউড তাকে ধাক্কা মেরে বার করে দিলেন।

কর্কউডের দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৬৮ সালে লর্ড লরেন্স আদেশ দিলেন যে নেটিভরা ইউরোপীয় পোশাকের সঙ্গে জুতো পরে অফিসে এবং অন্যত্র সাহেবদের কাছে যেতে পারবে। একটি ব্যতিক্রম; যারা ভারতীয় ফ্যাশনের জুতো পরবে তাদের আগের নিয়মই মানতে হবে।

সাহেব অফিসাররা ক্লাবে বড়লাটের নিন্দা করল। তাদের ধারণা এবার নেটিভরা আর তাদের পরোয়া করবে না। যেসব আমলা তাঁর উপর বিরক্ত ছিল তারা এখন বিলাতী জুতো পরে মস মস করে তাঁর কামরায় আসা যাওয়া শুরু করল। কর্কউড আজকাল আগন্তুকদের পায়ের দিকে নজর দেন আগে মুখের দিকে নয়। দেখেন পাদুকা কিরকম। নেটিভরা সরকারি আদেশ ভাল করে বুঝেছিল এবং প্রায় সকলে একজোড়া করে বিলাতী জুতো কিনেছে।

রাগে কর্কউডের পিত্তি জ্বলে যায় কিন্তু কিছু করার নেই। একজন কেরাণী জুতো পরার অপরাধে মার খেয়েছিল। এবার সে আপাদমস্তক সাহেবী পোশাকে সজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে এল এবং তাঁকে দেখিয়ে দুবার মাটিতে জুতা ঘসল। তাকে বেরিয়ে যেতে বলে কর্কউড ভাবতে বসলেন, এখন কি করা যায়। শেষ পর্যন্ত আদেশ দিলেন বিলাতি জুতো পরলেই যথেষ্ট হবে না, মোজাও পরতে হবে। আদেশের নকল তার আদালতের বিভিন্ন জায়গায় টাঙিয়ে দেওয়া হল।

আগে আমলারা মারাঠী জুতো পরত। সেগুলো সহজে খুলে ফেলা যেত। বিলাতী জুতো পরতে ও খুলতে অনেক ঝামেলা। আগে আমলারা কাজ করার সময় জুতো খুলে রাখত। এখন জুতোর সঙ্গে মোজার পরার আদেশ পেয়ে অনেকে আবার মারাঠা জুতো ধরল। বরং খালি পায়ে সাহেবের কাছে যাবে, এই গরমে মোজার সঙ্গে জুতো পরা অস্বস্তিকর।

কর্কউডের আদেশ দেখে পুরাতন বৈরী গৌরীশংকর নীরব রইলেন না। দীপিকায় লিখলেন, কর্কউডের আদেশ বড়লাটের আদেশের বহির্ভূত বলে আমরা প্রতিবাদ করছি।

খণ্ডপাড়া : আগষ্ট ১৮৬৮

জ্যোতির্বিদগণ গণনা করে বলেছিলেন ১৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার সূর্যগ্রহণ হবে এবং ছ মিনিট সূর্য অদৃশ্য থাকবে। এই বিশেষ ঘটনা অনুধাবন করতে অনেক ইউরোপীয় জ্যোতিষ মাদ্রাজ এলেন।

সূর্যগ্রহণের দিন ওড়িশায় সরকারি ছুটি ঘোষিত হল। হিন্দুদের আশঙ্কা গ্রহণ অনেক অমঙ্গলের পূর্বাভাস। ওড়িশার পক্ষে এই সূর্যগ্রহণের বিশেষ তাৎপর্য আছে। ঠিক কখন গ্রহণ লাগবে তার উপরে নির্ভর করবে ওড়িশায় এখন থেকে বাংলা পঞ্জিকা চলবে কি চলবে না।

১৮৬৬ সালের আগে ওড়িয়া পঞ্জিকা ছিল না—সকলে বাংলা পঞ্জিকা ব্যবহার করত। সে বছর লিথো ছাপা হয়ে প্রথম বাংলা পঞ্জিকা প্রকাশ করল কটক প্রিণ্টিং প্রেস কবিতার আকারে। ফলে মাত্র জ্যোতিষরাই এটি ব্যবহার করল, সাধারণের এটি দুর্বোধ্য। গৌরীশংকর এবং বিচিত্রানন্দ চিন্তা করলেন কী করে সরল ভাষায় একখানি নির্ভুল ওড়িয়া পঞ্জিকা প্রকাশ করা যায়। তাঁরা খণ্ডপাড়ার সামন্ত চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সামন্ত চন্দ্রশেখরকে সকলে পাঠানি সামন্ত বলে জানে। তিনি মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতিষশাস্ত্রী। তিনি রাজপরিবারের লোক। রাজা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। কুষ্ঠি তৈরি করতে অথবা কুষ্ঠি বিচার করতে ওড়িশায় নানা স্থান থেকে লোক আসে তাঁর কাছে।

চন্দ্রশেখরের পরামর্শ নিয়ে এবং তাঁর মত অনুসারে প্রিণ্টিং কোম্পানি একখানি দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশ করল। এটি বাংলা পঞ্জিকার মতো নয়। গৌরীশংকর এটির জনপ্রিয়তা বাড়াবার প্রয়াস করছেন। দীপিকা জানাল যে ওড়িয়া পঞ্জিকাখানি বাংলা পঞ্জিকার অনুবাদ নয়। এবং পরামর্শ দিল যে বাংলা পঞ্জিকার বিধানগুলি ওড়িশায় প্রযোজ্য নয়। লোকের উচিত ওড়িয়া পঞ্জিকা অনুসারে কাজ করা। এ প্রসঙ্গে 'শ্রীনিবাস দীপিকা' গ্রন্থের নিম্নলিখিত নিষেধ উদ্ধৃত হল :

সর্বদেশে সম্মত আছে এই যোগ,
বার নক্ষত্র মিলনে তিথি বার ভোগ।
বঙ্গদেশে মাত্র ইহার প্রচার,
অন্যদেশে ইহার নাহি ব্যবহার।
শ্রীনিবাস গ্রন্থে আছে এরূপ বয়ান,
শান্তচিতে ভেবে দেখ যত সুধীগণ।

প্রিণ্টিং কোম্পানির উৎকল পঞ্জিকা অনুসারে গ্রহণ দিবা ৮টা ২৯ মিনিটে আরম্ভ হবে এবং মোক্ষ ১১টা ৪৬ মিনিটে, অর্থাৎ গ্রাসকাল সাত দণ্ড দশ লিতা। গণনা করেছেন চন্দ্রশেখর। বাংলা পঞ্জিকা এবং কটকের পণ্ডিতদের মতে গ্রহণ লাগবে দিবা

দশ ঘটিকায়। উৎকল পঞ্জিকায় এ মতের উল্লেখ ছিল। কোন গণনা সঠিক জানবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব।

গ্রহণের সময় কাছে আসতে গৌরীশংকর একটি ঘড়ি নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তাঁকে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তি করতে হবে। উৎকল পঞ্জিকা সংকলনের সময় তিনি কটকের জ্যোতিষগণের সাহায্য নিয়েছিলেন। কয়েকটি স্থানে চন্দ্রশেখরের গণনাও গ্রহণ করেছিলেন। সূর্যগ্রহণের সময় দেখে তাঁকে স্থির করতে হবে ভবিষ্যতে তিনি কটকের পণ্ডিতদের মত নেবেন কিম্বা চন্দ্রশেখরের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করবেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে চন্দ্রশেখর খণ্ড পাড়াগড়ের নিকট এক মাঠে বসেছিলেন। সামনে একটি থানায় হলুদ গোলা জল, কাঠের বাক্সের উপরে রাখা একটি ঘড়ি এবং চারদিকে অনেক পত্রলিপি যেগুলি তিনি তন্ময় হয়ে দেখছেন। তাঁকে ঘিরে বাচ্চারা কোলাহল করছে এবং বয়স্করা দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। চন্দ্রশেখর উপহাসের পাত্র তারা বোঝে না রাজপরিবারের মানুষ এমন আজব কাজ কেন করেন। তাঁর কদাকার চেহারার জন্য বিবাহ বেদীতে কন্যাপক্ষ কি রকম ঝামেলা করেছিল সে কথা আজও লোকের কৌতুকের বিষয়।

সকালে আকাশে মেঘ ছিল। আশঙ্কা ছিল গ্রহণ লাগার সময় সূর্য মেঘে ঢাকা থাকবে কিন্তু সময়মত মেঘ সরে গেল। গৌরীশংকর লক্ষ্য করলেন গ্রহণ লাগল আটটা সাতচল্লিশ মিনিটে, দশটা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল এবং তারপরে কমতে কমতে এগারটা বত্রিশ মিনিটে শেষ হল। সময় চন্দ্রশেখরের গণনার সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় মিলল না বটে তাঁর গণনাই প্রকৃত সময়র সব থেকে কাছে। খুশি হয়ে গৌরীশংকর বিচিত্রানন্দের বাড়ি গিয়ে সুখবরটি দিলেন।

এদিকে চন্দ্রশেখরও জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। তাঁর গণনা ও প্রকৃত সময়ের মধ্যে অন্তর কেন হল ভেবে চন্দ্রশেখর স্থির করলেন ঘড়িটিতেই ত্রুটি আছে। ঘড়ির কাঁটা সামান্য ঘুরিয়ে গ্রহণের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। মনটা খুশিতে ভরে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরে পরিকল্পিত তাঁর গ্রন্থ সিদ্ধান্ত দর্পণের কথা মনে পড়ল। দশ বছর হল রচনা শুরু করেছেন। প্রকৃতপক্ষে চোদ্দ বছর বয়সে যখন জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন তখন থেকে এটি কল্পনায় জন্ম নিয়েছিল। আজও সেটি সম্পূর্ণ হয়নি। শুধু মাত্র অনেক গণনাই করতে হয় না, রাতের পর রাত জেগে নভঃমণ্ডলে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে লিপিবদ্ধ করতে অনেক পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন। আজকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে চন্দ্রশেখর স্থির করলেন একবছরে গ্রন্থের রচনা পূর্ণ করবেন।

কেন্দুঝর : আগষ্ট ১৮৬৮

রেভেনশা যখন বুঝতে পারলেন আরও কিছুদিন কেন্দুঝরে না থাকলে চলবে না তখন কটকে খবর পাঠিয়ে স্ত্রীকে আনালেন, ভাবলেন কয়েকটি দিন আরাম করবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। খবর পেলেন যে বসন্তপুরে—যেখানে রাণী অবস্থান করছেন সেখানে আদিবাসীরা তীর ধনুক, বর্বা কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে সমবেত হচ্ছে। রাণীর উস্কানিতে তারা বিদ্রোহের রাস্তা ধরেছে।

পুলিশ নিয়ে বসন্তপুর গেলেন রেভেনশা। আদিবাসীদের তীর ধনুক আর পুলিশের বন্দুক। এই অসম প্রতিযোগিতার দ্রুত সমাপ্তি হল, আদিবাসীদের বন্দী করলেন রেভেনশা। তারা জানাল রাণীকে তারা মাতৃসম জ্ঞান করে শ্রদ্ধা করে। তাদের বিদ্রোহের কারণ রাণীর কাছে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রাণী শপথমুক্ত করে দিলে তারা বিরোধিতা ছাড়তে পারে।

বন্দী আদিবাসীদের নিয়ে রেভেনশা রাণীর কাছে গেলেন। অনুরোধ করলেন তিনি আদিবাসীদের সন্তানের মতো স্নেহ করেন তবে তাদের শপথের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিন। অন্যথা তারা সারা জীবন বন্দী হয়ে থাকবে। মা হয়ে তিনি তাদের দুর্ভোগের কারণ হবেন? রাণী বললেন বিষয়টি ভেবে দেখতে সময় লাগবে। পরের দিন বন্দীদের নিয়ে আবার রাণীর কাছে গেলেন রেভেনশা। এতদিনে ভুঁইয়ারা ধৈর্য হারাতে বসেছে। রাণী পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তাদের শপথ থেকে মুক্ত করে দিলেন। ভুঁইয়ারা খুশি হল, রেভেনশা তাদের ছেড়ে দিলেন। তারা ধনুর্জয়কে স্বীকার করে নিল এবং জঙ্গলে গিয়ে এ খবর অন্যদের দিল। পলাতক রত্না নায়েক কিন্তু অটল রইল। পুলিশ তাকে ধরবার জন্য চতুর্দিকে খোঁজখবর করতে লাগল এবং আদিবাসীরা তাদের সাহায্য করতে লাগল। রত্নার জন্য তারা অনেক কষ্ট ভুগেছে। পুলিশ কিন্তু রত্নার নাগাল পেল না।

ভুঁইয়াদের আবেদন শুনে রাণী কেন্দুঝরে ফিরে এলেন। স্থির হল পুনর্বার ধনুর্জয়ের অভিষেক হবে। এর পর গত রীতি নিয়ম পূর্ণাঙ্গ পালিত হবে। তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারি, স্থান রাজবাড়ি। ভোর হতেই জুয়াঙ্গ ও ভুঁইয়ারা স্নানাদি সেরে নতুন পোশাকে রাজবাড়ির সামনে সমবেত হয়েছে। একজন হাঁটু গেড়ে ঘোড়া হল। ধনুর্জয় তার পিঠে চড়ে রাজবাড়ি এলেন। সে উপবেশন করলে পুজা আরম্ভ হল। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন, যথা সস্ত্রীক রেভেনশা, ছোটনাগপুরের কমিশনার কর্ণেল ডালটন। সিংহভূমের কালেক্টর হেস্ এবং তাদের সহকর্মীগণ। অভিষেকের পরের দিন রাণী ধনুর্জয়কে শিরোপা দিলেন। সকলে জানল রাণী ধনুর্জয়কে রাজা হিসাবে মান্যতা দিলেন।

অভিষেকের চারদিন পরে আরও কিছু আচার নিয়ম পালিত হল। প্রথা অনুযায়ী

রাজা রাজবাড়ির বহির্ভাগে এক উচ্চ বেদীতে আসীন হলেন। অতঃপর বাদ্যসহকারে নিজ নিজ সরদারের নেতৃত্বে দলে দলে রাজসমীপে উপস্থিত হতে লাগল। প্রত্যেক সরকার রাজার পদচুম্বন করে মস্তকে ধারণ করল। তারা নানা ভেট তাঁর সামনে রাখল যথা কুমড়ো, কলা, এক ডালা চাল ইত্যাদি। পুনরায় প্রণাম করে স্থান ত্যাগ করার আগে রাজা প্রত্যেক সরদারকে তসরের শিরোপা, ছাগল মুরগী ইত্যাদি দান করলেন। সারাদিন এই পর্ব চলল। রাত্রে সকলে সমূহ ভোজনে অংশ নিলেন।

এমনি ভাবে কেন্দুঝরের রাজগদির ঝগড়া মিটলে রেভেনশা খুশি হলেন। রাণী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি তিন মাস কেন্দুঝর থাকবেন, ধনুর্জয় ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পুরী চলে যাবেন। রাণীর মাসোহারা ঠিক হল ছয়শ টাকা। কুড়িজন সিপাহী কেন্দুঝরে থাকল, অন্যরা ফিরে গেল। সস্ত্রীক রেভেনশা কটক ফিরে গেলেন।

এ ব্যবস্থা কিন্তু স্থায়ী হল না। দুর্ভাগ্যক্রমে সময়মত বর্ষা হল না; অনেক বৃদ্ধ মারা গেলেন ভুঁইয়াদের মধ্যে। চারদিকে কানাকানি হল যে অনাবৃষ্টি এবং প্রাণহানির কারণ উপযুক্ত লোককে রাজা করা হয়নি। এপ্রিল মাসে আত্মপ্রকাশ করে রত্না নায়েক একটি সভা ডাকল। ভুঁইয়া জুয়াঙ্গ এবং কোলজাতির অনেকে এ সভায় যোগ দিল। তারা ঠিক করল ধনুর্জয়কে গদিচ্যুত করে বৃন্দাবনকে রাজা করবে।

খবর পেয়ে ধনুর্জয় কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে রত্নার কাছে পাঠাল। রত্না তাদের বন্দী করল। ২৮শে জুন প্রায় কুড়ি হাজার বিদ্রোহী কেন্দুঝরে হানা দিয়ে দোকান বাজার লুট শুরু করল। তারা পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিল এবং গড়ের তোপ অকেজো করে দিল। বিদ্রোহীরা রাজার একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করল এবং দেওয়ানসহ প্রায় একশ জনকে বেঁধে জঙ্গলে নিয়ে গেল। তারা গড়ের চতুর্দিকে প্রহরী মোতায়েন করল, রাজা গড়ের ভিতরে বন্দীর মতো রইলেন। তারা ঘোষণা করল তারা রাণীকে মানে ধনুর্জয়কে নয়। রাণীও তাদের পক্ষ নিলেন।

খবর পেয়ে সিংহভূমের কালেক্টর হেস সদলবলে কেন্দুঝরে এসে দেখলেন সশস্ত্র বিদ্রোহীরা রাজবাড়ি ঘিরে রেখেছে। তিনি তাদের নিরস্ত্র করে তাড়িয়ে দিলে, রাজা মুক্তি পেলেন। বিদ্রোহীরা যে লোকগুলিকে বেঁধে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল তাদের কিন্তু ছাড়ল না। কেন্দুঝরে অরাজকতা। পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করে হেস সৈনিক সাহায্য চাইলেন। ছোটনাগপুরে ডালটন এবং কটকে রেভেনশা সেনা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

১৯শে মে রেভেনশা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দিলেন যে সরকার ধনুর্জয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। দুদিন পরে আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে বৃন্দাবনকে বালেশ্বরে নজর বন্দী করা হল। ভয় পেয়ে ময়ূরভঞ্জের রাজা ঘোষণা করলেন যে তিনি রাণী বা বৃন্দাবনের দাবী সমর্থন করেন না। বিদ্রোহীদের উপর এর কোনও

প্রভাব পড়ল না। বরং তারা পুলিশের উপরে হামলা করল। জুন মাসের শেষ দিকে ডালটন পৌঁছালে অবস্থার উন্নতি হল। তার সিপাহীরা জঙ্গল থেকে রাজার লোকদের উদ্ধার করল কিন্তু ততদিনে বিদ্রোহীরা দেওয়ানকে হত্যা করেছে।

অগত্যা রেভেনশাকে পুনরায় কেন্দুঝর আসতে হল। বর্ষায় রাস্তাঘাট খারাপ। রেভেনশা কেন্দুঝর পৌঁছলেন ৭ই জুলাই। ২২০০ জন সিপাহী তেরজন অফিসারের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের খুঁজে বার করতে জঙ্গলে ঢুকল। এ কাজ পুরো হতে অনেকদিন লাগল। রত্না নায়েক অবশ্য ধরা পড়ল না। যে তাকে ধরিয়ে দেবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হল। একে একে ভুঁইয়া সরদাররা আত্মসমর্পণ করল। রত্না ধরা পড়ল ১৫ই আগষ্ট। বিচারের জন্য বিদ্রোহীদের কটক পাঠানো হল। বিদ্রোহের অবসান হল বটে, কিন্তু শান্তি বজায় রাখতে আরও কিছুদিন কেন্দুঝর রইলেন রেভেনশা।

পুরী কোনার্ক : ডিসেম্বর ১৮৬৮

শীতকাল, সন্ধ্যাবেলা, দরিয়া মহাবীরের কাছে চারখানা পাল্কি পাঁচখানা গোরুর গাড়ি ও দুটি হাতির সঙ্গে প্রায় চল্লিশজনের একটি দল এসে থামল। পূজা পার্বণের সময় রাজা মহারাজারা এরকম সদলবলে আসেন বটে, কিন্তু এখন তো সে রকম কিছু নেই। পাল্কি থেকে যে স্থূলকায় লোকটি নামলেন তিনি রাজা মহারাজা নন। কলকাতার নাবালক রাজপুত্রদের জন্য বোর্ডের অধীনে একটি স্কুল আছে। ইনি সেই স্কুলের ডাইরেক্টর বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বিলাতের রয়াল সোসাইটির উদ্যোগে ভারত সরকার প্রাচীন বিগ্রহগুলির প্লাষ্টার অফ্ প্যারিসের মূর্তি তৈরি করার জন্য কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছিল। স্থির হয়েছিল কলকাতার আর্ট স্কুলে ছাঁচ বানিয়ে মূর্তি তৈরি করতে তালিম দেওয়া হবে। তারা ওড়িশার মন্দিরগুলি ঘুরে সুন্দর বিগ্রহ চয়ণ করে তার মূর্তি তৈরি করবে। চয়নে সহায়তা করবেন রাজেন্দ্রলাল। ওড়িশায় অবস্থান কালে তিনি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণও করবেন। স্কুল থেকে তিনি ছুটি নিয়েছেন এবং তিনি কোনও পারিশ্রমিক নেবেন না।

বাবু রাজেন্দ্রলাল আসছেন এ খবর দীপিকা প্রকাশ করেছে প্রায় দু মাস হল। দীপিকা তাঁকে সহায়তা করার আবেদনও করেছিল। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল যখন বাতিঘর, কটক ভুবনেশ্বর হয়ে পুরী এলেন তখন গুজব রটে গেল যে তিনি আসলে লাখেরাজ ডেপুটী কালেক্টর অথবা সদাবর্ত অফিসার এবং তাঁর আসল উদ্দেশ্য মঠের মোহন্তদের বরখাস্ত করা। সুতরাং তাঁর সহায়তা করতে কেউ এগিয়ে এল না।

পুরীতে তাঁবু খাটিয়ে পরের দিন থেকে কাজ আরম্ভ করলেন রাজেন্দ্রলাল। পুরীর এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার রাধিকাপ্রসাদ মুখার্জী তাঁর সহায়ক হলেন। লণ্ডন থেকে জিপসাম এসেছে। সেগুলি গুঁড়ো করে প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস তৈরী করতে জুটে গেল কিছু লোক। নোট বই হাতে, সঙ্গে রাধিকাপ্রসাদ, পুরীর মন্দির সর্বেক্ষণে বেরিয়ে পড়লেন রাজেন্দ্রলাল।

মন্দিরে পা রাখতেই কাশী সিংহারীর খপ্পরে পড়লেন। সে তাকে সকল দেবদেবীর কাছে প্রণিপাত করে দক্ষিণা দিতে বাধ্য করল। মোটা মানুষ রাজেন্দ্রলাল পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়লেন। কাশী জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন তো সমুদ্র এখান থেকে কত দূরে?' রাজেন্দ্রলাল বললেন, 'এই তো কাছেই।' কাশীর প্রশ্ন, 'সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন?' রাজেন্দ্রলাল কান পেতে শোনার চেষ্টা করলেন, বললেন, 'না, পাচ্ছি না।' কাশী বলল, 'সমুদ্রের গর্জনে সুভদ্রা এমন ভয় পেলেন যে তাঁর শরীর সঙ্কুচিত হয়ে গেল হাতগুলি শরীরে ঢুকে গেল। রেগে গিয়ে ভগবান আদেশ দিলেন যত খুশি গর্জন কর কিন্তু আওয়াজ যেন মন্দিরে না আসে।' হনুমানকে নির্দেশ দিলেন 'নজর রাখবে সমুদ্রের গর্জন যেন মন্দিরের সীমা অতিক্রম না করে।' 'সমুদ্র যদিও অতি কাছে, সেদিন থেকে তার আওয়াজ মন্দিরের দ্বারে এসে থেমে যায়।'

শোনার পর রাজেন্দ্রলাল বাইরে এসে অরুণ স্তম্ভের কাছে দাঁড়ালেন। কি আশ্চর্য! সমুদ্রের গর্জন পরিষ্কার কানে আসছে। অথচ ভিতরে নিঃশব্দ! কাশী বলল, 'আসুন ঠাকুরের আর একটি মহিমা দেখবেন। যত লেখাপড়াই করে থাকুন পাপ করেছেন নিশ্চয়ই। জগন্নাথের সামনে গেলেই দর্শন পাবেন ভেবেছেন? সত্যই রাজেন্দ্রলাল রত্নবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না। ভয়ে চোখ বুঝে প্রার্থনা করলেন। চোখ খুলতেই সামনে প্রকট হলেন তিন দ্যুতিমান মূর্তি! অলৌকিক ব্যাপার! যতদিন মন্দিরে কাজ শেষ না করলেন রাজেন্দ্রলাল ততদিন এ প্রহসন চালিয়ে গেল পাণ্ডা।

পুরী ছেড়ে যাবার আগের দিন শেষবারের জন্য মন্দিরে গেলেন রাজেন্দ্রলাল। কাশী ওঁৎ পেতে ছিল। রাজেন্দ্রলাল তাকে বললেন, 'আমার হাত ধরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে চল।' চোখ বন্ধ করে তিনি পাণ্ডার সঙ্গে চললেন এবং মন্দিরের ভিতরে যেয়ে চোখ খুললেন। দেখলেন তিন মূর্তি তাঁর সামনে বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে তাতে চমক লাগানোর মত কিছু নেই। প্রখর রৌদ্র থেকে সোজা মন্দিরের অভ্যন্তরে গেলে কম আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একটু পরে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেলে সবকিছু দৃশ্যমান হয়। বাইরে এসে এ কথা রাধিকাপ্রসাদকে বললেন, আগে জানলে আপনাকে সাবধান করে দিতাম, এই পাণ্ডাদের চালাকি ধরা সহজ নয়।

পুরীর কাজ শেষ করে রাজেন্দ্রলাল কোনার্ক গেলেন। মন্দিরের চারপাশ জঙ্গলাকীর্ণ। সাপের ভয়ে তাঁর লোকেরা মন্দিরের কাছে যেতে রাজী নয়। সুতরাং

দূর থেকে যতটা সম্ভব দেখে নিয়ে নোট বুকে লিখতে লাগলেন। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটি শায়িত সিংহ মূর্তি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটি ছেলেকে ডেকে বললেন উপরে গিয়ে ফিতা দিয়ে সিংহটিকে মেপে তাকে বলতে। সে রাজী নয়। পয়সার লোভ দেখালেন, এমনকি দু টাকা দিতে রাজী হলেন কিন্তু কোনও কথা শুনল না, পালাল। আন্দাজ লিখলেন সিংহটি চোদ্দ ফুট লম্বা।

ততক্ষণে সূর্যতাপ অসহনীয় হয়েছে। একটি গাছের ছায়ায় বসে রাজেন্দ্রলাল কাগজপত্র খুললেন। ফার্গুসনের 'হিন্দুস্থান' খুলে কোনার্ক মন্দিরের ছবি দেখলেন এবং সামনে যে মন্দির আছে তার সঙ্গে মেলালেন। ছবিটিতে জগমোহনের পিছনে মূল মন্দিরের কিছু অংশ দেখা যায় যা এখন নেই। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখার সাহস হল না।

কাগজপত্রের মধ্যে মলাটে 'বিগ্রহ' লেখা একটি ফাইল আছে। সেটি হাতে নিলেন। নবগ্রহ প্রস্তরটি অবহেলিত, মাটিতে পড়ে আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি অনেকদিন থেকে দাবী করে আসছে যে এটিকে কলকাতায় এনে মিউজিয়ামে রাখা হোক। সরকার পূর্তবিভাগকে এ দায়িত্ব দিয়েছিল। তিন হাজার টাকাও মঞ্জুর করেছিল এ কাজের জন্য। ইঞ্জিনিয়ার নিকলস ঠিক করেছিলেন লোহার লাইন বিছিয়ে তার উপরে গাড়ি করে শিলাখণ্ড সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে ষ্টীমার যোগে কলকাতা নিয়ে যাবেন। একখানি গাড়ি নির্মাণ করা হল এবং লাইন বিছানোর কাজ আরম্ভ হল। লাইন অল্প দূর নিতেই গ্রাণ্ট ফুরিয়ে গেল এবং প্রস্তরটি ততদূর নিয়ে সেখানেই রাখা হল।

রাজেন্দ্রলাল লাইন মেপে দেখলেন প্রায় দুশ গজ। সমুদ্র আরও এক মাইল দূরে। তাঁর দুঃখ হল যে 'নবগ্রহ' কলকাতা নেওয়া সম্ভব হবে না। তিনি প্রস্তরে খচিত ন'টি মূর্তি খুঁটিয়ে দেখলেন। ষ্টার্লিং শুক্রগ্রহকে একটি পূর্ণ কায়া যুবতী বলে বর্ণনা করেছিলেন। মনে পড়তে রাজেন্দ্রলাল হেসে ফেললেন। অবশ্য ষ্টার্লিংকে দোষ দেওয়া অন্যায়। পাশ্চাত্য দেশে শুক্র হলেন সুন্দরী 'ভেনাস।'

এবারে মন্দিরের আর একটু কাছে গেলেন রাজেন্দ্রলাল। সাপ ও বন্য জন্তুর ভয়ে কম লোকই এত কাছে যায়। তবুও অনেকে মন্দিরের গায়ে নাম খোদাই করে বিকৃত করেছে। ভাল করে পড়ে দেখলেন যে সব নামই সাহেবদের। ষ্টার্লিং-এর নাম আছে কিনা জানতে ইচ্ছা হল কিন্তু সে নাম চোখে পড়ল না।

কোনার্কের কাজ শেষ করে রাজেন্দ্রলাল কটক এলেন। কটক ডিবেটিং ক্লাব তাঁর সম্মানে এক সভা আহ্বান করল। সভায় রাজেন্দ্রলাল বললেন ওড়িশার হিতাকাঙ্ক্ষীদের উচিত ওড়িয়া ভাষার বিলোপ করে বাংলা ভাষার প্রচলন করা। ওড়িয়া যতদিন থাকবে ততদিন উন্নতি সম্ভব নয়।

বামণ্ডা : জুন ১৮৬৯

ব্রজসুন্দরের পরে কে বামণ্ডার রাজা হবেন এ প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে উঠত। তাঁর এক পুত্রের জননী একজন সামান্য দাসী। সুতরাং তাঁর রাজা হবার অধিকার নেই। ব্রজসুন্দর তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা হরিহরের পুত্র বাসুদেবকে উত্তরাধিকারী করবেন। পরিবারে বাসুদেব জ্যেষ্ঠ, সেজন্য এই সিদ্ধান্ত। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ঝামেলা এড়িয়ে যাবার জন্য তিনি বাসুদেবকে উত্তরাধিকারী করে দলিলপত্র তৈরি করলেন এবং ব্রিটিশ পলিটিকাল অফিসারকে পাঠিয়ে দিলেন। সে আজ অনেকদিনের কথা, ১৮৫৫, যখন বাসুদেব মাত্র পাঁচ বছরের বালক।

বাসুদেবকে টিকায়েত উপাধি দিয়ে তার শিক্ষার বন্দোবস্ত হল। পণ্ডিত আনন্দ ব্রহ্মা ব্যাকরণ শেখালেন, পণ্ডিত পুরুষোত্তম তর্কালঙ্কার শেখালেন কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ইত্যাদি এবং ভুবনেশ্বর বড় পাণ্ডা ন্যায়শাস্ত্র বেদান্ত ইত্যাদির জ্ঞান দিলেন। বাসুদেব একটু বড় হলে রাজকার্য নির্বাহের সময় তাকে কাছে রাখতে শুরু করলেন। তিনি আশ্বস্ত হলেন তাঁর পরে রাজ্য একজন যোগ্য রাজা পাবে। কিন্তু মৃত্যু যে তাঁর এত কাছে সে কথা ভাবেন নি।

বামণ্ডার সব থেকে দর্শনীয় স্থান প্রধানপাট জলপ্রপাত। মাঝে মাঝে অবসর করতে সেখানে যান ব্রজসুন্দর। এ বছর সেখানে গেলে এক ব্যক্তি খবর দিল যে একটি বটগাছে একটি গোখুরা সাপ থাকে। ব্রজসুন্দর নিজেকে সাহসী বীর মনে করেন, শুনেই বললেন 'সাপটা ধরব।' কোনও নিষেধ মানলেন না, সাপ ধরতে গেলেন।

লাঠি সোটা নিয়ে অনেক লোক গাছটি ঘিরে দাঁড়াল। একটি মগডালে সাপ দেখা গেল। ব্রজসুন্দর ধুতি গুটিয়ে গাছে চড়তে আরম্ভ করলেন। হট্টগোলের মধ্যে সাপটি একটি ফোকরে ঢুকে গেল, ব্রজসুন্দর কিন্তু তার লেজ ধরে ফেললেন। তিনি একটু একটু করে টেনে বার করলেন সাপটি এবং তার ফণা ধরে ফেললেন। তিনি নিচের লোকদের সাপ দেখালেন, তারা উৎফুল্ল হল। কেমন করে সাপ নিয়ে নিচে নামবেন সে এক সমস্যা। দৌড়ে গিয়ে একজন একখানি মই এনে লাগিয়ে দিলে অনেক কষ্টে সাপ নিয়ে ব্রজসুন্দর নেমে এলেন।

সাপ নিয়ে কি করা যাবে? সকলে বলল মণিমা সাপটি ছুঁড়ে ফেলুন আমরা পিটিয়ে মেরে ফেলি। এত কষ্ট করে ধরা সাপটিকে এমনি মেরে ফেলতে চাইলেন না ব্রজসুন্দর, বললেন, 'একটা হাঁড়ি আন তার মধ্যে রাখি।' হাঁড়ি আনতে অনেক সময় লাগল। এদিকে সাপ ফোঁস ফোঁস করছে। ব্রজসুন্দর সাপটিকে আরও জোরে ধরলেন। একজন বলল যতক্ষণ হাঁড়ি না আসছে ততক্ষণ অন্য কেউ সাপটি ধরে থাক। ব্রজসুন্দর রাজী হলেন না।

হাঁড়ি এলে ব্রজসুন্দর সাপকে তার ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু সাপ পালাতে চেষ্টা করছে। অতি কষ্টে সাপকে হাঁড়িতে ঢোকাতে সক্ষম হলেও সাপ তাকে ছোবল মারল। দেখতে দেখতে ব্রজসুন্দর জ্ঞানশূন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ধরাধরি করে লোকে তাঁকে কুয়োর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর উপরে জল ঢালল, ওঝা ডাকতে লোক ছুটল, রাজধানীতে খবর পাঠানো হল। শেষে পাল্কিতে শুইয়ে তাঁকে দেওগড় নেওয়া হল। তাঁর অবস্থা আরও সঙ্গীন হল। সাহেব ডাক্তার ডাকতে লোক গেল। তাঁর অন্তিমক্ষণ আসন্ন জেনে ব্রজসুন্দরদের বলে দিলেন যে বাসুদেব তাঁর উত্তরাধিকারী। বাসুদেবকে ডেকে বললেন তোমার দেহে সতীর রক্ত। আর কিছু বলার আগেই তাঁর মৃত্যু হল।

এই রাজপরিবারের দুজন নারী সতী হয়েছিলেন। দুই পুরুষ আগে রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র। তাঁর আমলে ইংরেজরা ওড়িশা জয় করেছিল। বামণ্ডা অবশ্য ওড়িশায় অংশ ছিল না, ছিল ছত্রিশগড়ের অন্তর্ভুক্ত। তার মৃত্যু হলে রাণী সতী হতে চাইলেন। দেওগড়ের পাশে নদীকূলে রাণী মৃত স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে চন্দন কাঠের চিতায় নিজেকে আহূতি দিলেন। এই স্থান এখন সতীঘাট বলে পরিচিত।

প্রতাপরুদ্রের পরে তার পুত্র সর্বেশ্বর রাজা হলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিনের মধ্যে রেড়াখোলের এক আততায়ী তাঁকে হত্যা করল। রাণী চন্দ্রকুমারীর সতী হবার কথা লোকের মনে পড়ল। সর্বেশ্বরের স্ত্রী সতী হতে চাইলেন না কিন্তু জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি কোডরকোটে পতির চিতার সঙ্গে জ্বলে দেহত্যাগ করলেন। জায়গাটার নাম হল সতীকুণ্ড।

সতীরক্তের গুরুভার নিয়ে উনিশ বছর বয়সে বাসুদেব বামণ্ডার রাজা হলেন।

বালেশ্বর : জুলাই ১৮৬৯

সুনাহাটের দামোদর প্রসাদ দাসের গৃহে অবস্থিত লাইব্রেরী বালেশ্বরের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল বলা যায়। ফকীর মোহন ও রাধানাথ নিয়মিত সেখানে যান। দামোদর প্রসাদ তাদের উৎসাহ দেন। একদিন তিনি রাধানাথের কয়েকটি বাংলা কবিতা পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন পঞ্চাশটা কবিতা লেখা হলে তিনি সেগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করবেন। কিছুদিন পরে রাধানাথ তাকে একান্নটি কবিতা দিলেন। দামোদর প্রসাদ সেগুলি প্রকাশ করলেন, নাম দিলেন 'কবিতাবলী'।

আজকাল তাঁদের আলোচ্য বিষয় একটি ওড়িয়া প্রেস থাকলে ওড়িয়া পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হত। ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নির্দেশে ফকীর মোহন তাঁর 'জীবনচরিত' পুস্তকখানি ওড়িয়াতে অনুবাদ করে কলকাতা থেকে ছাপিয়ে এনেছিলেন।

এটি এখন স্কুলের পাঠ্য তালিকায়। ফকীর মোহন ছাত্রদের জন্য একখানি গণিত ও একখানি ব্যাকরণও লিখে ফেলেছিলেন। তিনি বালেশ্বরে ওড়িয়া প্রেস স্থাপনে উদ্যমী হলেন। স্থির হল কটকের মতো এখানেও একটি প্রিন্টিং কোম্পানি স্থাপিত হবে। তাতে মুখ্য ভূমিকা নেবেন দামোদর প্রসাদ, ফকীর মোহন এবং রাধানাথ। এও স্থির হল রাধানাথের নাম কোনও কাগজপত্রে থাকবে না, কারণ সুন্দরনারায়ণ তাঁকে কোনও সভাসমিতিতে যোগ দিতে এবং লোকের সঙ্গে মিশতে মানা করেছেন।

যাই হোক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পি. এম. সেনাপতি এণ্ড কোম্পানি গঠিত হল এবং উৎকল প্রেস স্থাপিত হল। ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে ফকীর মোহনের প্রচেষ্টায় এই প্রেস থেকে 'বোধদায়িনী' ও 'বালেশ্বর সংবাদ বাহিকা' প্রকাশিত হল। বালেশ্বরের পক্ষে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ইদানীং বালেশ্বরে অপরাধ বেড়ে গেছে। আশা করা গিয়েছিল দুর্ভিক্ষ শেষহলে চুরি ডাকাতি কমে যাবে। কিন্তু তা হল না। মেদিনীপুর থেকে ভদ্রক পর্যন্ত জগন্নাথ সড়কে ডাকাতের দৌরাত্ম্য। ডাকাতরা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। কয়েকটি ডাকাতের দল বেশী ভারী। লালু মির্দা, বৈদী মেঠী এবং গদেই কণ্ডরার দল সবথেকে কুখ্যাত। এতদিন ডাকাতরা সাহেবদের এড়িয়ে যেত। একবার অবশ্য বস্তা ও হলদিপদার মাঝে এসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর রাম্পিনীর পাল্কি লুট করেছিল। ডাকাতরা ভেবেছিল পাল্কিতে বালেশ্বরের ব্যাপারী যোগেয়া যাচ্ছিল। এমনকি একবার তারা শ্রীমতী রেভেনশার পাল্কিও আক্রমণ করেছিল। তিনি কটক থেকে বালেশ্বর যাচ্ছিলেন।

ধীরে ধীরে অনেক সামাজিক পরিবর্তনও হচ্ছে বালেশ্বরে। জেলায় অনেক বাঙালি বাস করে। ওড়িয়ারা কালক্রমে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাঙালিরা সাহেবদের অনুকরণ করে ছোট করে চুল কাটে শার্ট পরে। এখন অনেক ওড়িয়া ছোট চুল রাখছে। বাঙালিদের থেকে আর একটি অভ্যাস ওড়িয়ারা নিল, মদ্যপান করা। সরকারী কর্মচারী ও ভদ্র বাঙালীদের অনেকে মদ খায় আর যারা খায় না তাদের হেয় জ্ঞান করে। মোতিগঞ্জ বাজারের পাশে সুনাহাটের জমিদার ও মহাজন কিশোরীমোহন দাসের একটি বাগানবাড়ি আছে। প্রতি শনিবারে সেখানে বন্ধুমিলন হয়। তাস, দাবা, মদ, আফিম, চরস, নাচ গান ইত্যাদি সর্বপ্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। ফকীর মোহন এখানে আসা শুরু করলেন।

বাঙালিদের মাধ্যমে বালেশ্বরে ব্রাহ্মধর্ম এসে গেল। আদি ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করতে এলেন ঈশান চন্দ্র বসু। লবণ মহালে কর্মরত কেরাণী প্রসন্নকুমার চ্যাটার্জীর বাসাবাড়িতে প্রতি রবিবার প্রার্থনা সভা বসে। উপাসনা অন্তে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের জন্য মদ্যপানের ব্যবস্থা হয়। তারা মদ্যপানকে উপাসনার অঙ্গ বলে মানে। মোতিগঞ্জ বাজারের পাশে ময়ূরভঞ্জের বাগানবাড়িতে পরে ব্রাহ্মদের প্রার্থনাগৃহ স্থাপিত হল। ফকীর মোহন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন।

১৮৬৯ সনের জানুয়ারি মাসে রাধানাথ পুরী জেলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক হয়ে বদলী হয়ে চলে গেলেন। ফকীর মোহন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। মিশন স্কুলের সেক্রেটারী মিলারের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। তাছাড়া বেতনও সন্তোষজনক নয়। তিনি নতুন কালেক্টর ফাসিকে বাংলা পড়ান। তাঁকে বলে মুনশীর চাকরি নিলেন। এ চাকরি ভাল লাগল না, কারণ কাজের চাপে পড়াশুনার জন্য সময় মেলে না। ইতিমধ্যে রেভারেণ্ড মিলারের জায়গায় এলেন রেভারেণ্ড হালাম। তাকে বলে তিনি তাঁর পূর্বপদ প্রধানশিক্ষকের কাজে ফিরে এলেন। এ বছর ছাত্রদের পরীক্ষার ফল ভাল হল। খুশি হয়ে হালাম ফকীর মোহনের বেতন বাড়িয়ে পঁচিশ টাকা করে দিলেন।

এপ্রিল মাসে চম্পারন থেকে বদলী হয়ে জন বীমস এ গ্রেড কালেক্টর হয়ে বালেশ্বর এলেন। তার বেতন ১৯১৬ টাকা। চম্পারনে কর্মরত থাকার সময় তিনি ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উপর পুস্তক রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আজকাল তিনি ভারতীয় ভাষাগুলির একখানি তুলনামূলক ব্যাকরণ লেখার কাজ হাতে নিয়েছেন। বালেশ্বরে সরকারী কাজের চাপ কম। সুযোগ পেয়ে বীমস ব্যাকরণের কাজে মগ্ন হলেন। সাহেবদের ওড়িয়া শেখা সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে একখানি ওড়িয়া ব্যাকরণ লিখছিলেন হালাম। তিনি ওড়িয়া লিখতে পড়তে ও বলতে পারেন। তিনি মাঝে মাঝে ফকীর মোহনের সাহায্য নেন। ইদানীং বীমসের সঙ্গেও পরামর্শ করেন।

এই সময় বীমস এমন একজন পণ্ডিতের সন্ধান করছিলেন যিনি সংস্কৃত ওড়িয়া এবং বাংলা ভাষায় পারদর্শী। হালাম একদিন ফকীর মোহনকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। বীমস তাঁকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় ও অব্যয় সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করলেন। ফকীর মোহন সবগুলির সঠিক উত্তর দিলে তিনি খুশি হলেন। সেদিন থেকে ফকীর মোহন নিয়মিত বীমসের কাছে যাতায়াত করেন এবং ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা করেন। ফকীর মোহনের আসতে দেরী হলে বীমস প্রশ্ন করেন, বাবু, আপনি আসতে দেরী করলেন কেন?

কটক : আগস্ট ১৮৬৯

রাজেন্দ্রলাল মিত্র কটকে বক্তৃতা দিয়ে চলে গেলেন, পিছনে রেখে গেলেন বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার দ্বন্দ্ব। তার বক্তৃতার সময় প্রেস নতুন ভবনে স্থানান্তরে ব্যস্ত ছিলেন গৌরীশংকর। ভালভাবে ভেবে না দেখে তিনি রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতার প্রশংসা করেছিলেন। ১৮ই জানুয়ারি প্রেস স্থানান্তরের কাজ শেষ হল। এখন থেকে দরগা বাজারের নতুন বাড়ি হল প্রিণ্টিং প্রেসের স্থায়ী ঠিকানা। অনেকে গৌরীশংকরকে

বোঝালেন রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতা ওড়িয়া ভাষার পক্ষে ক্ষতিকারক। মার্চ মাসের দীপিকাতে তিনি 'ওড়িয়া ভাষার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখলেন. তাঁর মতে ওড়িয়া ভাষার উন্নতির পথে তিনটি প্রতিরোধক—বাংলা, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ সরকার।

কটক থেকে সদ্য প্রকাশিত 'কটক স্টারে' বাবু উমাচরণ হালদার লিখলেন ওড়িয়া ভাষার পুস্তক ও পত্রিকা বাংলা হরফে লিখলে বাঙালি ওড়িয়া ও সাহেব সকলে পড়তে ও বুঝতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে কটক ডিবেটিং ক্লাবের সভা ডেকে এ মতবাদের সমর্থন করা হল। কয়েকদিন পরে 'উৎকলোল্লাসিনীর' সভায় এ মতের বিরোধিতা করা হল। অন্যদিকে 'উৎকল হিতৈষী' হালদারের মত সমর্থন করল। গৌরীশংকর ব্যঙ্গ করে দীপিকায় লিখলেন : আহা কি জ্ঞানই দিলেন, অন্যের চক্ষু ধার নিয়ে অন্ধও দেখতে পায়! রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কটক ডিবেটিং ক্লাবে হালদারের মত সমর্থন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাকে উদ্দেশ্য করে গৌরীশংকর একটি প্রবন্ধ লিখলে সমস্যা দেখা দিল। 'সম্পাদকেষু' স্তম্ভে শ্রীরঙ্গপঞ্চানন ছদ্মনামে একখানি পত্র প্রকাশিত হল যার অন্তিম ভাগে লেখা আছে :

বাবু মহাশয় অনেক বিদ্যায় বিভূষিত হয়ে অনেক প্রশংসাপত্র অর্জন করেছেন এবং এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেছেন। স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হয়ে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে উৎকলদেশের প্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ দেশের সৌভাগ্য যে উপযুক্ত লোক পাওয়া গেছে, সন্দেহ নাই যে প্রগতি হবে। দুঃখের বিষয় এই যে বাবু যেমন বিদ্বান তার জঠরে যদি কয়েকটি ওড়িয়া অক্ষর স্থান পেত তাহলে বলার কিছু ছিল না। বাবু চতুরতার সঙ্গে কাজ করে উপাধি থেকে 'ষ' অক্ষরটি লোপ করে দিয়েছেন।

তেইশবছরের যুবক রাজকৃষ্ণ ওকালতি করেন এবং হাইস্কুলের আইন উপদেষ্টার কাজ করেন। গৌরীশংকর তাকে মেষ বললে তিনি কাল বিলম্ব না করে গৌরীশংকরকে লিখলেন :

মহাশয়,

আপনার প্রচারিত উৎকল দীপিকার ৩০ তম সংখ্যায় চতুর্থ ভাগে ২৪শে জুলাই ১৮৬৯ তারিখে শ্রীরঙ্গপঞ্চানন স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এতে আমার সম্পর্কে অনেক অপবাদমূলক উক্তি আছে যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০১ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য। অতএব, আপনাকে অনুরোধ উক্ত শ্রীরঙ্গপঞ্চাননের আসল নাম ও ঠিকানা আমাকে দিন। আমি তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করব এবং দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণ দাবী করব। আপনি যদি তা না করেন তবে বাধ্য হয়ে পত্রিকার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে।

আপনার অনুগত ভৃত্য
রাজকৃষ্ণ মুখার্জী, এম.এ.বি.এল.।

জবাবে গৌরীশংকর লিখলেন :

আপনার পত্রখানি পরিচালকদের সভায় বিচার করা হয়েছে। তাঁদের নির্দেশ অনুসারে জানাচ্ছি যে উক্তপত্রে অপবাদমূলক কিছু নেই। সুতরাং লেখকের নাম ধাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করছি।

২রা আগষ্ট রাজকৃষ্ণ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কর্কউডের আদালতে ফৌজদারী মামলা রুজু করলেন। কর্কউড গৌরীশংকরকে শায়েস্তা করার সুযোগ খুজছিলেন। তিনি রাজকৃষ্ণের জবানবন্দী নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না, সোজা গৌরীশংকরের নামে সমন জারী করলেন। শুনানী হবে ৪ঠা আগষ্ট।

মামলার দিন কোর্টের ভিতরে বাইরে জনারণ্য। এটি একটি সাধারণ মামলা নয়, এটি বাঙালি ওড়িয়ার প্রকাশ্য যুদ্ধ। মার মুখো ফিরিঙ্গী গৌরীশংকরের কি হাল করেন সেটি লোকের কৌতূহলের অন্য কারণ। গৌরীশংকরও একটু উদ্বিগ্ন। যদিও কটকের প্রখ্যাত উকিল রামমোহন মল্লিক তাঁর পক্ষে লড়বেন, তবু একটু শঙ্কা তো হবেই।

শপথ নিয়ে বাদী রাজকৃষ্ণ বয়ান দিলেন। তাঁর বক্তব্য দীপিকায় প্রকাশিত পত্র তাঁকে মেষের মত নির্বোধ বলেছে এবং ইঙ্গিত করেছে যে তিনি অসৎ উপায়ে এম.এ. ডিগ্রি পেয়েছেন। এতে তাঁর মানহানি হয়েছে। অতঃপর তিনি কবে কোথা থেকে কি কি উপাধি পেয়েছেন আদালতকে জানালেন।

রামমোহন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি প্রতিবাদীর পক্ষ থেকে যুক্তি দেখালেন। কর্কউড তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে প্রকাশিত পত্রটির বিষয়ে বিশদভাবে বুঝে নিলেন। এম.এ.-তে ষ অক্ষর যোগ করে কেমন করে একটি পশুকে বোঝানো যায় তা জানা বিরক্তিকর হলেও কৌতূহল উদ্দীপক। যুক্তিতর্ক মনোযোগ দিয়ে শুনে কর্কউড রায় লিখতে শুরু করলেন। গৌরীশংকর ভাবলেন জেলে যেতে যদি নাও হয় জরিমানা থেকে রেহাই নেই। আপীলে কি লিখবেন, ভাবতে লাগলেন।

অপরাহ্নে কর্কউড এজলাসে এসে সকলকে শান্ত হতে বলে রায় পড়তে শুরু করলেন :

ডিবেটিং ক্লাবে ওড়িয়া অক্ষর ও সংখ্যার বিলুপ্তি করে বাংলা অক্ষর ও সংখ্যা চালু করার প্রস্তাব হলে বাদী তা সমর্থন করেন। পত্রলেখক প্রস্তাবটি হাস্যাস্পদ মনে করে তার মতবাদ প্রত্যাখ্যান করলেন। এ পত্রকে শ্লেষ করে পত্রলেখক লিখেছেন যে এমন মত প্রকাশ করে বাদী স্বল্পবুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। বাদীর বক্তৃতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সর্বসাধারণের সম্পর্ক আছে এবং সে বিষয়ের নিষ্পত্তির সঙ্গে ওড়িয়া বাসীর সকলের সম্বন্ধ আছে। লেখক এ বিষয়ে বাদীর মতবাদের দোষগুণ বিচার করা ব্যতীত আর কিছু করেন নাই। বাদীর মতে 'স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হয়ে' বলায় তাঁর মানহানি হয়েছে। তাছাড়া অন্য উপায়ে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করার আরোপ হয়েছে। পত্রটি আমি পড়েছি। আমার মনে হয়নি 'স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হয়ে' মানহানিকর

উক্তি। পত্রে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা থেকে মনে হয়নি যে লেখক বলতে চেয়েছেন যে বাদী অন্য উপায়ে ডিগ্রী লাভ করেছেন। এম.এ. অক্ষর দুটি নিয়ে একটু রঙ্গ করা এবং বাবু বুদ্ধিহীন মেষের মতো বলার জন্য বাদীর ডিগ্রীর উল্লেখ করেছেন মাত্র।

আদলেতের মতে বাদীকে মেষের সঙ্গে তুলনা করা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০১ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় নয়। এটি বরং ৪৯৯ তৃতীয় বর্জিত উপধারার অন্তর্ভুক্ত। আদালতের মতে মানহানি প্রমাণিত হয়নি।

মকদ্দমা খারিজ হয়ে গেল। প্রতিবাদী গৌরীশংকরকে ২৫০ দফা অনুসারে আরোপ থেকে মুক্ত করা হল।

পুরী : ফেব্রুয়ারি ১৮৭০

উইলিয়াম উইলসন হাণ্টার জন বীমসের মতো জ্ঞানী অফিসার। ১৮৬৮ সালে তিনি ভারতের অনার্য ভাষাগুলির তুলনামূলক অভিধান লিখলেন এবং এনাল্‌স্‌ অফ রুরাল বেঙ্গল গ্রামীন বাংলার ইতিবৃত্ত লিখে খ্যাতি পেলেন। বঙ্গসরকারের কারো সঙ্গে তাঁর বনিবনা ছিল না। তাঁর ধারণা সকলে তাঁর প্রতি ঈর্ষা কাতর। তার অন্যতম কারণ তিনি ভারতীয় ও স্থানের নাম সহজে লেখা যায়এমন একটি হাণ্টারীয় প্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন।

ইদানীং তিনি একটি গেজেটিয়ার লেখার কাজে নিযুক্ত। এর জন্য আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। তাঁর চিঠিপত্রের জবাব আসতে সময় লাগবে ভেবে হাণ্টার স্থির করলেন একবার ওড়িশা ভ্রমণ করে আসবেন এবং ওড়িশার উপর একখানি পুস্তক লিখবেন। এটি গ্রামীণ বঙ্গের দ্বিতীয় খণ্ড হবে। এই উদ্দেশ্যে পঁচিশে জানুয়ারি হাণ্টার যাত্রা করলেন। তাঁর জাহাজ উনত্রিশে গোপালপুরে পৌঁছাল। সেখান থেকে পাল্কি করে গঞ্জামের পথে চিল্কায় এলেন এবং সেখান থেকে নৌকাযোগে পারিকুদ।

পারিকুদের রাজা চন্দ্রশেখর মানসিংহের সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটালেন। চন্দ্রশেখর তাঁকে দুর্ভিক্ষের বিষয়ে বললেন। পারিকুদের জনসংখ্যা ১১,১৭৯। তার মধ্যে দুর্ভিক্ষে মারা যায় ৫৩৭৫ জন। গৃহত্যাগী হয় আরও ১২৫০ জন। আকালের সময় লোকে খাজনা দিতে পারেনি। তার উপরে কাঙালদের সহায়তা করতে খরচ হয়েছে। এখন তিনি কপর্দকশূন্য। অবশ্য এক বছর আগে সরকার তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। তিনি কম্প্যানিয়ন অফ স্টার অফ ইণ্ডিয়া খেতাবও পেয়েছিলেন। ওড়িশাবাসীর গর্ব যে তখন পর্যন্ত কোনও ছোট লাট এ খেতাব পাননি।

সেদিন রাত্রে রম্ভা থেকে বেরিয়ে পরের দিন সকাল সাতটায় পুরীর সমুদ্রকূলে

এলেন হাণ্টার। তাঁর জন্য পাল্কির ব্যবস্থা হয়েছিল; তিনি ষ্টেজিং বাংলোতে উঠলেন। পরের দিনটি কাগজপত্র ঘেঁটে নোট নিতে কোর্টে গেলেন। তার পরের দিন কোনার্ক যাবার কথা। রাত্রি একটায় যাত্রা করে কোনার্ক পৌঁছলেন পরের দিন সকাল সাতটায়। কোনার্ক মন্দির এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি এনে দিল। তবে পুরী অবস্থান কালে যে ঘটনাগুলি তাঁকে বিচলিত করেছিল তার একটি স্বর্গদ্বারে প্রত্যক্ষ করা দৃশ্যটি। সন্ধ্যায় এক বৃদ্ধার শব শ্মশানে আনা হল। চার মাস আগে সে তীর্থযাত্রা করেছিল। দলে ছিল পঁচিশজন। তার মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। শবকে স্নান করিয়ে চিতায় রাখা হল কিন্তু ব্রাহ্মণরা অগ্নিসংযোগ করতে দিল না। তারা তিনশ টাকা পেয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট নয়, আরও চায়। শবযাত্রীদের কাছে আর টাকা নেই। অগত্যা একজন আশি টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট লিখে তাদের দিল। এবার শব সৎকার হল।

পুরীর জেল দেখতে গিয়ে আর একটি মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা হল। জেলের সুপারিণ্টেডেণ্ট ষ্টুয়ার্ট জেলটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। চারদিকে সুন্দর সব্জীর বাগান। কয়েদীরা ভালই আছে। তাদের মধ্যে নজরে পড়ার মত কেন্দুঝরের ভুঁইয়ারা। রেভেনশা যে বন্দীদের কটক পাঠিয়েছিলেন ফিরে এসে তিনি তাদের বিচার করলেন। রত্না নায়েক সহ সাতজনের ফাঁসির হুকুম হল, সাতাশজনের দীপান্তর। বাকি প্রায় দেড়জনের কারাদণ্ড হল যাদের মধ্যে আটচল্লিশজন পুরী জেলে। এদের মধ্যে এগার জনের মৃত্যু হয়েছে। দুজন মৃত প্রায়। জঙ্গল পাহাড়ে অভ্যস্ত লোকগুলি সমুদ্রকূলে অস্বস্তি বোধ করে, উন্মুক্ত সহজ সরল পার্বত্য জীবনের কথা ভেবে তারা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। ছোট লাট একটি মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে আদেশ দিলেন। জানা গেল জলবায়ুর পরিবর্তনই ভুঁইয়াদের মৃত্যুর মুখ্য কারণ।

হাণ্টার নিয়মিত স্ত্রীকে পত্র লেখেন। জেলখানা দেখার পরে লিখলেন : এই সরল নিরীহ আদিবাসীদের উপর কি অত্যাচার আমরা করেছি ভাবলে আমার রক্ত গরম হয়ে যায়। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা তাদের সরদারের আদেশ মেনেছিল। আজ সকালে পুরাতন নথীপত্র ঘেঁটে নোট নিতে অনেক পরিশ্রম করেছি। যতই কাজে ডুবে থাকি না কেন অবরুদ্ধ ভুঁইয়াদের করুণ মুখগুলি আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। মনটিকে একটু তাজা করার জন্য এক ঘণ্টা 'উইণ্টার্স টেল' পড়লাম। শেকস্‌পিয়ারের কমেডিগুলোর মধ্যে এটি আমার সবথেকে ভাল লাগে।

একদিন দিব্যসিংহ রাজপোশাকে সজ্জিত হয়ে গলায় হার ও কানে দুল পরে হাণ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। এখন সে পনেরো বছরের সুস্থসবল যুবক। সঙ্গে হাতি ঘোড়া ও বাদ্য এসেছে। জাঁকজমক হাণ্টারের ভাল লাগল। একজন মোক্তার সঙ্গে এসেছে। সে রাজার প্রশস্তি বয়ান করল দৈন্যের কথাও বলল। শুনে বিষণ্ণ হলেন হাণ্টার।

পুরীতে আটদিন কাটালেন হাণ্টার। এবার ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি হয়ে কটক যাবার জন্য যাত্রা করলেন। কথা ছিল কালেক্টর সঙ্গে যাবেন। সব ব্যবস্থা করতে একটু সময়

লাগল। হাণ্টারের জিদ তিনি ডাক পাল্কিতে যাবেন। সাধারণ পাল্কির বাহক চারজন, অন্য চারজন পাল্কির পিছনে পিছনে দৌড়ে 'বিশ্রাম' করে। কিছুদূর অন্তর বাহকবদল হয়। ডাক পাল্কিও চারজন বহন করে কিন্তু যারা তাদের কাছ থেকে দায়িত্ব নেয় তারা পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে আগেই পৌঁছে অপেক্ষা করে। তারা ঘণ্টায় চার সাড়ে চার মাইল চলে একদিনে পঁচিশ ত্রিশ মাইল এগিয়ে যায়। এইজন্য হাণ্টারের ডাক পাল্কি পছন্দ। এ ব্যবস্থায় অবশ্য দুটি অসুবিধা আছে। এক অনেক আগে থেকে কালেক্টর অথবা ডাকবিভাগকে জানাতে হয়। দ্বিতীয় কোনও স্থানে একজন কাহার-ও যদি অনুপস্থিত অথবা অসুস্থ হয় তবে সব ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায়। তাছাড়া বদলী বাহকরা ভিন্নজাতের হলে অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন ওঠে। যাই হোক হাণ্টার সকুশল ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি দেখে কটক এলেন।

এবার মনে হল সভ্যজগতে পুনঃ প্রবেশ করলেন। স্টেশন ক্লাবে অনেক সাহেবের সঙ্গে দেখা হল এবং পরিকল্পিত পুস্তকের জন্য অনেক তথ্য পেলেন। রেভেনশার বাড়িতে রাত্রিভোজন এক প্রীতিকর অভিজ্ঞতা। শ্রীমতী রেভেনশা নিপুণ গৃহস্বামীনি। মাত্র একটি অভাব রয়ে গেল। হাণ্টার ভেবেছিলেন রেভেনশার সঙ্গে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করবেন; সেটি হল না। রেভেনশার বিদ্যাবুদ্ধি সাধারণ। তাই হাণ্টার যখন ওর বাড়িতে ছিলেন, রেভেনশা ওর সঙ্গে গল্প করলেন কলকাতা থেকে আনা বরফ কলটি নিয়ে। কলের দাম ২৫০ টাকা। সিলিণ্ডারে এমোনিয়া ভরে গরম করে জলে ডুবিয়ে দিলে বরফ হয়, পাঁচঘণ্টায় চার পাউণ্ড বরফ পাওয়া যায়, নেটিভরা গরম জিনিস থেকে বরফ বেরিয়ে আসাকে জাদু মনে করে, ঠিক ঠিক সব প্রক্রিয়া না করলে অবশ্য বরফ হয় না, তাই তিনি নিজে এ কাজ করেন, চাকরদের উপর ভরসা করা ঠিক নয়—এই সব কথা।

যাই হোক কাজের প্রগতিতে হাণ্টার সন্তুষ্ট। সেদিন রাত্রে স্ত্রীকে লিখলেন : আমার কাজ ভালভাবে চলছে। আমি একখানি মহান গ্রন্থ রচনা করতে যাচ্ছি। আমি উপলব্ধি করছি, জীবনে এক দারুণ সুযোগ আমার সামনে উপস্থিত। আমার বিশ্বাস আমি এর সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হব।

বালেশ্বর : মার্চ ১৮৭০

বালেশ্বর এসে বীমস সরকারী কাজে এবং বই লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী এলেন কিন্তু সর্বদা বিষণ্ণ। বিলাতে তিন পুত্র রেখে এসেছেন একজন অবসর প্রাপ্ত ডাক্তারের হেপাজতে। বড়টির বয়স এখন আট বছর আর ছোট রবার্টের মাত্র পাঁচ বছর। এলেন চলে আসার সময় খুব কেঁদেছিল। তাদের কথা সর্বদা তাঁর মন জুড়ে থাকে। বালেশ্বরে আসবার সময় কোলে একবছরের কন্যা এবং তিনি গর্ভবতী ছিলেন।

বালেশ্বর ছোট শহর। শহরের পশ্চিম দিকে কাছারীর আশে পাশে সাহেব অফিসার ও কর্মচারী এবং আমেরিকান পাদ্রীর বাস। তাদের সংখ্যা নগণ্য। বালেশ্বরে আসার কিছুদিন পরে এলেন দ্বিতীয় কন্যার জন্ম দিলেন। খৃষ্টমাসের সময় কটকে কিছুদিন আনন্দে কেটেছিল। এখন আবার নিত্যনৈমিত্তিক একঘেয়ে জীবন। সকালে স্বামীর সঙ্গে ঘোড়সওয়ারী করে ফেরার পর সারাদিন নিঃসঙ্গ। ছেলেদের চিঠির জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। চিঠি কিন্তু আসে পনেরো দিনে একবার। কোনও সাহেব বাইরে থেকে এসে সকলে খুশী হন। বীমস যখন স্ত্রীকে বললেন যে মার্চ মাসে কিছুদিনের জন্য হাণ্টার আসবেন। এলেন আনন্দিত হলেন।

বীমসের খুশী হবার বিশেষ কারণ আছে। শুনেছিলেন তিনি পণ্ডিত ভাষাতত্ত্বে তাঁর বিশেষ রুচি আছে; এবং এ বিষয়ে তিনি বই লিখেছেন। বীমস হাণ্টারের পত্রের উত্তরে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখলেন :

বালেশ্বর
নভেম্বর ১২, ১৮৬৯

প্রিয় উইলিয়াম,

আপনার গেজেটিয়ারের জন্য এই প্রদেশের ইতিহাস ও ভূগোল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনি যে সুন্দর প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করেছেন একটু আগে সেটি পেয়েছি। আমার তরফ থেকে নির্ভর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সেগুলির যথাসম্ভব সঠিক জবাব দেব। বালেশ্বর দুর্ভাগ্যবশত এক নীরস জেলা; কিন্তু আপনাকে দেশীয় রাজ্য নীলগিরি এবং ময়ূরভঞ্জের (আসলে ময়ূরভঞ্জ অর্থাৎ ময়ূরের দেশ) বিষয়ে কিছু বিবরণী দেবার চেষ্টা করব। ভাবছি আমি যদি এখন পূর্ণিয়াতে থাকতাম। সেখানে চার বছর অবস্থান কালে অনেক কিছু নোট করেছিলাম।

আর একটি বিষয়, আপনিও হয়ত এটি লক্ষ্য করেছেন। লেখক হিসাবে আমি আপনার সমগোত্রীয়। লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং তার কলকাতা শাখার প্রেরিত আমার প্রবন্ধাবলী তার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু আপনি কি ভাবেন অধিকাংশ কালেক্টর আপনার প্রশ্নাবলীর কদর করবে? বিরক্ত হয়ে অনেকে হয়ত কোন ঘোষ বা বোস বাবুকে জবাব লিখতে বলবে। কজন আপনার সহকর্মী হতে ইচ্ছুক? আর ক'জনেরই বা প্রয়োজনীয় জ্ঞান অথবা ইচ্ছা আছে? আমার মতে সরকারকে বলে প্রতি জেলায় একজন করে ইউরোপীয় এসিষ্ট্যাণ্ট নিযুক্ত করান। তাঁরা আপনার অধীনে কাজ করবে। আমি নিঃস্বার্থে এ পরামর্শ দিচ্ছি কারণ বালেশ্বর সম্পর্কে সকল প্রশ্নের জবাব আমার কাছে পাবেন। শীতের দিনে তাঁবুতে বসে এ কাজ করতে আমার ভাল লাগবে। আমি বাঘ শিকার করি না, জন্তুর থেকে মানুষে আমার অধিক রুচি। ভারতের যে অঞ্চল সব থেকে আগে আমাদের অধীনস্থ হয়েছে সেই বাংলা বিহার ওড়িশার বিষয়ে এখনও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। গেজেটিয়ারের কাজ যদি কোন ঘোষ বোস বাবুদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তবে সত্য মিথ্যা রিপোর্টের যে বর্ষণ শুরু হবে তা ভেবে আমি শিউরে উঠি।

আপনার বিশ্বস্ত
জন বীমস।

মার্চ মাসে বালেশ্বর এলেন হাণ্টার। বীমস ভেবেছিলেন যতদিন হাণ্টার থাকবেন ততদিন তাঁর সঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনা চলবে। কিন্তু প্রথম দিন থেকে দুজনের মনের মিল হল না। দাড়ি গোঁফ আর সোনার ফ্রেমের চশমায় বীমসকে দেখলে মনীষী মনে হয় অন্যদিকে হাণ্টার ছুঁচোমুখো, তার উপর তার বাঁ চোখ সবসময় কাঁপে। বীমস তাঁর চোখের দিকে অপলক চেয়ে আছেন দেখে হাণ্টার বললেন বাল্যকালে একটি ছাগল তার বাঁ চোখে শিং বসিয়ে দেয় আর ঘোড়া থেকে পড়ে বাঁ হাতটি ভেঙে যায়।

কোনও আলোচনা জমে না কারণ হাণ্টার ভাবেন তিনি সবজান্তা। তাঁদের প্রথম মতভেদ হল উৎকল শব্দ নিয়ে। পুরীতে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে হাণ্টার উৎকল শব্দের অর্থ করেছিলেন উৎকৃষ্ট কলার দেশ। বীমসের মতে উৎকল অর্থাৎ বাহ্যদেশ বা গঙ্গা উপত্যকার বহির্ভূত অঞ্চল। বালেশ্বরের পণ্ডিতেরা তাঁর সহমত। এখান থেকে দুজনের মতান্তরের সূত্রপাত। হাণ্টার তাঁর পুস্তক সংকলনে ব্যস্ত এবং নানা প্রশ্ন করে বীমসকে উদ্ব্যস্ত করেন। হাণ্টার বীমসের বাড়িতে তাঁর অতিথি, রোজ রাত্রি ভোজনের সময় এলেন উপস্থিত থাকেন। বীমস দম্পতি সাধারণ আহার্য পছন্দ করেন কিন্তু হাণ্টারের প্রতিদিন শ্যাম্পেন চাই এবং সঙ্গে নানা প্রকারের উত্তম খাদ্য। সুতরাং বীমস ভাবেন একে অতিথি করে ভুল করেছেন। হাণ্টার বিদায় হলে বীমস স্বস্তি পেলেন।

পরের দিন ফকীর বীমসের কাছে এলেন। বীমসের কন্যা মার্গারেটের সঙ্গে দেখা হলে ফকীর মোহন আনন্দিত হন। দুই বছরের বালিকা ওড়িয়াতে সুন্দর কথা বলে। অনেক সাহেব দেখেছেন তিনি কিন্তু এমন সাবলীল ওড়িয়া বলতে পারে না। ফকীর মোহন কিছু বলতে চাইলে বীমস বললেন, 'বাবু এক মাস কোনও প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন করে হাণ্টার আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।'

পুরী : মার্চ ১৮৭০

প্রায় এক বছর হল রাধানাথ রায় পুরী জেলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক হয়ে এসেছেন। ততদিনে মধুরাও এর প্রবেশিকা পাশ করে চলে যাবার কথা। কিন্তু অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে না পেরে আর একবছর স্কুলে থেকে গেলেন। এর এক ফল হল সে রাধানাথের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেল। রাধানাথ মধুর পড়াশুনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। মধু গণিতে কমজোর। সে কারণে রাধানাথ রোজ তার বাড়ি গিয়ে তাকে গণিতে তালিম দিলেন।

পড়াশুনার বাইরে গুরু শিষ্যের মধ্যে আকর্ষণের অন্য কারণ সাহিত্যচর্চা। ইতিমধ্যে

রাধানাথের বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে এবং কবিতাগুলি বার বার পড়েছে মধু। সন্ধ্যায় সমুদ্রের কূলে মাইকেল মধুসূদনের কবিতা চর্চা হয় দুজনের মধ্যে। রবিবারে দীপিকা আসে এবং এতে প্রকাশিত সংবাদ আলোচিত হয়। দুজনে একসঙ্গে হরিহর দাসের বাড়ি যায়।

ইদানীং হরিহর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের কাজে ব্যস্ত আছেন। অযোধ্যার বলরামপুরের মহারাজা দিগবিজয় সিংহ সরকারের নিকট ৫৫০০ টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন। তার সুদ স্কুল পায়। তাছাড়া গরীব ছাত্রদের বৃত্তি দেবার জন্য আরও ১৩০০ টাকা দান করেছিলেন। বলতে গেলে তাঁর আনুকূল্যে বিদ্যালয়টি চলে। ইতিপূর্বে পুরীতে ব্রাহ্মণদের জন্য বিদ্যালয় ছিল না। জেলা স্কুল অবশ্য অনেকদিন থেকে আছে। কিন্তু জাত যাবার ভয়ে ব্রাহ্মণরা তাদের সন্তানদের এ স্কুলে পাঠাত না। এ অভাব পূর্ণ করল হরিহর দাসের সংস্কৃত বিদ্যালয়। অধিকাংশ ছাত্রই দরিদ্র। তাদের মাসিক তিন টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। এতে ছাত্রদের খরচ নির্বাহ হয়ে যায়। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা অবশ্য ধর্মহানির ভয়ে এখনও ছেলেদের স্কুলে পাঠায় না। পণ্ডিত হরিহর দাসের মতে ছাত্রদের ইংরাজী শেখা প্রয়োজন। রাত্রিতে ছাত্রদের ইংরাজী পড়ান হয়। এটাই ধর্মহানির আশঙ্কার কারণ।

স্কুলের নিজের বাড়ি নেই। সে এক সমস্যা। জেলা স্কুলের বারান্দায় সংস্কৃত বিদ্যালয় চলে। কিছু ঈর্ষাপরায়ণ লোক সরকারী স্কুলের বারান্দায় সংস্কৃত স্কুল চলার বিরোধিতা করল। কালেক্টর সঙ্গে সঙ্গে হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি জেলা স্কুলের বারান্দায় সংস্কৃত বিদ্যালয় চালাবার অনুমতি তো দিলেনই। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের বাড়ি তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি ফাণ্ড চালু করলেন এবং ৪০ টাকা চাঁদা দিলেন। তার অনুকরণে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এমন কি মহান্ত হয়গ্রীবও চাঁদা দিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে বৃত্তি পেল মধু। সে এফ.এ. পড়তে কটক চলে গেল। রাধানাথের মন খারাপ হয়ে গেল। মধু প্রতিশ্রুতি দিল মাসে না হলে প্রতি দু মাসে এসে দেখা করে যাবে। কটকে কলেজ নেই। জেলা স্কুলে দুটি অতিরিক্ত শ্রেণী খুলে এফ.এ. পড়লে হয়। মধুর সহপাঠীদের অন্যতম ছিলেন প্যারীমোহন আচার্য্য। অচিরে দুজন পরম মিত্র হয়ে গেল।

এফ.এ. পড়ান মাত্র দুজন শিক্ষক। ইংরাজী পড়ান রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় আর দর্শন পড়ান হরনাথ ভট্টাচার্য। মধু ও প্যারীমোহন হরনাথের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হল। হরনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা না নিলেও প্রতি রবিবার সকাল ও সন্ধ্যায় তিনি ব্রাহ্মদের প্রার্থনা সভায় যোগ দেন। তার প্রভাবে মধুসূদন ও প্যারীমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল।

পুরীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বক্সওয়েল ফেব্রুয়ারী ছুটি নিয়ে বিলাত যাবেন শুনে

হরিহর সঙ্গে যাবেন বলে স্থির করলেন। বক্সওয়েল হরিহরের অন্তরঙ্গ। যে বিলাতের বিষয়ে বইতে পড়েছেন বাসনা হল একবার সে দেশটি স্বচক্ষে দেখে আসবেন। কাজটি অবশ্য সহজ নয়। সমুদ্র পার করে ভিন্ন দেশে গেলে ধর্মহানি হয়। সুতরাং হরিহর বিলাত যাবেন রটে গেলে একটি বাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হল।

খবরটি মধুকেও নাড়া দিল। ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা সামান্য প্রভাবিত হয়েছে বটে, তার অস্থিমজ্জায় এখনও রক্ষণশীল হিন্দু সংস্কার। এর আগে যখন মধুসূদন পুরী গিয়েছিল তার শ্বশুর বলরামজী তার সামনে হরিহরের সমালোচনা করেছিলেন। এ সব ভাবছে এমন সময় হঠাৎ মনে হল সামনে একটি সজীব চলমান চিত্র :

জ্বলন্ত কাঠ কাঁধে নিয়ে পণ্ডিত হরিহর দাস ব্যাকুল হয়ে বড়দান্তে দিশাহারা ছোটাছুটি করছেন, সামনে যাকে দেখছেন তার দিকে জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারছেন। অগ্নিদগ্ধ হয়ে তারা আর্তনাদ করছে। এরকম করতে করতে শেষে নিকটবর্তী নরেন্দ্রপুকুরে ঝাঁপ দিয়ে হরিহর চিরশান্তি লাভ করলেন।

স্বপ্নটি অনেকদিন মধুকে বিচলিত করল। ভাবল এবার পুরী গেলে ব্যাপারটি রাধানাথের সঙ্গে আলোচনা করবে।

বাতিঘর : ফেব্রুয়ারী ১৮৭২

প্রথম যখন খবর এল যে বড়লাট কটক আসবেন কেউ বিশ্বাস করল না। আজ পর্যন্ত কোনও বড়লাট ওড়িশায় পা রাখেননি। কমিশনার সরকারী এ খবর পেলেন তখন কিভাবে তাঁর সংবর্ধনা করা হবে বিচার করার জন্য একটি সভা ডাকা হল। অগ্রণী ভূমিকা নিল উৎকলোল্লাসিনী সভা। বড়লাটের অভ্যর্থনার ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা তোলা আরম্ভ হল। জানুয়ারি মাসে পাঁচশ টাকা আদায় হল। স্থির হল বড় লাট পুরী থেকে ঘোড়াগাড়ি করে এসে কমিশনারের বাংলোতে অবস্থান করবেন। কাঠযোড়ি কূল থেকে বাংলো পর্যন্ত রাস্তায় চাঁদোয়া টানানো হবে এবং রাস্তার দু পাশে পুষ্পসজ্জা হবে। পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করা হবে। নদীকূল থেকে বাংলো পর্যন্ত তাকে বিধিমতে অগ্রগমন করে নিয়ে যাওয়া হবে।

কিছুদিন পরে খবর এল বড়লাট প্রথমে আন্দামান যাবেন। সেখান থেকে পুরী না গিয়ে বাতিঘরে আসবেন। অতএব উৎকলোল্লাসিনী আর একটি বৈঠক ডেকে বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করল। স্থির হল কমিশনারের বাংলো থেকে দরবার পর্যন্ত আলোকমালায় সজ্জিত করা হবে। মহানদীর চরে বাজী পোড়ান হবে। আলোকমালার জন্য কেবল গ্লাসবাতি ও চর্বিবাতি ব্যবহার হবে। উৎকৃষ্টতম বাজী সংগ্রহের চেষ্টা হবে। শহরের দুটি স্থানে গৌরীফটক ও চাঁদোয়া লাগানো হবে। নহবত বাজবে।

ইতিমধ্যে চাঁদা আদায়ে প্রগতি হয়েছে। ১২৫০ টাকা জমা হয়েছে। কমিশনারের অফিসে প্রাপ্ত বড়লাটের ভ্রমণসূচী এরূপ :

ফেব্রুয়ারী ১৪ : সস্ত্রীক বড়লাট বাতিঘর থেকে কেন্দুপাটনা যাবেন এবং রাত্রিযাপন করবেন।

ফেব্রুয়ারী ১৫ : খাল পরিদর্শন করবেন দু ঘণ্টা তারপর খালের শেষ পর্যন্ত এসে বিরূপা নদী পার হবেন। হাই লেভেল খাল পার হয়ে কিছুদূর যাবেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসবেন। অপরাহ্ন চারটায় বড়লাট জোব্রা পৌঁছবেন। এখানে তোপ সালামী দেওয়া হবে। সেখান থেকে তালদণ্ডা খাল যাবার প্রথম সাঁকো দিয়ে মঙ্গলাবাগে কমিশনারের অফিস, বক্সিবাজার, জেলখানা, জজকোর্ট, বালুবাজার হয়ে লালবাগে কমিশনারে বাংলোতে আসবেন। বড়লাট ও তাঁর সহগামীরা লালবাগে থাকবেন। ছোট লাট ও তাঁর সঙ্গীরা কমিশনারের অফিস ঘরের দ্বিতলস্থিত সার্কিট হাউজে থাকবেন।

ফেব্রুয়ারী ১৬ : সকালে ঘোড়ায় চড়ে বড়লাট নরাজ যাবেন এবং সেখান থেকে নৌকা ভ্রমণ করে এগারটায় ফিরে আসবেন। মধ্যাহ্নে সরকারী সাধারণ সংস্থাগুলি পরিদর্শন করবেন। সেদিন অপরাহ্ন চারটায় কেল্লার সামনে দরবার হবে। সকল নির্বাচিত সিভিল ও মিলিটারী অফিসার এতে যোগ দেবেন। কমিশনার রাজন্যবর্গের সঙ্গে বড়লাটের বিধিবদ্ধ পরিচয় করাবেন। কালেক্টর মোগলবন্দী রাজা, জমিদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পরিচয় দেবেন।

ফেব্রুয়ারী ১৭ : সকালে বড়লাট ভুবনেশ্বর পরিদর্শনে যাবেন। কাঠযোড়ি পার হয়ে পুরী ঘাট থেকে ঘোড়াগাড়িতে টণ্ডকপানি পর্যন্ত যাবেন। সেখান থেকে হাতি বা ঘোড়ায় চড়ে লিঙ্গরাজ মন্দির দর্শন করবেন। ভুবনেশ্বর এবং খণ্ডগিরির মাঝামাঝি তাঁবু খাটানো হবে। সেখানে বড়লাট মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন। তারপরে খণ্ডগিরির গুহাগুলি ঘুরে দেখে কটকে ফিরে আসবেন।

ফেব্রুয়ারী ১৮ : সকালে কটক থেকে যাত্রা করে বাতিঘরে যাবেন এবং সেখান থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

কলকাতা থেকে বড়লাটের ব্যবহার্য সামগ্রীগুলি আসতে আরম্ভ করল। ২৮শে জানুয়ারী শিবির করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এল, তিনটি তোপ, পতাকার জন্য খুঁটি ইত্যাদি। জাহাজে করে দশটি ঘোড়া এল ২রা ফেব্রুয়ারী। যতদিন বড়লাট ওড়িশায় থাকবেন ততদিন ডাক চলাচল ত্বরান্বিত করার জন্য মার্শাঘাই থেকে বাতিঘর পর্যন্ত দুখানি অতিরিক্ত ডাক নৌকা বহাল হল। সমুদ্র ও নদীপথে চলাচল সুগম করার জন্য কলকাতা থেকে তিনটি ষ্টীমার এসে বাতিঘরে নোঙর ফেলল।

দরবারে যাদের আমন্ত্রণ করে হবে তাতের তালিকা প্রস্তুত হল। স্থির হল উচ্চ সামন্ত রাজারা প্রত্যেকে ২০০ টাকা এবং নিম্ন সামন্ত রাজারা ১০০ টাকা করে নজরাণা

দেবেন। তাঁদের খিলাত অথবা শিরোপা দেওয়া হবে। জমিদারগণ নজরাণা দেবেন না, তাঁরা খিলাত অথবা শিরোপা পাবেন না।

৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গ কটক আসতে শুরু করলেন। দশ তারিখ নাগাদ পাললহড়া, তালচের, আটমল্লিক, খণ্ডপাড়া, বড়ম্বা, ঢেঙকানল, নরসিংহপুর মধুপুর ইত্যাদি গড়জাত ও মোঘলবন্দী রাজা এসে গেলেন। সকলের সঙ্গে আছে লোকজন হাতি ঘোড়া বাজাদার ইত্যাদি। কার সঙ্গে কতজন পাইক বরকন্দাজ তা নিয়ে অলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলে কটকে প্রচুর লোক সমাগম হল। রাজাদের অনুচরদের পোশাক লোকের মজার খোরাক। কেউ হরিণের চামড়া কেউ বাঘের ছাল পরেছে। মনে হয় উৎসব চলছে। এত বড় সমাবেশ আগে কোনও দিন হয়নি কটকে।

রাত্রি হবার আগে দরবার সমাপ্ত হবে। সুতরাং কার্যসূচীর সামান্য পরিবর্তন দরকার হল। এর জন্য উৎকলোল্লাসিনীর সভা আর একবার বসল। এবার স্থির হল মঙ্গলাবাগ, গৌখানা, চৌধুরীবাজার ও কমিশনারের অফিসের সামনে তোরণ নির্মিত হবে। রাত্রিতে কাঠঘোড়ীর চরে বাজী পোড়ানো হবে। জোব্রা থেকে লালবাগের বাংলো পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে অভ্র গেলাস পোঁতা হবে। বড়লাট যখন আসবেন তখন যদি অন্ধকার নেমে আসে তবে তখন, না হলে তিনি ফিরে যাবার সময় আলোকমালায় উদ্ভাসিত হবে সেই পথ। কালেক্টরের অফিসের উপরে এবং লালবাগের বাংলোতে বিদ্যুৎযন্ত্র বসিয়ে রোশনির ব্যবস্থা হবে। সংগৃহীত অর্থের ব্যয় নির্দিষ্ট হল :

দুটি কলকাতী বিদ্যুৎ রোশনি ৫০০ টাকা।

গৌরী ফটক ও গেলাস রোশনি ৪০০ টাকা।

আতস বাজী ও অন্যান্য বাজী ৪০০ টাকা।

১৩ই ফেব্রুয়ারী বসন্ত পঞ্চমী। পাছে সরস্বতী পূজার জন্য সব ফুল শেষ হয়ে যায় তাই কিছু ফুল তুলে সাবধানে রাখা হল তোরণ তৈরী করার জন্য। সকাল থেকে লোক তোরণ তৈরীতে জুটে গেল। রাস্তার দু ধার থেকে ছোট দোকানগুলি উঠিয়ে দেওয়া হল। ঘরের সামনে কলাগাছ পুঁতে সন্ধ্যায় দীপ জ্বালানোর বন্দোবস্ত করল গৃহস্থ ও দোকানদাররা। দরবারের কাছে এবং জোব্রায় অফিসারদের জন্য তাঁবু খাটানো হল। সম্ভ্রান্ত লোকেরা অভিনন্দনপত্র রচনা করিয়ে ছাপাতে দিল। কবি ও পণ্ডিতগণ স্বাগত গীত ও শ্লোক রচনায় মন দিল।

পুরীর রাজা দিব্যসিংহের নামে সেদিন সন্ধ্যায় প্রিন্টিং প্রেসের অফিসে রাজা মহারাজদের এক বৈঠক ডাকা হল। বাড়ির সামনে কলাগাছ পুঁতে আমপাতা ও ফুলের মালায় সুন্দর করে সাজানো হল। সন্ধ্যাবেলায় হাতি ঘোড়া পাল্কি, সিপাহী বাজানাদারে দরগা বাজার জমজমাট হয়ে গেল।

বড়লাটকে অভ্যর্থনা করতে সদলবলে রেভেনশা বাতিঘরে প্রতীক্ষা করছিলেন। ১৮ই ঠিক কোন সময় বড়লাটের জাহাজ পৌঁছাবে জানা নেই। জাহাজটি বড়, কূলের

খুব নিকটে আসতে পারবে না। সুতরাং দূর থেকে জাহাজ দেখা যেতেই ষ্টীমার নিয়ে যাবেন তাঁকে আনতে। রেভেনশা জরি দেওয়া নীল পোশাক পরেছেন, তাঁর মাথায় টুপি। জাহাজ দেখতে পেয়ে রেভেনশা ষ্টীমার নিয়ে অগ্রসর হলেন। কে একজন জাহাজে কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে রেভেনশাকে বায়নাকুলার দিল। তিনি দেখলেন জাহাজের মাস্তুলে পতাকা অর্ধনমিত। এক ঘণ্টা পরে জাহাজ কাছে এসে খবর দিল যে আন্দামানে বড়লাটকে হত্যা করা হয়েছে।

লর্ড মেয়ো ৮ই সকালে হোপ টাউনে পৌঁছেছিলেন। সেখানে সারাদিন জেল ইত্যাদি দেখে অপরাহ্ন পাঁচটায় মাউণ্ট হ্যারিয়েট দেখতে গেলেন। পাহাড় থেকে নেমে যখন টাউন জেটীর দিকে যাচ্ছিলেন তখন সাতটা বেজে গেছে। অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে যাবার জন্য লোকেরা মশাল জ্বালিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেয়ো সিড়ি দিয়ে নামছিলেন এমন সময় শের আলি নামক একজন কয়েদী পাশের ঝোপ থেকে লাফিয়ে পড়ে বড়লাটকে সজোরে ছুরিকাঘাত করল, তিনি ঢলে পড়লেন। ধরাধরি করে জাহাজের মধ্যে নিয়ে যাবার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃতদেহ কলকাতা পাঠানো হল। মাদ্রাজের গভর্নর নেপিয়ারকে খবর দিকে একটি জাহাজ গেল। 'নেমেসিস' জাহাজ বাতিঘরে গেল। সাগরদ্বীপ থেকে তার যোগে কলকাতা খবর পাঠাতে গেল অন্য একটি জাহাজ।

ছোট ক্যাম্বেল বাতিঘর যাবার জন্য হুগলী এসেছেন। এমন সময় খবর এল বড় লাটকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি কলকাতা ফিরে গেলেন। তার যোগে কটকে খবর এল। কালেক্টর ম্যাকফার্সন জেলখানা অফিসে গিয়ে সকলকে খবর দিলেন। প্রিন্টিং কোম্পানির অফিসে খবর এলে রাজাদের সভা ভেঙে গেল। বাতিঘরে ছিলেন বলে রেভেনশা সেদিন খবর পেলেন না। সেখানে টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা নেই। ১৪ই সকালে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য কালেক্টর নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন :

শ্রীমতী মহারাণীর প্রতিনিধি বড় লাট লর্ড মেয়ো এ মাসের ৮ই আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। আজ্ঞা হয়েছে সর্বসাধারণ শোকচিহ্ন ধারণ করবে। লর্ড নেপিয়ার আসা পর্যন্ত মান্যবর জন ষ্ট্রেসী কার্যকর ভাইসরয় হিসাবে দায়িত্ব নির্বাহ করবেন।

আর একটি আদেশ দ্বারা সরকারী অফিসগুলি দুদিনের জন বন্ধ রাখা হল।

বালেশ্বর : ডিসেম্বর ১৮৭২

বীমস বালেশ্বর এসেছেন তিন বছর হল। তাঁর তিনটি সন্তানের জন্ম হয়েছে এখানে। তাঁর সপ্তম সন্তান একটি কন্যার জন্ম হয়েছে মাত্র দুমাস আগে। স্ত্রী এলেন আজকাল

ম্যালেরিয়া এবং আরও নানা রোগে ভোগেন। বাইরে খোলা হাওয়ায় যাওয়া প্রায় বন্ধ। বীমস অবশ্য পূর্ববৎ কর্মব্যস্ত। তাঁর তুলনামূলক ব্যাকরণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এবং এটি ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে আদৃত হয়েছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকখানি পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেছেন।

বীমসের ওড়িশা ভাল লাগে। এই প্রদেশের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। ব্যাকরণ লেখার সময় ফকীর মোহনের সঙ্গে পরিচয় হয়। দীনকৃষ্ণ দাসের 'রসকল্লোলের' উপর তাঁর প্রবন্ধ 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিক্যারী'তে প্রকাশিত হয়েছে। দীপিকা তিনি নিয়মিত পড়েন। রেভেনশার কাছে কাজ থাকলে মাঝে মাঝে কটক যেতে হয়। তখন বিচিত্রানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গৌরীশংকরকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না কিন্তু তাঁর খবর রাখেন। বার বছর কটক কালেক্টরের অফিসে আবগারী রাইটারের কাজ করে এখন তিনি জজকোর্টে অনুবাদক। বালেশ্বর থেকে কয়েক বছর আগে 'বোধদায়িনী' ও 'বালেশ্বর সংবাদবাহিকা' প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ বাহিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বীমসের প্রেরণায় সেটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করল। পত্রিকাটি মুদ্রিত হয় পি. এম. সেনাপতি এণ্ড কোম্পানির উৎকল প্রেসে। এ প্রসঙ্গে বীমস লিখলেন :

সাধারণের গোচরার্থে বিজ্ঞাপন

> বঙ্গদেশের মান্যবর ছোটলাটের অনুমতি ক্রমে 'বালেশ্বর সংবাদ বাহিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হল। এর একভাগে সাধারণ সংবাদ থাকবে এবং অন্যভাগে সরকারী বিজ্ঞপ্তি আদেশাবলী ইত্যাদি। অতএব সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে উক্ত পত্রিকার সরকারী ভাগে যা কিছু প্রকাশ পাবে তাকে সরকারী আদেশ হিসাবে মানবে। যে সকল বিধান এখন প্রচলিত আছে তাতে যদি কোনওরকম সংশোধন অথবা পরিবর্তন করা হয় তবে তার কারণ সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করা হবে। যদি কোনও বিধান প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং নতুন বিধান প্রবর্তন করা হয় তবে তার কারণও প্রাঞ্জলভাষায় লেখা হবে। নতুনের প্রয়োজনীয়তাও সূচিত করা হবে।
>
> সরকার যখন কোনও নতুন আইন প্রণয়ন করে প্রজাহিত এবং অনিষ্ট নিবারণ তার লক্ষ্য হয়। ফল যাই হোক। অস্বীকার করছি না যে আইন কানুনের দ্বারা প্রজাদের হিত ছাড়া অহিত হয় না। সরকার সর্বজ্ঞও নয়। সাধারণ লোকের মতই তাদের কল্পনা ও অনুমান। প্রজারা চুপ থাকলে সরকার নাচার। এ কথা অবশ্য সত্য যে আইন ও বিধানগুলি ভাল করে যাচাই করে তার মর্ম বুঝে নেওয়া সকলের পক্ষে সহজ নয়। আইন কানুনের ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা আছে। সরকারের অভিপ্রায়ের বিষয়ে অজ্ঞতাই এমন ধারণা জন্মায়। এখন থেকে এমন ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করব আমরা। প্রণীত আইন কানুনগুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলে সহজে বোঝা যাবে সরকার কেমন প্রজাবৎসল। তখন এগুলি তারা মেনে নেবে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকাটি সরকার ও প্রজাদের মধ্যস্থের ভূমিকা নেবে।
>
> আমি এ প্রদেশে বদলী হয়ে অনেক লোকের সান্নিধ্যে এসেছি, অনেক কিছু শিখেছি, আবার অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে। ওড়িয়া ভাষায় আমার জ্ঞান থাকলে ব্যবহারিক দক্ষতার অভাব বোধ করি। আমার উচ্চারণ নির্ভুল নয়। ইউরোপীয় লোক এ দেশের

ভাষায় যতই জ্ঞানী হোক তাদের উচ্চারণের জড়তার জন্য তাদের মুখে দেশীয় ভাষা ভাল করে বুঝতে পারে না। তাছাড়া আইনের তাৎপর্য দেশীয় ভাষায় বোঝানোর ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এ পত্রিকায় মন্তব্যগুলি ওড়িয়াতে প্রকাশ করা হবে।

আইন বা ব্যবস্থাদির বিষয়ে কারও মনে কোনও রকম সন্দেহ থাকলে আমাদের অবগত করান, আমরা এ পত্রিকার মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ দেব।

জন বীমস

২০শে জুন ১৮৭২ কালেক্টর বালেশ্বর।

আর যার সঙ্গে বীমসের সৌহার্দ হয়েছে তিনি হলেন রাধানাথ রায়। তিনি রাধানাথের পিতা সুন্দর নারায়ণকে চেনেন কারণ তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী। পুরীতে তিন বছর কাজ করার পরে কিছুদিনের জন্য রাধানাথ বাঁকুড়ায় বদলী হয়ে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর হয়ে বালেশ্বরে যোগ দিলেন ১লা অক্টোবর। যখন পুরী ছিলেন তখন রাধানাথ রেমুনার চন্দ্রমোহন আদিত্যের কন্যা পরশমণিকে বিবাহ করেছিলেন। চার বছর আগে 'কবিতাবলী' প্রকাশিত হলে তিনি কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিছুদিন পরে রাধানাথের মিত্র বৈকুণ্ঠনাথ দে কবিতাবলীর দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশ করলেন। কিন্তু পুস্তকের বিজ্ঞাপন পড়ে রাধানাথ ক্ষুব্ধ হলেন। এতে লেখা হয়েছে : গ্রন্থকার আমার পরম মিত্র। উৎকলবাসীর পক্ষে বাংলায় কবিতা রচনা যেমন হাস্যকর তেমনি উপহাসের কারণ সে রচনা প্রকাশ করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। বন্ধুর রচনার মূল্য বিচার কেউ করে না। উদার বাংলা পাঠকগণ লেখককে উৎসাহিত করার জন্য একজন উৎকলবাসী এটি রচনা করেছেন ভেবে পড়বেন।

বৈকুণ্ঠনাথ তাকে মিত্র বললেও রাধানাথ জানতেন তাঁর প্রতি বৈকুণ্ঠনাথ গভীর ক্ষোভ পোষণ করেন। স্কুলে তাঁরা সহপাঠী ছিলেন। রাধানাথ অধিক মেধাবী, ডবল প্রোমোশন পেয়ে বৈকুণ্ঠনাথের শিক্ষক হয়ে বসলেন। সেই লজ্জায় বৈকুণ্ঠনাথ পড়াশুনা ছেড়ে দিল। বিজ্ঞাপনে যাই লিখুন রাধানাথ জানতেন যে ফকীর মোহন এবং অন্যরা পাঠ্যপুস্তক লেখেন এবং বাংলা রচনার অনুবাদ করেন মাত্র, মৌলিক রচনা একমাত্র তিনিই করেন।

রাধানাথ বালেশ্বর ফিরে আসার কিছুদিন পরে দেওয়ানের পদ পেয়ে ফকীর মোহন নীলগিরি চলে গেলেন। বীমস তাকে সুপারিশ করেছিলেন এবং রেভেনশা তাকে নিযুক্ত করলেন। বালেশ্বর থেকে নীলগিরির দূরত্ব মাত্র এগার মাইল। কিন্তু শেরগড় থেকে নীলগিরি পর্যন্ত চার মাইল রাস্তা এত খারাপ যে ঘোড়ায় অথবা পাল্কিতে যাতায়াত করা অসম্ভব। দেওয়ান হয়ে রাস্তার এই অংশ মেরামতের কাজ হাতে নিলেন ফকীর মোহন। রাস্তার উন্নতি হলে ফকীর মোহন প্রতি শনিবার বালেশ্বর আসতে লাগলেন। গড়গড়িয়ার ঘাটে আবার রাধানাথের সঙ্গে মিলতে লাগলেন।

একবার বালেশ্বরে এসে বীমসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি অভিযোগ করলেন গৌরীশংকর তাঁর বিরুদ্ধে লিখেছেন। প্রমাণ স্বরূপ দীপিকার একটি লেখা ফকীর মোহনকে দেখালেন যেটি তিনি কাল কালিতে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন :

বীমস সাহেব যদি নিজের অধঃস্তন কর্মচারীদের কার্যকলাপ খতিয়ে দেখতেন তবে জানতে পারতেন যে তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে কত অপকর্ম চলছে। কিন্তু তিনি যা বুঝেছেন তার উপর কারো কিছু বলার নেই।

ফকীর মোহন বীমসকে বোঝালেন যে গৌরীশংকর তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না। সে স্পষ্টবাদী, ভাল দেখলে ভাল বলে খারাপ দেখলে খারাপ। বীমস অনেকগুলি দীপিকা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কোথায় ভাল লিখেছে দেখান তো?' মহাবিপদে পড়লেন ফকীর মোহন। মাটিতে বসে সব কটি দীপিকা তন্ন তন্ন করে পড়লেন। শেষে যা খুঁজছিলেন তা পেলেন এবং বীমসকে দেখালেন :

আমরা জেনে খুশী হয়েছি যে বীমস সাহেব বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহস্বামীদের অবস্থা বিচার করে চার আনা থেকে চার টাকা পর্যন্ত অর্থ সাহায্য করেছেন।

বীমসের মুখে সামান্য হাসির ঝলক। তিনি সংবাদটি লাল কালিতে চিহ্নিত করে পত্রিকার এই সংখ্যাটি আলাদা রেখে দিলেন। ফকীর মোহন আর একটি কথা বলবেন কি না বিচার করলেন। শেষ পর্যন্ত সাহেব কিছু মনে করবেন ভেবে আর বললেন না। কথাটি হল তার পশ্চাতে লোকে তাকে ভীম সাহেব বলে। এ পদবী কর্মদক্ষতার জন্য না মারমুখী স্বভাবের জন্য সে বিষয়ে ফকীর মোহন নিঃসন্দেহ নন।

পুরী : মে ১৮৭৩

রেভেনশা আজকাল কটকের সকল সভাসমিতি বিশেষ করে স্কুলের সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কটক সোসাইটি উৎকলোল্লাসিনী ও ডিবেটিং ক্লাব মিলিয়ে একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য উদ্যোগী হলেন তিনি কিন্তু কার্যকর হলেন না। বরং একটি নতুন সংস্থার উৎপত্তি হল, প্যারীমোহনের ইয়ঙ্গম্যানস লিটারারী এসোসিয়েশন। রেভেনশা মাঝে মাঝে স্কুলগুলি পরিদর্শন করেন। ওড়িয়া লীলাবতীসূত্র পড়ে কখনও কখনও ছাত্রদের প্রশ্ন করেন, যেমন দ্বিপঞ্চ, দ্বাত্রিংশ, ত্রিনব, শত, অষ্টাদশ, দশশত নিযুত সংকলিত কর, তিনশ ষাট অংক নিকর কর ইত্যাদি। কটক হাই স্কুলের ছাত্রদের পুরস্কার দেবার জন্য তিনি প্রতিবর্ষ একশ টাকা দেন।

পুরী জেলা স্কুল থেকে পুরস্কার বিতরণের আমন্ত্রণ এলে রেভেনশা রাজী হলেন কিন্তু বললেন যে পুরস্কার বিতরণ হবে ২৫শে মে এবং হবে একসঙ্গে সব স্কুলের।

পরে জানা গেল এ তারিখের তাৎপর্য। ছাত্রদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ঠিক করে দিলেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। হিন্দুদের পৌত্তলিকতা বা খৃষ্টানদের মূর্তি পুজার বিরোধিতার কথা ভেবে তিনি প্রবন্ধের বিষয় চয়ন করেননি, এর কারণ একটি বিশেষ ঘটনা যেটি আজকাল সকলের আলোচ্য বিষয়। তিনি বিচিত্রানন্দকে এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানাতে বলেছিলেন।

হঠাৎ খবর এল যে ঝাকড় ঠাকুরাণীর আজ্ঞাপত্র বার হয়েছে যে পুরীতে বিমলাক্ষ্মী ঠাকুরাণীর কাছে হাঁড়ি পাঠিয়ে ভোগ দিতে হবে। গুজব শুনে লোক হাঁড়িতে চাল, আম, তরকারী, পয়সা রেখে রাস্তার পাশে রাখতে আরম্ভ করল। যার নজরে পড়বে তার কাছ হাঁড়িটি পুরীর রাস্তায় কিছু দূর এগিয়ে রেখে দেওয়া। এভাবে রিলে করে হাঁড়ি পুরীর দিকে অগ্রসর হবে। ভয়ে হাঁড়ির থেকে কেউ কিছু নেয় না। কারণ গুজব এও বলেছে যে হাঁড়িকে কিছুদূর এগিয়ে নেওয়া ছাড়া পথচারীদের আর কিছু করণীয় নেই। যে হাঁড়ি থেকে চুরি করবে বা হাঁড়িকে এগিয়ে নেবে না যোগিনী তাকে খেয়ে ফেলবে।

বিচিত্রানন্দের সঙ্গে গৌরীশংকরও গেলেন এই চমৎকার দেখতে। কাঠঘোড়ীর কূলে একটি গাছের ছায়ায় অনেক হাঁড়ি দেখলেন তাঁরা। রাস্তায় যে যাচ্ছে একটি হাঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে কিছুদূর যেয়ে রেখে দিচ্ছে। দুদিন পরে আবার গেলেন সেখানে, ভেবেছিলেন হাঁড়িগুলি পুরীর রাস্তায় অনেক দূর চলে গেছে। কিন্তু দেখা গেল অনেকগুলি ভাঙা হাঁড়ি পড়ে আছে। লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল কয়েকজন মাতাল হাঁড়ি থেকে পয়সা নিয়ে গেছে, আর চাল তরকারী গোরুতে খেয়েছে। শুনে রেভেনশা খুশী হলেন, বললেন দীপিকাতে এ খবর ছাপান, অন্ধবিশ্বাস দূর হোক।

পঁচিশ তারিখ পুরী জেলা স্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভা হল। রেভেনশা প্রধান অতিথি। পুরীর কালেক্টর, ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর, জমিদার মহান্ত ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। সকলে লক্ষ্য করলেন পুরীর রাজা আসেননি। নিজে না এসে মোক্তারের হাতে চল্লিশ টাকা পাঠানো অশোভন লাগল।

যাই হোক সভার কাজ সময়মত আরম্ভ হল। সরকার যে অনুদান দিয়েছিলেন তার সংগৃহীত চাঁদার টাকা মিশিয়ে কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। ইংরেজী স্কুলের ছাত্ররা শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার থেকে সিজারের হত্যার দৃশ্য অভিনয় করল। সংস্কৃত স্কুলের ছেলেরা অজের বিলাপ আবৃত্তি করল। ওড়িয়া স্কুলের ছাত্ররা 'বৈদেহীশ বিলাস' থেকে 'বিতলকে আলিঙ্গন' গেয়ে শোনাল। নাট্যগীতের জন্যও পুরস্কার দেওয়া হল।

কমিশনারের অনুরোধে প্রথমে ডেপুটী কালেক্টর নন্দকিশোর দাস এবং স্কুল ইনস্পেক্টর ভাষণ দিলেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর তাঁর ভাষণে রাজার সমালোচনা করে বললেন তিনি না এসে মোক্তারকে দিয়ে চল্লিশ টাকা পাঠিয়েছেন এটা ক্ষোভের বিষয়।

রাজা যদি আসতেন এবং কুড়ি টাকা অথবা কিছুই না দিতেন তাতে লোকে খুশি হত। দুঃখের বিষয় জনহিতের কাজে রাজার আগ্রহ নেই। রেভেনশা ছাত্রদের উপদেশ দিলেন যে তারা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করে আরও মন দিয়ে পড়াশুনা করে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবার চেষ্টা করুক। পুরীর রাজার প্রসঙ্গে বললেন রাজা উত্তম বংশজ লোকদের কাছে না রেখে নিচাশয় চাটুকারদের বুদ্ধিতে চলেন। আরও বললেন নিজের মহলে রুদ্ধদ্বারের পিছনে থেকে কেউ রাজা মহারাজা হয় না। রাজা এখন নাবালক নন তবুও চাটুকারদের কথায় চলেন এ বড় নিন্দার যোগ্য।

অবশেষে তিনি সকলকে জানালেন যে সেদিনটি মহারাণীর জন্ম দিন। তিনি উচ্চৈস্বরে 'লং লিভ দি কুইন' বললেন, সকলে হিপ হিপ হুররে বলে তার সমর্থন করল। সভা ভঙ্গ হতে রাত্রি হল। বাড়ি ফেরার সময় যে বিষয়টি আলোচিত হল সেটি পুরস্কার বিতরণ নয়, মহারাণীর জন্মদিনও নয়—বিষয়টি দুষ্ট চাকর পরিচালিত বিপথগামী রাজা।

যার বিষয়ে সকলে আলোচনা করল সে তখন আফিম খেয়ে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর পাশে নিদ্রিত। রাজপুরের রাজকন্যা নীলাদ্রির সঙ্গে এক মাস আসে তার বিবাহ হয়েছে। বিবাহে খুব জাঁকজমক হয়েছিল এবং শহর বাসীর কাছে সেটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। বাজী, রোশনী, গীতবাদ্য, শংখধ্বনি, উলুধ্বনি, বৈষ্ণব ভোজন, বাঈজীর নাচ—স্বয়ং কালেক্টর হাতির পিঠে বসে উপভোগ করলেন। দিব্যসিংহের চোখের সামনে এখনও এ দৃশ্য ভাসে।



সাত

পুরী : জুলাই ১৮৭৩

মে মাসে পুরীর কালেক্টর হয়ে এলেন জে. এস. আর্মষ্ট্রং। তিনি দশ বছর আগে একবার ওড়িশায় কাজ করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় যাজপুরে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। সুন্দর ওড়িয়া বলতে পারেন। যদিও লোকে ভাবে তিনি একটু পাগল, দক্ষ অফিসার বলে তাঁর খ্যাতি আছে। প্রতিটি বিষয় গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, সবদিক বিচার করে কাজ করেন। তিনি কালেক্টর হয়ে আসার কিছুদিন পরেই রথযাত্রা।

কিন্তু তার আগেই অন্য একটি সমস্যা দেখা দিল। মন্দিরে ভাতের ফেন নিষ্কাশনের যে নালাটি আছে অনেকদিন তার সংস্কার হয়নি। এটি এখন অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় এসে গেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ম অনুসারে এই অবহেলার জন্য রাজাকে একটাকা জরিমানা করা হয়েছিল। তথাপি রাজা বিষয়টি উপেক্ষা করলেন। পূর্বতন কালেক্টর রাজার উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল যদিও হেলথ্ অফিসার ফেন পড়ার জায়গায় একটি চৌবাচ্চা বানিয়ে দিয়েছিলেন, মন্দিরের ভিতরের অংশে মেরামত হয়নি। সুতরাং ফেন নালায় জমে এবং পচে। চারদিনের মধ্যে নালাটি মেরামত করতে বলা হল রাজাকে। নির্দেশ দেওয়া হল যে কাজের দৈনিক অগ্রগতির রিপোর্ট কালেক্টরকে পাঠাতে হবে।

রাজা কিন্তু নির্বিকার। অগত্যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ম অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল। ভয় পেয়ে রাজা কিছু কাজ করালেন এবং জানালেন যে নালাতে ফেন পড়া কিছুদিনের জন্য বন্ধ না করলে মেরামতের কাজ চালু রাখা সম্ভব নয়। রথযাত্রার সময় রন্ধনগৃহ বন্ধ থাকবে, তখন কাজ সম্পূর্ণ করবেন। আর্মষ্ট্রং রথ যাত্রার পরে এ বিষয়ে মন দেবেন ভেবে নোট করে রাখলেন।

রথযাত্রা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তার জন্য সেরিস্তাদার রামপ্রসাদ সিংহ জেনে নিলেন ক্রিয়া কর্ম কি ক্রম অনুসারে হয়। অফিসারদের বৈঠক ডেকে ঠিক করলেন কোন কোন বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সেগুলি হল : যাত্রীদের জন্য ঘাটের সুবিধা, তাদের থাকবার ব্যবস্থা, শহর পরিচ্ছন্ন রাখা, সময়মত খাদ্য জুগিয়ে দেওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, ঔষধের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা এবং ঠাকুর দর্শনে যাতে বিশেষ বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অফিসারদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। রাজাকে নির্দেশ দেওয়া হল তিনি যেন স্নান যাত্রার পূর্বদিন সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেন। স্নান যাত্রার দিন সকাল ন'টায় যেন তিন ঠাকুর স্নানমণ্ডপে এসে যান। দুই

ডেপুটী কালেক্টর কেদারনাথ দত্ত ও নন্দকিশোরকে নির্দেশ দেওয়া হল তাঁরা মন্দিরে উপস্থিত থেকে সব আয়োজন লক্ষ্য করবেন এবং মাঝে মাঝে আর্মষ্ট্রংকে পরিস্থিতি অবগত করাবেন।

পূর্ণিমার দিন সকাল নটায় আর্মষ্ট্রং ঘোড়ায় চড়ে সিংহদ্বারে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন এত প্রস্তুতি সত্ত্বেও মন্দিরের সিংহ দরজা তখনও বন্ধ। বাইরে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভীড়। মন্দির ঘুরে দেখলেন সব কবাট বন্ধ। পুলিশকে ভীড় সামলাতে বলে তিনি কাছারী চলে এলেন এবং রাজার নামে একটি মামলা রুজু করে সমন পাঠালেন। পুলিশ রাজবাড়ি গিয়ে সমন জারী করল এবং দেওয়ানকে ধরে আনল। রথযাত্রার অব্যবস্থার অপরাধে রাজার জরিমানা হল দশ টাকা। আর্মষ্ট্রং আদেশ দিলেন এর পরে কোনও ত্রুটি হলে প্রতি ত্রুটির জন্য একশ টাকা জরিমানা দিতে হবে রাজাকে।

স্নান যাত্রার দিন এগারটায় পহন্তি হল, তিনটায় নীতিকর্ম। মন্দিরের দরজা খোলা হল পাঁচটায়। এভাবে সব কাজে বিলম্ব হল। কিন্তু পরের দিন থেকে সবকিছু ঠিক সময়ে হল। নবযৌবনের দিন অফিসারদের তত্ত্বাবধানে রাত্রি এগারটায় মন্দিরের দরজা খোলা হল। সকাল নটা নাগাদ একলক্ষ তীর্থযাত্রী দর্শন করতে পারল। গুণ্ডিচার দিন ঠিক ছটায় তিন ঠাকুর রথের উপর পহন্তি করলেন। রথ দ্রুত গুণ্ডিচা ঘরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা হল। তিনদিন পরে রাত্রি দুইটায় ঠাকুর ত্রয় পহন্তি করে গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

এইভাবে শৃঙ্খলাপূর্ণ রথযাত্রা সমাপ্ত হল। লক্ষাধিক যাত্রী সমাগম হলেও মাত্র দুটি পুলিশ কেস হয়েছিল। খুর্দার কানুনগোর ভাই এক মহিলার স্তনমর্দনের অপরাধে দু মাসের জন্য জেলে গেল। এক চোর রথের উপর থেকে একজন পশ্চিমা স্ত্রীলোকের কানের দুল ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ধরা পড়ল। তার একমাস কারাবাস হল। বাহুড়া যাত্রাও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। এই প্রথম ঠাকুর যাত্রা শেষ করে বারদিনের মধ্যে শ্রীমন্দিরে রত্নাসিংহাসনে বিরাজমান হলেন।

সকলে আর্মষ্ট্রং-এর প্রশংসা করল। এরকম সুপরিচালিত রথযাত্রা আগে দেখা যায়নি। কিছু লোক এও বলল যে মলিকাতে সত্যই লেখা ছিল যে সত্য প্রকাশিত হবে সতেরোতে। হয়তো সতেরো অংকে এ রকম সুনিয়ন্ত্রিত রথযাত্রার কথা বলা হয়েছে। নানা লোক সত্যপ্রকাশের নানা কারণ উল্লেখ করল। প্রজারা ভাবল জমিদারের উৎপীড়ন বন্ধ হবে। মাড়োয়ারীরা ভাবল আয়কর উঠে যাবে। একজন পণ্ডিত সত্যপ্রকাশের তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করলেন : আমকে সত্য ফল বলে। এ বছর প্রচুর আম হয়েছে।

বালেশ্বর : অক্টোবর ১৮৭৩

জুলাই মাসে সুন্দরনারায়ণ কলেরায় মারা গেলেন। রাধানাথ শোকে মগ্ন হলেন। এক দারুন অপরাধ বোধ তাঁকে পীড়া দিল। বাল্যকালে রুষ্ট হয়ে পিতার মৃত্যু কামনা করেছিলেন। এখন মনে হল পিতার মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। আবার এও ভেবে স্বস্তি পেলেন যে অনুশাসন শেষ হল। এবং এই মনোভাবের জন্য তিনি লজ্জিত হলেন।

অনেকে সমবেদনা জানাতে এল। খবর পেয়ে নীলগিরি থেকে এলেন ফকীর মোহন। তিনি জীবনের অনিত্যতার উল্লেখ করলেন। কুমার বৈকুণ্ঠনাথ ও তাঁর পিতা মাঝে মাঝে এসে ভালমন্দ বুঝে যেতে লাগলেন। কালেক্টরের পিয়ন একখানি পত্র দিয়ে গেল। বীমস লিখেছেন :

আমার প্রিয় রাধানাথ,

তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মর্মাহত হয়েছি। তিনি কঠিন পরিশ্রমী, দক্ষ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী ছিলেন। সর্বদা সব কাজে আমার সহায়তা করতেন। অনেক আগে আমি পিতাকে হারাই। সে শোক আজও আমাকে পীড়া দেয়। সেজন্য আমি তোমার প্রতি গভীর সমবেদনা অনুভব করছি।

শ্রাদ্ধাদি শেষ হলে বাইরে এসে প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার কাকাদের বিষয়ে যদিও কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, তুমি জান যে তোমার পরিবারকে এই শোকাবহ সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হব না।

তোমার সহৃদয় বন্ধু

৩১শে জুলাই, ১৮৭৩ জন বীমস

সুন্দরনারায়ণের মৃত্যুর পরে সমস্ত পরিবারের ভার পড়ল রাধানাথের উপর। জন বীমসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাঁর দুই কাকা বলরাম ও রমানাথকে সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত করলেন। কিছুদিন পরে ফকীর মোহন বালেশ্বর এলে অনেকরাত্রি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গড়গড়িয়ার ঘাটে বসে কথা বললেন। এবার বুঝতে পারলেন তিনি সত্যই অনুশাসন মুক্ত। পিতা বেঁচে থাকলে এত রাত্রি পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকার প্রশ্নই উঠত না। বাড়ি ফিরে রাধানাথ নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব করলেন। হাঁপানির জন্য প্রায় শ্বাসকষ্ট হয়। আজ মনে হল পিতাকে অবজ্ঞা করার শাস্তি পাচ্ছেন। কষ্ট উপশমের জন্য পিতা আফিম খেতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ঠিক কতটা খেতে হবে সে বিষয়ে কড়া নির্দেশ ছিল। রাধানাথ কোট খুলে ফেললেন। আফিমের কৌটো খুলে একদানার পরিবর্তে দুই দানা মুখে দিলেন। দ্বিতীয় দানা পিতাকে অমান্য করার প্রয়াস কিনা বুঝতে পারলেন না। কষ্টের উপশম হল একটু নেশার আবিলতায় মন ভরে গেল। হঠাৎ দেখলেন সুন্দরনারায়ণ সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি নির্বাক কিন্তু দৃষ্টিতে তিরস্কার।

এবার রাধানাথ কাজে মন দিলেন। ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর হিসাবে স্কুলগুলি পরিদর্শন করা তাঁর কর্তব্য। তাছাড়া জেলা শিক্ষা সমিতির কাজ আছে। এদিকে মধুসূদন রাও একটি ভাল চাকুরির জন্য বার বার পত্র লিখছেন।

এফ.এ. পড়ার সময় হরমোহন ভট্টাচার্যের প্রভাবে মধুসূদন ও প্যারীমোহন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁরা উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। এ কারণে পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল মধুর। ভাগীরথী রাও নিষ্ঠাবান হিন্দু। প্রতিদিন স্নানের পরে পাঁচটি গাছে জল দেন। নির্মাল্য সেবা শেষ হলেই জলস্পর্শ করেন। মধু ধর্মত্যাগ করেছে শুনে তিনি তাকে বুঝিয়ে পত্র লিখলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে কটকে গিয়ে অনেক বোঝালেন। কিন্তু মধু অটল রইল।

এমন সময় একটি দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটল, প্যারীমোহন স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন। তিনি নিজের হাতে লেখা পত্রিকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিবন্ধ লিখেছিলেন। প্যারীমোহন কিন্তু বিচলিত হলেন না। একখানি পত্রিকা প্রকাশ করার প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্যারীমোহনের উৎসাহ মধুকে উদ্‌বোধিত করে।

কলকাতা গিয়ে বি.এ. পড়ার সম্বল নেই। অগত্যা আঠারো বছরে বয়সে মধু চাকুরি খুঁজল। অনেক চেষ্টার ফলে যাজপুরের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হল মধু, কিন্তু কাজ ভাল লাগল না। অনেক ছাত্র তার থেকে বয়সে বড় এবং এই ছোটখাট প্রধান শিক্ষককে তারা অবজ্ঞা করে। বালেশ্বর শিক্ষাসমিতির সভাপতি জন বীমস। রাধানাথের অনুরোধে বীমস মধুকে বালেশ্বর জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। তার সঙ্গে তার স্ত্রী, বিমাতা তুলসী বাই-এর বোন, ছোটভাই জগন্নাথ ও তার স্ত্রী। সকলে এসে রাধানাথের বাড়িতে উঠল। পরের দিন চাকুরিতে যোগ দিয়ে গিয়ে মধু জানল এ চাকুরি তার হবে না কারণ কলকাতা থেকে ইনস্পেক্টর হপকিন্স জানিয়েছেন এ নিযুক্তি দেবার অধিকার বীমসের নেই।

সৌভাগ্যবশত আগষ্ট মাসে রেভেনশা তিন মাসের ছুটিতে গেলেন এবং বীমস সেই সময়ের জন্য অস্থায়ী কমিশনার হলেন। দায়িত্ব নিয়েই বীমস হপকিন্সের আদেশ নাকচ করে তার যোগে রাধানাথকে জানালেন যে মধুসূদন তার পদে যোগ দিন। মধু সঙ্গে সঙ্গে তাই করল। রাধানাথের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হল।

ডমপাড়া : ডিসেম্বর ১৮৭৩

ওড়িশার তিনটি জেলা ছাড়া সতেরোটি দেশীয় রাজের দায়িত্বও কটকের কমিশনারের উপরে, এগুলির একটি হল ডমপাড়া। রাজা পুরুষোত্তম মানসিংহ ভ্রমরবর নিঃসন্তান। স্থির হল তাঁর পরে তাঁর জ্ঞাতি ভাই রঘুনাথ রাজা হবেন। সে নাবালক। তাঁকে ও

তাঁর ছোট ভাইকে সরকার কলকাতায় পাঠাল ওয়ার্ড স্কুলে পড়তে। রঘুনাথ যখন শিক্ষা শেষে ফিরে এল তখন দেখা গেল তার বুদ্ধির বিশেষ উন্নতি হয়নি এবং সে মোটামুটিভাবে নিষ্কর্মা।

রঘুনাথ যখন কলকাতায় পড়ছিল তখন শাসনভার ছিল কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের হাতে। দেওয়ান নিধি পট্টনায়কই শাসন চালায় এবং সে শাসন অত্যন্ত শিথিল। খাজনা আদায়ের ব্যাপারে সে উদাসীন, অনেক প্রজা নিষ্কর জমি ভোগ করে। প্রজাদের হাতে রাখার জন্য নিধি অনেক জমি পাট্টা দিয়েছিল। যারা জমি পেয়েছে তাদের অনেকে তার আত্মীয়। রঘুনাথ ফিরে এলে নিধির প্রতিপত্তি কমে গেল। রঘুনাথ জমি জরীপ করিয়ে নতুন করে খাজনা ধার্য করতে মনস্থ করল। নিধি এবং প্রজাদের কাছে এটি একটি বিপদের সংকেত। নিধি ভাবল কুকর্ম প্রকট হবে। প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধিতে আপত্তি। নিধির নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহ করল।

বিদ্রোহীরা নির্দেশ দিল কেউ খাজনা দেবে না, রাজবাড়ি কেউ যাবে না রাজার চাকুরি কেউ করবে না, রাজার ধোপা নাপিত বন্ধ। যে নিরীহ প্রজারা বিদ্রোহে যোগ দিল না তাদের বাড়ি লুট হল, তাদের মারপিট করা হল। চাকররা ভয়ে পালিয়ে গেল। রাজবাড়ির বাসিন্দাদের কাপড় কাচবার জন্য কটকে পাঠাতে হল। স্বয়ং রঘুনাথ প্রাণভয়ে কটক পালিয়ে গেল।

নভেম্বরে বীমস আবার কালেক্টর হলেন যখন রেভেনশা ফিরে এলেন। কিন্তু এবারে কটকের ডমপাড়ার অনেক রায়ত এসে তাদের দুঃখের কাহিনী তাকে শোনাল। এবং তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করল। রঘুনাথও এল। তার অনুরোধ দেওয়ানের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা হোক। নিধিকে বরখাস্ত করার অধিকার তার আছে কিন্তু সাহস নেই।

কটকের কালেক্টর হয়ে বীমসের প্রথম ভ্রমণ ডমপাড়ায়। নদীকূলে আমবাগানে তাঁর তাঁবু খাটান হল। কেরাণীদের নিয়ে দেওয়ান কাগজপত্র দেখাতে এল। বেচারা ক্ষীণকায় রাজা পোকায় কাটা রাজপোশাক পরে ছেঁড়া ময়লা পোশাকের সিপাহীদের নিয়ে জীর্ণ পাল্কি চড়ে ক্যাম্পে উপস্থিত হল। কদিন বীমস তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। রাজা কিছু বোঝে না আর নিধি অতি ধূর্ত। এক উপায় নিধিকে বরখাস্ত করে অন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত করা কিন্তু নিধি সব জানে এবং কাগজপত্র সব তার কাছে। তাছাড়া অনেক লোককে জমি দিয়ে হাত করেছে। তাকে বার করা সহজ নয়।

শেষ পর্যন্ত বীমস প্রজাদের ডাকালেন এবং নিধির বেআইনী আদেশগুলি রদ করলেন। যারা বেআইনী জমি পেয়েছে তাদের জমি ছাড়িয়ে নিলেন। শাসন চালানোর কয়েকটি সরল নিয়ম কানুন প্রণীত হল এবং সেগুলি সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। নিধি নিয়মগুলি মেনে চলবে বলে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিল। বীমস তাকে সতর্ক করে বললেন কথার খেলাফ করলে তাকে জেলে যেতে হবে।

সব শেষে বীমস রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। যাকে রাজবাড়ি বলা হয় সেটি একটি জরাজীর্ণ বড়বাড়ি বৈ আর কিছু নয়। অনেক জায়গায় ভাঙন ধরেছে, ইঁট খসে পড়েছে, সদর দরজার কবাট ভেঙে ঝুলছে এবং চারদিকে ঝোপ ঝাড়। রাজবাড়ির পাশে জঙ্গলাকীর্ণ বাগিচায় পাগলের মত পায়চারী করছে রঘুনাথ। অভিমান করে সে বীমসের সঙ্গে কথা বলল না। তার দাবী বদমাস দেওয়ানকে বরখাস্ত কর। তার সঙ্গে বাগিচার অপ্রশস্থ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বীমস তাকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু সে কিছু শুনতে রাজী নয়। তার এক গোঁ। নিধিকে বরখাস্ত করে নির্বাসিত করা হোক। বীমস চলে গেলেও রঘুনাথ বিড় বিড় করতে লাগল।

এমনি করে রাজায় প্রজায় একটি ভঙ্গুর শান্তি স্থাপন করে এক সপ্তাহ পরে কটক ফিরে এলেন বীমস।

পুরী : ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪

বকসওয়েলের সঙ্গে বিলাত যাবার সব বন্দোবস্ত করে ফেললেন হরিহর দাস। কলকাতা থেকে গরম স্যুট তৈরী করালেন। এক জোড়া জুতো কিনলেন। কিন্তু সংস্কৃত স্কুলের আর্থিক সঙ্কট মেটেনি; সুতরাং যাওয়া হল না। হরিহর ১৮৭২ সনের মাঝামাঝি ভারতের প্রমুখ রাজাদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পুরী থেকে যাত্রা করলেন।

প্রায় এক বছর তিনি নিরুদ্দেশ। ইতিমধ্যে প্যারীমোহন উৎকল পত্রিকা স্থাপন করেছেন। কলকাতার অমৃত বাজার পত্রিকার একটি খবরের অনুবাদ উৎকল পত্রিকায় ছাপা হল জুলাই মাসে। সংবাদটি হ'ল : পণ্ডিত হরিহর দাস সংস্কৃতে বিদ্বান, ইংরেজীর জ্ঞান তদনুসারে যথেষ্ট নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি গ্রীক ভাষায় উৎকর্ষ লাভ করেছেন। হোমারের কবিতাগুলির সুন্দর অনুবাদ করতে পারেন তিনি। সংবাদটি পড়ে সকলে আনন্দিত হল।

আবার কিছুদিন তিনি নিখোঁজ। একমাত্র সাতশ টাকার বই এল তাঁর কাছ থেকে। ডিসেম্বরে হঠাৎ একদিন রোগগ্রস্ত কপর্দকশূন্য হরিহর কোনও ক্রমে কটকের এক বন্ধুর বাড়ি ঢুকে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য কটকের ভদ্রলোকেরা চাঁদা সংগ্রহে জুটে গেল। গৌরীশংকর এ বিষয়ে অগ্রণী, দীপিকার মাধ্যমে তিনি চাঁদার জন্য আবেদন করলেন। প্যারীমোহন লিখলেন মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু হলে কটকবাসী চাঁদা করে দু'শ টাকা পাঠিয়েছিল। এখনও তেমনি মুক্ত হস্তে দান করার সময় এসেছে।

কটকের কবিরাজ ফকীর ত্রিপাঠী হরিহরকে পরীক্ষা করে মত দিলেন যে তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন এবং তার ঔষধ বৃহৎ ছাগঘৃত। এই ঔষধ তৈরী করতে খরচ হবে

একশ টাকা। কিন্তু কটক শহর থেকে চাঁদা উঠল মাত্র চোদ্দ টাকা। এখানে তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না দেখে আত্মীয়রা তাকে পুরী নিয়ে গেল। পুরীর কুণ্ঠাইবেণ্ঠ পাড়ার বাড়িতে রেখে তাঁর চিকিৎসা চালানো হল। হরিহর একদম মূক হয়ে গেছেন এবং উন্মাদের সকল লক্ষণ তাঁর মধ্যে প্রকট। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল তিনি নাস্তিক বলে পুরীর ব্রাহ্মণরা মন্ত্রবলে তাঁর এই দুর্দশা করেছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে হরিহরের অবস্থার অবনতি হল এবং তার পাগলামি এত বাড়ল যে তাঁকে বেঁধে রাখতে হল।

একদিন হরিহরকে কামরায় বন্ধ করে যে যার কাজ করছে এমন সময় তিনি বিলাত যাবার জন্য যে স্যুট বানিয়েছিলেন সেটি পরে নিলেন মাথায় টুপি লাগালেন আর জুতো পরে পায়চারি করতে লাগলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, কেমন করে তার থেকে পোশাকে আগুন লাগল। মূক হরিহরের বাক্য স্ফূরণ হল এবং তিনি বিকট চিৎকার করলেন। শুনে লোক ছুটে এসে দরজা খুলে দেখল তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেছে। পোশাকের যা কিছু তখনও শরীরে লেগে ছিল তা কেটে ফেলে তাঁকে কলাপাতায় শুইয়ে দেওয়া হল। এভাবে পড়ে রইলেন চারদিন।

হরিহর সামান্য কথা বলতে পারছিলেন এবং লোকদের চিনতে পারছিলেন। তাঁর অনুরোধে তাঁর বইগুলি এনে তাঁর চারপাশে রাখা হল। চোখের সামনে বই খুলে ধরলে তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাগজগুলির মধ্যে বীমসের একখানি পত্র এবং তাঁর মায়ের একখানি ছবি যার নিচে বীমস লিখেছেন, মম মাতৃ : চিত্রপ্রতিমা।

৯ই ফেব্রুয়ারী হরিহর প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র বত্রিশ বছর। মৃত্যুর আগে তিনি একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন : ন ধ্যাতং পদম ঈশ্বরস্য ইত্যাদি। অর্থাৎ সংসার থেকে মুক্তি পেতে বিধিমত ঈশ্বরের ধ্যান করা হল না। যে পুন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিতে পারত তাও অর্জন করা হয়নি। নারীর পীন স্তনযুগল জঘনদ্বয় স্বপ্নেও আলিঙ্গন করা হয়নি; কেবল মায়ের যৌবনরূপ বন কাটতে আমার জন্ম হয়েছিল কুঠার হয়ে। এটিই ছিল হরিহরের জীবনের কল্পনা ও কর্মকাণ্ড স্মরণ ও অন্তিম উক্তি।

কয়েকদিন পরে মধু রাও বালেশ্বরে হরিহর দাসের মৃত্যুসংবাদ পেলেন। অনেকদিন আগে দেখা স্বপ্নটির কথা তার মনে পড়ল এবং অজানা শঙ্কা ঘিরে ধরল তাঁকে।

পুরী : আগষ্ট ১৮৭৫

ফেনের নালার অভিজ্ঞতার পরে একটি বিশেষ অসুবিধার কথা রেভেনশাকে জানালেন আর্মষ্ট্রং। পুরীতে একজন মুসলমান ওভারশিয়ার আছে। জগন্নাথ মন্দিরে তার প্রবেশ

নিষেধ। ফেনের নালা ঠিকভাবে মেরামত হয়েছে কিনা দেখবার জন্য ভিতরে পাঠাতে হল একজন হিন্দু ডেপুটী কালেক্টরকে। আর্মষ্ট্রং লিখলেন মুসলমান ওভারশিয়ার বদলী করে একজন হিন্দু ওভারশিয়ার পাঠানো হোক।

রেভেনশা এ অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। কিন্তু রথযাত্রায় এমন একটি ঘটনা ঘটল যে এ বিষয়ে সকলে ভাবতে বাধ্য হল। ৭ই জুলাই মন্দিরের দরজা খুলে দেখা গেল এক খানি প্রকাণ্ড পাথর খসে রত্নবেদীর সামনে পড়েছে। ঠাকুরত্রয় তখন গুণ্ডিচা মন্দিরে। সৌভাগ্যবশত পাথর পড়ার সময় সেখানে কেউ ছিল না। অন্য সময় হলে অনেক প্রাণহানি হত। এখন চিন্তার বিষয় যদি আরও পাথর খসে পড়ে তবে মন্দিরের চূড়া ধ্বসে পড়তে পারে। সকলে এবার তৎপর হল। এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার পূর্ণ চন্দ্র সরকার পরিস্থিতির মূল্যাংকন করতে এলেন কটক থেকে। তিনি মন্দিরে গিয়ে দেখলেন আরও চারখানি পাথর খসে পড়েছে। এগুলি প্রায় চল্লিশ ফুট উপরে ছিল। দু বছর আগে মন্দিরের উপরে বজ্রপাত হয়েছিল। তখন কিছু ক্ষতি হয়ে থাকবে। চিড়খাওয়া স্থানে গাছ গজিয়েছিল এবং লোহার শলাকাগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পাথর স্থানচ্যুত হবার এক কারণ এও হতে পারে। মন্দিরের শীর্ষে পৌঁছান কঠিন কাজ। ভিতর থেকে যে পাথরের সিঁড়ি উঠেছে সেটি শুরু হয়েছে চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে। অগত্যা একটি মাচা তৈরী করে লোকদের উঠানো হল। সে স্থানে অন্ধকার এমন ঘন যে মশাল জ্বালাতে হল। সিঁড়িতে কেউ কোনও দিন পা রাখেনি। সিঁড়িতে এবং ছাদে বহুকালের জমা কালি ঝুল। রাশি রাশি ময়লা পরিষ্কার করে নিচে ফেলা হল। পূর্ণচন্দ্র সরকার মন্দির মেরামতের উপায় বর্ণনা করে রিপোর্ট দিল। সে সুপারিশ করল, এ কাজ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঠাকুর অন্যত্র বিরাজ করুন। এবং কাউকে মন্দিরের ভিতরে যেতে না দেওয়া হোক। তিনি মন্দিরের অঙ্গনে ছোট ছোট মন্দিরগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁর মনে হল কোইলী বৈকুণ্ঠের অবস্থা শোচনীয়। রিপোর্টে এ কথাও উল্লেখ করলেন তিনি।

রিপোর্ট পেয়ে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বণ্ড পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি মন্দিরের ভিতরে যেতে পারবেন না। মন্তব্য করলেন, জরুরী পদক্ষেপ না নিলে পুরী মন্দিরের অবস্থা কোনার্কের মতই হবে।

সাহেবরা যখন মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তায় মগ্ন তখন পুরীর পণ্ডিতদের চিন্তা অন্য ধারায় বইছে। যথা, মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার বিধেয় কিনা, যদি সংস্কার করা হয় তবে কাজ চলার সময় ঠাকুর কোথায় থাকবেন ইত্যাদি। সমস্যার সমাধান খুঁজতে মন্দিরে একটি সভা ডাকা হল। পুরীর রাজা, মহান্ত নারায়ণ দাস এবং পণ্ডিত গোপীনাথের মতে মন্দির মেরামতের কাজ চলার সময় জগন্নাথ পাশের কক্ষে বিরাজ করবেন। অন্যদিকে পণ্ডিত মার্কণ্ডেয় মহাপাত্র এবং অন্য মহান্তগণ ও সেবকদের মতে ঠাকুরত্রয় রত্নবেদীতেই বিরাজ করবেন, মাথার উপর মজবুত মাচান বেঁধে দিলে তাঁদের কোনও

ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকবে না। এ ব্যবস্থায় সেবকদের স্বার্থ আছে, ঠাকুর অন্যত্র গেলে ভক্তের সমাগম কমে যাবে এবং তাদের আয় কমে যাবে। তাদের যুক্তি সিংহাসনে অধিষ্ঠান ঠাকুরদের অন্নভোগ হয়—অন্য বিধান নেই। এ মতের বিরুদ্ধে মহান্ত নারায়ণ দাস মাদলা পঞ্জিকা থেকে উদাহরণ দিলেন। এখনকার মন্দির যখন নির্মিত হয়নি তখন একবার জীর্ণ মন্দিরের সংস্কারের সময় ঠাকুরদের গাছতলায় রাখা হয়েছিল। লোকেরা সেখানে অন্নভোগ করল না। তখন ঠাকুরের আজ্ঞায় একজন মূক একটি শ্লোক আবৃত্তি করে সকলের বিশ্বাস অর্জন করল। পুনর্বার সে মূক হয়ে গেল। অনেক যুক্তিতর্ক হল কিন্তু সেবকরা জিদ ছাড়ল না। পুরীর রাজা তাদের সঙ্গে একমত হলেন না। তারা বেশী চেঁচামেচি করলে তিনি বললেন, ঠাকুরদের অন্যত্র না নিলে কালেক্টরের অনুমোদন আবশ্যক। সেবকরা কালেক্টরের কাছে আবেদন করল এবং প্রচার করল যে মহান্ত নারায়ণ দাস ধর্মদ্রোহী। রাজাও একখানি আর্জি পাঠালেন কালেক্টরকে।

দরখাস্ত দুটি বিচার করে আর্মষ্ট্রং আদেশ দিলেন। তাঁর বক্তব্য মন্দিরের উপর রাজার পূর্ণ কর্তৃত্ব। তিনি যেখানে চাইবেন ঠাকুর সেখানে থাকবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সেবকরা মানতে বাধ্য। যারা অমান্য করবে তাদের বরখাস্ত করা হবে।

এ আদেশের ফলে গুণ্ডিচা ঘর থেকে ফিরে ঠাকুর জগমোহনে বিরাজমান হলেন। দুদিন সেবকরা কাজে এল না কিন্তু যখন দেখল যে অন্যরা কাজ চালিয়ে নিচ্ছে, তাছাড়া চাকুরি যাবার ভয় আছে তখন একে একে কাজে ফিরে এল।

একটি সমস্যা কিন্তু রয়ে গেল। এখানে যে অন্নভোগ হয় তা রাজা এবং কাঙাল ব্যতীত অন্যরা সেবন করে না। এই অন্নপ্রসাদ যে শাস্ত্র সম্মত তার প্রমাণ দিয়ে পণ্ডিত তারাকান্ত বিদ্যাসাগর একখানি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করলেন। একজন বাঙালি পণ্ডিতের মত খণ্ডন করলেন ওড়িয়া পণ্ডিতগণ। সামান্য যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ অন্নভোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সমাজচ্যুত ঘোষিত করল ষোলশাসনের পণ্ডিতেরা।

পুরীর রাজাকে মেরামতের কাজ ত্বরান্বিত করতে বললে তিনি বললেন তাঁর অর্থাভাব চলছে; সুতরাং তাঁকে কোইলী বৈকুণ্ঠ এবং লজিং হাউজ ফাণ্ড থেকে অর্থ দেওয়া হোক।

এদিকে মন্দির থেকে পাথর খসছে শুনে গ্রামে গ্রামে লোক বিচলিত হল এবং পূজা ও পুরাণ পাঠ আরম্ভ করল। অনেক ঠক এই সময়ে পূজা ও যজ্ঞ করবে বলে অর্থ ও ঘি সংগ্রহ করল। এইভাবে বাদ বিসম্বাদের মধ্যে মন্দিরের মেরামতের কাজ শুরু হল।

নীলগিরি : সেপ্টেম্বর ১৮৭৫

নীলগিরিতে কিছুদিন আনন্দে কাটালেন ফকীর মোহন। রাজার সঙ্গে সদ্ভাব হল। প্রতি শনিবার বালেশ্বর গিয়ে ব্যক্তিগত কাজকর্ম করেন। রাধানাথের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা বজায় আছে। পি. এম. সেনাপতি এণ্ড কোম্পানীর কাজ তদারক করতে পারেন। এমন সুখময় দিন কিন্তু স্থায়ী হল না। কিছুদিন পরে রাজার সঙ্গে মতবিরোধ আরম্ভ হল। অপুত্রক রাজা রক্ষিতার ছেলেকে উত্তরাধিকারী করতে চান কিন্তু ফকীর মোহন রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমর্থন করলেন।

দেওয়ান হবার দুবছর পরে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হলেন ফকীর মোহন। একটি ব্যাপক প্রজাবিদ্রোহ হল। যারা বিদ্রোহ করল তারা পাথুরিয়া প্রজা। বিষ্ণুপুর পাহাড়ের মাগুনি পাথর কেটে থালা, গ্লাস বাটি ইত্যাদি তৈরী করে এরা। হাতুড়ি ও ছেনি দিয়ে কাজ করে। হাতুড়ি পিছু সাড়ে ছ টাকা কর দেয় বছরে। কর আদায় করে একজন মাহালদার। মাহালদারী নিলাম হয়। যে রাজকোষে বেশী টাকা দেয় সেই মাহালদার হয়।

ফকীর মোহন দেওয়ান হবার এক বছরের মধ্যে মাহালদারী পাবার জন্য চার হাজার টাকা দিতে চাইল কানাই মিশ্র নামে এক ব্যক্তি। সে বছর মাহালদারী নিলাম হয়েছিল আড়াই হাজার টাকায়। পাথুরিয়াদের দেয় কর না বাড়িয়ে সে কেমন করে এত টাকা দেবে জিজ্ঞাসা করলে বলল, অনেকে কর ফাঁকি দেয় তাদের থেকে আদায় করবে। পরের বছর সে ইজারা পেল।

কানাই যা বলেছিল তা সত্য। পাট্টা নেয় একজন কিন্তু কাজ করে অনেকে, ভাই, ছেলে, আত্মীয় স্বজন। তারা কর দেয় না। তাদের পাথর কাটার অধিকার নেই। আগের মাহালদাররা এসব উপেক্ষা করত। কানাই মিশ্র পাট্টাদার ছাড়া অন্যদের পাথর কাটা বন্ধ করে দিল। অনেক পুরুষ ধরে পাথর কাটতে অভ্যস্ত লোকগুলি হঠাৎ বেকার হয়ে গেল। প্রতিবাদে সকলেই পাথর কাটা বন্ধ করে দিল।

কানাই কর উসুল করতে জোর করলে পাথুরিয়ারা রাজার কাছে নালিশ করল। এই সময় কানাই-এর ইজারা রদ করে দিলে ব্যাপারটা হয়ত মিটে যেত, কিন্তু ফকীর মোহন তা করলেন না। তাঁর যুক্তি কানাইকে বরখাস্ত করলে অনেক ক্ষতি হবে এবং মুখ রক্ষা হবে না। তিনি পাথুরিয়াদের আবেদন অগ্রাহ্য করলেন।

এবার বিদ্রোহীরা কাছারীর সামনে সমবেত হল। কেল্লার ব্রাহ্মণ এবং কাছারীর কিছু কর্মচারী প্রচ্ছন্নভাবে তাদের উৎসাহ দিল। কানাই মিশ্রকে বরখাস্ত করেননি বলে তারা অসন্তুষ্ট। অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হচ্ছে দেখে বালেশ্বর থেকে পুলিশ সুপার এলেন। গড়জাত এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট হরেকৃষ্ণ দাসও এসে পৌঁছলেন।

পাথুরিয়ারা চাঁদা করে কুড়িজনকে প্রতিনিধি করে কটকে রেভেনশার কাছে পাঠাল।

তিনি তাদের অভিযোগ মন দিয়ে শুনলেন। হরেকৃষ্ণ দাস কৃতকার্য হচ্ছেন না দেখে তিনি স্বয়ং নীলগিরি এলেন। তদন্ত করে জানতে পারলেন যে করবৃদ্ধিই প্রজাদের অসন্তোষের প্রধান কারণ। কানাই মিশ্র পাথুরিয়াদের উপর অত্যাচার করে। রেভেনশা তার ইজারা রদ করে দিলেন। এক বছরে কর ক্ষতি হল কিন্তু পাথুরিয়ারা খুশী হল। বিদ্রোহ করার অপরাধে কয়েকজন পাথুরিয়াকে সাজা দিলেন রেভেনশা। সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য ফকীর মোহনকে তিরস্কার করলেন।

রেভেনশা ফিরে গেলে রাজা ফকীর মোহনকে পাত্তা দিলেন না। এক বছরের কর বরবাদ হয়েছে। তার জন্যে রাজা ফকীর মোহনকে দায়ী করলেন। পরিস্থিতি এমন হল যে ফকীর মোহন উপলব্ধি করলেন যে আত্মসম্মান বজায় রেখে কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি পদত্যাগ করলেন। নীলগিরিতে আড়াই বছর কাটিয়ে পুনর্মূষিক হয়ে বালেশ্বরে ফিরে এলেন কপর্দকশূন্য ফকীর মোহন।

কটক : আগষ্ট ১৮৭৬

কটক শহরে হঠাৎ গুজব রটে গেল যে মাদ্রাজে সুরুকুমারী রোগ ছড়িয়ে গেছে এবং রোগ ক্রমে গঞ্জাম হয়ে কটকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রোগের লক্ষণ : প্রথমে পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যথা হবে, সে ব্যথা ক্রমে কোমরে উঠবে, রোগীর রং কালো হয়ে যাবে এবং সে মূর্চ্ছা যাবে। অচিরে মৃত্যু অবধারিত। জুলাই মাসে এ রোগ ব্রহ্মপুরে দেখা গেল। শোনা গেল কনষ্টেবলরা হাটে বাজারে এর ঔষধ বিলি করছে। ১৫ই জুলাই দীপিকায় সম্পাদকেষু স্তম্ভে ঔষধের এমন একটি বিবরণী প্রকাশিত হল :

> **রোগ প্রতিকারের ঔষধ**
>
> একটি কৃষ্ণবর্ণ (অন্য কোনও রং দেহে থাকলে চলবে না) ছাগলকে নানা প্রকার ঘাস লতাপাতা খাওয়াবে। সে জলপান করার বা জবের কাটার আগেই তাকে বলি দিয়ে অজীর্ণ খাদ্যপদার্থ আঙুল দিয়ে পেট চিরে বার করে নেবে। বার করা, শুকানো ও গুঁড়ো করার সময় যেন মাছি না বসে। পাথরের খলে চূর্ণ করে চার আনা পরিমাণ ওজনের পুরিয়া বেঁধে রাখবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিতেই এক পুরিয়া ঔষধ তিনভরি জলে গুলে খাইয়ে দিলে রোগমুক্ত হবে।
>
> নবসাগর দ্রাবককে তিনভরি পরিমাণ জলে দশ ফোঁটা মিশিয়ে খেলেও কাজ হবে।
>
> প্রকাশ থাকুক যে রোগ কোমরে উঠলে কোনও ঔষধে কাজ হবে না, রোগীর মৃত্যু হবে।

লোক ঔষধ তৈরীতে জুটে গেল। মনে হল সুরুকুমারী মানুষের রোগ নয়, কাল ছাগলের মৃত্যু পরোয়ানা। শত শত ছাগলের প্রাণ গেল। ঔষধ তৈরী করে সযত্নে

তুলে রাখল লোক। যদিও ছাগলের পেট থেকে ঔষধের সামগ্রী নেওয়া হয়, নিরামিষ ভোজী বৈষ্ণবরাও ঔষধ এনে বাড়িতে রাখল। কটকে ছাগলের দাম চার পাঁচ গুণ বেড়ে গেল।

আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে খবর এল রোগ পুরী ও খুর্দাতে দেখা গেছে। কদিন পরে প্রচার হল কটকেও রোগ শুরু হয়েছে। সুরুকুমারী আজকাল সর্বত্র আলোচ্য বিষয়। শোনা গেল কাছারীর কয়েকজন আমলার এ রোগ হয়েছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে। রোগের এক নতুন নিদানও চালু হল। পায়ের বুড়ো আঙুলে গরম লোহার ছেঁকা লাগালে রোগ হবে না। সকলে তাই করল। ইংরেজ ডাক্তাররা লোককে বোঝাল যে এমন রোগই নেই। কিন্তু ভয় কাটল না। লোক ঔষধ সংগ্রহে লেগে রইল। ঔষধ সংগ্রহের জন্য লোকে এতই ব্যাকুল যে ঔষধের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রইল।

কটক শহর গুজবের কারখানা। প্রায় বিচিত্র গুজব রটে এখানে। বিমলাক্ষী মন্দিরে হাঁড়ি পাঠানোর হুজুগ শেষ হবার কিছুদিন পরেই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে হনুমান অবতীর্ণ হবেন। যার ঘরের সামনে আলপনা নেই তার ঘরে যাবেন হনুমান এবং সে নির্বংশ হবে। যে শুনল সেই ঘরের সামনে আলপনা দিল। এমন সময় একজনকে কটক চণ্ডী ভর করলেন। সে বলল ঠিক উল্টা, আলপনা দেখলে হনুমান ক্রুদ্ধ হবেন এবং গৃহস্বামীর ক্ষতি করবেন। এবার আলপনা মুছে ফেলার হিড়িক পড়ে গেল।

আরও একটি গুজব। বক্তব্য বাড়িতে ঢেঁকি থাকলে রাত্রে খুলে রাখবে। নইলে রাত্রে চাল কোটার শব্দ শোনা যাবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে কে তুমি ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছ তবে সে কলেরায় মরবে। ভয়ে লোকে সন্ধ্যা হবার আগেই ঢেঁকি খুলে রাখতে লাগল।

যাই হোক সুরুকুমারী রোগ প্রায় একমাস কটককে আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখল। সাহেবরা বেশ মজা পেল। সুরুকুমারী কটক থেকে বিলীন হলে মানুষ ও ছাগল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

বালেশ্বর : সেপ্টেম্বর ১৮৭৭

বালেশ্বর স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টরের অফিসে সকলে কাজে ব্যস্ত, তাঁর চেয়ারখানি কিন্তু খালি। তিনি নিচে বসতে পছন্দ করেন। এখন তিনি পাশের কামরায় তাঁর প্রিয় বীরাসনে বসে। সামনে নস্য ও আফিমের কৌটো। দুটির থেকে একটু একটু সেবন করে রোমন্থন করছেন এ বছর কেমন কাটল।

বছরটি সত্যই ভাল কেটেছে। বিবাহের ছয় বছর পরে পরশমণি প্রথম পুত্রের

জন্ম দিয়েছেন। রোজ সকালে এক হাজার বার মধুসূদন লিখে অন্য কাজ আরম্ভ করেন রাধানাথ। দু বছর হল তিনি এমন করে আসছেন। ফেব্রুয়ারীকে কটক হাইস্কুলে বদলী হবার আগে মধুসূদন তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। রাধানাথের ইচ্ছা ছিল নবজাত পুত্রের নাম রাখবেন মধুসূদন। কিন্তু পিসতুতো ভাই চন্দ্রনাথ রায় শিশুর নাম রাখলেন শশীভূষণ। সেই নামটিই শেষ পর্যন্ত টিকে গেল যদিও তার কাছে সে মধু। এই নামে তিনি তাকে ডাকেন।

মধুরাও যতদিন ছিলেন সাহিত্যচর্চা চলত। রাধানাথ ও মধু যৌথভাবে 'প্রথম শিক্ষা' নামে একখানি পুস্তক রচনা করলেন। বৈকুণ্ঠনাথ তার নয় হাজার কপি ছাপিয়ে প্রকাশ করলেন। সব কপি তিন মাসে বিক্রি হয়ে গেল। ভাল আয় হল এর থেকে। কিন্তু যে পুস্তকটি তাঁকে বেশী আনন্দ দেয় সেটি হল মধু রাও-এর সঙ্গে লেখা 'কবিতাবলী'। এটি জন বীমসকে উৎসর্গীকৃত, প্রকাশক বৈকুণ্ঠনাথ দে। এটির বিষয়ে যে যাই বলুক রাধানাথ জানতেন এগুলি ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবিতা।

এ সকল প্রীতিকর চিন্তা করছেন এমন সময় বালেশ্বরের কয়েকজন ভদ্রব্যক্তি একটি অদ্ভুত অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের অনুরোধ স্কুলগুলি বন্ধ রাখা হোক, কারণ শহরে সুরুকুমারী রোগ দেখা দিয়েছে।

গুজবের ব্যাপারে বালেশ্বর কটকের থেকে পিছিয়ে নেই। কয়েক বছর আগে এক ঠাকুরাণীর ভরকরা এক ব্যক্তির আজ্ঞায় পুরাতন কুলো, ঝাড়ু, খুন্তি ইত্যাদি ময়ূরভঞ্জের দিক থেকে দীঘির ভনীয়াতে আসতে লাগল। এগুলি বিমলাক্ষীর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট। এরপরে এক রাত্রে একজন লোক পাছুড়িয়া গ্রাম থেকে ছুটতে ছুটতে মাকলপুর পাড়ায় এসে মাতবাড়ি থেকে সাত মুষ্টি চাল চেয়ে নিল। জিজ্ঞাসা করলে বলল দক্ষিণ দিক থেকে একটি ষাঁড় আসছে, তার পিঠে বটগাছ এবং সেই বটগাছে হনুমান। সকলে ভিন্ন গ্রাম এমন সাত বাড়ি থেকে সাত মুঠি চাল ভিক্ষা করবে যেখান থেকে আগে কেউ নেয়নি। সে চাল সযত্নে রেখে দেবে। ষাঁড় এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে সেই চাল এনে তাকে খেতে দেবে। না দিলে গৃহস্বামী নির্বংশ হবে। এ কথা শুনে লোকে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করতে ছুটল।

সুরুকুমারী বালেশ্বর এসে গেল—সেটা বড় বিপত্তি। একজন মুসলমান মহিলা তার প্রথম শিকার। সে হঠাৎ 'আমার পা গেল পা গেল' বলে নিচে পড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে সেখানে একজন বৈদ্য ছিলেন। তিনি দা গরম করে তার পায়ের বুড়ো আঙুলে দুবার ছেঁকা দিতেই সে ঠিক হয়ে গেল। রোগ শহরময় ছড়িয়ে গেল এবং তার সঙ্গে আতঙ্ক ছেয়ে গেল। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে লোক আসা বন্ধ হয়ে গেল। হাটে মাঠে ঘাটে সকলের মুখে এক কথা—সুরুকুমারী।

বৈকুণ্ঠনাথ দে, মদন মোহন দাস, হরেকৃষ্ণ দাস প্রমুখ ঔষধ তৈরী করে বিতরণ করলেন। তাতে যথেষ্ট হল না, পাড়ায় পাড়ায় ঔষধ তৈরী শুরু হল। যে ছাগলের

দাম আট দশ আনা ছিল তার দাম বেড়ে দাঁড়াল দেড় টাকা, দু টাকা। দলে দলে কালো ছাগল গ্রাম থেকে শহরে আনা হল বিক্রির জন্য।

বালেশ্বর সংবাদবাহিকা রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণী দিল :

> এই রোগ প্রথমে দুই পায়ের বুড়ো আঙুলে আরম্ভ হয়, আগুনে পোড়ার মত জ্বালা করে এবং ক্রমে উপরে ওঠে। কোমর পর্যন্ত উঠতে লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা। দুই আড়াই ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু করলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। রোগ কোমর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেলে রোগী বাঁচে না।
>
> চিকিৎসা :
>
> ১) পায়ের আঙুলে জ্বালা শুরু হতেই গোড়ালীতে দড়ি অথবা মসৃণ কাপড় দিয়ে বেঁধে দেবে। তার পরে দা গরম করে পায়ের বুড়ো আঙুলে ছেঁকা দেবে। কাজ না হলে দশ আঙুলে ছেঁকা দেবে।
>
> ২) ঘৃতকুমারী ও কাগজী লেবুর রস কোমর থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত ভাল করে মালিশ করবে।
>
> ৩) লাইকর এমোনিয়া শুঁকতে দেবে অথবা তার দশ ফোঁটা দুই তোলা জলে গুলে খাইয়ে দেবে।
>
> ৪) সম পরিমাণ নৈসাদর অথবা নিসাদল ও শুকনো চুন একটি বোতলে ভরে ভাল করে ঝাঁকাবে। কিছুক্ষণ রেখে দিলে চুন নিচে বসে যাবে। নির্মল জল উপরে থাকবে। সেই জল অন্য একটি বোতলে ভরে রাখবে। তার থেকে দশ ফোঁটা অন্য জলে মিশিয়ে রোগীকে খেতে দেবে।
>
> ৫) একটি কালো মাদী ছাগল যার পেটে বাচ্চা নেই সারাদিন নানা প্রকারের ঘাস পাতা খেতে দেবে। দেখতে হবে ছাগলটি যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থাকে, জল না খায়, শুয়ে না পড়ে বা জাবর না কাটে। দিনের শেষে তাকে বলি দিয়ে তার পেট থেকে অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বার করে শুকিয়ে নেবে। শুকানোর সময় যাতে মাছি না বসে সেদিকে নজর রাখতে হবে। শুকিয়ে গেলে সেগুলি গুঁড়ো করে আড়াই মাসা পরিমাণে পুরিয়া বানিয়ে রাখবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিতেই এক মোড়ক কাঁচা জলে গুলে খাইয়ে দেবে। আধ ঘণ্টা পরে আর এক পুরিয়া এবং তার পরে আরও একটি। তিন পুরিয়াতে রোগ মুক্তি হবে।
>
> পাঠকগণ এ রোগকে অবহেলা করবেন না। রোগের লক্ষণ প্রকট হতেই উক্ত পাঁচ প্রকার চিকিৎসার মধ্যে যার যেটি সুবিধা প্রয়োগ করলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

বাঙালিরা এ রোগে বিশ্বাস করল না। সংবাদ বাহিকা তার উপর টিপ্পনী করল : কোনও বাঙালির যদি এ রোগ হয় এবং সে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তবে তাদের বিশ্বাস জন্মাবে।

অন্য বাঙালিদের মতো রাধানাথও এ রোগে বিশ্বাস করলেন না। সুতরাং তিনি স্কুল বন্ধ করার আবেদন মঞ্জুর করলেন না।

সৌভাগ্যবশত সুরুকুমারী বালেশ্বরে বেশীদিন থাকল না, কলকাতা চলে গেল।

পুরী : সেপ্টেম্বর ১৮৭৬

মে মাসে খসে পড়া পাথরের জায়গায় নতুন পাথর লাগিয়ে মন্দির মেরামতের কাজ শেষ হল। রথযাত্রার পরে ঠাকুর পুনরায় রত্নবেদীতে বিরাজমান হলেন। ষোল শাসনের পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, শিষ্ট দণ্ডী এবং ব্রহ্মচারীরা এবার মহাপ্রসাদ সেবন করলেন। ঠাকুর যখন রত্নবেদীতে বিরাজমান ছিলেন না তখন যারা মহাপ্রসাদ খেয়েছিল তারা নিজ নিজ গ্রামদেবতার পূজা করলেন, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন এবং পুনরায় সমাজে গৃহীত হলেন। এভাবে এ সমস্যার সমাধান হল কিন্তু রাজার জন্য অন্য সমস্যার জন্ম হল।

গড়জাতের রাজারা পুরী এলে পুরী রাজাকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। সে কারণে দিব্যসিংহ ভাবত সে রাজাদের মধ্যমণি এবং সর্বত্র তাঁর স্থান সকলের উপরে হওয়া উচিত। ১৮৭৪ সালে ছোটলাট টেম্পল কটকে দরবার করেছিলেন। রাজা তাতে যোগ দিলেন না, কারণ সরকার তাকে রাজাদের মধ্যে প্রথম স্থান দিতে রাজী হয়নি। ১৮৭৬ সালে যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে যখন দরবার হল কলকাতায় তখন এ কথার পুনরাবৃত্তি হল। তারাকান্ত বিদ্যাসাগর এখন রাজার উপদেষ্টা। সে কটকে সদর আমীন ছিল। অবসর নেওয়ার পরে কলকাতা চলে গিয়েছিল। শেষ জীবন পুরীতে কাটাবে বলে এসে এখন রাজার স্তাবক হয়ে গেছে। তারাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে রাজা দরবারে যোগ দিতে গেলেন কলকাতা। প্রচার হল রাজা লক্ষ টাকা মূল্যের একখানি তরবারী এবং কুড়ি হাজার টাকার একখানি পানের বাটা ভেট দিতে নিয়ে গেছেন। এটি অবশ্য নিছক একটি গুজব। তারাকান্তের পরামর্শে রাজা গঙ্গাতীর থেকে পাল্কি চড়ে বাজনা বাজিয়ে আবাসস্থলে গেলেন। কলকাতাবাসী এ দৃশ্য দেখে রাজাকে উপহাস করল। দরবারে পুরী রাজার স্থান দির্নিষ্ট হয়েছে রাজাদের মধ্যে ত্রিশ জনের পরে। এই অজুহাতে রাজা দরবারে না গিয়ে পুরী ফিরে এলেন। এজন্য লোকে তার সমালোচনা করল। রাজাকে ভুল পরামর্শ দেবার জন্য সকলে তারাকান্তকেই দায়ী করল। রাজা কিন্তু চাটুকার তারাকান্তকে দেওয়ান করে দিলেন।

মন্দির নিয়েও রাজার কুপরিচালনার অন্ত নেই। মন্দিরের সেবকের পদ বংশানুক্রমে চলে। কিন্তু মাঝে মাঝে টাকা নিয়ে বাইরের লোককে এ পদে নিযুক্ত করেন। নিয়মিত সেবক এবং এভাবে নিযুক্ত সেবকদের ঝগড়া লেগে থাকে। একটি মামলাও হল এ নিয়ে। জজ তাঁর রায় দিয়ে বললেন যদিও সেবক নিযুক্তির ব্যাপারে রাজার পূর্ণ ক্ষমতা আছে তবুও তিনি সেবকের পুত্রকে সেবক নিযুক্ত করার যে পরম্পরা আছে তা মানতে বাধ্য। এর পরেও রাজা অনিয়মিত নিযুক্তি চালিয়ে গেলেন। এমন একটি নিযুক্তিকে কেন্দ্র করে এক বছর আগে বেশ ঝামেলা হয়েছিল।

ভোবনী কর নামক একজন সেবকের তার বিমাতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এ

কথা সকলে জানত। এ জন্য সেবকরা তাকে ঘৃণা করত। একদিন সে একজন বিধবার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে সম্ভোগে লিপ্ত থাকার সময় ধরা পড়ল এবং তার দু বছর জেল হল। জেল থেকে ছাড়া পেলে রাজা তাকে পশুপালকের কাজে লাগালেন। অন্য পশুপালকরা প্রতিবাদ করল কিন্তু রাজা কান দিলেন না।

অন্য সেবকরা স্থির করল ভোবনীকে তারা কাজ করতে দেবে না। রাজা এ কথা জানতে পারলেন। তিনি নিজের দেহরক্ষী পরন সান্ত্রা ও পদ্মচরণ পট্টনায়ককে পাঠালেন। তারা প্রায় দেড়শ পালোয়ান সঙ্গে নিয়ে গেল। তারা পুরাতন সেবকদের মেরে পিটে ভোবনীকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেল। বার বার এরকম বেনিয়ম ও অত্যাচার করতে থাকলেন রাজা। সুতরাং পুরীর হিন্দুরা ও সেবকগণ মিলে একটি আর্জি দিল রেভেনশার কাছে। তাদের বক্তব্য :

আগে সর্বসাধারণ মন্দিরে গিয়ে প্রভাত মঙ্গল, আরতি, অবকাশ সন্ধ্যাধূপ, চন্দন লেপন ইত্যাদি দেখতে পেত। এখন রাজা নিয়ম করেছেন এর জন্য মাথা পিছু চার আনা দিতে হবে। এর থেকে রাজার আমলারা নেবে দু আনা এবং মন্দিরের জন্য খরচ হবে দু আনা।

সেবকদের চাকুরি বংশানুক্রমিক। কিন্তু রাজা ঘুষ নিয়ে শত শত লোককে সেবক নিযুক্ত করেছেন। এ নিয়ে সব সময় গোলমাল লেগে থাকে এবং সেবায় অব্যবস্থা হয়। রাজার ভাড়াটে গুণ্ডারা নিয়মিত সেবকদের মারপিট করে। এ কাজের জন্য রাজা প্রত্যহ দেড় দুশ গুণ্ডা মন্দিরে পাঠান।

সেবকরা মন্দির থেকে যে ভোগ পেত তা কমিয়ে রাজা অর্ধেক করে দিয়েছেন। ফলে তাদের ক্ষতি হচ্ছে।

ভোগে নিকৃষ্ট সামগ্রী মেশানো হচ্ছে। গব্যঘৃতের পরিবর্তে ছাগল ভেড়া ও মহিষের ঘি ব্যবহার হচ্ছে। ফলে রোগ হচ্ছে।

তীর্থযাত্রী ধ্বজা বাঁধার জন্য যে অর্থ দেয় এবং রত্নসিংহাসনের সামনে যে দক্ষিণা দেয় তার কোনও হিসাব রাখা হচ্ছে না এবং রাজা তা আত্মসাৎ করছেন। ধনী লোকেরা মশাল জ্বালিয়ে মন্দিরে যাবার জন্য এবং চামর সেবার জন্য রাজাকে ঘুষ দিতে বাধ্য হচ্ছে।

রাজা নিজের দুষ্ট, নীচ, নির্বোধ ও দুশ্চরিত্র চাকরদের হাতে ক্রীড়নক এবং অত্যাচারের নিমিত্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর শাসন নষ্ট ভ্রষ্ট হয়ে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে।

এ সকল কারণে তাদের নিবেদন মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব রাজার হাতে ছেড়ে দেবার বিষয় সরকার পুনর্বিবেচনা করুন এবং অন্য ব্যবস্থা করার কথা বিচার করুন।

মন্দির পরিচালনায় অব্যবস্থার কথা রেভেনশা শুনেছিলেন। তিনি এও জানতেন

যে সেবকরাও মহা পাজি। সেজন্য তিনি রাজার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। আর্জি পেয়ে তিনি আদেশ দিলেন সেবকদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাজার থাকবে। এবং এ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সরকার তার সাহায্য করবে।

ডমপাড়া : ডিসেম্বর ১৮৭৬

ডিসেম্বর ১৮৭৩ বীমস ডমপাড়া থেকে চলে গেলে রাজা প্রজায় সদ্ভাব বেশী দিন বজায় রইল না। খাজনা দেবার সময় নিধি পট্টনায়কের পরোক্ষ সমর্থন পেয়ে প্রজারা আবার বিদ্রোহ করল। নিধি কটক গিয়ে সাহেবদের বোঝাল যে রাজার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি প্রজাদের উপরে অত্যাচার করেন বলেই তারা বিদ্রোহ করেছে।

রাজার আচরণ পাগলের মতো এ কথা সত্য। সে মা, ভাই, স্ত্রী চাকর—কাউকে বিশ্বাস করে না। তার ধারণা এরা তাকে মেরে ফেলতে চায়। পাছে ভাতে বিষ মিশিয়ে দেয় সেই ভয়ে সে ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। দুধ ও চিঁড়ে মুড়ি তার একমাত্র আহার। সে কারো সঙ্গে মেশে না, একা থাকে। নেহাত বাধ্য না হলে কারো সঙ্গে দেখা করে না। নির্জন ঘরে নিজের সঙ্গে কথা বলে এবং হাওয়াতে আঙুল দিয়ে কি সব লেখে।

গোলমাল শুরু হলে রঘুনাথ ডমপাড়া ছেড়ে চলে গেল। আজকাল সে কটক বা কলকাতায় থাকে। খরচ চালানোর জন্য রেজিষ্ট্রী হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে মহাজনদের থেকে ঋণ নেয়। এদিকে রাজবাড়িতে তার মা ও অন্যান্যরা অনাহারের সম্মুখীন হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আর্জি দিলে।

এ সব কারণে বীমস ভাবলেন রাজা সত্যই পাগল হয়ে গেছে। ডাকলে রঘুনাথ আসে না। তার ভয় সাহেব তাকে জেলে পুরতে চান। আর একবার ডমপাড়া গেলে হয়তো একটা সমাধান খুঁজে পেতেন বীমস কিন্তু নানা কাজের চাপে সময় করতে পারছিলেন না।

আজকাল ফকীর মোহন কটকে থাকেন। নীলগিরি থেকে ফিরে অনেকদিন বালেশ্বরে অর্থাগমের কোনও উপায় করতে পারলেন না। অবশেষে স্থির করলেন কটক যাবেন যেখানে তার হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মা বীমস আছেন। তিনি হয়তো কিছু করবেন। কটকে তিনি প্রথম জামাতা রঘুনাথ চৌধুরীর চাঁদনী চকের বাসায় থাকেন। সে তখন এফ.এ. পড়ছে। বীমসের কাছে অনেকবার গেছেন কিন্তু চাকুরি এখনও হয়নি। সময় কাটান সকালে ঘোড়সওয়ারী করে এবং সন্ধ্যায় কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মদ খেয়ে এবং তাস পাশা খেলে।

একদিন বীমস তাকে নাবালক জমিদারদের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের অডিটর হতে বললেন। তার বেতন হবে মাসে সত্তর টাকা। ফকীর মোহন বীমসের সামনে রাজী হলেন। কিন্তু পরে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে মনে হল এত কম টাকায় চালানো মুস্কিল। এমন ছোট ছোট জমিদারীর সংখ্যা অনেক। সে সব জায়গায় গিয়ে আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করতে হবে। একখানি পাল্কি, অন্তত আটজন কাহার, একজন রান্নার লোক দরকার হবে। এদের মাইনে দিতে ষাট টাকা যাবে। আবার গেলেন বীমসের কাছে। তাকে বোঝালেন এত কম টাকায় কাজ করা সম্ভব নয়। বীমস বুঝলেন। তিনি বোর্ডকে লিখলেন এ পদের বেতন বাড়িয়ে পঁচানব্বই টাকা করা হোক।

অনেকদিন চলে গেল, বোর্ডের জবাব এল না। ফকীর মোহন আর একবার বীমসের কাছে গেলেন। তিনি মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন, প্রকাশ্যে বললেন, 'আর কতদিন বোর্ডের উত্তরের আশায় থাকবেন?' ফকীর মোহন বললেন, 'হুজুর বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না।' বীমস বললেন, অলসের মন শয়তানের কারখানা। একটু ভেবে বললেন, 'ডমপাড়ায় গোলমাল হচ্ছে, আপনাকে সেখানকার দেওয়ান করতে চাই। যাবেন কি?' এ আবার একটা প্রশ্ন! সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'হুজুর যেখানে পাঠাবেন যাব।' স্থির হল তাকে তিন মাসের বেতন অগ্রিম দেওয়া হবে এবং তিনি দেওয়ান হয়ে ডমপাড়ায় যাবেন।

যাত্রা করার আগে ফকীর রাজা রঘুনাথ মানসিংহের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সে ভাবল সাহেব একজন গুপ্তচর পাঠিয়েছেন, ভাল করে কথা বলল না। তাঁর কোনও প্রশ্নের উত্তর দিল না। ফকীর মোহন যখন বললেন তিনি কাল ডমপাড়া গড় যাবেন তখন রঘুনাথ বলল গিয়েই খাজনা বাড়িয়ে দেবে।

আগষ্ট মাসে ফকীর মোহন ডমপাড়া গড়ে গেলেন। নিকি পট্টনায়কে ও বিদ্রোহীরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করল। খাজনা আদায় করতে চেষ্টা করলে তারা বলল, এক বছরের খাজনা দিতে রাজী যদিও বাকি ছিল পাঁচ বছরের। এদিকে রাজার জিদ নতুন করে জরীপ করে খাজনা বাড়ানো হোক। প্রজারা রাজী নয়, জরীপ করতে গেলে তারা বাধা দেবে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ডিসেম্বরে বীমস ডমপাড়ায় এলেন। সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের রসদ জোগাতে হবে ফকীর মোহনকে। তিনি গোয়ালাদের নামে পরোয়ানা জারী করলেন যে তারা একমণ ঘি ও চারমণ দুধ দই সরবরাহ করবে। তাদের গোরু বাছুর রাজার জঙ্গলে চলে বলে এ সব বিনামূল্যে দেবার রীতি ছিল। কিন্তু বিদ্রোহের পরে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সকালে বৃষ্টি হচ্ছে। ফকীর মোহন রসদের আশায় বসে আছেন। দিন বেড়ে চলল কিন্তু রসদ নিয়ে কেউ এল না। ফকীর মোহনের মেজাজ ক্রমে গরম হচ্ছে।

অনেক পরে একজন সামান্য ঘি দুধ নিয়ে এল। তার নাম সিঠ বেহেরা। তাকে দেখে ফকীর মোহন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, পাইকদের হুকুম দিলেন সিঠকে কাঠে বেঁধে তার আনা দুধ ঘি তার উপরে ঢেলে তাকে বেত মার। পাইকরা মহা উৎসাহে হুকুম তামিল করতে লেগে গেল। তার চিৎকার শুনে অন্য গোয়ালারা ভয় পেল, সুড়সুড় করে এসে রসদ দিয়ে গেল।

বীমসের তাঁবুতে গিয়ে ফকীর মোহন তাঁকে বোঝালেন খাজনা না বাড়িয়ে উপায় নেই। শেষ বন্দোবস্ত হয়েছিল কুড়ি বছর আগে এবং তখন খাজনা ধার্য হয়েছিল কম করে। বীমস রাজী হলেন না, বললেন, 'আমি প্রজাদের কথা দিয়েছি, খাজনা বাড়বে না।' ফকীর মোহন দেখলেন সুবিধা হচ্ছে না, ভাবলেন একটা চাল চালতে হবে। রাজাকে খুশী করতে হবে খাজনা বাড়াতেই হবে।

পরের দিন সকালে আবার গেলেন বীমসের কাছে। বললেন, প্রজারা চায় রাজার সঙ্গে বিবাদের একটা সমাধান ফকীর মোহনই করে দিন। হুজুর যদি সম্মতি দেন তবে তিনি এ কাজ করতে পারেন। বীমস খুশী হলেন, বললেন, 'বেশ তো চেষ্টা করুন না, আপনি সফল হলে খুশী হব, তবে কথাবার্তা আমার সামনে হবে।'

সেদিন প্রবল বৃষ্টি হল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইল। বিকেলবেলা প্রজাদের বীমসের তাঁবুতে ডাকা হল। একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে বীমস তাঁবুর বাইরে এলেন। হিন্দিতে প্রজাদের বললেন, 'তোমরা কি চাও যে, দেওয়ানবাবু রাজার সঙ্গে তোমাদের বিবাদ মিটিয়ে দিন?' চার পাঁচজন সর্দার চেঁচিয়ে বলল, 'দেওয়ানবাবুই যদি এ কাজ করবেন তবে আপনি কেন এসেছেন কটক থেকে?' বীমস কিছু বুঝতে পারলেন না, ফকীর মোহনের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'কি বলছে এরা।' এই সুযোগ। ফকীর মোহন বিনা দ্বিধায় বললেন দেওয়ান বাবু গোলমাল মিটিয়ে দেবেন, এর জন্য আপনি কেন এখানে এসে কষ্ট পাচ্ছেন? বীমস বললেন, 'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, তবে তাই হোক।' তিনি দক্ষ লোক এবং আমার আস্থাভাজন। সালাম প্রজাগণ, গুডবাই! ফকীর মোহনের বাধা দূর হল। চক্রান্ত করে তিনি নিধি পট্টনায়কের ভাইপোকে ধরে আনলেন এবং মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ছয় মাসের জন্য জেলে পাঠালেন। খাজনা আদায় করতে পাঠান পাইকদের লাগালেন। তারা অনেকদিন থেকে প্রজাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে এ সুযোগ তারা ছাড়ল না। ফকীর মোহনের সমর্থন পেয়ে তারা গ্রামে গ্রামে লুটতরাজ শুরু করল। বিদ্রোহীদের পক্ষে ছিল একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাকে ধরে এনে ভরদুপুরে গোহিল দাণ্ডে দৌড় করাল তিনবার। তালবস্ত গ্রামের কুয়ো ঘিরে রাখল, জল নিতে দিল না। কারো বাড়িতে হাঁড়ি চড়ল না।

বীমস ডমপাড়া থেকে যাবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ফকীর মোহন পরিস্থিতি নিজের আয়ত্বে আনলেন। সাম দানে যা সম্ভব হয়নি দণ্ডভেদে তা অক্লেশ হয়ে গেল।

কটক : জানুয়ারি ১৮৭৭

বৃটিশ সরকার ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি একটি আইন প্রণয়ন করল যাতে বলা হল এখন থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হলেন। এই উপলক্ষে দিল্লী এবং অন্যান্য বড় বড় ভারতীয় শহরে দরবার হল। সংযোগবশতঃ পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্রে এই দিনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল হস্তিনাপুরে। মহারাণী ভিক্টোরিয়াও হস্তিনাপুরে অর্থাৎ দিল্লীতে রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। পঞ্জিকা অনুসারে দিনটি রাজ্যাভিষেকের জন্য প্রশস্ত। এই উপলক্ষে কটকে বারবাটি কেল্লায় এক বিরাট দরবার হল। সাতদিন ধরে উৎসব চলল। রেভেনশার অধ্যক্ষতায় এক মাস আলোচনা করে কার্যসূচী স্থির হয়েছিল। কার্যক্রম নিম্ন প্রকার :

১লা জানুয়ারি সোমবার : কেল্লার দরবারে যাঁরা মানপত্র পেলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধাশ্যাম নরেন্দ্র, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ পণ্ডিত প্রমুখ জমিদারগণ। পুরীর রাজাকে পদবী ও খিলাত দেবার কথা কিন্তু যখন তাঁর নাম ঘোষণা করা হল তখন দেখা গেল তিনি অনুপস্থিত।

২রা মঙ্গলবাল : আতসবাজী ও রোশনাই। সন্তান থেকে চাঁদনীচক পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালান হল, রাণীহাট, কটকচণ্ডী ও কেল্লা ময়দানের দুই ধারে তেলের প্রদীপ জ্বালান হল। সরকারী বাড়ি ও অফিসগুলিতে ও তেলের দীপ জ্বলল। তিন প্রকারের আতসবাজী পোড়ান হল। কাঠাজাড়ীর চরে দেশী, বিদেশী ও গড়জাতি। লাল বাংলো ও প্রাঙ্গণ থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এ দৃশ্য উপভোগ করলেন। অন্যরা দেখল কাছারী থেকে। বিলাতী আতসবাজীর নানা রঙের গাছ, ফল, ফুল নক্ষত্র ইত্যাদি লোককে মুগ্ধ করল। দেশীয় বাজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'লাল মহতারা' গড়জাতী বাজী 'হাভেলী' ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

৩রা বুধবার : দরবার প্রাঙ্গণে কুস্তি ও খেলাধূলা হল। ছাত্রদের ও সেনাদের পৃথক দৌড় প্রতিযোগিতা হল। বস্তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দৌড় মজাদার হয়েছিল। পাল্কি দৌড়ের প্রতিযোগিতার সময় লোক হাত তালি দিয়ে চিৎকার করে সকলকে উৎসাহ দিল। বিদেহী বেহেরার দল প্রথম স্থান পেল আর দ্বিতীয় স্নান পেল দধি বিষোই-এর দল। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় নানা রকমের খেলা, জাদু, সার্কাস, কুস্তি তেলুগু বাদ্যের মেলা বসে লোকের মনোরঞ্জন করল। বাচ্চাদের তালপাতার থালায় খেতে দেওয়া হল। ব্রাহ্মণরা খাদ্য প্রস্তুত পরিবেশন করল যাতে কাউকে জাতিভ্রষ্ট হতে না হয়।

৪ঠা বৃহস্পতিবার : ইউরোপীয়রা কমিশনারের বাংলোতে আপ্যায়িত হলেন। দেশীয় লোককে এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হল না।

৫ই শুক্রবার : রাজা, জমিদার ও অন্যান্য দেশীয় ভদ্রব্যক্তি মোট প্রায় দুশজনকে

কমিশনার আপ্যায়ন করলেন। রাত্রে দরবার ঘরে দেশীয় মজলিস বসল। কলকাতা ও গঞ্জামের বাঈজীরা এতে অংশ নিল। কটকের বেশ্যা ও গোটিপুও নর্তকরাও যোগ দিল।

৬ই শনিবার : সকাল সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত চাউলিয়াগঞ্জের রেসকোর্সে ঘোড়দৌড় হল। এবং বিজেতাদের পুরস্কার দেওয়া হল। রাত্রে দরবারে পণ্ডিতদের সভা বসল। ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধির উপরে কবিতা পাঠ করল। গোবিন্দ রথের কবিতা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হল। ময়ূরভঞ্জ ও কেন্দুঝরের রাজারা এ সভার খরচ বহন করলেন।

৭ই রবিবার : কাছারী প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচশ গরীব লোককে মিষ্টান্ন জামাকাপড় এবং কম্বল বিতরণ করা হল। পুলিশ চৌকিদারগণও মিষ্টান্ন পেল।

সাতদিনব্যাপী অভিষেক মেলা শেষ হলে তারাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে পুরীর রাজা কটক এলেন উপাধি নিতে। তাঁকে পত্র দ্বারা জানানো হয়েছিল যে তাঁকে মহারাজা উপাধি দেওয়া হবে। তাঁকে পাঁচশ টাকা খরচ করে নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করতে হবে :

চোগা - ১৫৪ টাকা
রেশমী পাজামা - ১৫ টাকা চার আনা
বেনারসী পাগড়ি - ৩২ টাকা
শাল কম্ফর্টার - ৩০ টাকা
রেশমী রুমাল - ৫ টাকা
একখানি তরোয়াল - ১৫ টাকা
ঢাল - ১২ টাকা
জড়োয়ার বালা - ১২০ টাকা
মোতীর গলাবন্ধ - ১১৬ টাকা
এক শিশি আতর - বার আনা
মোট - ৫০০ টাকা।

রাজা খিলাতের জন্য ৫০০ টাকা নজরানা দিতে প্রস্তুত। তিনি কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। রেভেনশা মানা করে দিলেন। শুনে তারাকান্ত রাজাকে নিয়ে বিচিত্রানন্দের কাছে গিয়ে তার খোশামোদ শুরু করলেন। বিচিত্রানন্দ গিয়ে কমিশনারকে বললেন নিজের আসন সবার উপরে থাকবে দাবী করে পুরীর রাজা অন্য রাজাদের অসম্মান করেছেন। তিনি যদি ময়ূরভঞ্জ ও কেন্দুঝরের রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে তাঁর উপাধির বিষয়ে বিচার করা যেতে পারে। রেভেনশা এ প্রস্তাব মেনে নিলে বিচিত্রানন্দ রাজাকে জানালেন। রাজা ময়ূরভঞ্জ ও কেন্দুঝরের রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র লিখলেন। পরের দিন কমিশনারের অফিসে এসে

দিব্যসিংহ এক স্বর্ণ মোহর ভেট দিয়ে সাক্ষাতপ্রার্থী হলেন। রেভেনশা তথাপি নরম হলেন না, বিচিত্রানন্দকে দিয়ে খবর পাঠালেন যে রাজার উপাধি সনদ পরে পুরী পাঠিয়ে দেবেন।

পুরী : এপ্রিল ১৮৭৭

বারানসীর পণ্ডিতগণ অনেক দিন আগে থেকে রাজাকে জানিয়ে আসছিলেন যে এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বারুনী স্নান ও গোবিন্দ দ্বাদশী পড়বে। তখন পুরীতে অনেক তীর্থযাত্রী আসবে। বাংলা পঞ্জিকার একটি শ্লোকে লেখা আছে ২৫শে ফেব্রুয়ারি গোবিন্দ দ্বাদশী পড়বে। ওড়িয়া পঞ্জিকায় এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। সুতরাং রাজা পুরীর পণ্ডিতদের মত জানতে চাইলেন। ওড়িয়া পণ্ডিত ও জ্যোতিষীরা বাংলা পঞ্জিকার মত অগ্রাহ্য করে দৃঢ় মত দিলেন যে ঐদিন গোবিন্দ দ্বাদশী পড়তে পারে না। দেওয়ান তারাকান্ত বাংলা পঞ্জিকা মানে। সে রাজাকে অনেক বোঝাল কিন্তু রাজা ওড়িয়া পণ্ডিতদের মত স্বীকার করে নিলেন।

রাজার মত যাই হোক উত্তর ভারতের লোক বারানসীর পণ্ডিতদের মানে। রোজগারের এমন সুযোগ পাণ্ডারা হাত ছাড়া করতে চাইল না। তারা লজিং হাউজ ভাড়া নিয়ে যাত্রী সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ল। গোবিন্দ দ্বাদশীর জন্য মন্দিরে কোনও রকম বন্দোবস্ত হল না কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগে পুরীতে অভূতপূর্ব লোকসমাগম হল। তিন বছর আগের নবকলেবরের সময়ও এত ভীড় হয়নি। একুশে সকাল থেকে মন্দিরের সামনে তীর্থযাত্রীরা সমবেত হতে লাগল। সিংহদ্বারে কুড়ি হাজার লোক জমা হলে রাজা কালেক্টরকে খবর পাঠালেন যে মন্দিরে মোতায়েন পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হোক। এবং একজন হিন্দু ম্যাজিষ্ট্রেটকে মন্দিরে পাঠানো হোক। দুর্ভাগ্যবশত কালেক্টর এবং পুলিশ সুপার পুরীতে ছিলেন না। এ্যাক্টিং ম্যাজিষ্ট্রেট মন্দিরের সামনে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠালেন। দরজা খুলতেই জনস্রোত মন্দিরে ঢুকে পড়ল। বাইরেও ভীড় বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে মন্দিরে তিলধারণের স্থান রইল না। এমন সময় কয়েকজন বৈরাগী ও নাগা সন্ন্যাসী সব বাধা অগ্রাহ্য করে মন্দিরে প্রবেশ করল এবং আমশোহী ছেক বা ভোগ লুট করে নিল। ভীত সেবকরা মন্দিরের প্রধান দ্বার বন্ধ করে দিল।

বাইশে রাজা পুনর্বার অনুরোধ করলেন মন্দিরের সামনে একশ জন ঠিকা কনষ্টেবল মোতায়েন করা হোক। তাই করা হোল। তারপরে রাজা, ডেপুটী কালেক্টর মহানন্দ গুপ্ত ও আমলাদের সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের দ্বার খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢোকার জন্য ধাক্কাধাক্কি শুরু হল। অতএব সেবকরা দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হল। সেদিন দরজা

আর খুলল না। যাত্রীরা হতাশ হল। তেইশে আর্মষ্ট্রং ফিরে এলেন। তিনি রাজাকে নির্দেশ দিলেন মন্দিরের সামনে কাঠের ব্যারিকেড লাগানো হোক এবং পাণ্ডাদের আদেশ দিন যে ভীড় নিয়ন্ত্রণে তারও সহযোগ করবে। এসব করতে সময় লাগল, এদিকে যাত্রীরা অধীর হচ্ছে। সন্ধ্যা নাগাদ ভীড় আরও বাড়ল। আর্মষ্ট্রং রাজাকে একখানি পত্র পাঠিয়ে একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে মন্দিরে পাঠালেন। তিনি এসে চল্লিশজন কনষ্টেবলের সাহায্যে প্রধান দ্বার খুলে দিলেন। কিন্তু ভীড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল না। ঠেলাঠেলির মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট নিচে পড়ে গেলেন। অনেক কষ্টে দ্বার বন্ধ করা গেল। গোলমাল দেখে রাজার লোকেরা চম্পট দিয়েছিল।

চব্বিশে মন্দিরের চারপাশে, নরেন্দ্র পুষ্করিণীর সবদিকে এমনকি সারা শহরে জনসমুদ্র দেখে বাবু মহানন্দ গুপ্ত রাজাকে মন্দির খুলতে বললেন। রাজা জবাব দিলেন প্রসাদ রন্ধন শেষ না হলে মন্দির খোলা সম্ভব ন। অপরাহ্নে ভোগ প্রস্তুত হল কিন্তু মন্দির খুলল না। যাত্রীরা অস্থির হল। এই দিনটিতে ঠাকুরের দর্শনের আশায় তারা দূর দূরান্তর থেকে অশেষ কষ্ট সহ্য করে পুরী এসেছে। অর্দ্ধরাত্রে অশ্বাসীন আর্মষ্ট্রং এসে দরজা খুলতে আদেশ দিলেন। মুখ্য দ্বার খুলতেই সকলে একসঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করল, এমন ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হল যে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে দুজন প্রাণ হারাল। অগত্যা মন্দিরের মুখ্য দ্বার বন্ধ করতে হল।

দোল পূর্ণিমার রাত্রে অবস্থা এই রকমই হল। সারাদিন মন্দির বন্ধ থাকল এবং বাইরে ভীড় বাড়তে লাগল। রাজার কাছে বার বার খবর পাঠালেও তিনি প্রধান দ্বার খোলার চেষ্টা করলেন না। তিনি তখন খালিকোটের রাজার সঙ্গে সওদাবাজীতে লিপ্ত, কত অর্থ পেলে তিনি তাকে প্রথম দর্শনের সুযোগ দেবেন। এদিকে উদ্বেল জনতা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হল। তারা এস.পি. কে ঘোড়া থেকে টেনে নিচে ফেলে দিলে তিনি গুরুতর আঘাত পেলেন। আর্মষ্ট্রং-এরও সেই দশা হত। কিন্তু তাঁর হাতে একখানি মজবুত লাঠি ছিল। তিনি সেটি যথেচ্ছ ব্যবহার করে ভীড় থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে সফল হলেন। মধ্যরাত্রে মন্দিরের কবাট খোলা হলে ভীড়ের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে মারা গেল নয় ব্যক্তি। জোর করে কবাট বন্ধ করে বাইরের লোকদের দুর্ঘটনার কথা জানানো হল। রক্তপাতে মন্দির অপবিত্র হল এবং প্রস্তুত ভোগ নষ্ট হল। তীর্থযাত্রীরা হতাশ হল।

আর্মষ্ট্রং যাত্রীদের ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। সকালে বাবু মহানন্দ বাইরে এসে মন্দিরের ভিতরের অবস্থা জানালেন আর্মষ্ট্রংকে। রাজবাড়িতে যখন এ খবর পৌঁছাল তখন রাজা আফিমের নেশায় বুঁদ, কিছু বোঝার অবস্থা নেই তাঁর। কয়েকদিন পরে এগার জন যাত্রীর অকাল মৃত্যুর খবর পেলেন রেভেনশা। তিনি কিন্তু বিচলিত হলেন না। তিনি বোর্ডের সদস্য হিসাবে বদলীর আদেশ পেয়েছেন এবং যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রথমে কটকে এসে রেভেনশা ভাবতেন কটি মাস এখানে থাকতে হবে কিন্তু থাকলেন প্রায় বার বছর। 'দুর্ভিক্ষ' তাঁর কটকে অবস্থান কালের এক বেদনাদায়ক

অনুভূতি। তার পরে তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। তিনি ওড়িয়াদের সঙ্গে এক প্রকার আত্মীয়তা অনুভব করতেন, এমন কি পিকায় টান দিয়েও দেখেছিলেন। একুশে মার্চ কটক ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে দীপিকা লিখল :

> শ্রীযুক্ত রেভেনশা সাহেব ওড়িশা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। জেনে ওড়িশাবাসী নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে। শাসনকার্যে তাঁর দক্ষতা ছিল না কিন্তু দীর্ঘকাল ওড়িশায় থেকে লোকের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। কাজে করতে পারুন বা না পারুন তিনি সর্বদা ওড়িশার হিত চিন্তা করতেন। বিশেষত সাধারণ শিক্ষার প্রতি তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। প্রমাণস্বরূপ কলেজ ও মেডিকাল ইত্যাদি অনেকগুলি কীর্তি রেখে যাচ্ছেন।

২৭শে মার্চ জন বীমসকে কটকের কমিশনার নিযুক্ত করে আদেশ এল। এই পদে যোগ দিয়ে তাঁর প্রথম কাজ হল মন্দিরের দুর্ঘটনার তদন্ত করা। পূরী এসে তিনি মহান্ত, পাণ্ডা ও ভদ্রলোকদের ডাকালেন এবং ঘটনার বিবরণ ও তাদের মত জেনে নিলেন। পুরীর রাজা এক লিখিত কৈফিয়তনামা পেশ করলেন। বীমস তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে অনেক অবান্তর কথা বললেন। সেবকরাও সত্য গোপন করল পাছে রাজা কোনও ঝামেলায় পড়েন। কটক ফিরে বীমস এক দীর্ঘ রিপোর্ট সরকারকে পাঠলেন। তাঁর মতে পুরীর রাজার দায়িত্বজ্ঞানের অভাবই এ দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। এই নির্বোধ যুবক এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী। তিনি মন্তব্য করলেন রাজার হাত থেকে মন্দিরের দায়িত্ব নিয়ে নিলেই ভাল হয় কিন্তু উপস্থিত পরিস্থিতিতে তা করা সম্ভব নয়।

বীমস রাজাকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি একটি কমিটি গঠন করুন। এই কমিটি স্থির করবে তীর্থযাত্রীদের ভীড় বেশী হলে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারকে পরামর্শ দিলেন এমন একটি প্রস্তাব রাজার থেকে না পেলে তাকে যেন সনদ ও খিলাত না দেওয়া হয়।

রিপোর্টে যাই লিখুন ওড়িশায় জনমানসে পুরী রাজার স্থান বীমস জানতেন। সরকার উপাধি দিন বা না দিন, সাহেবরা রাজার সম্বন্ধে যেমন মতই পোষণ করুন না কেন, তাঁদের দৃষ্টিতে এই নির্বোধ যুবক হলেন জগন্নাথের চলমান প্রতিমা।

বালেশ্বর : জুন ১৮৬৭

মহাত্মা রেভেনশার পরে মহাত্মা বীমস কটকের কমিশনার হলে ওড়িশাবাসী খুশী হল। কিন্তু বালেশ্বরবাসীর পক্ষে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। তিনি তাদের আপনজন। তিনি বালেশ্বরের জনপ্রিয় কালেক্টর ছিলেন। যেদিন সংবাদ এল যে বীমস বালেশ্বর আসবেন সেদিনই তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে এক সভা ডাকা হল। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ৭ই জুন সরকারি ইংরাজী স্কুলে এক সভা করে স্থির করলেন যে বীমসের আগমন

উপলক্ষে শহরে আলোকমালা হবে এবং পূর্বপরিকল্পিত সাধারণ পুস্তকালয় নির্মাণ করা হবে। রোশনাই-এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য চাঁদা আদায় করা হল। রাজা শ্যামানন্দ দে পৃথকভবে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন।

১৪ই জুন দু সপ্তাহের জন্য বীমস বালেশ্বর এলেন। ১৬ই তাঁর সম্মানে আলোকমালা হল। শহরে দুটি তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। সরকারী বাড়িসহ অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ি আলোকসজ্জায় ঝলমল করছিল। রাত্রি নটায় কালেক্টরের সঙ্গে ঘোড়াগাড়ি করে আলোকমালা দেখতে গেলেন বীমস। তাঁর সঙ্গে শহরের অনেক ভদ্রব্যক্তি। শহর পরিক্রমা করে সকলে শ্যামানন্দদের পড়ুয়াপাড়া স্থিত নতুন ভবনে এলেন। ময়ূরভঞ্জের রাজা, অনেক জমিদার, বালেশ্বরের সাহেবগণ এবং অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বীমসকে অভ্যর্থনা করলেন। তার উত্তরে বীমস হিন্দিতে বললেন :

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অভ্যর্থনায় আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। যদিও আমি চার বছর আগে আপনাদের এবং বালেশ্বর ছেড়ে চলে যাই বালেশ্বর আমাকে ছাড়েনি। যখন বালেশ্বর ছিলাম তখন বালেশ্বরের জন্য কাজ করেছি কিন্তু তা নগণ্য। সেইজন্য এতদিন পরেও আপনারা আমাকে এমন সাদর অভ্যর্থনা করলেন যে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। এখানে অনেক ভদ্রব্যক্তি আছেন যাঁদের মধ্যে কম লোক এমন আছেন যাঁদের আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। আর যাঁরা আমার অপরিচিত তাঁরাও আমাকে সম্মান করলেন। তাঁদের উপস্থিতি তাঁদের মনোভাবের পরিচায়ক। পরিচিতদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁদের আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তার থেকে বেশী ভাই মনে করি। বালেশ্বরে অবস্থান কালে এ স্থানের প্রতি গভীর হৃদ্যতা অনুভব করেছি। যেভাবে বালেশ্বরবাসী আমার আদেশপালন করতেন সেরূপ তৎপরতার সঙ্গে সরকারী আদেশগুলিও পালন করতেন। বালেশ্বরে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে জনহিতকর কাজে লিপ্ত আছেন। আমি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে বালেশ্বর আমাকে মনে রাখে বা না রাখে আমি বালেশ্বরকে কোনওদিন ভুলব না। আমার প্রার্থনা বালেশ্বরের হৃদয়ে আমার এবং আমার হৃদয়ে বালেশ্বরের স্থান যেন চিরস্থায়ী হয়।

বক্তৃতার পরে সকলে ছাদে উঠে আতসবাজী দেখলেন। তারপর বাঈজী নাচ দেখে গীতবাদ্য শুনে গভীর রাত্রে বীমস কালেক্টরের বাংলোতে ফিরে এলেন।

২১শে বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডলের বাগানবাড়িতে বীমসের বিধিবদ্ধ অভ্যর্থনা হল। ২৬শে মদন মোহন দাসের বৈঠখখানায় তাঁর স্থাপিত বারবাটী বিদ্যালয়ের এবং পুরাতন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভা হল। বীমস এবং কালেক্টর ব্যতিত সভায় নীলগিরির রাজা এবং স্থানীয় ভদ্রলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের ছাত্ররা বিদ্যার মাহাত্ম্য এবং পারিতোষিক প্রাপ্তিজনিত খুশীর বিষয়ে একটি গান শোনাল।

তারপর 'আলেকজাণ্ডার ও দস্যু' এবং 'রাজা ক্যানুট ও তার পারিষদগণ' ইংরেজীতে অভিনয় করল। বীমস প্রথমে ওড়িয়াতে এবং পরে ইংরাজীতে ভাষণ দিলেন। তিনি মদন মোহন দাসের উদ্যমের প্রশংসা করলেন। সেদিন রাত্রে উমেশ চন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে আর একবার বীমসকে সংবর্ধনা জানান হল—এবার দেশীয় রীতিতে।

বালেশ্বরে অবস্থান কালে বীমস সকল সরকারী স্কুল ও অফিসগুলি পরিদর্শন করলেন। ২৮শে সেণ্ট জেমস স্কুল পরিদর্শনে গেলেন। তিনি পৌঁছতেই ছাত্ররা এই গানটি গেয়ে শোনাল :

মহামহিম মহিমার্নব শ্রীযুক্ত মহাত্মা জোহন বীমস ওড়িশার কমিশনার মহোদয় শ্রীচরণ কমলেষু,

হে ওড়িশার ললাট তিলক,
আজ আমাদের অপার সৌভাগ্য যে এখানে
আপনার শ্রীচরণ পড়ল,
আমাদের আনন্দের সীমা নাই আজ,
সকলের মুখে এক নাম বীমস বীমস বীমস।

গানের বাকী অংশে বলা হল মহারাণী ভিক্টোরিয়া সাতসমুদ্র পারে বিরাজমান আছেন, সে দুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছে বীমসের চন্দ্রানন। গানে বীমসকে প্রাণেশ্বর, উৎকল হৃদের কর্ণধার ইত্যাদি অনেক আখ্যা দেওয়া হল। শুনে বীমস অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি ওড়িয়াতে ছাত্রীদের সম্বোধিত করলেন। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটায় মহাত্মা বীমস বালেশ্বর থেকে কটক অভিমুখে প্রস্থান করলেন।

ডমপাড়া : জুন ১৮৭৭

ডমপাড়ার শাসন সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বে এনে ফকীর মোহন পাঁচ বছরের বকেয়া খাজনা আদায়ে মন দিলেন। কড়া শাসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল, সর্দাররা তাঁকে ভয় করে, সুতরাং খাজনা আদায় করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তালবস্তা অঞ্চল থেকে একদিনে আঠার হাজার টাকা আদায় হল। এত টাকা রাখার জন্য সিন্দুক বা বাক্স নেই। অগত্যা বস্তায় ভরে টাকা নিয়ে ফকীর মোহন রাজার কাছে গেলেন। আজকাল তিনি রাজবাড়িতে থাকেন না, পিছনের বাগানে একখানি ঘর বানিয়ে নিয়ে সেখানে থাকেন। প্রচুর টাকা আদায় হয়েছে। রাজা খুশি হলেন কিন্তু টাকা নিতে রাজী হলেন না। বললেন, আপনাকে বলেছিলাম জমি জরীপ করে খাজনা বাড়িয়ে দিন, তা আপনি করেননি। এ টাকা আপনি রেখে দিন। বলে উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

টাকা নিয়ে রাজবাটি গেলেন ফকীর মোহন, রাণীকে টাকা রাখতে বললেন। তিনিও রাজী হলেন না। ফকীর মোহন একবার ভাবলেন তিনি রেখে দেবেন টাকা। আবার ভাবলেন সেটা অনুচিত হবে, তিনি বেতন পান, তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সব কিছু পান। শেষে টাকা নিয়ে কটক গেলেন, মহাজনদের টাকা শোধ করে হ্যাণ্ডনোটগুলি ফেরত নিলেন।

এবার তিনি বন্দোবস্তের কাজে মন দিলেন। পাঁচ মাস কঠিন পরিশ্রমের ফলে এ কাজ সম্পন্ন হল। রোজ ঘোড়ায় চড়ে দোনলা বন্দুক নিয়ে গ্রামে গ্রামে জরীপের কাজ তদারক করে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন। খানাপুরী শুরু হলে রাজার উপস্থিতি প্রয়োজন হল কিন্তু তিনি তখন কলকাতায়। ফকীর মোহনের পত্র পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন। বন্দোবস্তের প্রগতিতে তিনি খুশি। এবার তিনি রাজবাটিতে থাকতে লাগলেন। এতদিন পরে তিনি ফকীর মোহনের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বললেন। শুধু তাই নয়। আজকাল সকাল বিকেল রাজবাটিতে ডাকেন ফকীর মোহনকে। রাত্রে উদ্যানে বসে দুজনে খোশমেজাজে গল্প করেন ও বিয়ার খান। রাজা আজকাল নিজের একান্ত গোপন বিষয়ও ফকীর মোহনের সঙ্গে আলোচনা করেন। একদিন তিনি ফকীর মোহনকে বললেন কুমার ব্রজেন্দ্রর জন্য একজন ভাল গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করুন। একটু ভেবে ফকীর মোহন বললেন প্যারীমোহন আচার্যের মত শিক্ষক দুর্লভ কিন্তু তিনি রাজী হবেন কিনা জানতে হবে। প্যারীমোহন কলেজের শিক্ষা শেষ না করেই নানা প্রকার দেশহিতকর কাজে লেগে গিয়েছিলেন। তিনি ইয়ংম্যানস্ লিটারারী এসোসিয়েশন স্থাপন করেছিলেন। এখানে মাঝে মাঝে আলোচনা সভা হয়। বাংলা ও ওড়িয়াতে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাগ্মী। আরও একটি মহৎ কাজ করলেন প্যারীমোহন—কটকে একটি স্কুল স্থাপন করলেন। তাঁর 'কটক একাডেমি' ১৮৭৩ সনে মাত্র বারজন ছাত্র নিয়ে শুরু হয়েছিল। সেই বছর তিনি 'উৎকলপুত্র' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। দুই কাজে তাঁকে সাহায্য করলেন তাঁর সহপাঠী বাঁকীর গোবিন্দ রথ। তাঁর অন্যতম সহপাঠী মধুসূদন রাও আজকাল কটকে আছেন। কিন্তু তিনি সরকারী কর্মচারী, খোলাখুলি সাহায্য করতে পারেন না। কারণ প্যারীমোহন প্রায়ই সরকারের সমালোচনা করেন। দুজনের মধ্যে হৃদ্যতা অবশ্য বেড়েছিল।

প্যারীমোহন ও গোবিন্দ রথ স্কুল ও পত্রিকার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলেন। ১৮৭৫ সনে স্কুলটি মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিবর্তিত হল। ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হল ষাট। নানা প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করে স্কুলটি চালাতে হচ্ছিল। এমন সময় প্যারীমোহন রাজকুমারের গৃহশিক্ষক হয়ে ডমপাড়ায় যাবার আমন্ত্রণ পেলেন এবং তিনি বিনা দ্বিধার সম্মত হলেন।

ডমপাড়ায় ফকীর মোহন ও প্যারীমোহন পরস্পরকে কাছে পেয়ে আনন্দিত হলেন। ফকীর মোহন প্যারীমোহনের থেকে আট বছরের বড়। তথাপি তাঁদের মধ্যে

অনায়াসে গভীর বন্ধুত্ব হল। দুজনের একত্র থাকা কিন্তু স্থায়ী হল না। কমিশনার ফকীর মোহনকে ঢেঙ্কানলের এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করলেন, রাজা কিন্তু তাঁকে ছাড়তে রাজী হলেন না। বললেন, কেন যাবেন, আমি আপনার বেতন বাড়িয়ে দেব। শেষে দুজনে বীমসের কাছে গেলেন। রাজা বললেন ফকীর মোহনকে ছাড়া তাঁর চলবে না। বীমস ফকির মোহনকে আলাদা ডেকে বললেন, 'বাবু, এই রাজাটা পাগলাটে, এর কথার ঠিক নেই। এর কথা শুনলে পরে পস্তাবেন।'

অবশেষে ফকীর মোহনের ডমপাড়া ছাড়ার সময় এল। তাঁকে বিদায় দেবার সময় রাজা প্রায় কেঁদে ফেললেন। তিনি তাঁকে কটকে বাড়ি করার জন্য পাঁচ হাজার টাকা, একখানি নেপালী ভোজালী এবং নিজের দোয়াত কলম উপহার দিলেন।

ফকীর মোহন চলে গেলে রাজা প্যারীমোহনকে দেওয়ান নিযুক্ত করলেন।

ঢেঙকানল : আগষ্ট ১৮৭৭

ফকীর মোহন ঢেঙকানালের এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদে যোগ দেবার কয়েক মাস আগে মহারাজা ভাগীরথী মহীন্দ্র বাহাদূর দেহত্যাগ করেছিলেন। তিনি ১৪০ কিলো ওজনের বিশালকায় পুরুষ ছিলেন যদিও তাঁর বিশাল বপু তাঁর কোনও কাজে বাধা হয়নি। দক্ষ শিকারী ছিলেন। যে চেয়ারে বসে শিকারে যেতেন সেটি কাঁধে করে নিতে চব্বিশজন লোক লাগত। তিনি তিনশ আশীটি বাঘ মেরেছিলেন। এদিকে অনেক স্কুল ও হাসপাতালও তিনি স্থাপন করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি কাঙালদের হিতে অনেক কাজ করেছিলেন এবং কটক রিলিফ কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁকে মহারাজা উপাধি দিয়েছিল সরকার। তিনি কটক প্রিণ্টিং কোম্পানী ও দীপিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রিণ্টিং কোম্পানীর বিশাল দোতলা বাড়ি তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল। গৌরীশংকর বলতেন ভাগীরথী মহীন্দ্র যে কোম্পানীর পৃষ্টপোষক তার ভবন কি যেমন তেমন হতে পারে? কোম্পানীর অফিসের দোতলায় দুখানা চেয়ার সর্বদা পাতা থাকত তাঁর জন্য। শৌখিন লোক ছিলেন। কটকের কমিশনারের লালবাগের বাংলোর অনুকরণে একটি প্রাসাদ বানিয়েছিলেন ঢেঙকানলে।

তার ভগন্দর রোগ ছিল। কষ্টের উপশমের জন্য তিনি ভারী মাত্রায় আফিম খেতেন। আফিমের নেশা ছাড়ানোর জন্য কটকের সিভিল সার্জন ষ্টুয়ার্ট তাঁকে একটি বিলাতী ঔষধ দিয়েছিলেন। একদিন যখন খুব কষ্ট হল, দেখলেন ঔষধ শেষহয়ে গেছে। একজনকে পাঠানো হল ডাক্তারখানায় ঔষধ আনতে। সে গিয়ে বাঙালি ডাক্তারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ঔষধ চাইল। ডাক্তার ভুল করে তাকে বিষাক্ত ঔষধ দিল যা খেয়ে মহারাজার অবস্থার বিপদজনক অবনতি হল। ছুটে গিয়ে লোক কটক

থেকে ডাক্তার ষ্টুয়ার্টকে নিয়ে এল। তিনি মহারাজার প্রাণ বাঁচালেন। ততক্ষণে ডাক্তার তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেল। শোনা গেল জঙ্গলে তাকে বাঘ খেয়েছে।

ফকীর মোহন যখন ঢেঙকানলে এলেন তখন ভাগীরথীর নাবালক পোষ্যপুত্র দীনবন্ধু রাজা হয়েছে। তার ম্যানেজার বনমালী সিংহ। রাজার শিক্ষক প্যারীমোহন সেন এবং বিজয়কুমার চক্রবর্তী এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন। তাদের সঙ্গে অনতিকালে ফকীর মোহনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এরা সকলে মদ্যপায়ী। অচিরে তাঁর মদের অভ্যাস হয়ে গেল।

ফকীর মোহন ঢেঙকানলে আসার কিছুদিন পরে, আগষ্ট মাসে বীমস দেখতে এলেন শাসন কেমন চলছে। দুদিন পরে তিনি রাজবাটি দেখতে গেলেন। রাজবাটির পিছনের দিকে একটি আঙ্গিনাযুক্ত অন্ধকার ঘর। সেখানে বাস করে পূর্বতন মহারাজার ষাটজন রক্ষিতা। স্বাস্থ্যহানির পর থেকে সেদিকে আর যেতেন না মহারাজা। তাদের অবস্থা দেখে বীমস সিদ্ধান্ত নিলেন যারা নিঃসন্তান তারা বিবাহ্ করে চলে যাবে। আর যাদের সন্তান আছে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার নেবে। রাজার একপাল চাকরবাকর। প্রতিটি পদের জন্য দুজন লোক কারণ বেতনের পরিবর্তে তারা জমি পেত। একজন যখন কাজ করে অন্যজন তখন জমি চাষ করে। মহারাজার পাল্কির জন্য চব্বিশজন লোক দরকার কিন্তু নিযুক্তি পেয়েছিল আটচল্লিশজন। মহারাজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য বাহাত্তর জন লোক। দাঁতন জোগাতে চারজন, একজন গাছে চড়ে ডাল আনে একজন ডাল কেটে দাঁতনের মাপে কেটে টুকরো করে, একজন সেটি স্বস্থানে রাখে এবং একজন হাতে তুলে দেয়। বীমস তিনজনকে ছাঁটাই করে একজনকে রাখলেন।

রান্নার লোক ছ'জন। চারজনকে বীমস বরখাস্ত করলেন। যাদের চাকরি গেল তাদের মধ্যে একজন অনেক কান্নাকাটি করলে ফকীর মোহন তাকে বীমসের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তার গুণগ্রাসের এমনই ব্যাখ্যান করলেন যে বীমস যে শুধু তার চাকরি ফিরিয়ে দিলেন তাই নয় তার বেতন মাসে সাত টাকা বাড়িয়ে দিলেন।

কমিশনার ফিরে যাবার আগে রাজবাটিতে একটি দরবার হল। এই উপলক্ষে রাস্তাঘাট সাফ করা হল, তোরণ নির্মিত হল, পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হল এবং আমের পাতা সাজানো হল। দরবারে সরকারী কর্মচারী ছাড়া পণ্ডিত, প্রধান, রাজার জ্ঞাতি ভাই মিলে প্রায় একশজন উপস্থিত হলেন। বাংলা গান ও ইংরাজী বাজনার পরে পণ্ডিতদের সভা বসল। তারা শ্লোক আবৃত্তি করলেন এবং সংস্কৃতে ভাষণ দিলেন। বীমসও কম যান না, গীত গোবিন্দ থেকে 'ললিত লবঙ্গলতা' গাইলেন। এভাবে সভা শেষ হল। মহাত্মা বীমসের কণ্ঠে গানটি অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য হলেও কারো সন্দেহ রইল না যে তিনি জ্ঞানী লোক।

৩০শে আগষ্ট বীমস ঢেঙকানল থেকে কটক যাত্রা করলেন। কিছু রাস্তা যেতেই প্রবল বর্ষণ শুরু হল। রাজবাটিতে লাল নীল কাঁচলাগানো একটি লোক এল তাদের পথ দেখাতে। আরও কিছুদূর গেলে একটি নালা আসবে। দেখা গেল সেটি বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। অগত্যা যাত্রা থেমে গেল। ঠিক হল ঢেঙকানল থেকে হাতি আনা হবে। বর্ষায় ভিজে ব্রাণ্ডি খেয়ে হাতির জন্য অপেক্ষা করতে বীমসের মাথায় একটি কবিতার আকার নিল। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষায় সেটি রচনা করে ফেললেন। বাংলায় অনুবাদ করলে মোটামুটি এরকম হবে :

ছেড়ে এলাম ঢেঙকানল,
রাস্তা অতি অসমতল,
গরম দেশের বাত্যা প্রবল,
মুষলধারে ঢালছে জল,
ঘিরে চারদিকে ঢেঙকানল,
চিৎকার করে শৃগালদল—ইত্যাদি।

কিছু সময় পরে ঢেঙকানল থেকে দুটি হাতি এল। একটির উপরে বীমসের পাল্কি বাঁধা হল। অন্যটির উপরে বসল অন্য সকলে। যাত্রা আবার শুরু হল।

কটক : ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮

অনেক ভদ্র, শিষ্ট, মিশুক ও মিষ্টভাষী অফিসার কটকে কাজ করেছেন। তাঁরা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন বটে কিন্তু লঘুগুরুর ভাব তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সাহেব অফিসারগন নেটিভ ভদ্রব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের বাংলোতে দেখা করতেন কিন্তু স্তরভেদ ঘুচে যেত না। সাহেবরা হাকিম। দেশীয় লোক শিক্ষিত হতে পারেন, ধনী হতে পারেন কিন্তু তাঁরা তো প্রজা। সামাজিক স্তরে দুই-এর মধ্যে সাম্য স্থাপন সম্ভব হত না। ভার্ণাকুলার ক্লাসের বুক রিডারে এ বিষয়ে লেখা ছিল :

হিন্দুরা সাহেবদের বাড়ি গেলে দিন দশটার পরে এবং অপরাহ্ন একটার আগে যাওয়া উচিত। ঘরে ঢুকবার আগে এবং বিদায় নেবার সময় সালাম করা কর্তব্য। কোনও স্ত্রীলোক নিজে হাত না বাড়ালে করমর্দন করার প্রয়াস অনুচিত। পোশাক পরিচ্ছদের বিষয়ে আর একটু মনোযোগ দিলে ভাল হয়। ময়লা কাপড় না পরে যথাসাধ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা বাঞ্ছনীয়—ইত্যাদি।

এ বিষয়ে প্রথম ব্যতিক্রম কালেক্টর বীডন। ১৮৭৭ সনের আগষ্ট মাসে তিনি নিজের বাংলোতে দেশীয় ভদ্রব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করলেন। ইংরেজ কর্মচারী ও দেশীয় ভদ্রলোকেরা মিলে একসঙ্গে আমোদপ্রমোদ রত হলেন এই প্রথম। অনেক

জমিদার চারজন উকিল, সকল ডেপুটী কালেক্টর, মুনসিফ ও শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদস্ত কর্মচারী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁদের একজন গৌরীশংকর রায়। বৈঠক চলল মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। সেতার ও পিয়ানো বাজান হল। তাসপাশা চলল। কমিশনার বীমসের ওড়িয়াতে কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা সকলে উপভোগ করল। একটি ত্রুটি অবশ্য কারো নজর এড়াল না নিমন্ত্রিতদের তালিকায় ডেপুটী কালেক্টর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল, বীডনের নয়। তাছাড়া পত্রের লিখনশৈলী থেকে মনে হবে নিমন্ত্রণ নয়—কোর্টের সমন।

কিছুদিন পরে রেভেনশা পুনরায় কমিশনার হয়ে এলেন এবং বীমসের থেকে পদভার গ্রহণ করলেন। বীমস চট্টগ্রামের কমিশনার হয়ে গেলেন। রেভেনশা ফিরে আসাতে লোকে যত আনন্দিত হল তত দুঃখিত হল বীমসকে হারিয়ে।

ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হবার এক বছর পূর্ণ হলে ১লা জানুয়ারি রেভেনশা দেশীয় ভদ্রলোকদের নিজের বাংলোতে আমন্ত্রণ করলেন। এই প্রীতি সম্মেলন অত্যন্ত আনন্দদায়ক হল।

সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা কোনও দেশীয় লোকের বাড়িতে হয়নি। অবশ্য অনেকদিন আগে সাহেবা জমিদার বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের বাড়ি গিয়েছিলেন সার্কাস দেখতে। আর একবার গোলক চন্দ্র বসুর বাড়ি গিয়েছিলেন সার্কাস দেখতে। তবে প্রকৃত মেলামেশার সুযোগ হয়নি। ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগমোহন রায় ২রা জানুয়ারি নিজের বাড়িতে সকলকে নিমন্ত্রণ করে এ অভাব দূর করলেন।

এই মজলিশে যোগ দিলেন প্রায় পঁয়ত্রিশজন সাহেব এবং সমসংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোক। কমিশনারের বাংলোতে যেমন বন্দোবস্ত হয়েছিল জগমোহন রায় প্রায় তেমনই করলেন। ঘর ও আঙ্গিনা ঝাড়লণ্ঠন দিয়ে সাজানো হল। রং বেরঙের আলোকমালা হল। দোতলায় জলখাবারের আয়োজন হল এবং বৈঠকখানা ও আঙিনায় খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদের। সেতার ও বেহালা বাজল, গোটিপুত্ত ও বাঈজীর নাচ হল। সর্বশেষে ইংরেজী রীতিতে ছোট ছোট ভাষণ দেওয়া হল। সকলে সাহেব ও দেশীয়দের অবাধ মেলামেশার সুফল বর্ণনা করলেন। উকিল রাজেন্দ্র মিশ্র শেক্স্পিয়ারকে উদ্ধৃত করে বললেন, 'আর্ উই নট্ ব্রাদার্স?'

মাত্র একজন এ মজলিশে উপস্থিত থেকে উপভোগ করতে পারলেন না। সকলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেননি রাধানাথ রায়। এক মাস আগে জয়েণ্ট ইনস্পেক্টরের পদে উন্নীত হয়ে তিনি কটকে যোগ দিয়েছিলেন। ওড়িশায় শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী এখন তিনি। উচ্চপদস্থ অফিসারদের একজন। মজলিশে সকলে তাঁর অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি এক কোণে চুপচাপ বসে থাকলেন। একটু গান বাজনা শুনলেন কিন্তু বাঈজীর নাচ শুরু হতেই উঠে চলে গেলেন। কয়েকজন ইংরেজ তা দেখে তাঁকে ঠাট্টা করলেন। কিন্তু তিনি কি করে সকলের সামনে বলেন যে

ঝলমলে আলো যেখানে অন্ধকারে মিশেছে সেখানে তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দর নারায়ণ?

এ মজলিশের কিছুদিন পরে চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে কোনও উচ্চপদের জন্য রেভেনশা জগমোহন রায়ের নাম সুপারিশ করেছেন। অনেকে বলল, এই জন্যই জগমোহন মজলিশের আয়োজন করেছিলেন। একজন ওড়িয়াকে না করে একজন বাঙালিকে সুপারিশ করার জন্য লোকে রেভেনশার সমালোচনা করল। শেষে কিন্তু দেখা গেল পদটি পেলেন নন্দকিশোর দাস, একজন ওড়িয়া। যারা এতদিন রেভেনশার সমালোচনা করেছিল তারাই এখন তার প্রশংসক হয়ে গেল। অনেকে মন্তব্য করল, বেচারা জগমোহন, তার এক কাঁড়ি টাকা বরবাদ হল। বড় পদের প্রলোভন দিয়ে সাহেবরা খেয়ে দেয়ে মজা করল কিন্তু দেবার বেলায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল। একেই বলে ভাগ্য!



আট

পুরী : ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি নেবার এক বছর পূর্ণ হলে কটকের মত পুরীতেও দরবার হল ১লা জানুয়ারি। বড়দাণ্ডে একটি অস্থায়ী বেদী নির্মাণ করে কালেক্টর ও পুরীর রাজার জন্য দুখানি সিংহাসন স্থাপন করা হল। তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গে দরবারের কাজ শুরু হল। অভিনন্দনপত্র পাঠ হল, কালেক্টর ভাষণ দিলেন, 'মহারাণী কী জয়' ধ্বনিত হল। কটক এবং রম্ভা থেকে আনা বারবনিতারা নৃত্য পরিবেশন করল। মঙ্গলসূচক শ্লোক আবৃত্তি করল পণ্ডিতগণ। দরবার সুচারুরূপে পরিচালিত হল। একটি অভাব অবশ্য রয়ে গেল। রাজা যোগ দিলেন না।

ইতিমধ্যে দিব্যসিংহের অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়েছে। এখন তিনি সম্পূর্ণরূপে ভৃত্যদের করতলগত। সব সময় ভাঙ্ আর আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন। গোবিন্দ দ্বাদশীর সময় বিশৃঙ্খলার পরে সরকার তাঁকে জানিয়েছিল যে এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য একটি যোজনা তৈরী করে পাঠালেই তাঁকে মহারাজ উপাধি দেওয়া হবে। কিন্তু বারম্বার তাগাদা দিলেও তিনি সে কাজে কোনও আগ্রহ দেখালেন না। ফলে তাঁর সনদটি কালেক্টরের আলমারীতে বন্ধ রয়ে গেল।

দিব্যসিংহ নিয়ে সূর্যমণির চিন্তার শেষ নেই। ভেবেছিলেন বড় হলে তার মতিগতি বদলে যাবে। এখন তার বয়স তেইশ বছর। দুই বছরের একটি পুত্র আছে তাঁর। কিন্তু তার বুদ্ধিসুদ্ধির কোনও উন্নতি হচ্ছে না। শিক্ষাদীক্ষা হয়নি। সর্বক্ষণ আখড়ায় ভৃত্য পরিবৃত থেকে তার চরিত্র অতি নিম্নস্তরে নেমে গেছে। মন্দির বা জমিজমা পরিচালনায় রুচি নেই, ভদ্রব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যায়। নেশার ঘোরে যখন তখন চাকরদের মারধোর করে। রোজ সূর্যমণিকে তার নামে নালিশ শুনতে হয়। এসব কোনও রকমে সামলে নেন সূর্যমণি পাছে রাজবাড়ির বাইরে এ কথা জানাজানি হয়ে যায়। নেশার ঘোরে দিব্যসিংহ এমন বেপরোয়া মারে যে কারো রক্ত ঝরে কারো মাথা ফাটে।

শেষ পর্যন্ত সূর্যমণি শিবদাস বাবাজীর পরামর্শ চাইলেন। গত বছর রাজবাড়িতে কলেরা দেখা দিলে সূর্যমণির আহ্বানে তিনি এসে ঔষধ দিয়েছিলেন। কিন্তু বললেন যতই চেষ্টা করা হোক পাঁচজনের মৃত্যু অনিবার্য্য। সূর্যমণির তাঁর উপর আস্থা আছে। যখন সত্যই পাঁচজনের মৃত্যু হল তখন তাঁর বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। দিব্যসিংহকে কি করে সৎপথে আনা যায় জিজ্ঞাসা করলে বললেন ঔষধে কাজ হবে না, প্রথমে আফিমের নেশা ছাড়াতে হবে। রাণী জোর করলে তিনি দিব্যসিংহের জন্য কিছু ভস্ম

দিলেন। দিব্যসিংহ তা খেতে রাজী হল না। ভৃত্যরা তাকে বলেছিল রাণী তাকে বিষ দিয়ে মারতে চান। এরপরে দিব্যসিংহ উৎকট উন্মাদের মতো আচরণ করতে লাগল। ঔষধ দিয়েছিলেন বলে শিবদাসের উপর তার বিদ্বেষ বাড়ল। তাছাড়া রাত্রে শিবদাস রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন বলে চাকররা মন্তব্য করত। এতে দিব্যসিংহের মেজাজ আরও গরম হয়ে গেল। একদিন শিবদাসকে দেখে দিব্যসিংহ বলল, 'কি রে শালা বাবাজী, আমাকে ঔষধ দিয়ে ঠিক করছিলি যে তার কি হল?' শিবদাস ব্যঙ্গ করে বললেন, 'তুই তো হলি তেলেঙ্গা, ভাঙ্ খেয়ে তুই গোল্লায় গেছিস, তোকে ঠিক করবে কার সাধ্য?'

শিবদাস চলে গেলেন। এদিকে দিব্যসিংহের মাথায় খুন চড়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে পাল্কিতে বসে হুকুম দিল, 'বাবাজীর পিছনে ধাওয়া কর, বেটাকে ধরে আনতে হবে।' ভাগ্য ভাল চাকররা তাকে আঠার নালা থেকে ফিরিয়ে আনল। তারা বোঝাল বাবাজীকে শায়েস্তা করার জন্য অন্য উপায় করতে হবে। তাদের সঙ্গে বসে বাবাজীকে শিক্ষা দেবার ষড়যন্ত্র করল। দিব্যসিংহ বলল, 'বেটাকে এমন ধোলাই দেব যে জীবনে ভুলবে না।' কি ভাবে কি করতে হবে কার ভূমিকা কি হবে সবিস্তারে আলোচনা করে ব্যবস্থা পাকা করা হল। জমাদার সার্জন উপাধ্যয় ও বৃদ্ধ পুরোহিতকে টাকা দিয়ে সব সরঞ্জাম সংগ্রহ করার আদেশ দিল দিব্যসিংহ। সকল প্রস্তুতি শেষহলে ২৩শে ফেব্রুয়ারি শিবদাসকে ডাকা হবে স্থির হল। সন্ধ্যাবেলায় ঠিকা চাপরাশী গোপীসিংহ এবং সেজিয়াপাট মহারথাকে শিবদাসকে ডাকতে পাঠানো হল। তারা গিয়ে পুনাঙ্গবাগানের বাবাজীকে ডাকলে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা ঠিক জান রাজা আমাকে ডেকেছেন— শিবদাসকে নয়?' তারা ভুল বুঝতে পারল এবং শিবদাসের কাছে গিয়ে তাকে ডাকল। বলল, 'কার যেন অসুখ আপনাকে একবার আসতে হবে।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় পতিত নায়ক, বালকৃষ্ণ ও নিধি মিশ্র তার সঙ্গে যোগ দিল। জানকীদেইপুর হাটে পৌঁছালে লীলা বেহেরাও তার সহগামী হল।

রাস্তায় ভাঙ্ গাঁজা খেয়ে পুরী পৌঁছাতে রাত্রি হল। তাদের বাইরে দাঁড়াতে বলে মহারথা খবর দিতে ভিতরে গেল। গোপী সিংহের সময় পুরো হয়েছিল। সে পাহারাদারদের তরোয়াল দিয়ে বাড়ি চলে গেল। মহারথা এসে শিবদাসকে ডাকলে তিনি সাথীদের অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে গেলেন। মহারথা তাকে নিয়ে গেল দেওয়ালে ঘেরা কুস্তির আখড়ায় এবং বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। দিব্যসিংহ তার ন জন সঙ্গীকে নিয়ে ওঁৎ পেতে ছিল। শিবদাসকে দেখেই সে পাগলের মতো ছুটে এসে তার মাথায় সজোরে লাঠির বাড়ি মারল এবং চিৎকার করে বলল 'মার শালাকে।' সকলে তাকে ঘিরে ধরল। শিবদাস সুস্থ সবল লোক। তিনি জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেওয়াল টপকে পালাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না, দেওয়ালের উপরে কাঁটা পোঁতা। তিনি কবাট ধাক্কালেন কিন্তু কেউ খুলল না। চাকররা

তাঁকে পিটিয়ে ধরাশায়ী করে দিল। চারজন তাকে চেপে ধরে রাখল এবং দিব্যসিংহ তার মুখে প্রস্রাব করল। মেথর বন নায়ক ও গণেশ নায়ক বিষ্ঠা রেখেছিল এখন তা শিবদাসের মুখে ঠেসে দিল। শরীরের সর্বশক্তি একত্র করে শিবদাস উঠে বসলেন। পুনরায় লাঠিবর্ষণ শুরু হল এবং তিনি আবার মাটিতে পড়ে গেলেন। লোকেরা আবার চেপে ধরল তাঁকে। শিবদাসের পুরুষাঙ্গে পেরেক ঢুকিয়ে তার উপর চুন ঢেলে দিল। মলদ্বারে কাঁটা লাগানো সোল ঢুকিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। একটি মশাল জ্বালিয়ে শিবদাসের শরীরের স্থানে স্থানে পুড়িয়ে দিল। শিবদাস যতই আর্তনাদ করলেন অত্যাচার ততই বেড়ে চলল। চার ঘণ্টা পরে শিবদাস নীরব হলেন, শরীর নিথর হল। বাবাজী মরে গেছে ভেবে সকলে তাঁকে টেনে রাজবাড়ির বাইরে নিয়ে ফেলে এল।

অর্ধরাত্রে একটু জ্ঞান ফিরতে শিবদাস টেনে হিঁচড়ে কোনক্রমে সিংহদ্বারে পৌঁছলেন। তার 'মারে বাবারে মরে গেলাম রে' শুনে দুজন বীট্ কনষ্টেবল ছুটে এল। শিবদাস জল চাইলেন। তারা দৌড়ে গিয়ে জল নিয়ে এল। খেয়ে শিবদাস একটু আরাম বোধ করলেন। তিনি উলঙ্গ, দেহ রক্তাপ্লুত, শরীরের অনেক জায়গা পুড়ে গেছে। তিনি শরীর থেকে সোল বার করার চেষ্টা করলেন। কনষ্টেবল দুজন তাঁর দু হাত ধরে তাঁকে থানার দিকে নিয়ে চলল। রথগড়া পাড়ায় এসে শিবদাস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'নীলে, পতিত দৌড়ে আয় আমায় মেরে ফেলেছে।' রাজবাড়ির বাইরে সঙ্গীরা শুয়েছিল, তারা ছুটে এল। নীলা বেহেরা গামছা বিছিয়ে শিবদাসকে শুইয়ে দিল। পতিত জল খেতে দিল। নীলা গিয়ে থানায় খবর দিলে থানার থেকে পাল্কি এসে তাঁকে নিয়ে গেল। এজাহার লেখা হলে সেই পাল্কিতে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হল।

ডাক্তার নসীরাম ঘোষাল ঘুমিয়েছিলেন। তাঁকে ডেকে আনলে তিনি শিবদাসকে দেখেই বুঝলেন এর অবস্থা সংকটজনক। বিরেচক ঔষধ দিলে তার শরীর থেকে চৌত্রিশটি সোল বেরিয়ে এল। যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্য তাঁকে বেশী পরিমানে আফিম খাইয়ে দেওয়া হল। সকালে খবর পেয়ে আর্মষ্ট্রং হাসপাতালে এলেন। তিনি পুলিশ সুপার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহানন্দ গুপ্ত ও নবীন চন্দ্র সেনকে ডেকে পাঠালেন। অধিক মাত্রায় আফিম খেয়েও শিবদাস যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। বয়ান দেবার অবস্থা ছিল না। তবুও আর্মষ্ট্রং ঘটনাক্রম বুঝবার চেষ্টা করলেন। আফিমের নেশায় এবং যন্ত্রণায় কাতর শিবদাস পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারলেন না। এইটুকু মাত্র বোঝাতে সক্ষম হলেন যে দিব্যসিংহ এবং তার চেলারা তার এই দশা করেছে।

আর্মষ্ট্রং ডেপুটী কালেক্টরদের সরেজমিনে তদন্ত করতে পাঠালেন। তারা দেখল কুস্তির আড্ডায় রক্ত এবং মনসূত্র ছড়িয়ে আছে। ধস্তাধস্তির চিহ্নও আছে। রাজবাড়ির পাশে কাপাসিয়া গলির দরজার সামনে শিবদাসের গলার হার ছিঁড়ে পড়েছিল। তারা ফিরে কালেক্টরকে রিপোর্ট দিল। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ সব কিছু জেনে গেল।

তারা মত দিল যে রাজবাড়ির ভিতরেই এই নৃশংস কাজ হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে দিব্যসিংহ এবং তার নজন সাথীকে গ্রেপ্তার করা হল।

তড়িৎগতিতে খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং লোকে নানা জল্পনা কল্পনা আরম্ভ করল।

কটক : এপ্রিল ১৮৭৮

রাজার গ্রেপ্তার সম্পর্কে পুলিশের রিপোর্ট কমিশনারকে পাঠালেন আর্মষ্ট্রং। সেটি পড়ে রেভেনশা সন্তুষ্ট হলেন না। সমস্ত ঘটনাবলী অবিশ্বাস্য মনে হল। রাজা কেন এমন জঘন্য কাজ করবেন? হতে পারে যে এই বাবাজীটিও বদমাস; তার কোনও বদমতলব থাকা অসম্ভব নয়। রাজা স্বপক্ষে কিছু বলেছেন কি? রেভেনশা আর্মষ্ট্রংকে লিখলেন বিষয়টি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করে ঘটনার সব খুঁটিনাটি তাঁকে সবিস্তারে জানাতে।

চিঠি পেয়ে আর্মষ্ট্রং মনে মনে রেভেনশার বাপান্ত করলেন। রেভেনশা যদি ভাবেন যে আর্মষ্ট্রং একটু পাগলাটে তবে তিনি স্বয়ং অপদার্থ। উভয় মতই অবশ্য আংশিক সত্য। দক্ষ হলে কি হবে রেগে গেলে আর্মষ্ট্রং সবদিক বিচার না করেই কিছু করে বসেন। একবার যা মাথায় ঢুকে যায় তা আর বদলায় না। ওড়িশা প্রসঙ্গ উঠলে বলেন, 'আমি একজন খাঁটি ওড়িয়া, আমার নাম আর্মষ্ট্রং—অর্থাৎ ভুজবল, হা হা হা।'

যাই হোক রেভেনশার চিঠি থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল, প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে সব কিছু জানা যায় না। আর একবার শিবদাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কিছু জানা গেল না। তাঁর হয়ত আশঙ্কা ছিল যে রাজবাড়ির মহিলারা জড়িত হয়ে পড়তে পারেন। রাজার বিদ্বেষের কি কারণ থাকতে পারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি রাজার কথা না শুনে রাণীর কথা মানতেন—এটাই কারণ হতে পারে। তদন্তের সময় দিব্যসিংহ কিছু বলল না, শুধু বলল তার কোনও সাক্ষী নেই। চাকরদের মধ্যে একজন বলল সে জানে না কে শিবদাসকে মেরেছে, তবে হতে পারে কোনও বেশ্যাবাড়ীতে কোনও মাতাল তাকে পিটিয়েছে।

শিবদাস একটু সুস্থ হয়ে আসছিলেন এমন সময় তার ধনুষ্টংকার হল। দিব্যসিংহ এবং তার নজন চাকরকে হাসপাতালে আনলে তিনি প্রত্যেককে সনাক্ত করলেন। ১১ই মার্চ বিচারের দিন ধার্য হল এবং দুই হাজার টাকা জামিনে দিব্যসিংহ মুক্তি পেল। শিবদাসের মৃত্যু আসন্ন জেনে কেস নরহত্যায় পরিবর্তিত হল এবং রাজার জামিন খারিজ হয়ে গেল। তাঁকে এনে হাজতে রাখা হল। অনেক কষ্ট ভোগ করে ১০ই মার্চ শিবদাস প্রাণত্যাগ করলেন। ১১ই আর্মষ্ট্রং-এর এজলাসে মহারাণী বনাম দিব্যসিংহ ও

অন্যান্যদের কেস উঠল। এদের নাম সার্জন উপাধ্যায়, গোপী রাউতরা, দৈতারী সিংহ, গণেশ নায়ক, বন নায়ক, গোপালদাস, নারায়ণ বাহিনীপতি ও বাজী সান্ত্রা—সকলে রাজার কর্মচারী।

আসামীরা সাক্ষীদের কোনও প্রশ্ন করল না বা আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও সাক্ষী দিল না। বোঝা গেল তারা সেসন্স কোর্টে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মৃত শিবদাসের বয়ান প্রাঞ্জল এবং তিনি আসামীদের সনাক্ত করেছেন। দিব্যসিংহ, সার্জন উপাধ্যায়, দৈতারী সিংহ এবং দুজন লম্বা চওড়া পশ্চিমা লোককে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আর্মষ্ট্রং বিচারের জন্য সকলকে দায়রা সোপর্দ করলেন। আর্মষ্ট্রং চাইলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দায়রা জজের সামনে কেসটি পরিচালনা করবেন। রেভেনশার মত কটকের পুলিশ সুপার গীভস এ কাজ করুন। শুনে আর্মষ্ট্রং রেগে অগ্নিশর্মা হলে রেভেনশাকে 'শাল কটকী' বলে গালি দিলেন এবং লিখলেন প্রসিকিউটর নিযুক্ত করার অধিকার একমাত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের। এ বিষয়ে কমিশনারের কিছু করণীয় নেই। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটি বঙ্গসরকারকে স্থির করতে হল। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রীভস ও সেন যৌথভাবে মামলা পরিচালনা করবেন।

কিছুদিন পরে রেভেনশা ছুটিতে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন স্মিথ।

১৭ই মার্চ দিব্যসিংহকে পাল্কি করে কটকে আনা হল। কাঠযোড়ীর কূলা থেকে এক ভাড়াগাড়ি করে জেলে নেওয়া হল। এ খবর আগে থেকে জানতে পারে নি কটকবাসী। সুতরাং রাস্তায় কোনও গোলমাল হল না। খবর পেতেই লোকে জেলখানার সামনে ভীড় করল।

সেসন্স জজ ডিকেন্সের আদালতে শুনানী আরম্ভ হল ২৬শে মার্চ। দিব্যসিংহের কাউন্সেল ইভান্স ও হ্যাণ্ডলী—দুজন প্রখ্যাত আইনজীবী। দিনে এক হাজার টাকা এঁদের ফি। সরকারী গ্রীভস এবং নবীনচন্দ্র সেন ছাড়া ছিলেন সরকারী উকিল হরিবল্লভ বসু এবং ফৌজদারী সেরিস্তাদার ক্ষেত্রমোহন বসু। গণ্ডগোলের আশঙ্কা করে স্মিথ কড়া পুলিশ বন্দোবস্ত করেছিলেন। সকাল থেকে কোর্টে লোক জমা হতে লাগল। কোর্ট ভরে গেলে লোকে বাইরে অপেক্ষা করল।

এগারোটায় মকদ্দমা আরম্ভ হল। সেদিন যাদের সাক্ষ্য নেওয়া হল তারা হল হাসপাতালের কমপাউণ্ডার। রোড সেস ইঞ্জিনিয়ার যে ঘটনাস্থলের নক্সা তৈরী করেছিল, পুলিশ ইন্স্পেক্টর রামা রাও এবং চাপরাশী গোপী সিংহ। পরের দিন কাছারীতে ভীড় কম হল। সরকারী পক্ষের সাক্ষ্য নেওয়া শেষহল ৩১শে মার্চ।

১লা এপ্রিল দিব্যসিংহের পক্ষে বক্তৃতা দিলেন ইভান্স। সেদিন কটকের কালেক্টর বীডন এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। ইভান্স পুরীর রাজার মর্যাদা ও সম্মানের অনেক নজীর দেখিয়ে বললেন এমন লোক এরকম ঘৃণ্য কাজ করতে পারেন না। তাঁর অন্য যুক্তিগুলি :

পুরো মামলা নির্ভর করছে শিবদাসের বয়ানের উপর। তিনি তিনবার বয়ান দিয়েছিলেন যার মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য। ধর্মের দিক থেকে দেখতে গেলে রাজা মেথরদের সঙ্গে মিশে মলমূত্র স্পর্শ করেছেন বিশ্বাস করা যায় না। সাক্ষী রেখে নিজের বাড়িতে ডেকে কেউ নরহত্যার চেষ্টা করে না। বাবাজীর দশার জন্য কে দায়ী তা নির্ণয় করা আসামীর দায়িত্ব নয়—ইত্যাদি।

এর পরে আসামীদের পক্ষে অনেক সাক্ষী পেশ হল। তাদের মুখ্য বক্তব্য ঘটনাস্থলে তারা কেউ ছিল না। দিব্যসিংহ গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল, সার্জন উপাধ্যায় রামখুন্দিয়ার পোষ্যপুত্র যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করছিল; গোপী রাউতরা রাজবাড়িতে পাহারা দিচ্ছিল; দৈতারী সিংহ ভগবতীঘরে নাচ দেখছিল; গোপাল দাস হাতি সর্দারের বাড়িতে শুয়েছিল; নারায়ণ বাহিনীপতি জ্বরে শয্যাশায়ী ছিল; বাজী সান্ত্রা গ্রামে ধান মাড়াই তদারক করছিল; অর্জুন সিংহ পণ্ডিতজী মঠে ভোজন করছিল; আর গণেশ ও বননায়ক একটি মেথর মেয়ের মঙ্গলা উপলক্ষে তার বাড়িতে ভোজ খাচ্ছিল।

৪ঠা এপ্রিল ইভান্স দ্বিতীয়বার যুক্তি পেশ করে, আশা ব্যক্ত করলেন যে মাননীয় জজসাহেব সবদিক গভীর অনুধাবন করে রায় দেবেন; মফঃস্বলের হাকিম যেমন দুর্বল প্রমাণের উপর নির্ভর করে রায় দিয়ে বলেন ইচ্ছা করলে আপীল করতে পার—তেমন যেন না করেন। এবার গ্রীভস্ উত্তর দিলেন। ব্যারিস্টার ইভান্সের মনোগ্রাহী বাগ্মিতার পরে গ্রীভসের উক্তি নিতান্ত নীরস ও পানসে লাগল। তিনি আসামীদের বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল সেগুলির দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রার্থনা করেন আসামীদের কঠোরতম দণ্ড দেওয়া হোক।

উভয় পক্ষের তর্কবিতর্ক শেষ হলে জজ ডিকেন্স মকদ্দমার এস্যেসর কালীমোহন ঘোষাল ও বিহারীলাল পণ্ডিতের মত জানতে চাইলেন। কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে গিয়ে পরামর্শ করে তারা মত দিলেন আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ অকাট্য নয়; সুতরাং নির্দোষ মানতে হবে। সাতদিন পরে রায় দেবেন বলে জজ মামলা মুলতবী করে দিলেন।

১১ই সকাল এগারটায় আদালতের কাজ আরম্ভ হল। কোর্টের ভিতরে ও বাইরে তিলধারণের স্থান নেই। সকলে লক্ষ্য করল দিব্যসিংহ আজ দাঁড়িয়ে, তার জন্য কোনও চেয়ার নেই। এর থেকে রায় কি হতে পারে অনেকে অনুমান করল। ডিকেন্স প্রত্যেক আসামীর নাম ধরে কার কি সাজা হয়েছে জানিয়ে দিলেন। সেরিস্তাদার তা তর্জমা করে শোনাল। দিব্যসিংহ এবং তার চারজন চাকর—সার্জন উপাধ্যায়, গোপী রাউতরা, গোপাল দাস ও নারায়ণ বাহিনীপতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অন্য পাঁচজনকে প্রমাণের অভাবে খালাস করা হয়েছে। এতক্ষণ দিব্যসিংহ চুপচাপ ছিল, রায় শুনে কেঁদে ফেলল।

পুলিশ অভিযুক্তদের নিয়ে গেল। জজ ডিকেন্স উকিলদের দেখার জন্য রায়ের

এক কপি টেবিলে রাখলেন এবং কোর্ট ছেড়ে চলে গেলেন। সতেরোখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজের দুদিকে লেখা দীর্ঘ রায়। এটি সুচিন্তিত এবং সুরচিত। লোকে রায়টির প্রশংসা করে বলল যেন একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। বিজ্ঞ লোকেরা মন্তব্য করল চার্লস ডিকেন্সের পুত্রের থেকে এমনটিই আশা করা যায়।

পুরী : মে ১৮৭৮

রায় জানা যেতেই কটকে হুলস্থুল পড়ে গেল। জনসাধারণ দিব্যসিংহের মতিগতি ও চাল চলনের নিন্দা অবশ্যই করে কিন্তু পুরীর গজপতি রাজার দ্বীপান্তর শুনে সকলে বিচলিত হল। রাজা তাদের সহানুভূতির পাত্র হল। গ্রামে গ্রামে এ খবর রটে গেল এবং সর্বত্র এরকম প্রতিক্রিয়া হল।

মামলা চলার সময় নবীনচন্দ্র বন্ধু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। মকদ্দমার রায় জানিয়ে তিনি আর্মষ্ট্রংকে একখানি পত্র লিখলেন। পুরীতে সদ্যোজাত পুত্রকে ছেড়ে এসেছিলেন; সুতরাং তিনি পুরী ফিরে যেতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। পত্র পেয়ে আর্মষ্ট্রং অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং নবীন চন্দ্রের কাজের প্রশংসা করে তাঁকে চিঠি লিখলেন। আর্মষ্ট্রং তাঁকে পরামর্শ দিলেন কটকের কালেক্টর রাস্তায় তাঁর সুরক্ষার বন্দোবস্ত করলেই যেন তিনি যাত্রা করেন। অবশেষে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে তিনি রওনা হলেন। কিছুদূর গিয়ে লক্ষ্য করলেন রাজার লোকজন সদলবলে তাদের পিছনে আসছে। কনস্টেবলরা তাদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল তাদের মতলব কি? তারা বলল, তারাও পুরী যাচ্ছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের পাল্কিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলে তার অসম্মান হবে; সুতরাং—।

নবীন চন্দ্র পুরী পৌঁছে আর্মষ্ট্রঙ্গের বাংলোতে গেলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আর্মষ্ট্রং তাঁকে আলিঙ্গন করে ঘরে নিয়ে চা দিলেন, বললেন, 'পুরীর রাজার পক্ষে সব থেকে বড় যুক্তি তাঁর পদমর্যাদা। আমি কিন্তু তার বিপরীত চিত্র তুলে ধরব।' নবীন চন্দ্রের হাতে তিনি একখানি কাগজ দিলেন। অনেক বইপত্র ঘেঁটে তিনি নোটটি তৈরী করেছিলেন। রাজার বিষয়ে এতে লেখা আছে:

ওড়িশার রাজার ইতিহাস সর্বকালে রক্তরঞ্জিত। সূর্যবংশী রাজা প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু হলে তাঁর সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর তাঁর দুই নাবালক পুত্রকে হত্যা করে নিজেকে রাজা ঘোষণা করলেন। তিনি ভোই বংশ প্রতিষ্ঠা করলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের পুত্র চক্রপ্রতাপকে বিষ দিয়ে মারলেন তাঁর নিজের পুত্র নরসিংহ। মুকুন্দ হরিচন্দন স্ত্রীবেশে রাজবাড়িতে প্রবেশ করে নরসিংহকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করলেন। আরম্ভ হল চালুক্যবংশ। মুসলমানরা ওড়িশা আক্রমণ করার সময় মুকুন্দের মৃত্যু হল।

গোবিন্দ বিদ্যাধরের সেনাপতির ছেলে খুর্দার সৌরা সর্দারকে হত্যা করে রাজা হলেন। খুর্দার রাজবংশের সেই সূত্রপাত। তাদের বংশধরেরা একালের পুরীর রাজা।

কাগজখানি পড়ে নবীনচন্দ্র মন্তব্য করলেন তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন; কিন্তু আসামী অথবা তার পূর্বপুরুষদের দুশ্চরিত্র মামলায় ব্যাপারে অপ্রাসঙ্গিক। শুনে আর্মষ্ট্রং একটু হতাশ ও বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন আগে রায়টি ভাল করে পড়ে নিন। যদি আপীল হয় তবে নতুন যুক্তি প্রয়োগ করব। স্থির করলেন যদি রাজা আপীল করেন তবে নবীনচন্দ্র সরকারের তরফ থেকে লড়বেন।

ডিকেন্সের রায় নিয়ে মত পার্থক্য দেখা দিল। কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ' রায়টির তারিফ করল এবং মন্তব্য করল আপীল না করলে রাজা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। অন্যদিকে এসেসরদের মত উপেক্ষা করার জন্য রায়টির সমালোচনা করল। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'। যাই হোক দিব্যসিংহ হাইকোর্টে আপীল করলেন। নবীনচন্দ্র কলকাতা এসে এডভোকেট জেনারেল পলকে কেসটি বুঝিয়ে দিলেন। পুরীর রাজার পক্ষে ইভান্স ও ব্যারিস্টার ব্রানসন এবং মনমোহন ঘোষ। প্রধান বিচারপতি গার্থ ও অন্য দুজন জজ আপীল শুনলেন। ৬ই শুনানী আরম্ভ হল। রাজার উকিলরা তাদের পক্ষ পেশ করতে চার দিন নিল। পল তার জবাব দিলেন। দুপক্ষের তর্কযুদ্ধ চলল অনেকক্ষণ।

১৩ই জজেরা আদেশ পড়ে শোনালেন। পুরী রাজার শাস্তি বহাল রইল। সার্জন উপাধ্যায় ও নারায়ণ বাহিনীপতির আপীলও অগ্রাহ্য হল। গোপাল দাস ও গোপী রাউতরা মুক্তি পেল কারণ শিবদাস তাদের সঠিক সনাক্ত করেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল।

এই আদেশের পরে পুরী রাজা ওড়িশার সর্বত্র আলোচনার পাত্র হলেন। রাজার একটি ঘোড়া মরে গেল। তার দুদিন পরে রাজার একটি হাতি মরে গেল খুর্দায়। লোকে ভাবল ঠাকুররাজা শনিগ্রস্ত হয়েছেন। 'পুরী বানীর রোদন শীর্ষক একটি কবিতা লিখে বিলি করা হল, এর প্রথম পদ :

আজ রাজপুরে উদাসিনী সম
পুরী রাজপাটেশ্বরী
পড়িয়া ভূতলে কাঁদেন বিকলে
শোকে বিবশা সুন্দরী।।

রাজাকে যখন কলকাতা নিয়ে যাবার সময় এল আশঙ্কা হল গোলমাল হতে পারে। সুতরাং প্রস্তুতি পর্বে গোপনীয়তা রক্ষা করা হল। ২৭শে মে ভোর চারটায় রাজাকে ঘোড়াগাড়ি করে জোব্র ঘাটে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে স্টীমারে বাতিঘরে নিয়ে জাহাজে বসান হল। এবার শুরু হল প্রথমে কলকাতা ও পরে আন্দামান যাবার প্রতীক্ষা।

কলকাতা : জানুয়ারি ১৮৭৯

১৮২৮ সনে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ১৮৪১ সনে। রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম থেকে অনেক উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ চাইলেন ব্রাহ্মরা হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলি থেকে তত্ত্ব গ্রহণ করুক এবং খৃষ্টধর্ম ওদের মতবাদের বাইরে থাক। দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথের ওড়িশাতে জমিদারী ছিল। ১৮১১ সালে তিনি দশ হাজার টাকায় পাণ্ডুয়ার জমিদারী কিনেছিলেন। জমিদারীর কাজে মাঝে মাঝে ওড়িশা আসতেন দেবেন্দ্রনাথ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ও প্রসারে কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি অব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সংস্কৃত জানতেন না। তবু অল্প বয়সে একজন আচার্য হলেন দেবেন্দ্রনাথের কৃপায়। তাদের যৌথ উদ্যমে সারা ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে ব্রাহ্মসমাজের অনেক শাখা প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৬৪ সালে দেবেন্দ্রনাথ কটকে একটি শাখা স্থাপন করলে গৌরীশংকর রায়, জগনমোহন রায় প্রমুখ তাতে যোগ দিলেন। জগনমোহনের উদ্যমে চাঁদা তুলে ওড়িয়াবাজারে একটি ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হল। দেবেন্দ্রনাথ এর জন্য প্রচুর অর্থ দিলেন।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর সমর্থকরা চাইলেন ব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য ধর্ম থেকে বিশেষ করে খৃষ্টধর্ম থেকে তত্ত্বগ্রহণ করে। তারা শিশু বিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিপ্রথা ইত্যাদির বিরোধিতা করলেন। এ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মতভেদ হল। ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথের অনুষ্ঠান কলকাতা অথবা আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হল। কেশবচন্দ্রের সমর্থকদের নাম হল ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ। কটক জেলা সকলে দর্শনের শিক্ষক হরনাথ ভট্টাচার্য্য কেশবচন্দ্রের সমর্থক ছিলেন। ১৮৬৯ সনে তিনি উৎকল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। তার ছাত্র প্যারীমোহন আচার্য। মধুসূদন রাও প্রভৃতি এর সভ্য হলেন। ওড়িয়া বাজারস্থিত ব্রাহ্মমন্দিরে প্রতি রবিবারে প্রার্থনা সভা করার অনুমতি পেলেন তাঁরা।

হেয়ার স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে ১৮৭৬ সালে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ একটি অনুষ্ঠান স্থাপন করলেন ব্রাহ্মসমাজের ধার্মিক ও সামাজিক মতবাদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদের সমন্বয় ঘটিয়ে। এতদিনে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আভিমুখ্য ছিল না। ১৮৭৭ সালে বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন। ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্রের প্রয়াসে সিভিল বিবাহ আইন চালু হল। এই আইনে ছেলেদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ধার্য হল আঠার বছর এবং মেয়েদের চোদ্দ। কিন্তু যখন ১৮৭৮ সালে নিজের তের বছর বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেন কুচবিহারের মহারাজার ষোল বছরের ছেলের সঙ্গে তখন ব্রাহ্মসমাজের আর

একবার বিভাজন হল। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হল। শিবনাথ শাস্ত্রী এর অন্যতম পুরোধা। নিজেদের কর্মীদের শিক্ষা দেবার জন্য সিটি স্কুল নামে একটি নতুন স্কুল খুললেন তাঁরা। শিবনাথ শাস্ত্রী হলেন সম্পাদক।

বিপিনচন্দ্রের ইচ্ছা সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করবেন। কিন্তু দুবার পরীক্ষা দিয়েও এফ্.এ. পাশ করতে পারেননি। তাছাড়া নিজে পড়েছেন শ্রীহট্টের মফঃস্বল স্কুলে, তিনি কি কলকাতার ছাত্রদের আয়ত্তে রাখতে পারবেন? সুতরাং সিটি স্কুলের চাকরি করা হল না। এমন সময় ব্রাহ্মনেতা যদুমণি ঘোষ কটক একাডেমীর হেডমাষ্টার হয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। প্যারীমোহন যদুমণিকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর একজন ব্রাহ্মধর্মবলম্বী প্রধান শিক্ষক এবং আরও দুজন শিক্ষক দরকার। তাঁদের বেতন কম, তাছাড়া শিক্ষকতার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করতে হয়। তখন বিপিনচন্দ্রের বয়স কুড়ি বছর। কটকের বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। তবুও তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। এবং কটকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর বেতন মাসে ত্রিশ টাকা এবং থাকার জন্য বাড়ি পাবেন।

জানুয়ারি মাসে বিপিনচন্দ্র এবং অন্য দুজন শিক্ষক 'সার জন লরেন্স' জাহাজে কলকাতা থেকে রওনা দিলেন। সন্ধ্যায় জাহাজ সমুদ্রের মোহনায় পৌঁছাল। অন্য একটি জাহাজে চাঁদবালি থেকে খালপথে স্টীমারে কটক যাবার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এতে থাকে না কিন্তু যে সবুজরঙের নৌকোগুলো স্টীমারে বাঁধা আছে তার উপরে কেবিন আছে যার একটি পেলেন বিপিনচন্দ্র। তার পাশে রান্নাঘর। মুখ্য রাঁধুনে একজন মাদ্রাজী। ছোটবেলা থেকে বিপিনচন্দ্রের রান্নার শখ ছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি মাদ্রাজী রান্না শিখে নিলেন।

কটক : মার্চ ১৮৭৯

কটকে পৌঁছে বিপিনচন্দ্র কটক একাডেমীর কার্যভার গ্রহণ করলেন। তাঁর দুই ব্রাহ্মবন্ধু ব্রজেন্দ্র নাথ সেন ও রাজচন্দ্র চৌধুরীও শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন। তিনজনের অনেক মিল, তিনজনই ব্রাহ্ম এবং এফ.এ. ফেল!

বিপিনচন্দ্রের মিত্রতা হল প্যারীমোহনের সঙ্গে। তাঁর আদর্শবাদ, নির্ভিকতা, বাগ্মিতায় বিপিনচন্দ্র প্রভাবিত হলেন। অন্য যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল তাঁরা হলেন গৌরীশংকর, রাধানাথ ও মধুসূদন রাও। কটকের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তাঁর ভাল লাগল। প্রিণ্টিং কমিটির দোতলায় রোজ সভাসমিতি বসে। ধরতে গেলে এই দোতলা কটকের টাউন হল। ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি নেবার সময় স্থির হয়েছিল চাঁদা করে ভারতেশ্বরী টাউন হল নির্মাণ করা হবে। একটি মডেলও তৈরী হয়েছিল। সেটি এখন কমিশনারের

অফিসের শোভা বাড়াচ্ছে। অর্থ সংগ্রহ হয়নি। এ অভাব কার্যত পূরণ করেছে প্রিণ্টিং কোম্পানির দোতলা।

এই সময়ে কটকে নানা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হল, যথা ডিবেটিং ক্লাব, উৎকল সভা, ইয়ংমেনস লিটারারী এসোসিয়েশন ইত্যাদি। সকলেই প্রিণ্টিং কোম্পানীর দোতলায় আলোচনা সভা করে। অনেকের বাগ্মিতা বিকাশে সহায়তা করেছে এই হল। নিঃসন্দেহ যে এদের মধ্যে সব থেকে খ্যাতি পেয়েছেন প্যারীমোহন। তিনি বাংলা এবং ওড়িয়াতে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিতে পারেন। ওড়িয়া সাহিত্য, মদ্যপান, উৎকোচ গ্রহণ, নেশার দ্রব্য সেবন—এমন বিষয় নেই যার উপরে তিনি বক্তৃতা দেননি। তিনি ভাষণ দেবেন জানলে শ্রোতাদের এমন ভীড় হত যে দোতালায় উপরে বারান্দায় এমনকি রাস্তায়ও দাঁড়িয়ে লোক শুনত। প্যারীমোহনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছাপাখানার গণ্ডি পেরিয়ে বহুদূর ছড়িয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে করতালিতে সারা অঞ্চল মুখরিত হয়ে ওঠে। একটি দুর্বলতা কিন্তু রয়ে গেছে। বলতে বলতে তিনি ভাষার সংযম হারিয়ে ফেলেন। প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যে অশ্লীলতা তাঁর আক্রোশের প্রধান লক্ষ্য।

প্যারীমোহন যেমন সুবক্তা তেমনি নিকৃষ্ট বক্তা রাধানাথ। ভাষণ কালে তার হাত পা কাঁপে গলা শুকিয়ে যায় এবং এমন মিন মিন করে বলেন যে কিছু বোঝা যায় না। কোনক্রমে দু চার কথা বলেই বসে পড়েন।

বাবু ভূদেব মুখার্জির সংবর্ধনার জন্য মার্চ মাসের প্রথম দিকে একটি সভা ডাকা হল প্রিণ্টিং কোম্পানীর দোতলায়। যোগ দিলেন, গৌরীশংকর, প্যারীমোহন, রাধানাথ মধুসূদন, বিপিনচন্দ্র এবং অন্যান্যরা। ওড়িশা ছাড়া ভাগলপুর এবং বর্ধমান ডিভিশন ও তাঁর দায়িত্বভুক্ত। দু বছর আগে সি.আই.ই. পেয়েছেন। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হিসাবে নাম করেছিলেন। এই প্রথম বার ওড়িশা এসেছেন; সুতরাং তাঁর মর্যাদা অনুসারে সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছে। রাধানাথ ও প্যারীমোহনের উপরে এ দায়িত্ব বর্তেছে।

ভূদেব মুখার্জী কটকে এলেন ১৫ই। এসেই রাধানাথকে সঙ্গে নিয়ে পুরীর স্কুলগুলি পরিদর্শনে গেলেন। কটকে ফিরে এলে ২৪শে মে তাঁর সংবর্ধনা সভা হল। সভাপতিত্ব করলেন নন্দকিশোর দাস। বিপিন বিহারী মিশ্র ভূদেব মুখার্জীর পরিচয় দিয়ে বর্ণনা করলেন কিভাবে তিনি প্রধান শিক্ষক থেকে আজ এত উচ্চপদে উন্নীত হয়েছেন। এখন তাঁর মাসিক বেতন পনেরোশ টাকা। ভূদেবের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি প্রস্তাব করলেন অশেষ গুণাবলীর জন্য এবং তার দেশহিতকর কার্যাবলীর জন্য সভা প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁকে যথোচিত সম্মান করুক। প্যারীমোহন এ প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন ভূদেব বিদ্বান, উদার এবং বহুগুণের আকর। তিনি আরও বললেন যে বাঙালি ও ওড়িয়াদের মধ্যে পার্থক্য নেই। বিপিনচন্দ্র পাল ভূদেবের সম্মানে বাঙালি ও ওড়িয়াদের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ সন্তোষ

প্রকাশ করে বললেন আত্মশিক্ষা মানুষকে কোন শিখরে পৌঁছে দিতে পারে ভূদেব মুখার্জী তার সুন্দর উদাহরণ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাননি, কোন গালভরা ডিগ্রী নেই তাঁর। তবুও আত্মশিক্ষা তাঁকে সমাজের পুরোভাগে স্থান দিয়েছে।

এ সকল মন্তব্যের জন্য ভূদেব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, এত প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়। বললেন আমাদের দেশে লোকে কাঠের প্রতিমার কাছে বর চায় এবং মাঝে মাঝে পেয়েও যায়। কিন্তু সে প্রতিমার কৃপায় নয়, তাদের নিষ্ঠার জন্য। ঠিক সেইরকম বক্তারা আমার গুণগান করে যা বলেছেন তাতে তাঁদের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বক্তৃতার পরে সকলকে পান, আতর ও ফুলের মালা দেওয়া হল। গোলাপজল ছিটিয়ে সভা ভঙ্গ হল। ভূদেবের লম্বা দাড়ি, ঋষিতুল্য চেহারা, সরল ও নম্র স্বভাব। তিনি সকলের মন জয় করে নিলেন। সেদিন তাঁর জীবনের চুয়ান্ন বছর পূর্ণ হল। তিনি রাধানাথকে নিয়ে বালেশ্বরে স্কুলগুলি পরিদর্শনে বেরিয়ে গেলেন।

বালেশ্বর : এপ্রিল ১৮৭৯

ভূদেব ও রাধানাথ বৈকুণ্ঠনাথদের বাগানবাড়িতে বসে আছেন। সন্ধ্যাবেলা, চারিদিক নিস্তব্ধ। কাছে পিঠে কেউ নেই। স্কুল পরিদর্শন ও অফিসের কাজ দেখতে দুজনে একসঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। স্বল্পবাক রাধানাথের দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ নীরব থেকে ভূদেব বললেন, 'এতক্ষণ ধরে কি দেখছ আকাশে? সব সময় এমন আত্মমগ্ন হয়ে থাকা ভাল নয়। এমন করলে নিজের আকিঞ্চনতা প্রকট হয়, অস্তিত্ব বিলোপ হতে বসে। কাজে মন লাগে না। ধ্যানযোগীরাই এমন করতে পারেন।'

এ রকম অনেক উপাদেয় কথা রাধানাথকে বলেন ভূদেব। তিনি যখন ওড়িশা এলেন তখন রাধানাথের বিষয়ে তাঁর ধারণা ভাল ছিল না। অনেকে রাধানাথের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছে। এখানে এসে তাকে দেখলেন তার সঙ্গে মিশলেন, বুঝলেন লোকটি ভাল। রাধানাথ তাঁর স্নেহভাজন হলেন। রাধানাথ নিজের দুখানি বাংলা বই তাঁকে উপহার দিয়েছেন এবং 'লেখাবলী' কবিতা সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছেন। বাংলায় লেখা পাণ্ডুলিপিতে পৌরাণিক স্ত্রীদের স্বামীর প্রতি নিবেদন আছে, যেমন রামচন্দ্রের প্রতি জানকী, অর্জুনের প্রতি সুভদ্রা, কচের প্রতি দেবযানী, ইত্যাদি। একজন আধুনিক কাল্পনিক নারীর উক্তিও আছে। কুমার নাথের প্রতি কমলকামিনী। এই কবিতার নায়ক রেমুনাবাসী এবং নায়িকা কমল তার মামাতো বোন। কবিতাগুলি উচ্চকোটীর। এর আগের রচনায় যে অপরিপক্কতা ছিল তা আর নেই। কবিতাগুলি অবশ্য অতিমাত্রায় আদিরসাত্মক। ভূদেব মনোযোগ দিয়ে সেগুলি

পাঠ করেছেন। কমলকাহিনীর প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন এতে আদিরসের যে রূপের অবতারণা হয়েছে তা শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। এটি নৈতিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, অতএব পরিহার্য।

ভূদেবের সব উক্তি মনে রাখার মতো। স্কুল পরিদর্শনের সময় যে সব তর্ক বিতর্ক হয় তাও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কটক একাডেমী পরিদর্শনের সময় অসুস্থতার জন্য প্যারীমোহন অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধু যদুমণি ঘোষ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করলেন। বিপিনচন্দ্র পালও ছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের কথা উঠল এবং কিছু উষ্ণতার সৃষ্টি হল। তর্ক ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করল না। ভূদেব মন্তব্য করলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের যে স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন তা যদি বজায় থাকত তবে তিনি নিজে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতেন। নিষ্ঠাবান ভূদেবের পক্ষে এ এক তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকারোক্তি। এটি তাঁর নিরাকার একেশ্বরবাদে আস্থার পরিচায়ক।

একসঙ্গে যাবার সময় ভূদেব ও রাধানাথ সাহিত্য আলোচনা করেন। গ্যেটে, হোমার, শেক্সপিয়ার, কালিদাস, ভবভূতি থেকে উপেন্দ্র ভঞ্জ, মাইকেল মধুসূদন তাঁদের আলোচনার পরিসরভুক্ত। রাধানাথ ভূদেবকে প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করালেন, উপেন্দ্র ভঞ্জের 'লাবণ্যবতী' ও 'বৈদেহীশ বিলাসের' কিছু অংশ আবৃত্তি করে। বৈদেহীশ বিলাসের 'বদন পুরি অছি হাস হরষে' শুনে এমন অভিভূত হলেন যে বিড় বিড় করে বললেন, 'কি আশ্চর্য এই ওড়িশাকে বাঙালিরা বলে চাকর কাহারদের দেশ!'

লেখার ব্যাপারে অনেক উপদেশ দিলেন ভূদেব। 'লেখাবলী'র পাণ্ডুলিপি পড়ে বললেন, 'পুরাতন বিষয় ঘেঁটে কেন সময় ও পরিশ্রম বরবাদ কর? তোমার পাণ্ডুলিপি পড়েছি, ভাল লেগেছে, এডুকেশন গেজেটে ছাপাব। কিন্তু আশা করছি এখন থেকে কিছু আলাদা, কিছু নতুন সৃষ্টি করবে। দেখ, তুমি সুভদ্রার বর্ণনা করেছ, কিন্তু যত চেষ্টাই করো ব্যাসদেবের থেকে সুন্দর চিত্রন করতে পারবে না। তাই বলছি নতুন সৃষ্টিতে মন দাও। ওড়িশা অতি মনোরম দেশ, এখানকার মনোহর প্রকৃতি কবিতার উপযোগী। ওড়িশা বাস্তবিক কবিত্বপূর্ণ শিশুর দক্ষ ধাত্রী। যেদিকে তাকাও নতুন সৃষ্টির উপাদান পাবে।' সব শুনে রাধানাথ স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'নতুন ঘটনা কল্পনা করে লেখা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

ভূদেব অতি সাবলীলভাবে তাঁর জবাব দিলেন। কটক থেকে বালেশ্বর যেতে রাস্তায় দেশীয় রাজ্য দর্পণ পড়ে। এখানকার কিম্বদন্তীর বিষয়ে রাধানাথ বললেন, 'ওড়িশার গঙ্গাবংশীয় সম্রাট কেশবিন্যাস করার সময় দপর্ণের রাজা তাঁর সামনে দর্পন ধরতেন। জগন্নাথ সড়কের পাশে এখানে একটি সুন্দর সরোবর আছে। একজন ধনী পশ্চিম যাত্রীর ছোট শিশু এই সরোবরের কাছে খেলতে খেলতে অদৃশ্য হয়ে যায়। অনেক খুঁজেও তার পাত্তা পাওয়া গেল না।' ভূদেব বললেন, 'আমি কিন্তু অন্যরকম

শুনেছি। শোন। উৎকল সম্রাটের পুত্র দর্পণ রাজ্যে মৃগয়া করতে এলে দপর্ণের রাজকন্যা তাঁর প্রণয়াসক্ত হলেন। পিতা যখন যুবরাজের কেশ বিন্যাসের জন্য দর্পণ নিয়ে গেলেন তখন রাজকন্যা কৌশলে নিজের একখানি ছবি ও একখানি প্রেমপত্র তার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। এ দুটি দর্পণ থেকে খসে পড়লে রাজা লজ্জিত হলেন। ফিরে এসে তিনি রাজকন্যাকে তিরস্কার করলেন। লজ্জায় দুঃখে তিনি এই সরোবরে আত্মহত্যা করলেন।'

রাধানাথ বুঝতে পারলেন এটি ভূদেবের কপোলকল্পিত। তাঁকে যে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে উপদেশ দিয়েছিলেন তার সমর্থনে তিনি এ কাহিনী এই মুহূর্তে উদ্ভাবন করেছেন। রাধানাথ মনস্থির করলেন যে তিনি প্রচলিত কাহিনীর সময়ানুগ রূপ দেবার চেষ্টা করবেন।

বালেশ্বর থেকে ফিরে ভূদেব রাধানাথের সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দিলেন। লিখলেন :

বাবু রাধানাথকে ওড়িশার স্কুলগুলির স্বতন্ত্র দায়িত্ব দেওয়া হোক। তাঁর পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুর করা হোক। আমার মতে স্বাধীনভাবে একটি সার্কেলের দায়িত্ব নিতে তিনি সক্ষম। তিনি সুশিক্ষিত, দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। বীমস ও নরম্যান সাহেব তাঁর সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। সরকারি রিমল্যুশনের ১৩ ধারা অনুসারে রাধানাথকে জুনিয়ার শিক্ষাসেবার উচ্চতম গ্রেডে উন্নীত করে ওড়িশা সার্কেলের স্বতন্ত্র দায়িত্ব দেওয়া হোক।

এই সুপারিশের থেকে রাধানাথের প্রতি তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধার অধিক প্রমাণ ছিল তাঁর রাধানাথের উপরে রচিত কবিতাটিতে যার প্রথম পদ :

রাধানাথ ওড়িশার গৌরবকেতন
উদার বিনীত ধীর সুবোধ সুজন।
নানা ভাষা বিভূষিত
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত
কবিতা কাননে পিকবর, প্রিয়বর
স্বর্গীয় স্বভাবে পূত তোমার অন্তর।

খণ্ডপাড়া : আগষ্ট ১৮৭৯

'সিদ্ধান্ত দর্পণ' লেখা হয়েছে দশ বছর হল। কিন্তু এখনও প্রকাশ করার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। সামন্ত চন্দ্রশেখর প্রতিদিন তালপত্রের বাণ্ডিল খুলে ঝেড়ে পুঁছে আবার বেঁধে রাখেন। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে যেন বার্ধক্যে ধরেছে। অর্থাভাব তো

আছেই। তাঁর শরীর ভাল থাকছে না আজকাল। অগ্নিমান্দ্য ও অম্লশূল অসহনীয় হয়ে উঠেছে। পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়নি সুতরাং লোকে পড়েনি। অনেকে অবশ্য এটির কথা শুনেছে। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে। জ্যোতিষবিদ্যা সংক্রান্ত কোনও সংশয় হলে লোকে তাঁর মত চায়। কিছু উৎসাহী লোক তাঁর শিষ্য হতে চাইল। তাঁর প্রথম শিষ্য মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের রুদ্রনারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য। তিনি দু বছর চন্দ্রশেখরের বাড়িতে থেকে প্রায় দু বছর জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তিনি 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' বাংলায় অনুবাদ করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং রুদ্রপঞ্জিকা নামে একখানি পঞ্জিকা প্রকাশ করলেন। এতে অনেক ভুল রয়ে গেল কারণ গণনার ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়নি। এক বছর পরে তিনি পঞ্জিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন।

মঞ্জুষার রাজা চন্দ্রশেখরের খ্যাতি শুনে নিজের রাজ্যের কয়েকজন জ্যোতিষীকে তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে পাঠিয়েছিলেন। এই সূত্রে বল্লভ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীধর প্রহরাজ খণ্ডপাড়ায় অবস্থান করছিলেন, কিন্তু কেউ সিদ্ধান্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারলেন না। পরবর্তীকালে তাঁর মেধাবী শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন মঞ্জুষার গদাধর বিদ্যাভূষণ, তালচেরের দামোদর বাণীভূষণ, খুর্দার পাঁচগড়ের সদাশিব খড়িরত্ন প্রমুখ। চন্দ্রশেখরের খ্যাতি বিস্তারে এঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

পণ্ডিত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ ১৮৭৮ সালে 'সূক্ষ্ম পঞ্জিকা' নামে একখানি পুস্তক রচনা করে পুরী প্রিণ্টিং কোম্পানীতে ছাপিয়ে প্রকাশ করলেন। এতে আটটি শ্লোকে এবং তাদের টাকায় চন্দ্রশেখরের প্রশস্তি করে লিখলেন :

সত্যযুগের অন্তিমভাগে সূর্যাংশ পুরুষ কর্তৃক গ্রহস্ফুণ্টের উপকরণ থাকে কিছুদিন পরে স্বয়ং সূর্যাংশ পুরুষ দোষ দিয়ে তার নির্মল বীজ ময়াসুরকে দিলেন। পুনরায় কলিকালে ৪২৭০ বর্ষে ভাস্করাচার্য তাতে দোষ দিয়ে 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামে গ্রন্থরচনা করলেন। কিন্তু সেটি বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং খণ্ডপাড়ার চন্দ্রশেখর সামন্ত 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই পুস্তকে কলিকালের ৭২৭৮ বর্ষের ঘটনাবলীর যে রকম দৃকসিদ্ধ হয়েছে তাহার সাধন ক্রমলিখিত হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে পুরীর পণ্ডিতগণ স্থির করলেন যে চন্দ্রশেখরের সিদ্ধান্ত দর্পণ অনুযায়ী দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকাই নির্ভুল এবং জগন্নাথ মন্দিরের ক্রিয়াকর্ম সেই অনুসারে হবে।

এত কিছুর পরেও 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' প্রকাশ করা সম্ভব হল না বলে চন্দ্রশেখরের দুঃখ। মাঝে মাঝে কটক গিয়ে গৌরীশংকরকে জিজ্ঞাসা করেন 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' ছাপাতে কত খরচ হবে। গৌরীশংকর যে অর্থের উল্লেখ করেন তা চন্দ্রশেখরের কল্পনাতীত। তিনি কোনও উপায়ে একহাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন না। দীপিকার মাধ্যমে তিনি ওড়িশার রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের আবেদন করলেন তাঁরা যেন 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' প্রকাশ করতে সাহায্য করেন কিন্তু অন্যান্য আবেদনের মত এতে কোন ফল হল না।

১৮৭৯ সালের ১১ই জুলাই দীপিকাতে এই সংবাদটি প্রকাশ পেল :

আমেরিকায় একজন অধ্যাপক গণনা করে জানতে পেরেছেন যে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন (শেষ দুটি গ্রহের ভারতীয় নাম নেই, এ দুটি হালে আবিষ্কৃত হয়েছে, সুতরাং পুরাতন জ্যোতিষ শাস্ত্রে এর উল্লেখ নেই)—এই চারটি গ্রহের আবর্তন মার্গে সূর্য থেকে কম দূরত্ব থাকবে ১৮৮০ সালে। এর থেকে তিনি নির্ণয় করেছেন যে ১৮৮০ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে ঘোর বিপত্তি দেখা দেবে, এশিয়া জনশূণ্য হয়ে যাবে। ইউরোপের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ হবে এবং আমেরিকায় দেড় কোটি লোক প্রাণ হারাবে। মড়ক ছাড়াও ভয়ংকর ঝড় তুফান হবে, পাহাড় টলে পড়বে, দিগদর্শন যন্ত্রগুলি অকেজো হয়ে যাবে। হাজার হাজার লোকের প্রাণ যাবে। পশু পক্ষী ও মৎস্য বিনষ্ট হবে। মড়ক থেকে যে মুষ্টিমেয় মানুষ রক্ষা পাবে তারাও দুর্ভিক্ষ ও গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারাবে। শেষ দু বছরে পৃথিবীর উত্তাপ ভীষণ বেড়ে যাবে। এ গণনা ঠিক কি নয়, এবং যদি ঠিক হয় তবে কি করে গ্রহশান্তি হবে তা নির্ণয় করুন ভারতীয় জ্যোতিষীরা।

দীপিকায় খবরটি পড়ে চন্দ্রশেখর পুঁথিপত্র নিয়ে হিসাব করতে বসেগেলেন। আহার নিদ্রা ভুলে খড়ি দিয়ে নানা হিসাব নিকাশ করলেন। 'সিদ্ধান্ত দর্পণে'র শ্লোক পড়ে অংক কষে ফলাফল নির্ণয় করতে সময় লাগে। অনেক সময় লাগল এ কাজে। ৪ঠা আগষ্ট গণনা শেষ হল। চন্দ্রশেখর একখানি পত্র পাঠালেন গৌরীশংকরকে তাঁর গণনা অনুসারে আমেরিকান অধ্যাপকের ভবিষ্যতবাণী ভুল। চন্দ্রশেখরের মতে উক্ত চার গ্রহের এক সময়ে সূর্যের কাছে আসতে সময় লাগবে আরও এগার লক্ষ বছর।

কটক : অক্টোবর ১৮৭৯

১৩ই সেপ্টেম্বরের দীপিকায় কটক পাগলখানায় প্রস্তুত ক্যাষ্টর অয়েলের বিজ্ঞাপনের নিচে আর একটি বিজ্ঞাপন :

ওড়িশার ইতিহাস
শ্রী প্যারীমোহন আচার্য প্রণীত
মূল্য মাত্র এক টাকা।
বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।
কটক প্রিণ্টিং কোম্পানীর যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্যারীমোহন এ পুস্তকের জন্য কাজ করেছেন অনেকদিন। চার বছর আগে ওড়িশার জয়েন্ট স্কুল ইনস্পেক্টর রাধানাথ রায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে কেউ যদি ওড়িশার একখানি ইতিহাস রচনা করেন এবং সে রচনা যদি জয়েন্ট ইনস্পেক্টর দ্বারা

অনুমোদিত হয় তবে সরকার তাঁকে তিনশ টাকা পুরস্কার দেবে। প্যারীমোহনের পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়ে সামান্য সংশোধন করে ছাপাতে নির্দেশ দিলেন রাধানাথ। রেভেনশা তাঁর অফিসের পুরাতন নথীপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছিলেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন প্যারীমোহন। পুস্তকখানি সেই অনুসন্ধানের ফল। প্যারীমোহনের অসুস্থতা ও ছাপার কাজে বিলম্বের জন্য পুস্তক প্রকাশে দেরী হল। প্যারীমোহন এতে লিখেছিলেন :

এখানে স্বীকার করা উচিত হবে যে এ পুস্তকের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে অনেক পুস্তক ও কাগজপত্রের সাহায্য নিয়েছি। হাণ্টার, ষ্টার্লিং, সাটন, টয়েনবী ও মিত্র লিখিত ওড়িশার বিবরণ, লোকসংখ্যা বিজ্ঞাপনী, এলফিনষ্টোন, মার্সম্যান, ব্লগম্যান প্রমুখ লিখিত ভারতের ইতিবৃত্ত, মুসলমান শাসনকালের বিবরণী, এশিয়াটিক সোসাইটীর কিছু বিজ্ঞাপন, মনু চৈতন্য চরিতামৃত, দাঢ্যতাভক্তি প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃত ওড়িয়া ও বাংলা গ্রন্থ, কমিশনার অফিসের কতকগুলি পুরাতন ও আধুনিক দস্তাবেজ এর মুখ্য অবলম্বন।

পুস্তকখানি আদৃত হল। এর আগে ওড়িয়া ভাষার ওড়িশার ইতিহাস ছিল না। প্যারীমোহনের খ্যাতি বেড়ে গেল। মাত্র আঠাশ বছর বয়সে এটি তাঁর তৃতীয় মহান কৃতি। 'উৎকল পুত্র' প্রকাশ করে এবং কটক একাডেমী স্থাপন করে তিনি আগেই সুনাম অর্জন করেছিলেন। ওড়িশার ইতিহাস প্রকাশ পাবার অল্পদিন পরে কটক একাডেমীতে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল; বিপিনচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। তাঁর স্কুল ছেড়ে যাবার কারণ প্রীতিকর নয়। প্যারীমোহন এর জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হলেন।

স্কুলে পরীক্ষা করে দুজন ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। তাদের আবেদনপত্র পূরণ করে, তাতে হস্তাক্ষর করে বিপিনচন্দ্র দিলেন প্যারীমোহনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার জন্য। নভেম্বরে পরীক্ষা হবার কথা। যে ছাত্রগুলি পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হল না তাদের মধ্যে একজন অনুনয় বিনয় করল বিপিনচন্দ্রের কাছে। কিন্তু বিপিনচন্দ্র তালিকায় আর নাম যোগ করতে রাজী হলেন না। ছুটি থেকে ফিরে বিপিনচন্দ্র দেখলেন তিনি যে ফর্মগুলি পূরণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলি না পাঠিয়ে প্যারীমোহন অন্য একটি তালিকা করে ফর্ম পূরণ করে পাঠিয়েছেন। নতুন তালিকায় সেই ছেলেটির নাম আছে। স্কুলের রেক্টর হিসাবে এমন করার অধিকার আছে প্যারীমোহনের। তবুও বিপিনচন্দ্রের উপর এ দায়িত্ব দেবার পর তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ হয়েছে। এতে তিনি আঘাত পেলেন এবং স্কুল ছেড়ে দিলেন।

ওড়িশা ছাড়ার সময় বিপিনচন্দ্র স্থির করলেন, সারা জীবন দেশ সেবায় কাটাবেন। এক বছরের কম সময় কটকে কাটিয়েছেন। এই সময়ে তিনি উপলব্ধি করলেন সময়টি তাঁর পক্ষে গভীর শিক্ষার সময়। জনজীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা হয় কটকে। প্রিণ্টিং কোম্পানীর দোতলায় তাঁর বাগ্মিতা প্রকট হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে তাঁর গুরু আর কেউ নয়—স্বয়ং প্যারীমোহন।

পুরী : মার্চ ১৮৮১

১লা মার্চ দশটায় একটি বিচিত্র দল শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে সমবেত হল। ভীড় তখনও আরম্ভ হয়নি। অল্প কয়েকজন দর্শনার্থী মন্দিরে গেছে। এই দলটি চোখে পড়বার কারণ তাদের দেহ মলিন, অপরিচ্ছন্ন, অনেকটা সাপুড়েদের মতো। পুরুষরা পরেছে ছোট কৌপীনবস্ত্র আর স্ত্রীলোকগুলি নগ্ন প্রায়। সবার হাতে একটি পাত্র যার থেকে তারা কিছু খাচ্ছে। নিম্নজাতির লোকের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং তাদের দেখে সেবকরা মন্দিরের দ্বার বন্ধ করতে চেষ্টা করল।

তেরজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোকদের দল এই দেখে 'অলেখ অলেখ' বলে চিৎকার করে সেবকদের ধরাশায়ী করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কয়েকজন সেবকের অনুরোধ মেনে তারা ভোজনপাত্র বাইরে রেখে গেল। তাদের সঙ্গে অন্য দুশজন তীর্থযাত্রীও ঢুকল মন্দিরে। অনেক লোক মজা দেখতে তাদের কাছে এল। তারা জগন্নাথের কাছে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু জয় বিজয় বন্ধ। শত চেষ্টা করেও তারা জয় বিজয় খুলতে বা ভাঙতে পারল না। দলটি বাইরে এল দেখতে ঠাকুরের নিকটে যাবার অন্য কোনও রাস্তা আছে কিনা। ততক্ষণে প্রায় এক হাজার কৌতূহলী যাত্রী তাদের পাশে ভীড় করেছে। সামান্য ধস্তাধস্তি শুরু হল। যে লোকটি বেশী চেঁচামেচি করছিল সে অন্য একজনের কাঁধে চড়ে দেখার চেষ্টা করল উপরে চড়ে ভিতরে যাবার কোনও উপায় করা যায় কিনা। ধাক্কাধাক্কির মধ্যে লোকটি ভোগ মণ্ডপের সিঁড়ির পাশে পড়ে গিয়ে সংজ্ঞা হারাল। সাথীরা ধরাধরি করে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। তার আর জ্ঞান ফিরল না। এক ঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যু হল।

খবর পেয়ে পুলিশ এসিষ্ট্যান্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট ক্লার্ক অরুণ স্তম্ভের কাছে এলেন। মৃত লোকটির সঙ্গীরা তাকে ঘিরে রেখেছিল। ক্লার্ক সাব ইনস্পেক্টর কৃপাসিন্ধু মহান্তিকে অবস্থার সমীক্ষা করতে ভিতরে পাঠালেন। শবটি ময়নার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হল। দলের অন্য সকলকে শান্তিভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল। এদের থেকে জানা গেল যে মৃতব্যক্তির নাম দাসরাম, সে দলের নেতা। প্রায় এক সপ্তাহ আগে গুরুর আদেশে তারা সম্বলপুর থেকে যাত্রা করেছিল। গুরুর আদেশ ছিল তারা মন্দিরের ভিতরে যেয়ে উচ্ছিষ্ট ফেলবে এবং তিনমূর্তিকে বড়দাণ্ডে এনে জ্বালিয়ে দেবে। তাদের বিশ্বাস তাদের গুরু স্বয়ং অলেখের থেকে এমন আদেশ পেয়েছিলেন। তারা আরও জানাল যে এই উদ্দেশ্যে আরও একটি দল আসছে। ক্লার্ক তৎক্ষণাৎ লোক পাঠালেন এ খবরের সত্যতা যাচাই করতে। সব কথা জানিয়ে আর্মষ্ট্রংকে খবর পাঠালেন। ক্লার্ক জানতেন যে খবর পেতেই আর্মষ্ট্রং চলে আসবেন। সুতরাং তিনি এও জানালেন যে এখন আসার দরকার নেই কারণ শবটি মর্গে এবং অন্যরা হাজতে।

সেদিন সন্ধ্যায় পুলিশ আর একটি দলকে ধরল। এ দলে ছজন পুরুষ, এগারজন

স্ত্রীলোক ও এগারটি বাচ্চা। তারাও বলল যে গুরুর আদেশে তারা পুরী যাচ্ছে, উদ্দেশ্যে মন্দির অপবিত্র করে মূর্তি তিনটি জ্বালিয়ে দেওয়া।

মন্দিরে যে ভোগ রান্না হয়েছিল তা ফেলে দেওয়া হল। এক ব্যক্তির মন্দিরের অঙ্গনে মৃত্যু হয়েছে বলে মহাস্নানে শুদ্ধি করা হল। সিভিল সার্জন বি. বি. গুপ্ত মত দিলেন যে ভরা পেটে পাথরের উপর পড়ে যে আঘাত পেয়েছিল সেটাই লোকটির মৃত্যুর কারণ।

ক্লার্ক ও কৃপাসিন্ধু কেস তদারক করে চালান ফাইল করলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কমলনাথ ঘোষের কোর্টে কেস উঠল। অভিযোগ দুটি, পেনাল কোডের ধারা ১৪৭ ও ২৯৭ অনুসারে দণ্ডনীয়। শুনানির সময় মন্দিরের সেবক, সিভিল সার্জন ও পুলিশ কর্মচারীদের বয়ান নেওয়া হল। ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বিতীয় মামলার রায় দিলেন প্রথমে। তাঁর মতে এদের সাজা হওয়া অনুচিত কারণ পুরীতে আরও যে হাজার হাজার জীবিকাহীন যাত্রী আসে তাদের সঙ্গে এদের কোনও তফাৎ নেই। তাদের মলিন ছিন্নবস্ত্র ও আচা ব্যবহার থেকে সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে এরা কোনওরকম বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত। অবশ্য চারজন স্বীকার করেছে যে মূর্তি তিনটি জ্বালিয়ে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য একত্র হয়েছিল বলে তারা ১৪৩ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয়। এই চারজন, মায়া, ভজ, জীরা ও হিরাকে সাতদিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। অন্যদের মুক্তি দেওয়া হল।

অন্য কেসটির রায় বার হল ১৪ই। বাদী জগুয়া সিংহ বনাম প্রতিবাদী ধনী, সিতু, ভগত মায়ারাম ইত্যাদি পনেরোজনের মামলায় প্রমাণ হল যে তারা দাসরামের নেতৃত্বে পুরী এসেছিল বিগ্রহ তিনটি ভস্মীভূত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তারা গুরুর প্রতি এতই অন্ধবিশ্বাসী যে গুরুর বাণী তারা গুরুর অনুপস্থিতিতেও শুনতে পায়। দলের ছোট বাচ্চা ও অন্য কয়েকজনকে পিছনে রেখে ষোলজন পুরী পৌঁছে গিয়েছিল। জোর করে মন্দিরে ঢোকার সময় দাসরাম পড়ে মরে গেলে অন্যরা ভাবল সে গুরুজীর শরণে গেল। তারা দাবী করল বরকন্দাজরা তাদের মারধোর করেছে। এ কথা অবশ্য সত্য যে সেবকরা তাদের সামান্য মারধোর করেছিল তাদের মন্দির থেকে বার করার জন্য। সাক্ষ্য প্রমাণ শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট সকলকে ১৪৭ ও ২৯৭ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং প্রথম দফায় দু মাস এবং দ্বিতীয় দফায় এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড শুনালেন।

কটক কমিশনার স্মিথ জগন্নাথ মন্দিরের উপর আক্রমণের খবর সরকারকে পাঠালেন। সরকার বিচলিত হয়ে আদেশ দিল যে ওড়িশা ও ছত্রিশগড়ের কমিশনার দ্বয় অলেখ মতাবলম্বীদের বিষয়ে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিন।

কলকাতা : আগষ্ট ১৮৮১

চার বছরে যখন পুরী মন্দিরে এগারজন প্রাণ হারায় তখন সরকার নির্দেশ দিয়েছিল যে পুরীর রাজা মন্দিরের নিয়মকানুন তৈরী করার জন্য একটি কমিটি গঠন করুন। এবং এও জানিয়ে দিল যে এ কাজ না করলে তিনি মহারাজা উপাধি ও খিলাত পাবেন না। রাজা কিন্তু নির্বিকার, কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। বিরক্ত হয়ে আর্মষ্ট্রং রাজাকে একখানি কড়া চিঠি লিখলেন। এবার রাজা কমিটি গঠন করলেন। সদস্য হলেন মহান্ত মোহন দাস, মহান্ত রাধাচরণ দাস, অধিকারী রাসবিহারী দাস, রামচন্দ্র রায়গুরু, নীলাম্বর বাহিনীপতি, গোবিন্দ সান্ত্রা প্রমুখ। কমিটি নিয়মাবলী প্রস্তুত করে পাঠাল। এটি কমিশনারকে পাঠিয়ে দিলেন আর্মষ্ট্রং।

জনসাধারণ এই নিয়মাবলীর বিরোধিতা করল। বিষয়টির নিষ্পত্তি করার জন্য আর্মষ্ট্রং একটি সভা ডাকলেন। সভায় মতানৈক্য দেখা দিল। আলোচনা করে স্থির হল উপস্থিত ভদ্রব্যক্তিদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নিয়ে আর একটি কমিটি গঠিত হবে এবং এই কমিটি পুনরায় আর একটি নিয়মাবলী প্রস্তুত করবে। সভ্য হলেন ডেপুটী কালেক্টর কেদার নাথ রায়, প্রধান শিক্ষক রামদাস চক্রবর্তী, মহান্ত নারায়ণ দাস ও বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগর।

এই সময় রাজা দিব্যসিংহের দ্বীপান্তরের আদেশ হল। তার পুত্র মুকুন্দ দুই বছরের শিশু। সুতরাং রাজার জমিজমা ও মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন সূর্যমণি। নিয়মকানুন তৈরী করার জন্য কমিটির কয়েকটি বৈঠক হল, কিন্তু সদস্যরা কোনও বিষয়ে একমত হলেন না। শেষ পর্যন্ত কমিটির দুই গোষ্ঠী দুটি নিয়মাবলী তৈরী করল। আর্মষ্ট্রং দুটি রিপোর্ট মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। মহান্ত নারায়ণ দাস ও তারাকান্ত বিদ্যাসাগরের নিয়মাবলী সামান্য পরিমার্জিত করে কমিশনারকে পাঠিয়ে দিলেন। এতে তীর্থযাত্রীদের সুবিধা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মগুলি আছে।

এই নিয়মাবলী পাবার প্রায় একমাস আগে কমিশনার সুপারিশ করেছিলেন যে মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব রাজার হাত থেকে নিয়ে একটির উপর ন্যস্তকরা হোক। এ প্রস্তাব গৃহীত হল না, কারণ আইন বিভাগের মতে ১৮৪০ সনের আইনে সরকারকে এমন অধিকার দেয়নি। আর্মষ্ট্রঙের কাছ থেকে নিয়মাবলী এলে দ্বিতীয়বার আইন বিভাগের মত চাওয়া হল। তাদের মতে মন্দির সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রণয়নের সঙ্গে সরকারের জড়িত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য রাজা অপারগ হলে একজন ম্যানেজারকে এ দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এবং তা করতে চাইলে প্রথমে আইনটিতে সংশোধন করতে হবে। এবার বোর্ডের মত চাইল সরকার।

১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোর্ডের সদস্য জম্পিয়ার ওড়িশা গিয়ে কমিশনার স্মিথ, কালেক্টর আর্মষ্ট্রং এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করলেন।

তিনি ফিরে এসে মত দিলেন যে রাজা যদি অক্ষম বা অযোগ্য হন তবে একটির হাতে মন্দিরের দায়িত্ব দেবার অধিকার সরকারের থাকা উচিত। দরকার হলে এর জন্য নতুন আইন পাস করা হোক।

সরকার এ পরামর্শ মেনে নিল কিন্তু কিভাবে সেটি কার্যকর করা যায় তা ঠিক করতে অনেক দিন কেটে গেল। কেউ মত দিল নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। সিভিল প্রসিডিয়র কোডের ৫৩৯ ধারা অনুসারে সরকারের এমন পদক্ষেপ নেবার অধিকার আছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বোর্ডের অফিসে একটি বৈঠক বসল ২২শে আগষ্ট। তাতে যোগ দিলেন বোর্ডের সদস্য রেনাল্ড্স্, এডভোকেট জেনারাল জি. সি. পাল, লিগাল রিসেম্ব্রান্সার টি. টি. এলেন এবং ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল ডব্লু. সি. ব্যানার্জী। পলের মতে ৫৩৯ ধারা দাতব্য ট্রাষ্টের প্রতি প্রযোজ্য যা জগন্নাথ মন্দির নয়। জগন্নাথ মন্দির সর্বসাধারণের হিতে কিছু কাজ অবশ্যই করে কিন্তু এটি মূলত একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ট্রাষ্ট নয়। এলেন তার সঙ্গে একমত হলেন। ব্যানার্জী বললেন জগন্নাথ মন্দিরকে ট্রাষ্ট বলে মানলেও যতদিন ১৮৪০ সালের আইন আছে ততদিন অন্য কোনও আইন মন্দিরের ব্যাপারে চালু হতে পারে না। সকলে এ মত গ্রহণ করলেন। এদিকে মন্দির পরিচালনায় অব্যবস্থা বজায় রইল অসূর্যম্পশ্যা রাণী সূর্যমণির হাতে।

কটক : নভেম্বর ১৮৮১

অলেখ ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে নানা রিপোর্ট আসতে লাগল। ছত্রিশগড়ের কমিশনার রিপোর্ট পাঠালেন। আর যাঁরা রিপোর্ট পাঠালেন তাঁরা হলেন বাঁকীর তহশীলদার বলরাম বসু, অন্তগুলের তহশীলদার বিছন্দ পট্টনায়ক এবং ঢেঙকানলের ম্যানেজার বনমালী সিংহ। রিপোর্টগুলি অনুধাবন করে জুডিশিয়াল ডিপার্টমেণ্ট একটি রিজল্যুশন প্রকাশ করল। এতে কুম্ভিপটুয়াদের এইভাবে চিত্রিত করা হয়েছে :

কুম্ভীপটধারণকারীরা একজন অলেকস্বামীর চেলা। লোকটি ১৮৬৪ সালে হিমালয় থেকে বাঁকী এসে ৬৪ জনকে নিজের শিষ্য করে নেয়। সেখান থেকে সে ঢেঙকানলে যায় এবং ক্রমে তার মতবাদ সম্বলপুরেও ছড়িয়ে যায়। এই মতবাদের মূলমন্ত্র এক অদ্বিতীয় পুরুষে বিশ্বাস, সত্যবাদিতা, গুরুর আদেশ পালন ইত্যাদি। তারা মূর্তি পূজার বিরোধী, ঔষধ ব্যবহার করে না। দিনে একবার খায় এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। কোনও নিয়ম ভঙ্গ করলে জাতিচ্যুত করা হয়। অনুগুলের তহশীলদার পানোদের এ মতবাদ গ্রহণ করিয়ে তাদের অপরাধ প্রবণতা কমাতে পেরেছিল।

সোনপুরের ভীম কন্ধ এদের নেতা। সে জন্মান্ধ। কিন্তু শুনে শুনে রামায়ণ ও মহাভারত আয়ত্ত করেছে এবং গান রচনা করতে পারে। তার চেলারা তাকে শ্রদ্ধা

করে। তাদের সন্দেহ একজন শিষ্যার সঙ্গে ভীমের যৌন সম্পর্ক আছে কিন্তু কিছু বলতে সাহস করে না। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হলে ভীম ঘোষণা করল এর গর্ভজাত শিশু অর্জুনের অবতার এবং সে সকল অবিশ্বাসীকে বিনষ্ট করবে। সকলে এ কথা মেনে নিল কিন্তু জন্ম নিল একটি কন্যা। ভীম বলল কিছুদিন আগে তাকে স্বপ্নাদেশ হয়েছে যে মেয়েটি নিজের মায়ায় সকল অবিশ্বাসীকে ধ্বংস করবে। কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটির মৃত্যু হলে ভীম প্রচার করল যে এ সংসার এতই পাপপঙ্কিল যে দেবী প্রস্থান করলেন।

এই ঘটনার পর কিছুলোক ভীমকে ছেড়ে একটি আলাদা গোষ্ঠী স্থাপন করল। অনেক শিষ্য অবশ্য তার সঙ্গে থাকল। প্রতি সকালে ভীম স্ত্রীলোকটির সঙ্গে একটি বেদীতে আসীন হয় এবং শিষ্যরা তাদের পূজা করে, তাদের পা দুধ দিয়ে ধুয়ে সেই দুধ খায়।

যে কুম্ভীপটুয়ারা পুরী গিয়েছিল তারা চন্দ্রপুরের লোক। তাদের নেতা দাসরাম ভেবেছিল যে জগন্নাথের বিগ্রহ পোড়াতে পারলে হিন্দুদের আস্থা নষ্ট হবে এবং সকলে অলেখ স্বামীর শরণ নেবে।

রিজল্যুশনটি কলকাতা গেজেটে পড়ে গৌরীশংকর সেটির ওড়িয়া অনুবাদ দীপিকায় প্রকাশ করলেন। কিছুদিন পরে বিচ্ছন্দ পট্টনায়ক কটক এলে গৌরীশংকর তার সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করলেন। বিচ্ছন্দ বললেন কুম্ভীপটুয়ারা আজকাল চুপচাপ আছে সত্য কিন্তু এরকম কতদিন চলবে অনুমান করা কঠিন। তারা যদি আবার মন্দির আক্রমণ বা তেমন কিছু করে তবে মুস্কিল হবে। গৌরীশংকর মন্তব্য করলেন তিনি অনেকদিন থেকে এদের বিষয়ে সাবধান হতে বলেছেন।

শুনে বিচ্ছন্দ বললেন, তা কি করে সম্ভব? এর আগে এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানত না কেউ। আমিই প্রথমে পানোদের কুম্ভীপটুয়া করে সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছিলাম। এ কথা শুনে গৌরীশংকর একখানি আসন বিছিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন এবং পুরাতন দীপিকাগুলি ঘাঁটতে আরম্ভ করলেন। সত্যই দেখা গেল ১৮৬৭ সালের ১লা জুনের সংখ্যায় নতুন ধর্মপ্রচারক শীর্ষক খবর ছিল মহিমা ধর্মের সম্পর্কে। ১৮৭১ সালের ১৬ই আগষ্ট সংখ্যায় ঢেঙকানল প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য অঞ্চলের ফলাহারী কুম্ভীপটুয়াদের বিষয়ে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। আরও খুঁজে গৌরীশংকর ১৮৭৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের দীপিকা 'মহিমা বাবাজী' শীর্ষক সংবাদ পড়ে শোনালেন। এতে তিনি লিখেছিলেন যে এরা বেদ বা অন্য ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস করে না বা কোনও দেবতার পূজা করে না। তাদের ধর্ম নির্ভেদ ও অলেখ, একমাত্র মহিমাই তাদের পূজ্য। রাজা ব্রাহ্মণ নাপিত ও মালীদের সঙ্গে এদের কোনও সংস্রব নেই। এরপরে গৌরীশংকর নিজের তৎকালীন মন্তব্য উচ্চৈস্বরে পড়লেন : 'ধর্ম বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই কিন্তু এরা রাজাকে অধর্মী মনে করে তার তাৎপর্য কি?

এবং রাজা বলতে এরা কাকে বোঝায়? যদি কোনও দেশীয় রাজা বোঝায় তবে ঠিক আছে কিন্তু যদি ইংরেজ সরকারকে বোঝায় তবে মতটি দুর্বোধ্য এবং সরকারের উচিত উক্ত সম্প্রদায়ের লোকের কাছে স্পষ্টীকরণ চাওয়া। এমন হতে পারে যে ইংরেজ সরকারকে বিধর্মী বলে প্রচার করে লোকের মধ্যে রাজভক্তি কমিয়ে দেবে। ফলে বিদ্রোহ ঘটতে পারে।'

বিচ্ছন্দ হার মানলেন এবং তাদের আলোচনা শেষ হল। গৌরীশংকর ভাবলেন মধুসূদন দাসের কাছে গিয়ে বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচনা করবেন।

পনেরো বছর আগে মধুসূদন হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে মাত্র ছ মাস আগে হঠাৎ কটকে উপস্থিত হলেন। এতদিনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাঁর। ১৮৭৩ সালে এম.এ. পাশকরে বেথুন কলেজে তার সহপাঠী এবং বয়সে এক বছরের বড় সৌদামিনী চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করেছিলেন। কলকাতায় নানা চাকরি করেছিলেন যথা শ্রীরামপুরের খৃষ্টান কলেজের অধ্যাপক, হাইকোর্টের অনুবাদক, গার্ডেনরীচ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, আশুতোষ মুখার্জীর গৃহশিক্ষক ইত্যাদি। ১৮৭৮ সালে ওকালতি পাশ করলেন এবং আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। সেই বছর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হল এবং তিনি কটকে ফিরে এলেন। এখন ডগর পাড়ায় থাকেন। বিহারীবাগে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে পুনরায় ওকালতি শুরু করলেন। কটকের সভা সমিতিগুলিতে সক্রিয় অংশ নিতে আরম্ভ করলেন। তিনিই এম.এ. এবং এল.এল.বি. পাশ প্রথম ওড়িয়া। সুতরাং মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে মান্যতা পেলেন। মধুবাবু বলতে তাঁকেই বোঝায়।

গৌরীশংকর মধুবাবুর থেকে দশ বছরের বড়। তথাপি দুজনের মধ্যে মিত্রতা আছে। তাঁরা প্রায় মিলিত হন। ওড়িশায় ফিরে আসার পরে মধুবাবুর মধ্যে একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল, তিনি বাংলায় কথা বলেন এবং অন্যদেরও তাঁর সঙ্গে বাংলায় বলতে হয়। ওড়িশায় অবশ্য এটা কিছু নতুন কথা নয়। শিক্ষিত ওড়িয়ারা বিশেষ করে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলেন। ফকির মোহন সেনাপতি এবং মধুসূদন রাও এর ব্যতিক্রম নন।

বিচ্ছন্দ পট্টনায়কের সঙ্গে আলোচনার কিছুদিন পরেই গৌরীশংকর মধুবাবুর কাছে গেলেন। কুম্ভীপটুয়াদের উপর রিজল্যুশনটি তিনি পড়েছিলেন। তিনি বললেন, 'আপনারা মহিমার কথা জানবার অনেক আগে আমি তাঁকে দেখেছি।' মধুবাবুর পিতা চৌধুরী রঘুনাথ দাস পটিয়া রাজার উকিল ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে পটুয়া যেতেন। এনট্রান্স পাশ করার পরে একবার মধুবাবু পিতার সঙ্গে পটিয়া গিয়েছিলেন ১৮৬৪ সালে এবং মহিমা গোঁসাইকে দেখেছিলেন। দোল পূর্ণিমার দিন পটুয়া এসে প্রবচন দিতেন মহিমা গোঁসাই। মধুসূদন প্রবচন শুনেছিলেন। মহিমার আচারব্যবহার এবং ধার্মিক বিচার তাকে আকৃষ্ট করেছিল।

গৌরীশংকর রাজদ্রোহের কথা তুললে মধুবাবু বললেন, 'মহিমা গোঁসাই যদি বোম্বাই, পাঞ্জাব কিংবা বাংলায় জন্ম নিতেন তবে দয়ানন্দ সরস্বতী অথবা রামমোহন রায়ের মতো খ্যাতি পেতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মেছেন ওড়িশায়!'

ময়ূরভঞ্জ : ডিসেম্বর ১৮৮১

স্কুলের জয়েণ্ট ইনস্পেক্টর পদে কটকে চার বছর কাজ করলেন রাধানাথ। তাঁর অনেক সুনাম হল। এ সময়ে তিনি সুধীবর্গের অগ্রণী হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন। পাঠ্যপুস্তকের প্রণেতা হিসাবে শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। কার্য উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জ যেতেন মাঝে মাঝে। সেখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। বালেশ্বরে শ্যামানন্দদের বাড়িতেও প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হত। কৃষ্ণচন্দ্র ও রাধানাথ সমবয়স্ক। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রাজা। সুতরাং রাধানাথ তাঁকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের এগার বছরের ছেলে রামচন্দ্রকে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো স্নেহ করতেন। শিক্ষার প্রসার বিষয়ে তিনি রাজাকে পরামর্শ দিতেন। লণ্ডন থেকে কোন কোন পত্রিকা আনালে ভাল হয় তাও বলতেন। এবং তাঁর গ্রন্থাগারে কি কি পুস্তক থাকা উচিত তার নির্দেশ দিতেন।

রামচন্দ্রও রাধানাথকে অগ্রজের মতো সম্মান করতেন। তিনি রাধানাথের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করতেন। চিঠিতে সব কিছু জানাতেন, নিজের স্বাস্থ্যের কথা, ঘোড়া চড়া, কি কি বই পড়েছেন—এরকম নানা কথা। রাধানাথ তাঁকে সত্য কথা বলা, সৎপথে চলা ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কি কি বই পড়লে ভাল তার তালিকা দিতেন।

১৮৮১ সালে কৃষ্ণচন্দ্র স্থির করলেন ময়ূরভঞ্জের জন্য একজন দক্ষ দেওয়ান নিযুক্ত করবেন। তিনি গড়জাত মাহালের এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট নন্দকিশোর দাসকে মনোনীত করে কমিশনারকে প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি লিখলেন নন্দকিশোরকে তিনি মাসিক ছ'শ টাকা বেতন দেবেন। নন্দকিশোর কিন্তু রাজী হলেন না কারণ বেতন আকর্ষক নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। হঠাৎ জীবনাবসান হতে পারে ভেবে রামচন্দ্রকে যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে গড়ে তোলায় যত্নবান হলেন। ভেবে দেখলেন রাধানাথকে দেওয়ান হিসাবে পেলে ভাল হয় কারণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের শিক্ষার দায়িত্বও নিতে পারবেন। তিনি এই মর্মে রাধানাথের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন এবং শ্যামানন্দ দে কে অনুরোধ করলেন তিনি যেন রাধানাথকে রাজী করাতে চেষ্টা করেন। কমিশনারকে অনুরোধ করলেন ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটে চাকরি করার জন্য রাধানাথকে অনুমতি দিন। রাধানাথ পরিস্কার করে কিছু জানালেন না। কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় তাকে লিখলেন :

প্রিয় মহাশয়, কল্যাণবরেষু,

আপনার দুখানি পত্র পেয়েছি এবং শ্রীরাজা শ্যামানন্দকে পত্র লিখেছি। তাঁর জবাব পেলে, পুনরায় আপনাকে লিখব। আপনি মনে করুন এ বাড়ি আপনার, এখানে আপনার কোনও রকম অসুবিধা হবে না। আপনি অনুগ্রহ করে এখানে এলে আমার স্বাস্থ্যরক্ষার উত্তম উপায় হল বলে ভাবব। আমার শরীর যে ভাল নেই সে কথা আপনার জানা। বেশী পরিশ্রম করলে রোগ বেড়ে যাবে। আজ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনাকে দিলাম। সে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তার রাজ্য যাতে সুরক্ষিত থাকে তার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। আপনি নিশ্চয় আসবেন। আমার সব ক্ষমতা আপনাকে দিলাম, আপনি এসে সব দায়িত্ব নিজের হাতে নিন।

ইতি,
শ্রী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ।

চিঠি পেয়ে রাধানাথ হিসাব করে দেখলেন এ চাকরি নিলে লাভ ক্ষতি কি হবে। এখন মাসিক চারশ টাকা গ্রেডে আছেন, ভবিষ্যতে পদোন্নতি হবে। কৃষ্ণচন্দ্র মাসিক ছ'শ টাকা দিতে চান, তার উপরে ঘরভাড়া দিতে হবে না এবং টি.এ. মিলবে। এর আগে যারা দেশীয় রাজ্যে চাকরি করেছেন রাধানাথ তাদের খোঁজ করলেন। কটকের ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর প্যারীমোহন সেন বেতন পেতেন একশ টাকা, ঢেঙকানলের রাজা তাঁকে নিযুক্ত করলেন একশ আশী টাকা বেতনে। ঢেঙকানল থেকে ফিরে প্যারীমোহন জানালেন যে সরকারী চাকরিতে যে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি হয় তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন এবং কটক থেকে তাঁর বদলী হয়ে গেছে। সুতরাং সব মিলিয়ে তাঁর ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে অনুগুলের অস্থায়ী তহশীলদার ঢেঙকানলের চাকরি পেয়ে লাভবান হলেন। ঢেঙকানলের রাজা তাঁর বেতন বৃদ্ধি করলেন অবশ্য কিন্তু থোকে তেইশ হাজার টাকা দিলেন এবং বেহেরা প্রধানের পদ দিলেন যার থেকে পনেরো হাজার টাকা আদায় হবে। রাধানাথ অবশ্য ভাবলেন দেওয়ান হলে বেহেরা প্রধানের কাজ করা অশোভন হবে।

রাধানাথ সকলের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন, যেমন মধুসূদন রাও, শ্যামানন্দ দে, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ইত্যাদি। কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখলেন :

শ্রীচরণেষু মহারাজ,

আজ আপনার পত্র পেলাম। মহারজের যেমন দয়াপূর্ণ এবং দাক্ষিণ্যপরায়ণ মনোভাব পত্রখানিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে। আমি মহারাজকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি এবং শ্রীমান রামচন্দ্রকে অনুজতুল্য স্নেহ করি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি বড় হয়ে সে যেন রাজ্য শাসনে আপনার মতই কিম্বা আপনার থেকে অধিক সুখ্যাতি লাভ করে।

আমি এখন চারশ টাকা গ্রেডে আছি, মহারাজা আমাকে ছয় শত টাকা দিতে চান। তবুও এ পদ স্বীকার করতে সাহস হচ্ছে না তার অনেক গূঢ় কারণ যা পত্রে জানাতে অক্ষম।

মুখে নিবেদন করতে চাই। মহারাজ বলতে পারেন, কেন তোমার সরকারী চাকরি তো থাকছে এবং যখন ইচ্ছা সে চাকরিতে ফিরে যেতে পার? এর অনেক উত্তর আছে। সবগুলি লিখতে পারছি না। মাত্র একটি কথা লিখছি। ধরুন আমি ছ মাস বা এক বছর আপনার চাকুরি করে ফিরতে চাইলাম তখন আমাকে বিহার অথবা চট্টগ্রামের মতো সুদূর স্থানে বদলী করা হল আর আমার এখানকার পদটি চিরকালের মত হাত ছাড়া হয়ে গেল। তাছাড়া সরকারী চাকরিতে যে বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি হয় তাও পাব না।

দেশীয় রাজ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিশেষ স্থান আছে। রাজার প্রিয়পাত্র হতে পারলে কম সময়ে লোকে ধনী হয়ে যেতে পারে। সরকারী কাজে এমন হবার সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে মোটামুটি জীবিকা নির্বাহের ঝুঁকি কম।

আমি যা লিখেছি তাতে যদি অপরাধ করে থাকি তবে মহারাজ নিজ গুণে ক্ষমা করবেন; এই প্রার্থনা মহারাজা এই সেবককে আশ্রিত ও জ্ঞাতিবর্গের একজন মনে করেন তা আমার জানা এবং ভগবানের আশীর্বাদে সে সম্বন্ধ অটুট থাকবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যদি ময়ূরভঞ্জে যাই তবে আর একটি সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং সে পরিস্থিতিতে পূর্বের সম্পর্ক ভুলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় হবে।

একই বিভাগে অনেকদিন কার্যরত আছি। এ বিভাগে যতটা পদোন্নতি আশা করা যায় তা আমার হয়ে গেছে। অন্যধরণের কর্তব্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করে এবং সর্বান্তঃকরণে প্রভুর মঙ্গলসাধন করে তার প্রীতিভাজন হ'ব এ ইচ্ছা আমার মনে সদা জাগ্রত; কিন্তু তা চরিতার্থ হবে কিনা তা মহারাজের অনুগ্রহ সাপেক্ষ। মহারাজা আমাকে অনুগ্রহভাজন মনে করেন কিনা জানিনা কিন্তু আমি জানি যে শ্রমশীলতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা যদি রাজপ্রসাদ লাভ করতে পারে তবে আমি সেই রাজপ্রসাদ থেকে বঞ্চিত হব না।

আজকাল আমি শিক্ষা বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কাজ করছি। প্রতি বছর আমার বেতন বৃদ্ধি হয়। এখন ছেড়ে গেলে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হব। ফিরে এলে পূর্ব বেতন থেকে শুরু করতে হবে। সবদিক থেকে ভেবে দেখলাম ময়ূরভঞ্জের চাকরি নিলে আমার আর্থিক লাভ হবে না। এই অবস্থায় আমার যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা মহারাজার সুবিবেচনার উপর নির্ভর করছে।

আমি বালেশ্বরের অধিবাসী। ময়ূরভঞ্জকে আমার প্রথম আশ্রয় স্থল মনে করি। সম্ভব হলে ময়ূরভঞ্জের প্রজা হয়ে থাকতে চাই। পূর্বপুণ্যের ফলে ময়ূরভঞ্জ আপনাকে পেয়েছে। জগদীশ্বর যদি আমাকে দীর্ঘজীবন দেন শ্রীরামচন্দ্রের গৌরবময় রাজত্বকালও দেখব। আমি সে গৌরবের ভাগীদার হই বা না হই সে অন্য কথা। কিন্তু সর্বদা কায়মনবাক্যে ময়ূরভঞ্জের মঙ্গল কামনা করব।

কমিশনার সাহেব শীঘ্র আমার মত জানাতে বলেছেন। কিন্তু এইরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে।

বশম্বদ ভৃত্য,
রাধানাথ রায়।

রাধানাথ আশা করেছিলেন পত্র পেয়ে মহারাজা তাঁকে অধিক বেতন দেবার প্রস্তাব করবেন। অথবা কোনও অন্য উপায়ে কিছু অতিরিক্ত অর্থাগমের উপায় করবেন। কিন্তু তেমন কিছু হল না। বন্ধুরা তাঁকে দেশীয় রাজ্যে কাজ করতে মানা

করল না বটে তবে অনেক অসুবিধার কথা বলল। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ক্রফট্ জানালেন যে শিক্ষাবিভাগে প্রথম শ্রেণীতে পদোন্নতি হতে সময় লাগবে। সুতরাং তিনি ময়ূরভঞ্জের চাকরি নিতে পারেন। এরকম দোমনা অবস্থায় তিনি গড়জাত এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্টের কাছে থেকে শীঘ্র তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার জন্য তাগিদ পেলেন যা তার দশদিন আগেই করা উচিত ছিল।

এই চিঠিখানি এল যখন রাধানাথ পুরী সফর করছিলেন। পেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ও নিজের ভাগ্যকে দোষ দিলেন। বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন :

ভেবেছিলাম এক দুমাসের মধ্যে ময়ূরভঞ্জে গিয়ে মহারাজার সঙ্গে আলোচনা করব এবং কিছু স্থির করব কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি এখনই নিতে হয় তবে দুঃখের সঙ্গে বলব এ প্রস্তাব গ্রহণে আমি অক্ষম।

রাধানাথ ময়ূরভঞ্জে আসতে রাজী নন জেনে রোগশয্যায় শয়ান মহারাজা অনেক দুঃখ করলেন।

কটক : ডিসেম্বর ১৮৮১

প্যারীমোহনের ওড়িশার ইতিহাস প্রকাশ পেলে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন। কিছু লোক অবশ্য তাঁর কুৎসা রটনায় লিপ্ত হ'ল। বক্তৃতায় হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলেন বলে তাঁকে হিন্দুবিরোধী বলা হল। সমালোচনা এত উচ্চগ্রামে পৌঁছাল যে দীপিকায় একখানি পত্র লিখতে বাধ্য হলেন প্যারীমোহন :

> শুনতে পেলাম হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে এমন কথা দু চারজন লোক অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করছে। তাদের আমি আহ্বান করছি দেখিয়ে দিন আমার কোন বক্তৃতার কোন অংশে এমন উক্তি আছে। আমি সম্পাদক মহোদয় ও আমার সভায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বিনীত অনুরোধ করছি যে তাঁরা বলুন আমি কোনও সভায় কোনও বক্তৃতায় কোনও ধর্মাবলম্বীর মনোকষ্ট হতে পারে এমন কিছু বলেছি কি?
>
> বশম্বদ,
>
> কটক, ১২.২.৮০ প্যারীমোহন আচার্য।

অন্য যে বিষয় নিয়ে তাঁকে আঘাত করা হল সেটি তাঁর 'ওড়িশার ইতিহাস'। যাঁরা তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন তাঁদের মুখ্য কটকের কালীপদ ব্যানার্জী। তিনি পুস্তকটির বিরুদ্ধে কলকাতার সকল সংবাদপত্রের সম্পাদককে লিখলেন এবং তাঁর পত্র ছাপিয়ে জগন্নাথী এক নম্বরী নাম দিয়ে বিলি করলেন। প্যারীমোহন কালাপাহাড়ের ওড়িশা আক্রমণের যে বর্ণনা করেছেন তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল আছে বলে দাবী করলেন। প্যারীমোহন লিখেছিলেন :

পুরী জয় করে হিন্দু দেবদেবীর উপর ঘোর অত্যাচার শুরু করল কালাপাহাড়। জগন্নাথকে সেবকরা চিল্কা অঞ্চলে নিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখল। কি করে কালাপাহাড় জানতে পারল। সে মাটি খুঁড়ে ঠাকুরকে তুলে হাতির পিঠে করে গঙ্গাকুলে নিয়ে গেল এবং জ্বলন্ত চিতায় বিসর্জন দিল। মূর্তি কিন্তু ভস্ম হল না, বিশর মহান্তি নামে এক ব্যক্তি অর্ধদগ্ধ বিগ্রহ থেকে নাভি উদ্ধার করে ওড়িশা নিয়ে এল। কুজঙ্গের রাজা নাভি পেয়ে ঠাকুরকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন।

কালীপদর বক্তব্য, মূর্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জানলে মন্দিরে যে মূর্তি আছে তাকে কেউ ভক্তি করবে না, পুরীতে দর্শনার্থী আসবে না এবং মন্দিরের প্রসাদ কেউ সেবন করবে না। কালীবাবুর পত্র কলকাতার 'ডেইলী নিউজ' প্রকাশ করল। ওড়িশাতে বাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি হল। প্যারীমোহনের সমর্থক বললেন তিনি মাদলা পঞ্জিকা এবং সাটনের বিররণী থেকে তথ্য নিয়েছেন। সাটনের ইতিহাস আগে পাঠ্যপুস্তক ছিল; সুতরাং প্যারীমোহনের বর্ণনা অগ্রাহ্য করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। আরও বলা হল দর্শনার্থীদের উপর এর কোনও প্রভাব পড়েনি। মন্দির থেকে যখন পাথর খসে পড়েছিল অথবা রাজাকে যখন গ্রেপ্তার করা হল তখন যদি কোনও গণ্ডগোল না হয়ে থাকে তবে এখন প্যারীমোহনের এক জায়গায় কি লেখা হয়েছে তা নিয়েই বা লোকে বিচলিত হবে কেন?

সংবাদপত্রে চিঠি লিখে এবং প্রচারপত্র বিলি করেই ক্ষান্ত হলেন না কালীপদ। একটি আর্জি পাঠালেন কালেক্টরের কাছে। তিনি প্যারীমোহনের আরও একটি উক্তির প্রতি কালেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্যারীমোহন লিখেছেন, জনসাধারণকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশা দিয়ে ১৮১৩ সনের এক নম্বর আইন দ্বারা তাদের ধোঁকা দিয়েছেন। কালীপদর মতে এ উক্তি সরকারকে ঠক বলে চিত্রিত করেছে।

দরখাস্তটি পেয়ে কালেক্টর শিক্ষা কমিটির মত চাইলেন। ৭ই এপ্রিল কমিটির সভা ডেকে সদস্যদের মত চাওয়া হল। স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর উমাপ্রসাদ দে এবং অন্য কয়েকজন সদস্য কালীপদকে সমর্থন করলেন, অন্যরা বললেন, প্যারীমোহন আপত্তিজনক কিছু লেখেন নি। চিতাবহ্নি শব্দের চুলচেরা বিশ্লেষণ হল। কালীপদ ও তাঁর সমর্থকদের মতে চিতাবহ্নি শব্দের অর্থ চিতার জ্বলন্ত কাঠ, অন্যদের মতে যে কোনও জ্বলন্ত কাঠ চিতাবহ্নি। তদ্রূপ বঞ্চিত অর্থ প্রবঞ্চিত হয়। সব শেষে সভা স্থির করল যে পুস্তকের কোন অংশই আপত্তিজনক নয়।

কালীপদ হার মানলেন না। জগন্নাথী দুনম্বরী প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন সাটনের পুস্তকে জগন্নাথের দুর্দশার কাহিনী ভিন্ন এবং তা সত্ত্বেও এটিকে পাঠ্য করা হয়েছিল বলে ১৮৫৭ সালে বৈদেশ্বর স্কুলে ছাত্র এল না এবং স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেল। কালীপদ শিক্ষাকমিটিকে আলোচনার বিবরণী দিয়ে পুনরায় ওড়িশার ইতিহাসের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন।

কিছুদিনের মধ্যে জগন্নাথী তিন নম্বরী প্রকাশিত হল। এতে কালেক্টর ও অন্যান্যদের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তার নকলগুলি ছিল। তার একটি উমাপ্রসাদ দের, যাতে তিনি লিখেছিলেন :

অপরিণত বয়স্ক যুবকদের প্রকাশ্য সভায় গ্রন্থকার হিন্দুধর্মাবলম্বীদের উপহাস করেন তেমনি জেনে শুনে জগন্নাথ দেবের বিষয়ে অসত্য তিনি হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছেন।

এরকম মতানৈক্য দেখে কালেক্টর ফসী আদেশ দিলেন যে পুস্তকটি পাঠ্য তালিকায় থাকবে না, যদিও সরকার এটির প্রশংসা করেছিল। প্যারীমোহন এবার বিশেষ মর্মাহত হলেন।

এই ঝামেলা শেষ হতে না হতে প্যারীমোহনকে ঘিরে আর একটি ব্যাপার ঘোরাল হয়ে উঠল। সেটি হল বাঁকী তহশীলদারের মামলা। প্যারীমোহনের প্রিয় মিত্র গোবিন্দ রথ তহশীলদারের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করে কমিশনারকে অনুরোধ করলেন যে তহশীলদারকে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত করা হোক। গোবিন্দ রথ কিছুদিন কটক একাডেমীতে শিক্ষকতা করে বাঁকী চলে যান এবং নিজেকে সামাজিক কাজ ও লেখায় সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন। বাঁকীতে তহশীলদারের প্রবল জনমত দেখে গোবিন্দ রথ এই পদক্ষেপ নিলেন। এই অভিযোগ যখন বিচার করা হয় তখন প্যারীমোহন ডমপাড়ার ম্যানেজার। গোবিন্দ রথের মনোবল বাড়াবার জন্য তিনি লিখলেন :

প্রিয় গোবিন্দ,

যে কাজ হাতে নিয়েছ তার জন্য খুব সতর্ক থাকা দরকার। সাক্ষীরা যাতে সত্য বলে সেদিকে নজর দেবে। তারা সত্য বলবে কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কমিশনার তহশীলদারকে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তর করতে রাজী হননি শুনে চিন্তিত হয়েছি। সাবধান, সাবধান। যতোধর্মস্ততোজয়ঃ মনে রেখে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে। বাকি ভগবানের হাতে।

সকল বাংলা ও ওড়িয়া সংবাদপত্রে খবরটি পাঠাবে। 'মিরর' ও ষ্টেটস্‌ম্যানকে তার যোগে জানাও যে তহশীলদারের অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত জনসাধারণ কমিশনারের কাছে নালিশ করেছে। তারা দাবী করেছে তদন্তের সময় তহশীলদারকে স্থানান্তর করা হোক কিন্তু কমিশনার তা অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি মাত্র তার কৈফিয়ৎ তলব করেছেন। ইত্যাদি।

মধু ও অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক করে তারযোগে খবর দাও। রাত্রে তার পাঠালে এক টাকায় ছত্রিশটা শব্দ পাঠান যায়।

তোমার,
প্যারীমোহন।

২০.৮.৮০

খবরের কাগজে এসব পড়ে কমিশনার বাঁকী তহশীলদার শ্রীনাথ বাবুর থেকে দায়িত্ব নিতে সেরিস্তাদার বলরাম বসুকে পাঠালেন। এই সময় বালেশ্বর সংবাদবাহিকায়

গোবিন্দ রথের উপরে একটি কবিতা প্রকাশিত হল। তার প্রথম কয়েকটি পংক্তি :

শুন বিচার কর নরনাথ গোবিন্দের কথা অতি অদ্ভুত।
কাহারও কথা হয় না স্থায়ী রাবণ হল যে দেশত্যাগী॥
তাহার আশ্রিত রাক্ষসগণ ঘোরে একদল জনপদ বন,
সব তারা লুটেপুটে খায় ভয়ভীত লোকে নীরব রয়;
ভোগ করে অসুর ধনদৌলত করজোড়ে থাকে সব শঙ্কিত।
দুষ্টের দলন শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দরূপে প্রকট হন॥
অনেক সাহসে ভরিয়া মন, অভিযোগপত্র করিয়া লিখন,
একটি অসুর করিতে দমন আদালতের নিলেন শরণ॥ ইত্যাদি।

১৮৮১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর প্রবল জ্বরাক্রান্ত প্যারীমোহন কটকে এলেন। খবর পেয়ে মধুসূদন রাও ছুটে এলেন। তাঁকে দেখে প্যারীমোহন বললেন, 'এবার আর বাঁচব না।' মধুসূদন বললেন, 'তা কি করে সম্ভব? মনে নেই ছেলেবেলা থেকে আমাদের চুক্তি মরব একসঙ্গে; তাছাড়া এখনও যে অনেক কাজ বাকি।'

সন্নিপাত রোগে আরও ছদিন ভুগলেন। ২৯শে সকাল নটায় প্যারীমোহনের দেহাবসান হল। বয়স হয়েছিল মাত্র ত্রিশ বছর। তাঁর মৃত্যুতে সকলে শোক প্রকাশ করল এবং তাঁর তিনটি কীর্তির কথা আলোচনা করল। কারও মনে হল না তিনি দুটি জীবন্ত কীর্তিও রেখে গেলেন, গোবিন্দ রথ ও মধুসূদন রাও।



নয়

পুরী : ডিসেম্বর ১৮৮২

দিব্যসিংহকে কলকাতা নিয়ে যাবার পর থেকে তার কোনও খবর আসেনি। একবার শোনা গিয়েছিল সে জেলখানার প্রেসে অক্ষর জোগানোর কাজ করে। সর্বশেষে খবর ছিল ১৮৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সাতারা জাহাজে তাকে আন্দামান নিয়ে গেছে। জাহাজে পাগলের মতো ব্যবহার করার জন্য তার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জাহাজ টাপু পৌঁছলে সে খুব কান্নাকাটি করেছিল তখন তার পায়ের বেড়ি খুলে দিয়ে তাকে একটি আলাদা সেলে রাখা হয়েছিল।

দিব্যসিংহের দ্বীপান্তর হলে এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন সূর্যমণি, রাজবাটিতে তার দৌরাত্ম্য আর সইতে হবে না। দিব্যসিংহের পিতা প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করলেন যদিও সূর্যমণি কোনও পদক্ষেপ নিলেন না। তিনি দক্ষ উকিল নিযুক্ত করলেন কিন্তু কোনও ফল হল না।

দিব্যসিংহের নাবালক পুত্রকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে তাকে কি করে সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার দেওয়াবেন সে দিকে এবার মন দিলেন সূর্যমণি। তিনি জেলা জজের কাছে আবেদন করলেন যে রাজাকে যে পেনশন দেওয়া হত সেটি এখন তাঁকে দেওয়া হোক কারণ তিনি নাবালক রাজকুমার ও তার মায়ের একমাত্র অভিভাবক। জেলা জজের কোর্টে তার উকিল যুক্তি দেখালেন যে দিব্যসিংহের দ্বীপান্তর হলে তার এত বদনাম হয়েছে যে তাকে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত এবং সব সম্পত্তি জেনামণির পাওয়া উচিত। জেলা জজ আবেদন স্বীকার করে আদেশ দিলেন :

> পুরী জেলা অন্তর্গত রাজবাটি কুণ্ঠাই বেণ্ট পাড়ার নিবাসী জগন্নাথ জেনামণি নাবালক। সে যত দিন সাবালক না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত ১৮৫৮ সনের ৪০ নম্বর আইনের সাত ধারা অনুসারে এই আদালত উক্ত পাড়া নিবাসী সূর্যমণি পাট মহারাণীকে তলিত মাস ২২ তারিখের হুকুমনামা অনুসারে তার অভিভাবক নিযুক্ত করছে। অবশ্য উক্ত আইনের ২১ ধারা প্রমাণিত হলে এই আদালতের ক্ষমতা অনুসারে এই হুকুমনামা রদ করা যেতে পারে। তাঁকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা দেওয়া হল :
>
> ক) আপনি নাবালকের সম্পত্তির দখল নেবেন। নাবালকের এজেণ্ট বাবদ যে অর্থ প্রাপ্য হবে তা আদায় করবেন এবং ন্যায্য খরচ নির্বাহ করবেন। এবং সম্পত্তির জন্য প্রয়োজন হলে মকদ্দমা লড়বেন।
>
> খ) আপনার দায়িত্ব নির্বাহ করার জন্য যা কিছু করণীয় সাবধানতার সঙ্গে সম্পন্ন করবেন। কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি বিক্রি করতে বা বন্ধক রাখতে পারবেন না।

গ) পুনশ্চ, এই আদালতের অনুমতি না নিয়ে কোনও জমি পাঁচ বছরের অধিক কালের জন্য পাট্টা দেবেন না।

ঘ) জমা খরচের সঠিক হিসাব রাখবেন। হিসাব যে ঠিক তা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখবেন।

এই আদালতের এই নির্দেশ ২৭শে আগষ্ট ১৮৭৯ রাণী মন্দির এবং জমিজমা তত্ত্বাবধানের জন্য কমিশনার অফিসের সেরিস্তাদার রামপ্রসাদ সিংহকে ম্যানেজার নিযুক্ত করলেন। এভাবে সব সুচারুরূপে চলছিল এমন সময় শোনা গেল মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব একটি কমিটিকে দেবার জন্য একটি আইন প্রণয়নের কথা বিচার করছে সরকার। এমনকি প্রস্তাবিত আইনের খসড়া তৈরি শুরু হয়েছে। এ নিয়ে রামপ্রসাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন সূর্যমণি। স্থির হল জগন্নাথ জেনামণিকে রাজা ঘোষণা করলে সমস্যা মিটে যাবে। এর জন্য একটি রাজ আদেশ জারী হল :

স্ত্রী পুরুষোত্তম মন্দিরের পরিছা এবং সকল কর্মীদের নির্দেশনামা—

মেব ২০শে সোমবার শ্রীমান জেনামণির রাজ্যাভিষেক হবে। পরম্পরা অনুযায়ী তোমরা উপস্থিত থাকবে। অন্যান্য বিবরণী বার্তাবহের মুখে শুনবে।

১৮৮২ সনের ১লা মে জগন্নাথ জেনামণিকে শ্রীমুকুন্দ দেব নাম দিয়ে সিংহাসনে বসানো হল। অনেকে এ কাজের প্রতি কটাক্ষ করল কারণ দিব্যসিংহ জীবিত। দীপিকা মন্তব্য করল, সিংহাসন এতদিন যেমন খালি ছিল তেমনি থাকলে কিছু ক্ষতি হত না। রাজা দ্বীপান্তর আছেন সত্য কিন্তু তিনি ফিরতে পারেন না, এ কথা বলা যায় না। জেলের নিয়মানুসারে অথবা ভারতেশ্বরীর কৃপায় তাঁর শাস্তি মকুব হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল এবং তিনি দীর্ঘায়ু হতে পারেন। তাছাড়া বয়সের হিসাবে তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য নয়। এদিকে রাজকুমার অবোধ শিশু মাত্র, সাবালক হতে অনেক দেরী। ততদিন তার অভিভাবকই কাজ চালাবেন। এই পরিস্থিতিতে নাবালককে রাজগদিতে বসিয়ে কি লাভ হল? আসলে রাজার প্রতি যৎসামান্য সহানুভূতি লোকের মনে ছিল তাও মুছে দেবার চেষ্টা হয়েছে।

সূর্যমণি এসব সমালোচনা গ্রাহ্য করলেন না। এবার তিনি প্রস্তাবিত নতুন আইনের দিকে মনোযোগ দিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে সূর্যমণি অনেক অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমতী হয়েছেন। সমস্যার মুখোমুখি হতে এখন আর ঘাবড়ান না। প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্যোগ করলেন। ১৮৮২ সনের ৮ই জুলাই মাধব পাণ্ডা এবং অন্য ৪৫০ জন কমিশনারকে একটি আর্জি জানাল। তাদের বক্তব্য প্রস্তাবিত আইনের কথা শুনে তারা বিচলিত হয়েছে। মন্দির পরিচালনা রাজার চিরন্তন অধিকার এবং এ কারণেই রাজন্যবর্গ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। তাছাড়া কমিটির হাতে এ কাজ তুলে দিলে পূজা অর্চনায় ব্যঘাত ঘটবে।

২৮শে জুলাই ছোট লাটকে এক সুদীর্ঘ আবেদন পাঠালেন স্বয়ং সূর্যমণি। মাদলা পঞ্জিকা থেকে উদ্ধৃত্তি দিয়ে তিনি লিখলেন :

সত্যযুগে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে জগন্নাথের পূজা করলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে পরবর্তী রাজারা সেবা পূজা চালু রাখলেন। এভাবে পুরুষানুক্রমে পুরীর রাজা মন্দিরে পূজা অর্চনা করে এসেছেন। দিব্যসিংহের দ্বীপান্তরের পরে নাবালক নাতির তরফ থেকে আমি মন্দিরের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করে আসছি। এ দায়িত্ব একটি কমিটিকে দিলে শুধু যে হিন্দুধর্মের অসম্মান করা হবে তাই নয়, রাজপরিবারের মর্যাদা হানি হবে। এবং সেবা পূজায় বাধা আসবে। আমার পুত্রের দ্বীপান্তর হয়েছে কিন্তু সে জীবিত এবং তার পুত্র আছে। দিব্যসিংহের অপরাধের জন্য তার পুত্রকে তার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত হবে। ইত্যাদি।

এছাড়া সূর্যমণি মঠের মহান্তদের, দণ্ডীদের এবং সন্ন্যাসীদেরও একখানি আর্জি দিতে উসকানি দিলেন। ১৯শে জুলাই তারা দরখাস্ত পাঠাল. এতেও সত্যযুগ থেকে চলে আসা পরম্পরার বর্ণনা করে দেখানো হল সর্বকালে রাজপরিবারই মন্দিরের দায়িত্ব পালন করে এসেছে। তাদের আবেদন রাজার হাত থেকে মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে একটি কমিটির উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব ত্যাগ করা হোক।

২২শে জুলাই পুরী ও ষোল শাসনের ব্রাহ্মণগণ আর একখানি আবেদনপত্র পাঠান। তাদের বক্তব্য ভুবনেশ্বরের ও সত্যবাদীর মন্দির পরিচালনা করছে কমিটি কিন্তু পুরীর মন্দিরের স্থান সর্বাগ্রে। তাছাড়া কমিটি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে তাও বলা যায় না। এর পরে নীলাদ্রী মহোদয় ও ক্ষেত্র মাহাত্ম্যর উল্লেখ করে লিখল পুরী রাজা স্বয়ং অথবা তাঁর আদেশে অন্য কেউ পূজা করতে পারে। অন্য কোনও বিধান নাই। রাজা ছাড়া অন্য কাহাকে এ দায়িত্ব দিলে হিন্দুধর্ম এবং রাজার অবমাননা হবে।

দরখাস্ত পেয়ে সরকার কমিটি গঠন করার প্রস্তাব স্থগিত রাখল। রাজার অধিকার বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সূর্যমণি স্থির করলেন মুকুন্দের নামে অংক চলবে। প্রাচীন প্রথা অনুসারে সেপ্টেম্বর মাসের মুনিয়ার দিন চতুরঙ্গ দোলায় খালিসাহী যাত্রা করে মুকুন্দ অংক চালু করল। প্রথা অনুসারে সিংহাসনে আরোহণের সময় দুই অংক পূর্ণ হয়েছে। এবং তার পরের মুনিয়ার দিন তৃতীয় অংকের শুরু। অংক কাটার সময় অনেক লোক উপস্থিত হল এবং ৩০০ টাকা আদায় হল। অনেকে অবশ্য ব্যাপারটি পছন্দ করল না কারণ দিব্যসিংহ এখনও জীবিত। তারা এটিতে ফালতু মুকুন্দদেবের অংক বলে ব্যঙ্গ করল।

ডিসেম্বর মাসে সূর্যমণি জেলা জজের আদালতে দরখাস্ত করে সকল কাগজপত্র থেকে 'জগন্নাথ জেনামণি' নাম খারিজ করিয়ে 'রাজা মুকুন্দদেব' দরজ করিয়ে নিলেন।

কটক : সেপ্টেম্বর ১৮৮৩

কটক মিউনিসিপ্যালিটী থেকে তিন টাকা তের আনা তিন পয়সা ফিরে পাবার জন্য গৌরীশংকর যে মামলা করেছিলেন তা মিটতে দেড় বছর লাগল। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান কালেক্টর আর.এইচ. পসি।_ ১৮৮০ সালে মিউনিসিপ্যালিটী করের হারের পরিবর্তন করল। গৌরীশংকর কর দিতেন নয় টাকা। পসি তা বাড়িয়ে করলেন বার টাকা। তাঁর যুক্তি গৌরীশংকরের ভাই হরিশংকর ইতিমধ্যে মাসে ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকরি পেয়েছেন।

১৮৮২ সালে ভাইসচেয়ারম্যান গৌরীশংকরের করভার আরও বাড়িয়ে দুগুণ করে দিলেন। গৌরীশংকর তিন মাসের জন্য ছ টাকার একটি নোটিশ পেলেন। তখন কর পুনর্নির্ধারণের সময় নয় বলে গৌরীশংকর প্রতিবাদ করলেন। উত্তরে তাঁকে জানানো হল যে তিনি মাসে একশ টাকা বেতন পান সরকারী চাকরি থেকে; তিনি 'উৎকল দীপিকা'র সম্পাদক এবং প্রিণ্টিং প্রেসের কোষাধ্যক্ষের কাজও করেন। তাঁর এক ভাই যে তার সঙ্গে থাকে সেও মাসে ত্রিশ টাকা বেতন পায়। ইদানীং তাঁর অন্য ভাই মাসে বত্রিশ টাকা বেতনের চাকরি পেয়েছে। তাছাড়া গৌরীশংকর কিছু দোকান করে ভাড়া দিয়েছেন। তাঁর মাসিক আয় দুশ টাকার বেশি হবে। সুতরাং তাঁর দেয় কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই আদেশের বিরুদ্ধে ১৮৮২ সালের জুন মাসে একখানি রিভিউ দরখাস্ত পেশ করলেন কিন্তু কালেক্টর পসি পুনর্বিচার করতে সম্মত হলেন না।

গৌরীশংকরের হিসাবে তাঁর তিনমাসে দেয় তিন টাকা; সুতরাং তিনি কর দিলেন না। তখন তাঁর একখানি পাল্কি ক্রোক করা হল। ছয় টাকা তের আনা তিন পয়সা দিয়ে তিনি পাল্কি ছাড়িয়ে নিলেন। তের আনা তিন পয়সা ওয়ারেণ্টের খরচ বাবদ দিতে হল।

এবার গৌরীশংকর মুনসিফ কোর্টের আশ্রয় নিলেন। তাঁর দাবী মিউনিসিপ্যালিটী তাঁকে তিন টাকা তের আনা তিন পয়সা ফেরত দিক। ১৮৮৩ সনের জানুয়ারি মাসে মুনসিফ হরেকৃষ্ণ চ্যাটার্জী এ মামলা তাঁর অধিকার বহির্ভূত বলে খারিজ করে দিলেন।

এই সময়ে পসি স্বদেশ যাবার জন্য কুড়ি মাসের ছুটি নিলেন। যে দিন কেস খারিজ হল সেদিন সন্ধ্যায় পসির জন্য বিদায়ী সভা হল। বিহারীলাল পণ্ডিতের দোতলা বাড়িতে নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করলেন মধুসূদন দাস। কমিশনার স্মিথ, জেলা জজ ও ওর্গান, নতুন কালেক্টর জোনস্ তথা শহরের গণ্যমান্য ও ভদ্রব্যক্তি এই নৈশভোজে যোগ দিলেন। শেষে মধুসূদন দাস পসির গুণগান করে বক্তৃতা দিলেন এবং পসি তার উত্তর দিলেন। সাহেবরা জলি গুড ফেলো গান করল, ব্যাণ্ড ওল্ড্ সাইন বাজানোর সময় সকলে দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত ধরে এক সঙ্গে তাল দিল। এবার সকলে বারান্দায় গিয়ে বাজী পোড়ান দেখল। এই অবসরে বৈঠকখানা থেকে

চেয়ার সরিয়ে মজলিশের বন্দোবস্ত হল। সাহেবরা ও দেশীয় লোক মিলে মিশে বসল। গোটিপুত্ত নাচের পরে বাঈজীর নাচ হল। রাত্রি দুইটায় মজলিশ শেষ হল। পরের দিন ৩০ শে জানুয়ারি জোব্রা ঘাট থেকে পসি জাহাজে উঠলেন। তাঁকে বিদায় দিতে অনেক লোক এসেছিল, অনেকের চোখ ছলছল করছিল।

বলা বাহুল্য বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে গৌরীশংকরও এই অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন। পসির বিদায় উপলক্ষে তিনি উৎকল দীপিকায় লিখলেন :

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছি সাহেবকে নিরাপদে বিলাতে পৌঁছে দিন। সেখানকার জলবায়ুতে তাঁর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হোক এবং তিনি পুনরায় এখান ফিরে উত্তরোত্তর উন্নতি করুন। তাতেই আমাদের আনন্দ।

এবার গৌরীশংকর মুনসিফের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের কোর্টে আপীল করলেন। তার উকিল বিপিন বিহারী মিত্র ও যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র। সরকারী পক্ষে হরিবল্লভ বসু এবং ব্যারিষ্টার উইলকিন্স। এই আপীলের সঙ্গে সঙ্গে মুনসিফ কোর্টে আরও একটি আবেদন করলেন পরবর্তী কালে তার থেকে যে সাত টাকা দু আনা আদায় করা হয়েছে তাও ফেরত পাবার দাবী করে। এবার তিনি কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণও দাবী করলেন।

জেলা জজ ৯ই আগষ্ট রায় দিলেন। তিনি মুনসিফের রায় ভ্রমাত্মক ঘোষণা করে আদেশ দিলেন গৌরীশংকরকে তাঁর দাবী মোতাবেক অর্থ ফেরত দিতে হবে। কেস লড়তে তাঁর যা খরচ হয়েছে তাও তিনি পাবেন।

কেস জিতে গৌরীশংকর মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকলাপের সমালোচনা করে বাংকবাজারের জনৈক নিবাসীর নামে একখানি পত্র ছাপালেন :

মিউনিসিপ্যালিটী আমাদের থেকে অগ্রিম কর আদায় করে। যে না দিতে পারে তার বাসনকোসন জামাকাপড় নীলাম করে পয়সা উসুল করে। কেউ তার প্রতিবাদ করে না এই ভেবে যে সংগৃহীত অর্থ জনহিতে খরচ হবে। এই অর্থ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ হয়, রাস্তার পাশে নালা তৈরী হয়। লণ্ডন থেকে লণ্ঠন এনে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা হয়েছে কিছুদিন আগে। আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় এবং তা ফেলার জন্য গাড়ি কেনা হয়।

সকাল থেকে মেথরদের জঞ্জাল এদিক থেকে সেদিক, সেদিক থেকে এদিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফল হয় বিপরীত। মাসের কুড়ি দিন ময়লার গাড়িগুলি আমাদের বাড়ির কাছে খালি করে চলে যায়। গাড়ির আওয়াজ শুনে বাইরে এলে দেখা যায় গাড়িগুলি মুখব্যাদান করে কর্দমাক্ত ময়লা উদ্‌গীরণ করছে। আপত্তি করলে মেথররা কান দেয় না, গাড়ি খালি করে সহর্ষে চলে যায়। ময়লা জল ঘরে ঢুকতে বাকি থাকে। পোকা মাকড় ভরে গেছে। দুর্গন্ধে নাক বন্ধ হয়ে যায়। ইত্যাদি।

এর কিছুদিন পরে মুনসিফ হরেকৃষ্ণ চ্যাটার্জী গৌরীশংকরের মামলার রায় দিলেন। এবার রায় বাদীর পক্ষে। আদেশে মুনসিফ লিখলেন :

আমার মতে প্রতিবাদীর কুটিল ও ত্রুটিপূর্ণ কাজে গৌরীশংকরের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণের হকদার। তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং নিজের দাবী হাসিল করার জন্য তাঁকে যে মনস্তাপ ভোগ করতে হয়েছে তার জন্য সামান্য ক্ষতিপূরণ তিনি দাবী করেছেন তাঁকে তা দিতে হবে। তাঁর দাবী খরচের সঙ্গে ডিক্রি করা হল। আজ থেকে সমস্ত রাশির উপর ছয় প্রতিশত সুদ সমেত তিনি পাবেন।

পুরী : সেপ্টেম্বর ১৮৮৩

রাণী সূর্যমণি জগন্নাথ জেনমণিকে রাজা ঘোষণা করলেন এবং জেলা জজের আদেশ বলে তার অভিভাবক হলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট গ্রাণ্ট এসব মানতে রাজী নন। তিনি কমিশনারকে লিখলেন দিব্যসিংহের জীবনকালে তার সম্পত্তি আর কেউ পেতে পারে না। তাছাড়া দিব্যসিংহকে যখন মহারাজা উপাধি দেওয়া হয়নি তার ছেলেকে রাজা মানা যায় না। সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করার অধিকার দিব্যসিংহের আছে—মুকুন্দের নয়।

সরকার সিদ্ধান্ত করল দিব্যসিংহ বেঁচে থাকতে অন্য কেউ রাজা হতে পারে না, তথাপি দিব্যসিংহ দ্বীপান্তরে আছে বলে তার পরিবারের অন্য কেউ যদি রাজা হতে চায় তবে আবেদন করতে পারে। ইতিমধ্যে গ্রাণ্টের স্থানে কে. জি. গুপ্ত কালেক্টর হয়েছেন। তিনি সূর্যমণিকে খবর দিলেন যে তিনি যদি এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখতে চান তবে লিখে দিন। উত্তরে সূর্যমণি এক দীর্ঘ দরখাস্ত পেশ করলেন :

> দরখাস্ত শ্রীমত্যা রাণী সূর্য পাটমহাদেবী, রাজপ্রাসাদ কুণ্ঠাইবেন্টপাড়া পুরী, এই যে আমার পৌত্রের রাজপদ ও মুকুন্দদেব নাথ মহামান্য সরকারকে মঞ্জুরীর জন্য আবেদন করেছি বলে শ্রীহুজুর তার ২৬শে জুনের পরোয়ানা দ্বারা সাক্ষ্য প্রমাণ দেবার জন্য নোটিশ জারী করেছেন। উক্ত রাজপদ ও মুকুন্দদেব নাম সম্বন্ধে আমার কাছে যে আবশ্যক প্রমাণ আছে সেগুলি নিম্নলিখিত মতে উপস্থাপন করছি; বিচার করা হোক।
>
> ১) আমাদের বংশীয় রাজাগণ ওড়িশার গজপতি সিংহাসনারূঢ় ভোই বংশ নামে সুবিখ্যাত। ওড়িশার ইতিহাসে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে এবং এর সহিত সম্বলিত কৃষি নামা থেকে জানা যাবে। উক্ত ভোই বংশের আদি পুরুষ শ্রীরাজা রামচন্দ্র দেব ১৫০৩ শকাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। ১৫০৩ থেকে ১৭৩৬ শকাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ইংরেজ বাহাদুরের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত উক্ত ভোই বংশের রাজাগণ খুর্দাতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। তাঁরার জনসাধারণের কাছে মহারাজা নামে পরিচিত থেকে নিজ নিজ নামে অংক কাটিয়েছিলেন। তারপরে ১৭৩৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ

আমার পুত্র দিব্যসিংহের দ্বীপান্তর পর্যন্ত যদিও সরকার চিঠিপত্রে কখনও মহারাজা কখনও রাজা বলে উল্লেখ করেছেন তথাপি আমার বংশের রাজাদের জনসাধারণ মহারাজা বলে সম্বোধন করে এসেছে এবং এখনও করে। এতদ্ব্যতীত এদেশের লোকের নানা প্রকার দলিল দস্তাবেজে ওড়িশার মহারাজার পদ ও তাদের উল্লেখ হত এবং এখনও হয়। সুতরাং বহুকাল থেকে আমাদের পুরুষানুক্রমে মহারাজা পদ প্রচলিত ছিল এবং ইংরেজ শাসনের সময় কখনও মহারাজা কখনও রাজা বলে কাগজপত্রে লেখা হয় এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর প্রমাণ প্রাচীন মাদলা পঞ্জিকা ও দেশীয় পঞ্জিকায় পাওয়া যাবে। সাটন সাহেব, হাণ্টার সাহেব প্যারীমোহন আচার্য ও শিবচন্দ্র সোমের রচিত ওড়িশার ইতিহাস, রেজিষ্ট্রী সেরেস্তার পুরাতন দলিল দস্তাবেজের নকল, জেলার বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং এখন আমি যে সরকারী চিঠি ও কাগজপত্রের নকল সংলগ্ন করছি তার থেকে এ তথ্য স্পষ্ট হবে। এ সকল নথীপত্রে এ বংশের রাজাদের মহারাজা অথবা রাজা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ২০শে জুন ১৮৫৯ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সার্কুলার অনুসারে এ জেলার শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব এ জেলার উপাধিধারী ব্যক্তিদের যে তালিকা কমিশনার সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন এবং যার নকল শ্রী হুজুরের অফিসে পাওয়া যাবে সে তালিকা দেখলে শ্রীহুজুর সব বুঝতে পারবেন।

২) ১৬ই জুলাই ১৮৭৭ সালের শ্রীযুক্ত কালেক্টরের ৫৭৭ নম্বর পরোয়ানা থেকে প্রকাশ যে আমার পুত্র দিব্যসিংহকে সরকার যে মহারাজা উপাধি দিতে চেয়েছিলেন সেটি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। ধর্মাবতার, যারা রাজা তারাই মহারাজা খেতাব পায়। পূর্বে যারা রাজা ছিলেন না তাঁদের মহারাজা উপাধি দেবার প্রথা নেই। এ বংশ যদি রাজবংশ না হত তাহলে মহারাজা উপাধি দেবার প্রস্তাব কি করে সম্ভব হত তা শ্রীহুজুর চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন।

৩) এ জেলার শাসন ও বত্রিশ পরগণার ব্রাহ্মণগণ পুষ্য পূর্ণিমা ও গম্মা পূর্ণিমার দিন রাজবাড়ি এসে রাজাকে সুবর্ণ উপবীত প্রদান করে শাস্ত্র অনুসারে রাজ আশীর্বাদ ও রাজ্যাভিষেক বিধিগুলি পালন করেন। আমাদের পরিবার রাজপরিবার না হলে পূজকগণ এমন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করতেন না।

৪) আমাদের বংশের রাজাগণ পূর্বতন চতুর্থ পুরুষের নাম গ্রহণ করে থাকেন; তার প্রমাণ মঙ্গল পঞ্জিকা, কৃষিনামা ও অন্যান্য পুরাতন পঞ্জিকাগুলি থেকে জানা যাবে। তার কিছু নমুনা সংলগ্ন করছি। সেই রীতি অনুসারে পৌত্রের নাম রেখেছি শ্রীমুকুন্দদেব।

৫) শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে শ্রীশ্রী জগন্নাথের কিছু সেবাপূজা আমাদের বংশজ রাজাদের অথবা তার অনুপস্থিতিতে মুদিরথ নামক প্রতিনিধির দ্বারা সম্পন্ন হয়। রাজগদি খালি থাকলে মুদিরথের মনোনয়ন সম্ভব নয় এবং এরকম পরিস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজায় বাধা হতে পারে এবং তদ্দ্বারা ধর্মহানি হতে পারে ভেবে আমার পৌত্রকে মুকুন্দদেব নাম দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়েছি। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ মিলবে নীলাদ্রীমহোদয় নামক পুস্তকে যেটি নারদীয় পঞ্চরাত্র, সুত-সংহিতা এবং রাম সংহিতা ইত্যাদি স্মৃতিগুলি থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

৬) শ্রীহুজুর যদি ইচ্ছা করেন তবে রাজপদে এ বংশের দাবী এবং রাজাদের শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবাপূজায় সহিত সম্পর্ক এবং মুদিরথ নামক সেবকের রাজার দ্বারা

মনোনীত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য মন্দিরের সেবক পূজারী প্রধান প্রধান সন্ত মহান্ত পণ্ডিত ও দেশীয় রাজাদের উপস্থিত করাতে পারি।

৭) ধর্মাবতার, আমার পৌত্রকে মুকুন্দদেব নাম দিয়ে গদীনাসীন করিয়ে সরকারের কোনও আইন বা আদেশ উল্লঙ্ঘন করি নাই। কেবল কৌলিক প্রথা ও ধর্মরক্ষার জন্য এ কাজ করেছি। যদি সরকার এ ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করেন তবে আমাদের লোকচক্ষুতে হেয় করা হবে। এবং ধর্মানুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটবে। সুতরাং শ্রীশ্রী হুজুরের কাছে নিবেদন করছি যে উপরোক্ত প্রমাণ বিচার করে সরকারকে শ্রীমুকুন্দদেব নাম ও পদ কায়েম করার সুপারিশ করবেন।

১২ই জুলাই ১৮৮৩ সন, মিথুন ৩০ ১২৯০ শকাব্দ।

৩০শে সূর্যমণি আর একখানি আর্জি পেশ করলেন। তিনি জানালেন যে রাজা দিব্যসিংহ যদি দ্বীপান্তর থেকে ফিরে আসেন তাঁকে মন্দিরের সেবাপূজা করতে দেওয়া হবে না, কারণ, তিনি ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বাস করেছেন এবং তাদের সঙ্গে ভোজন করেছেন। এর এক নজীর মিলবে রামচন্দ্র দেবের জীবনীতে। তিনি ১৭১৭ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি একজন নবাবের কন্যার সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে তার মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। এবং তাঁকে গদীচ্যুত করে তার নাতি ভাগীরথীকে রাজা করা হয়েছিল। আর্জির সঙ্গে সূর্যমণি যে সকল পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শংকর দামোদর তীর্থস্বামী, পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র, ত্রিবেদী দীনদয়াল ব্রহ্মচারী। তাঁদের মতে দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এলেও তিনি মন্দিরে সেবাপূজার অধিকার পাবেন না।

সব কিছু বিচার করে কে. জি. গুপ্ত সরকারকে রিপোর্ট দিলেন যে প্রথা অনুসারে মন্দিরে সেবাপূজা করার জন্য একজন রাজা থাকা প্রয়োজন। এ কারণে মুকুন্দকে রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দিলে সরকার উদারতার পরিচয় দেবেন এবং জনসাধারণ খুশী হবে।

এই সময়ে সূর্যমণির সামনে আর একটি ছোট সমস্যার উদ্ভব হল। পুরীর রাজা বাৎসরিক ২৫০০ টাকা পেনশন পেতেন। তা থেকে পদ্মনাভ রায় পেতেন ১১৫ টাকা। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে ঝামেলা হল। পদ্মনাভের দুই স্ত্রী, শ্রীমতী ও চন্দ্রমণি। সূর্যমণি দুজনকে মাত্র ১৫ টাকা দিলেন। প্রতিবাদ করে তাঁরা কালেক্টরের কাছে আবেদন করলেন। কালেক্টর আদেশ দিলেন শ্রীমতী ও তাঁর দুই পুত্র পাবেন মাসিক ৭০ টাকা এবং চন্দ্রমণি পাবেন ৪০ টাকা। সূর্যমণি দরখাস্ত করলেন যে দুটির মধ্যে একটি ভাগীরথী শ্রীমতীর পুত্র নয়, সে পদ্মনাভের জারজ সন্তান। কমিশনারের কাছে মামলা এলে কমিশনার ফয়সালা করলেন যে যতক্ষণ না ভাগীরথী জারজ প্রমাণিত হয় ততদিন কালেক্টরের আদেশ বলবৎ থাকবে। এও আদেশ দিলেন যে সূর্যমণি যদি আদেশ অনুসারে বিধবাদের অর্থ না দেন তবে কালেক্টর রাজার পেনশন থেকে এ টাকা কেটে তাদের দেবেন।

আদেশ পেয়ে চুপ রইলেন। তাঁর সামনে বড় সমস্যা মুকুন্দের রাজগদির উপর দাবী পাকা করা।

ঢেঙ্কানল : সেপ্টেম্বর ১৮৮৩

ফকীরমোহন ছ বছরের অধিককাল ঢেঙ্কানলে আছেন। অন্য কোনও জায়গায় তিনি এত সময় কাজ করেন নি। সময় অবশ্য খুব ভাল কাটেনি। শরীরও ভাল থাকছে না আজকাল। এর প্রধান কারণ মদে আসক্তি। তিনি যখন প্রথম ঢেঙ্কানল আসেন তখন প্রথম বন্ধুত্ব হয় ম্যানেজার বনমালী সিংহ, রাজশিক্ষক প্যারীমোহন সেন ও এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন বিজয় চক্রবর্তীর সঙ্গে। প্যারীমোহন সুরাপান করেন না। বনমালী পরিমিত পান করেন, একমাত্র বিজয় চক্রবর্তী পাকা মদ্যপ। তিনি যেখানে যান মদের বোতল তাঁর সঙ্গে যায়। সেকালের ঢেঙ্কানলের সকলে একটু আধটু পান করত। এমনকি বেড়ালছানা এবং ভক্ত মহাদেবও বাদ যায় না। ঘরে ঘরে সুরাপান চলে। চাকররা বাজার করার সময় বাড়ির সকল পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা মদের বোতল কিনে আনে। শহরের স্থানে স্থানে দেশী মদের দোকান আছে এবং ভদ্রলোকেরা সেখানে আড্ডা দেয়।

ফকীরমোহন ঢেঙ্কানলের চাকরিতে যোগ দেবার কিছুদিন পরে অনুগুলের তহশীলদার বিছন্দ পট্টনায়ক তাকে খবর পাঠালেন যে তিনি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ঢেঙ্কানলের রাস্তায় নিজের গ্রামে যাবেন। ফকীরমোহন বিছন্দের অভ্যর্থনার ব্যবস্থায় মন দিলেন। ব্রাহ্মণীকূলে বউলপুর মৌজার আমবাগানে সামিয়ানা টানিয়ে ভোজের ব্যবস্থা হল। বনমালী, প্যারীমোহন ও বিজয়কে নিয়ে হাতি চড়ে সকাল নটায় ফকীরমোহন আমবাগানে এলেন। কিছুক্ষণ পরে বিছন্দের নৌকা কূলে ভিড়ল। মদের পেটী নিয়ে বিছন্দ নামলেন। সকলে হাত পা ধুয়ে মদ্যপানে রত হলেন। বিছন্দের সঙ্গে আছে এক নম্বর বিলাতী ব্রাণ্ডি। এক বোতল খোলা হল। সকলের গ্লাসে ঢেলে ফকীরমোহন মেশানোর জন্য জলের গ্লাস হাতে নিয়েছেন দেখে বিছন্দ বলল, 'এতদিন পরে আমরা মিলিত হয়েছি, আজ আর ভেজাল নয় শুদ্ধই পেটে যাক।'

অল্প খেয়ে বনমালী উঠে গেলেন কিন্তু অন্য তিনজন চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ না খাওয়ার ডাক এল। কয়েকটি বোতল খালি হয়ে গেল। প্রায় তিনটায় খাওয়া শেষ হলে সকলে নৌকায় কয়েক মাইল গেলেন এবং রাত্রের জন্য ক্যাম্প করলেন। রাত্রে আবার মদের আসর বসল। অত্যধিক মদ্যপানের জন্য ফকিরমোহন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে বিছন্দ বিদায় নিলে সঙ্গীদের নিয়ে ফকীরমোহন ঢেঙ্কানলে ফিরে এলেন।

সেইদিন থেকে ফকীরমোহনের শরীর ভাল যাচ্ছে না। শিরঃপীড়া, অজীর্ণ, অনিদ্রা, অর্শরোগ আগেই ছিল। এখন ঔষধের অছিলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় দু তোলা দেশী মদ খেতে আরম্ভ করলেন। স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হল এবং তিনি প্রায় শয্যাশ্রয়ী হয়ে পড়লেন। গরীবদের জন্য নানাপ্রকার কবিরাজী ঔষধ তৈরী করতেন তিনি যথা, তৈলপাক, ধাতুজারণ, কস্তুরী, মকরধ্বজ বটিকা ইত্যাদি। এখন সুঁড়ি ডাকিয়ে মৃতসঞ্জীবনী সুরা অর্থাৎ মদ তৈরী করালেন এবং প্রতিদিন নিজে খেতে লাগলেন।

শরীরের যখন এই অবস্থা তখন আর একটি দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটল। তাঁর একটি পুত্র জন্মের ছ মাসের মধ্যে মারা গেল। শোকে দুঃখে অল্পবয়স্কা দ্বিতীয়া স্ত্রী কৃষ্ণকুমারী শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ফকীরমোহন মহারাজার লাইব্রেরী থেকে বাল্মীকি রামায়ণ এনে ওড়িয়াতে অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে কৃষ্ণকুমারী রামায়ণে আকৃষ্ট হলেন এবং পুত্রশোকের লাঘব হল। সন্ধ্যা হতেই দুখানি আসন পেতে ফকীরমোহন এসে রামায়ণ পড়ে শোনাবার জন্য অপেক্ষা করেন। বালকাণ্ড শেষ হলে ফকীরমোহন সেটি ছাপিয়ে বিতরণ করলেন। এটি ১৮৮০ সালের কথা। যদিও বীমস ওড়িশা ছেড়ে গেছেন দুবছর হল, পুস্তিকাটি তাঁকে উৎসর্গ করলেন ফকীরমোহন। ছাপিয়েছিল কটক প্রিণ্টিং প্রেস। গৌরীশংকর দীপিকায় লিখলেন, ওড়িয়া ভাষায় রামায়ণের অভাব নেই, ফকীরমোহন আর কিছু লিখলে ভাল হত। ফকীরমোহন কিন্তু অনুবাদের কাজ চালু রাখলেন। অযোধ্যাকাণ্ড শেষ হবার সময় কৃষ্ণকুমারী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় তিনি দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম দিলেন।

এই সময় চাকরিক্ষেত্রে নানা রকম ঝামেলা শুরু হল। জন বীমস স্বল্পকাল কমিশনার থেকে পুনরায় কালেক্টর হয়ে গেলেন। তারপরে রেভেনশার বদলী হলে সকলে ভেবেছিল এবার বীমস নিয়মিত কমিশনার হবেন কিন্তু এলেন স্মিথ। এবং বীমস গেলেন চট্টগ্রাম। তিনি ছিলেন ফকীরমোহনের ভরসাস্থল। ফকীরমোহন অসহায় মনে করলেন নিজেকে। এর উপরে বীমস যাদের চাকরি দিয়েছিলেন তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন স্মিথ।

ফকীরমোহন রাধানাথ প্রমুখ আশা করেছিলেন বীমস ফিরে আসবেন। কিন্তু সে আশা ধূলিসাৎ হল যখন রাধানাথ তাঁর কাছ থেকে এই চিঠি পেলেন :

চট্টগ্রাম।

অক্টোবর ১০, ১৮৭৮

প্রিয় রাধানাথ,

ওড়িশা ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। আরও আঘাত পেলাম যখন শুনলাম রেভেনশার স্থানে আমাকে কমিশনার করা হয়নি। সার ইডেন যখন কটকে এসেছিলেন কে নাকি তাঁকে বলেছিলেন ওড়িশায় খুব অপ্রিয় আমি। সে কারণে হয়তো আমাকে কটকের

কমিশনার করা হয়নি। চট্টগ্রাম আমার মোটেই ভাল লাগেনি। এমন খারাপ জায়গায় আগে কাজ করিনি। শরীর সর্বদা খারাপ থাকে, সঙ্গী সাথি নেই। এখানে নিম্নশ্রেণীর বাঙালি মুসলমান বাস করে যারা বিশ্বাসের অযোগ্য এবং মামলাবাজ। ওড়িশার খবর আমি সব সময় নেব এবং সেখানে ফিরে যাবার চেষ্টা করব। হয়তো একদিন সফল হব। এখন আমার দেহ মন অসুস্থ। কোনও আশা দেখছি না। যদি ভগবানের দয়া হয় তবে তোমাকে এবং অন্যান্য বন্ধুদের আবার দেখব। তবে এখনকার মতো 'ভ্রষ্ট' বললে ঠিক হবে।

ওড়িশায় সকল বন্ধুকে আমার কথা বলবে।

তোমার বিশ্বস্ত
জন বীমস

বীমসের ১৮৭৯ সালের ২রা মের চিঠিটি আরও হতাশাজনক। তিনি জানিয়েছেন ওড়িশায় ফেরার আশা নেই। এমন কি চার বছর পরে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। পরিশেষে লিখেছেন :

ওড়িশায় যে সুসময় কাটিয়েছি তা ভেবে আনন্দ পাই। সেখানকার দয়ালু সুহৃদগণের কথা মনে পড়তে আনন্দে ভরে যায় মন। নিজে যে যশ লাভ করতে পারিনি তা যেন তোমার ভাগ্যে জোটে, এই কামনা করি।

বীমসের অনুগত ফকীরমোহনের প্রতি স্মিথের কোপদৃষ্টি তো ছিলই সমস্যা আরও ছিল। বীমসকে বলে একটি লোককে রাঁধুনের চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন ফকীরমোহন। পরে সে মোক্তার হয়েছিল। তার এক মক্কেলের আবেদন খারিজ করে দিলে সে শত্রুতা আরম্ভ করল। তাঁর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তার পেশকারও স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করল। সে ফকীরমোহনের রায়গুলি পরিবর্তন করে নিয়মিত অর্থাগমের উপায় করে নিলে। অর্থের প্রলোভন দেখালে সে সব কিছু করতে প্রস্তুত। ডিক্রি বদলে ডিসমিস লেখা এবং ডিসমিস কেটে ডিক্রি লেখা খুব কঠিন নয়। ফাইন কম বেশী করাও সহজ, তাকে অর্থ দিলে পাঁচ পঞ্চাশ হতে পারে এবং পঞ্চাশ, পাঁচ। এই পরিস্থিতিতে এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট নন্দকিশোর দাস ঢেঙ্কানল পরিদর্শনে এলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন প্রতি রেজিষ্টারে কাটাকুটি হয়েছে। ফকীরমোহন রাতারাতি নতুন রেজিষ্টার তৈরী করার চেষ্টা করলেন কিন্তু এতগুলি রেজিষ্টার বদলানো একার পক্ষে সম্ভব হল না। নন্দকিশোর সত্য লিখলে ফকীরমোহনের চাকরি যেত। কাটাকুটির কথা না লিখে তিনি লিখলেন ফকীরমোহনের সেরিস্তায় অনেকগুলি রেজিষ্টার নষ্ট হয়ে গেছে।

রিপোর্ট পেয়ে স্মিথ স্বয়ং ঢেঙ্কানলে এলেন। এবার আর রক্ষা নাই। রেজিষ্টারে যে কাটাকুটি আর কিছু না হলেও ফকীরমোহনের দক্ষতা প্রমাণ করে না। কোনও উপায় না পেয়ে ফকীরমোহন দুর্নীতির আশ্রয় নিলেন। পেশকারকে বলে ছাদের এক অংশ খুলে দিলেন এবং নথিগুলি ছিঁড়ে তার উপরে জল ঢেলে দিলেন। স্মিথ সব দেখলেন বুঝতে অসুবিধা হয় না কাগজপত্র নষ্ট করার প্রয়াস হয়েছে। কিন্তু কোনও

প্রমাণ নেই। সুতরাং আলমারী কেনার জন্য অর্থ মঞ্জুর করে কটক ফিরে গেলেন। যাবার সময় ফকীরমোহনকে ডেকে বললেন, 'বাবু, দেশীয় রাজ্য বলে এবার পার পেয়ে গেলে।'

এবার ঘুস নেবার অভিযোগ করে ফকীরমোহনের বিরুদ্ধে বেনামী চিঠি আসতে শুরু করল। নন্দকিশোর দাস অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিলেন যে এতে সত্যতা নেই, তিনি সৎ লোক। স্মিথের মন্তব্য : যে যাই বলুক, আমি লোকটিকে বিশ্বাস করি না।

শারীরিক অসুস্থতা এবং মানসিক দুশ্চিন্তার জন্য ছ মাসের ছুটি নিয়ে বালেশ্বর এলেন ফকীরমোহন। এবার বনমালী সিংহও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলেন। বউলপুর মৌজার একটি মামলায় ফকীরমোহন যে রায় দিয়েছিলেন তা নিয়ে তদন্ত হল। অভিযোগ হয়েছিল যে মামলার দুরকম রায় লেখা হয়েছে। বনমালী সিংহ রিপোর্ট দিলেন যে ফকীরমোহন শুনানী শেষ হবার অনেকদিন পরে রায় দেন এবং ঘটনাস্থলে না যেয়েও সরেজমিনে তদন্ত করেছেন বলে দাবী করেন। রিপোর্ট পেয়ে কমিশনার ফকিরমোহনের কৈফিয়ত তলব করলেন।

ফকীরমোহনের বয়স চল্লিশ বছর। তিনি শয্যাশায়ী। গুপ্তভাবে নন্দকিশোর তাঁকে ইস্তফা দিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি তাই করলেন, ঢেঙ্কানলে আর ফিরলেন না।

পুরী : আগষ্ট ১৮৮৪

নাবালক মুকুন্দদেবকে রাজা মানা হবে কিনা সে সংক্রান্ত কালেক্টর রিপোর্ট কমিশনার সরকারকে পাঠিয়ে দিলেন। ছোটলাট ভারত সরকারকে লিখলেন বংশানুক্রমে রাজা হবার অধিকার মুকুন্দের আছে কি নেই তা বিচার করার দরকার নেই। তাকে রাজা মেনে নিলে ভাল হবে। ভারত সরকার কালেক্টর ও কমিশনারের সঙ্গে একমত হল যে মুকুন্দদেবকে রাজা বলে স্বীকার করে নিলে উদারতার পরিচয় দেওয়া হবে এবং ওড়িশাবাসী খুশি হবে।

১৮৮৫ সালের এপ্রিল মাসে কমিশনার একখানি দলিল পেলেন :

সনন্দ

সিমলা, ২৯শে মার্চ, ১৮৮৪।

প্রাপ্তি : জগন্নাথ জেনামণি, পুরী

আমি আপনাকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের জন্য রাজা উপাধি প্রদান করছি।

রিপন

ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল।

সরকার কমিশনারকে নির্দেশ দিল যে সনদটি মুকুন্দকে দেওয়া হোক। আর

জানতে চাইল তাকে এখন খিলাত দেওয়া উচিত হবে কিনা। সূর্যমণিকে জানানো হল যে মুকুন্দকে রাজা স্বীকার করে সনদ দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। সে এসে নজরানা দিয়ে সনদ নিয়ে যেতে পারে। ততদিনে কে. জি. গুপ্ত চলে গেছেন এবং এফ্ জোনস এসেছেন কালেক্টর হয়ে। তাঁকে নিম্নলিখিত উত্তর দিলেন সূর্যমণি :

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত এফ্ জোনস সাহেব,
ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর, পুরী।
মহাশয়,

চলিত বর্ষের মে মাসের ১৫ তারিখে লেখা আপনার পত্র পেয়ে অত্যন্ত আনন্দের সহিত অবগত হলাম যে শ্রীযুক্ত মহামান্য ভারত সরকার অনুগ্রহপূর্বক আমার নাতিকে তার আত্মগৌরব স্বরূপ রাজপদ প্রদান করার অনুমোদন করেছেন। তার জন্য মহামান্য সরকারকে নজরানা স্বরূপ কত টাকা দিতে ইচ্ছুক তা শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেব জানতে চেয়েছেন। তদুত্তরে জানাচ্ছি যে আমি আমার নাতির রাজপদ প্রাপ্তি উপলক্ষে আমাদের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এক হাজার পাঁচ টাকার সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা মাহামান্য সরকারকে দিতে প্রস্তুত।

আমি শুনতে পেয়েছি মহামান্য সরকার অনুগ্রহপূর্বক আমার নাতিকে রাজপদ দিতে স্বীকৃত হয়ে কটকে দরবার করতে চান। এবং কমিশনার সাহেব এই নাবালকের হাতে সনদটি দিতে চান। আমার নাতি মাত্র সাত বছরের বালক, এখনও হাকিমদের সাক্ষাতের উপযুক্ত হয় নাই। সুতরাং আমার নাবালক নাতিকে দরবারে হাজির হতে না বলে যদি সম্ভব হয় তবে সনদটি এখানে কালেক্টরের বাংলোতে শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেব অথবা শ্রীহজুরের হস্তে প্রদান করতে আজ্ঞা হোক। ইতি, জুন ১০, ১৮৮৪।

শ্রীসূর্যমণি পাটমহাদেবী।

শেষ পর্যন্ত সনদটি পুরী এল। মোক্তারের সঙ্গে গিয়ে কাগজের টুকরোটি নিয়ে এল মুকুন্দ।

এভাবে দাবী প্রতিষ্ঠিত করে অন্যদিকে মন দিলেন সূর্যমণি। তিনি সিভিলকোর্টে আবেদন করলেন যে পদ্মনাভের পরিবারকে রাজার পেনশান থেকে কেটে যে অর্থ দেওয়া হয় তার আর না দেওয়া হোক এবং এতদিন যা দেওয়া হয়েছে তা তাঁকে ফেরত দেওয়া হোক।

দাশপাল্লা : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪

প্রায় দেড় বছর আগে ঢেঙ্কানল ছেড়ে এসেছেন ফকীরমোহন। এখনও অন্য চাকরি পাননি। রামায়ণের যে অনুবাদ শুরু করেছিলেন তার সাত কাণ্ড শেষ করেছেন। যে কাণ্ডগুলি ছাপা হয়নি বৈকুণ্ঠনাথ দে সেগুলি ছাপাতে রাজী হলেন। তাঁর পিতা

শ্যামানন্দ দে ফকীরমোহনকে এই রামায়ণের জন্য সাড়ে সাতশ টাকা দিলেন। এ টাকায় তিনি ঋণ পরিশোধ করলেন। ততদিনে স্মিথ বিদায় নিয়েছেন। ফকীরমোহন কটক গিয়ে নন্দকিশোর দাসের আশ্রয় নিলেন। ভাগ্যক্রমে দাশপাল্লার দেওয়ানের পদ খালি ছিল। নন্দকিশোর ফকীরমোহনকে এই চাকরিটি পাইয়ে দিলেন।

সঙ্গে একজন চাকর নিয়ে মহানদীর গড়গড়িয়া ঘাট থেকে নৌকাযোগে দাশপাল্লা যাত্রা করলেন ফকীরমোহন। ন'দিন পরে নৌকা বেলপাড়ায় ভিড়ল। ততদিনে তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন। নৌকাটি ছোট। তার আরও ঘুপচি ছাউনির মধ্যে ন'দিন কাটানো কষ্টকর। বেলপাড়া পৌঁছাবার একদিন আগে ঝড় তুফানের মধ্যে নৌকাটি একটি পাথরে আটকে গেল। সেদিন অনাহারে গেল। বেলপাড়ায় নৌকা থেকে নামার শক্তিটুকুও নেই। কিন্তু যে লোকরা তাকে নিতে এসেছিল তাদের দেখিয়ে তিনি নৌকা থেকে লাফ দিলেন। দুর্ভাগ্য যে কূলে না পৌঁছে চিৎপাৎ হয়ে পড়লেন কাদায়।

লোকে ধরাধরি করে উঠালো তাঁকে। খাইয়ে দাইয়ে পাল্কিতে বসিয়ে দিল। রাত্রের আগে ফকীরমোহন মধুবন পৌঁছাতে পারলেন না। চার মাইল দূলে এক গ্রামে রাত্রিযাপন করলেন। পরের দিন সকালে তিনি গড়ে পৌঁছলেন। তাঁর জন্য একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে এবং রাজবাড়ি থেকে আসবাবপত্র এনে এটিকে বাসযোগ্য করে রাখা হয়েছে। দেশীয় রাজ্যে অতিথি হলে খাদ্যদ্রব্য দাঁতন ইত্যাদি পাঠানোর রীতি ছিল। হাত মুখ ধুয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ফকীরমোহন।

দাশপাল্লার রাজা শ্রীচৈতন্যদেও ভঞ্জ দীর্ঘকায় সবল আবক্ষলম্বিত দাড়িধারী অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। বীমসের সময় একটি বড় ঝামেলায় পড়েছিলেন। একজন প্রজার স্ত্রীকে অপহরণ করে রাজবাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। লোকটি আপত্তি করলে তাকে বহিষ্কারের আদেশ দিলেন। রাজার লোকেরা তার ঘরবাড়ি দখল করে নিল।

লোকটি অনাহারে অসহায়ের মতো জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিছু লোক তাকে পরামর্শ দিল একটু হিম্মত করে রাজার কাছে যাও, বল তোমার স্ত্রী ও জমিবাড়ি ফেরত দিন। সে তাই করল। রাজার সিপাহীরা তাকে বেঁধে বেদম প্রহার করল। লোহা গরম করে তার গায়ে ছেঁকা দিয়ে দিল। সে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলে নিয়ে নদীকূলে ফেলে এল। রাত্রে তার বন্ধুরা তাকে কটকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করল এবং বীমসের কাছে নালিশ করল।

বীমস প্রথমে ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেননি কিন্তু পরে যখন লোকটি হাসপাতাল থেকে এসে তার ক্ষত দেখাল তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ দিলেন রাজাকে গদিচ্যুত করা হবে। এস্. পি. এই আদেশ নিয়ে দাশপাল্লা এলেন। প্রথমে রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন না। পরে যখন দেখা করলেন তখন বললেন, 'লোকটি মিথ্যা বলেছে, আমি কটক গিয়ে কমিশনার সাহেবকে সব বুঝিয়ে বলব।'

চৈতন্যদেও কটক এলে বীমস তার বিচার করলেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী থেকে

রাজা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কুকীর্তি পরিষ্কার হয়ে গেল। এও জানা গেল যে রাজা দুরাচারী ও দুশ্চরিত্র। বীমস কটকে রাজাকে নজরবন্দী করে একজন দেওয়ানকে দাশপাল্লায় পাঠালেন। তিনি সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেন রাজাকে গদিচ্যুত করা হোক এবং তার পুত্র সাবালক না হওয়া পর্যন্ত একজন ইংরেজ অফিসার দাশপাল্লার শাসন চালাবেন।

এ কথা জানতে পেরে চৈতন্যদেব বীমসের বাংলোতে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। এই কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় দশাসই বদখত চেহারার লোকটি ভয়ে কুঁকড়ে গেছে এবং আরও কুৎসিৎ দেখাচ্ছে। সে মাথার পাগড়ী খুলে বীমসের পায়ের কাছে মাথা রাখার জন্য পা ধরে টানাটানি করতে লাগল। সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। বীমসের চাকররা তাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল। রাজা ভীষণ ভয় পেয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে দাশপাল্লা ফিরে স্ত্রীলোকটিকে তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিল, লোকটিকে প্রচুর অর্থ দিয়ে মানিয়ে নিল এবং নিষ্কর জমি দিল। সরকার বীমসের সঙ্গে একমত হলেও একজন দেশীয় রাজাকে এভাবে গদিচ্যুত করা ঠিক হবে কিনা স্থির করতে পারলেন না। রেভেনশা কলকাতায় ছুটি কাটাচ্ছিলেন। তাঁর মত চাওয়া হল। তিনি মত প্রকাশ করলেন যে রাজাকে এভাবে গদিচ্যুত করা ঠিক হবে না। শেষে স্থির হল চৈতন্যদেও রাজা থাকবেন বটে কিন্তু শাসনভার থাকবে বীমস নিযুক্ত দেওয়ানের হাতে।

ফকীরমোহন এসব জানতেন। এও জানতেন যে আজ পর্যন্ত কোনও দেওয়ান রাজার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে পারেনি। অনেক দেওয়ান এসেছেন এবং অল্পদিন থেকে চলে গেছেন। নন্দকিশোর দাস ফকীরমোহনকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর চাকরির বিশেষ প্রয়োজন ছিল, ভাবলেন রাজাকে কোনও ক্রমে মানিয়ে নেবেন।

রাজবাড়ি গিয়ে দেখলেন রাজা সপারিষদ তাঁর প্রতীক্ষা করছেন। রাজা একটি গদির উপরে উপবিষ্ট, একটি পাশবালিশ দুহাতে ধরে আছেন এবং তাঁকে ঘিরে আছে অন্যরা। রাজার পিছনে চাকররা দাঁড়িয়ে। নতুন দেওয়ানকে দেখবার জন্য গ্রাম থেকেও অনেক লোক এসেছে। রাজার ডানদিকে ফকীরমোহনের জন্য আসন পাতা। রাজাকে নমস্কার করে তিনি বসলেন। রাজা নীরবে ফকীরমোহনের আপাদমস্তক কয়েকবার ভাল করে দেখে মাথার পিছনে হাত নিয়ে কি সব ইঙ্গিত করলেন তাঁর লোকদের। বেশ কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ রাজার মুখ খুলল, বললেন, 'হাঁ হে দিওয়ানবাবু ভাতের সঙ্গে কত ঘি খাও?' ফকীরমোহন বললেন, 'কত আর, এই এক তোলা মতো হবে!' রাজা নিজের লোকদের দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন, বললেন, 'এত কমে কি করে হবে, রোজ অন্তত আধ সের ঘি খাবে। ভাণ্ডারী, দেওয়ান বাবুর বাড়ি রোজ দু সের ঘি পাঠাবে। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'দেওয়ানবাবু, ভাবছ আমি মূর্খ? আমি শ্রীছামু লিখতে পারি, দেখবে?' তৎক্ষণাৎ অভ্যস্ত দপ্তরী তার সামনে দোয়াত কলম, কাগজ এনে রাখল। রাজা অনেক কসরত করে কি সব

লিখলেন। দু পৃষ্ঠা লিখে কাগজখানি তুলে ধরে বললেন সকলে দেখ ছামু কি সুন্দর লিখতে আজ্ঞা করেছেন। আমার দাদু কি এমন লিখতে পারতেন? পারিষদগণ এক স্বরে বলল, না, মহাপ্রভু, কখনও না। এবার রাজা বললেন, নুয়াগড়ের রাজা, খণ্ডপাড়ার রাজা কি আমার মত লিখতে পারে? জবাবের অপেক্ষা করলেন না, অঙ্গুলি সঞ্চালন করে বললেন, 'না বাবা, না।'

এবার কাগজখানি ফকীরমোহনের দিকে বাড়িয়ে দিলে তিনি দেখলেন দু পাতা ভরা একই কথা বার বার লেখা হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেব ভঞ্জ, রাজা, দাশপাল্লাগড়।

এভাবে রাজার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। রাজার সম্পর্কে তাঁর ধারণা :

রাজা ভাবে সে সবথেকে সুদর্শন, গুণবান ও ধনবান। তার মতে যে যত স্থূলকায় সে তত সুপুরুষ ও বিদ্বান। সেই জন্য সে ক্ষীণকায় ফকীরমোহনকে ঘি-এর মাত্রা বাড়াতে বলেছে। তার বর্ণপরিচয় হয়নি কোনও ক্রমে নিজের নামটি লিখতে শিখেছে। বার বার অভ্যাস করে এখন মোটামুটি সহজভাবে শ্রীচৈতন্যদেও ভঞ্জ লিখতে পারে। ফকীরমোহন এর সঙ্গে বেশীদিন কাজ করা সম্ভব হবে না।

কটক : সেপ্টেম্বর ১৮৮৫

রাধানাথ এখন ওড়িশার শিক্ষাবিভাগের হর্তাকর্তা। সমাজে তাঁর বিশেষ স্থান। কয়েক বছর হল কিছুলোক অবশ্য তাঁর দুর্নাম রটাচ্ছে। এদের অগ্রণী কটকের দীননাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজেকে ওড়িশার বিবেক রক্ষক মনে করেন। কোনও অন্যায় দেখলে তিনি প্রতিবাদ করেন। দীপিকা ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় প্রায়ই তাঁর সমালোচনামূলক লেখা দেখা যায়।

২৫শে অক্টোবর ১৮৮০, দীপিকাতে একখানি পত্র লিখে তিনি রাধানাথের সমালোচনা শুরু করেন। তার যুক্তি ওড়িয়া ভাষায় একখানি সাহিত্যপুস্তক লেখার জন্য ৩০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। ছ মাসের মধ্যে পুস্তকখানি কমিশনারের অফিসে জমা দেবার কথা। রাধানাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু মধুসূদন রাও প্রবন্ধমালার জন্য পুরস্কার পেলেন। দীননাথের বক্তব্য মধুসূদন রাও আগেই খবর পেয়েছিলেন, সুতরাং তিনি ছ' মাসের মধ্যে পুস্তক জমা করতে পারলেন, যা আর কেউ করতে পারল না। তাছাড়া প্রবন্ধমালা পাঁচ বছর আগে রাধানাথ ও মধুসূদনের যৌথ রচনাগুলির সংকলন ছাড়া আর কিছু নয়। সব থেকে আপত্তিজনক কথা যে জয়েন্ট ডাইরেক্টর হিসাবে পুস্তকখানি নির্বাচন করার আগেই রাধানাথ সংবাদ বাহিকায় এর প্রশংসা করেছিলেন।

এ বিষয় নিয়ে বাদবিসম্বাদ চলল অনেকদিন। দীপিকা বইটির বিষয়ে মন্তব্য করল :

এর ভাষা খাঁটি ওড়িয়া নয়। হালে লেখা অন্যান্য ওড়িয়া পুস্তকের মতোই এতেও বাংলা ভাষার প্রভাব স্পষ্ট।

দীপিকায় এ বিষয়ে অনেক পত্র প্রকাশ পেল। 'হক কথা' ছদ্মনামে এক ব্যক্তি রাধানাথের সমর্থন করে লিখল, কিছুদিন হল দীনুবাবু দীপিকার মাধ্যমে এক নাটক সৃষ্টি করেছেন। উত্তরে দীননাথ একখানি দীর্ঘ পত্র লিখলেন যার অন্তিম ভাগে ছিল :

ভবিষ্যতে আমরা কোনও বেনামী চিঠির জবাব দেব না।

শেষ পর্যন্ত মধুসূদন নিজে দীপিকায় একখানি পত্র লিখে কিছু স্পষ্টীকরণ দিলেন। দীননাথ এবার একটি নতুন অভিযোগ করলেন; রাধানাথ নিজে ক্ষেত্রতত্ত্ব নামে বই লিখে পাঠ্যপুস্তক করে দিয়েছেন।

১৮৮৩ সালে রাধানাথের পৃষ্ঠপোষক ভূদেব মুখার্জী অবসর নিলেন। এবার রাধানাথ একটু অসহায় বোধ করলেন। ইদানীং আর্থিক পরিস্থিতিতেও সন্তোষজনক নয়। ভেবে মনস্তাপ হল যে ময়ূরভঞ্জের চাকরি তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সর্বোপরি শরীরও ভাল যাচ্ছে না। এদিকে তাঁর সমালোচনায় ভাঁটা পড়ছে না; বরং বাড়ছে। এখন অভিযোগ হল পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে বৈকুণ্ঠনাথ দের প্রেস থেকে প্রকাশিত পুস্তকগুলি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আগে পুস্তক নির্বাচন করত একটি কমিটি, এখন সেটির অস্তিত্ব নেই। রাধানাথ একাই সে কাজ করেন। তিনি অবশ্য একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেন, 'দে' প্রেস থেকে প্রকাশিত পুস্তকগুলি শিক্ষকরা চয়ন করে কারণ রাধানাথ খুশী হবেন এবং তিনি শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ কতৃপক্ষ। এও শোনা যায় যে 'দে' প্রেসের অনেক বইতে প্রণেতার নাম থাকে না এবং সেগুলির প্রকৃত লেখক স্বয়ং রাধানাথ অথবা তাঁর ভাই সতীনাথ যে 'দে' প্রেসে কাজ করে। আরও শোনা যায় যে রাধানাথ অনেক লেখককে 'দে' প্রেস থেকে বই ছাপাতে অথবা বৈকুণ্ঠনাথ দে-কে পুস্তকের স্বত্ব বিক্রি করতে পরামর্শ দেন। শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে অনিবার্যভাবে বৈকুণ্ঠনাথের স্থান পায়।

এ সব সমালোচনায় মধুসূদনও জড়িয়ে পড়লেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর হিসাবে তিনি রাধানাথের অধঃস্তন কর্মচারী। দুজনের প্রগাঢ় হৃদ্যতার কথা সকলে জানে। একথাও সর্বজনবিদিত যে দুজনে যৌথভাবে 'কবিতাবলী' রচনা করেছেন। 'বালেশ্বর সংবাদবাহিকা' এতদিন রাধানাথের সমর্থক ছিল এবার তার সমালোচনায় যোগ দিল। এর সম্পাদক শিক্ষা বিভাগের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী গোবিন্দ চন্দ্র পট্টনায়ক। বিরক্ত হয়ে রাধানাথ পত্রিকার সম্পাদনের অনুমতি প্রত্যাহার করে নিলেন।

শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে দীননাথ মন্তব্য করলেন যে এ বিভাগ তাদের চালচলনের পরিবর্তন না করলে তাঁর 'পানদোষ নিবারণী ও উৎকোচ সংহারিনী' সভা এ দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হবে যেমন তারা পূর্ত বিভাগের বিরুদ্ধে করেছে। তিনি দীপিকায় লিখলেন : পবিত্র শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে এমন ঘৃণ্য দুর্নাম শোনা

অত্যন্ত অসহনীয় এবং ভদ্র শিক্ষিত সমাজের পক্ষে নিতান্ত কলঙ্কের বিষয়।

মধুসূদনের 'ছন্দমানা' আর একটি বিতর্কের সূত্রপাত করল। অভিযোগ হল স্কুলগুলিকে এটি কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। জয়েণ্ট ইনস্পেক্টর রাধানাথকে বিষয়টি অনুসন্ধান করতে বলা হল। অনেকে এ অনুসন্ধান নিরপেক্ষ হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল। শুধু যে রাধানাথ মধুসূদনের পরম মিত্র তাই নয় অনেক সময় অনুসন্ধান তাঁর উপস্থিতিতেই হল। অনুসন্ধানের পদ্ধতি নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। একদিন কটক 'নর্ম্যাল' স্কুলের শিক্ষকদের একত্র ডেকে রাধানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মধুসূদন তাঁর বই কিনবার জন্য আপনাদের উপর চাপ দেন কি?' শিক্ষকরা বললেন, 'না, আমরা স্বেচ্ছায় কিনে ছাত্রদের দিই।' অন্য উত্তর আশা করা বৃথা। কোনও শিক্ষক উচ্চপদাধিকারীর বিরুদ্ধে সর্বসমক্ষে বলতে সাহস করবে না।

গৌরীশংকরও রাধানাথ ও মধুসূদনের তীব্র সমালোচনা করলেন দীপিকায়। তাঁর মতে নিজের অধঃস্তন কর্মচারীর সঙ্গে মিলে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসা করা গর্হিত কাজ। রাধানাথের সমর্থক সংস্কারক ও সেবক পত্রিকা লিখল : বিদ্যাবুদ্ধি, সৌজন্য ও দেশানুরাগের দৃষ্টিতে অনেকে রাধানাথকে গৌরীশংকরের উর্ধে ভাবেন। এভাবে বিতর্ক ব্যক্তিগত ও কুৎসিৎ আকার নিল। নিজের বিষয়ে মন্তব্য পড়ে গৌরীশংকরের হাসি পেল। কারণ আঠার বছর আগে রাধানাথ তাঁকে পার্থ ধনুর্ধরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তাঁর 'গৌরীশংকর' শীর্ষক কবিতায়। লিখেছিলেন দীপিকারূপ পাশুপত অস্ত্র হাতে উৎকল তিমিরের সঙ্গে রণে অবতীর্ণ হয়েছেন গৌরীশংকর।

সময়টি রাধানাথের পক্ষে অশান্তিময়। অনেক মিত্র শত্রু হয়েছেন। পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত তাঁর সমালোচনা প্রকাশ পায়। মিউনিসিপ্যালিটির মেথররা তাঁর পোষা কুকুরটি মেরে ফেলল। এত প্রতিকূল পরিবেশেও একটি জিনিস তাঁকে আনন্দ দেয়— উৎকল প্রেস প্রকাশিত দুই পয়সা মূল্যের 'কেদার গৌরী'। এই ছোট্ট পুস্তিকাতে ভূদেব মুখার্জীর উপদেশ মেনে সত্য ও কল্পনার সমন্বয় করেছিলেন।

বালেশ্বর : আগষ্ট ১৮৮৬

ওড়িয়া পাঠ্যপুস্তক নিয়ে রাধানাথের সমালোচনা আরও তীব্র হল। এবার যে পুস্তক নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠল সেটি মধুসূদনের ভ্রাতা জগন্নাথ রাও প্রণীত 'প্রথম পাঠ'। জগন্নাথ রাধানাথের অফিসের হেড কেরাণী, অর্থাৎ আমলাদের প্রধান। অনেক দিক থেকে বইটির উপর আক্রমণ হল। বানান ও তথ্যগত ত্রুটি তো ছিলই! ব্যাকরণও অশুদ্ধ। বইটিতে যে সাহেবদের তোষামোদ করতে চেষ্টা হয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে একটি বাক্য উদ্ধৃত করা হল : সাহেবদের দেশের কুকুরগুলি যেমন বৃহদাকার ও

গুণসম্পন্ন আমাদের দেশের কুকুরগুলি সেরকম নয়। এ কথাও বলা হল যে জগন্নাথ রাধানাথের অফিসে কর্মরত থেকে জানতে পারত বাজারে কি প্রকার বই-এর অভাব আছে এবং তার সুযোগ নিয়ে সেই রকম বই লিখে হাজার হাজার কপি বিক্রি করে। দীপিকাকে বইটির এরকম সমালোচনা হল : ২১ পৃষ্ঠা : 'অন্যায় উপায়ে ধন উপার্জন করার থেকে না উপার্জন করা ভাল'—উপদেশটি সুন্দর কিন্তু গ্রন্থকার তার থেকে অনেক দূরে।

এই বাদ বিসম্বাদ বালেশ্বরেও পৌঁছে গেল। পারিতোষিক হিসাবে এ জেলার ছাত্রদের দেওয়া হত বিচিত্র রামায়ণ অথবা চৌতিশা ও ন' পোই। এ দুটি কটক প্রিণ্টিং প্রেসে ছাপা হয়। বৈকুণ্ঠনাথ দে এগুলির কিছু অংশের ইংরাজী অনুবাদ করে সরকারকে পাঠালেন। তাঁর বক্তব্য এগুলি অশ্লীল অতএব ছাত্রদের পাঠযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ বিচিত্র রামায়ণের এই অংশ উদ্ধৃত করলেন : 'রসিল সে রষি নারী যুবতীরতন' (পৃ. ১০) 'করিল বিবিধ সুরতি কাম পাঠ বিধিমত' সব সখী জিজ্ঞাসিল কেলির বিধান, বর্তুল স্তনে ক্ষতচিহ্ন বিশ্রস্ত বসন (পৃ. ১৭) ও বাহুবন্ধন ও প্রতিচুম্বদান, কাম দেখাচ্ছে কি তার মুক্তিস্থান, কটি বসনা, হইয়া বিমনা বিপরীত ধ্বনি করে হইয়া সুমনা (পৃ. ২৩২)। সরকার রাধানাথের মত চাইলে তিনি বললেন, তিনি বৈকুণ্ঠের সহিত একমত। সরকার এ বইগুলি কেনা বন্ধ করে দিল।

এবার প্রশ্ন উঠল বৈকুণ্ঠনাথ দের 'প্রথম শিক্ষা' নিয়ে। বইখানি স্কুলে ব্যাপক প্রচলিত। এখন তৃতীয় সংস্করণ চলছে। এতে কৃষ্ণকলেবর কানাই সঙ্গে রোহিনীসূত কবিতা যার একটি পংক্তি : থির মদন সংঘাতে কাম গেল ভুলে।' এটি নিশ্চয়ই অশ্লীল। এ রকম সমালোচনা দেখে পরবর্তী সংস্করণে 'কৃষ্ণকলেবর' শব্দটি বাদ দিলেন বৈকুণ্ঠনাথ।

এবার এল রাধানাথের কেদার গৌরীর পালা। বই-এর ভূমিকায় রাধানাথ লিখেছিলেন যে পৌরাণিক কাহিনী ভিত্তি করে এটি লিখেছেন। কিন্তু ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে তিনখানি পৌরাণিক গ্রন্থ, একাগ্র পুরাণ, কপিল সংহিতা ও শিবপুরাণে কেদার গৌরীতে যে গল্প বলা হয়েছে তার কোনও উল্লেখ নেই। অন্যদিকে এ কাব্যের আধার যে 'পিরামস এণ্ড থিসবী' তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পৌরানিকত্ব দাবি করার যুক্তিযুক্ততা কি এবং সত্যই এটির আধার যদি কোনও পৌরাণিক গ্রন্থের হয় তবে তিনি বলুন কোন পুরাণে এ গল্প আছে। রাধানাথ নীরব রইলেন কারণ এর জবাব তাঁর কাছে নেই।

রাধানাথের সভাপতিত্বে ওড়িয়া পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কমিটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দু আনা মূল্যের 'বোধোদয়ে'র পরিবর্তে সীতানাথ রায়ের চার আনা মূল্যের 'পাঠমালাকে' পাঠ্যপুস্তক চয়ন করল। সীতানাথ রাধানাথের ভাই, সুতরাং অনিবার্য সমালোচনা হল।

লেখকরা কমিটিতে পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠাতেন, মনোনীত হলে তবেই ছাপানোর ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু রাধানাথের চেলা চতুর্ভূজ পট্টনায়ক তাঁর 'স্বাস্থ্যসাধন' একেবারে ছেপেই কমিটিকে দিলেন। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন, পাণ্ডুলিপি পড়তে কমিটির সদস্যদের অসুবিধা হতে পারে ভেবে তিনি একেবারে ছেপে আশ্বান্বিত হৃদয়ে তাঁদের করকমলে অর্পণ করলেন। এও লিখলেন যে মধুসূদন আদ্যন্ত পাঠ করে বইটিতে অনেক সংশোধন করে দিয়েছেন। এর থেকে অনুমান করা সহজ যে চতুর্ভূজ জানতেন যে তাঁর বইটি নির্বাচিত হবে এবং সেই ভরসায় মুদ্রণের খরচ বহন করেছিলেন। একটি মজার বিষয়, পুস্তকের প্রকাশক চতুর্ভূজের দুই বছরের শিশুপুত্র!

পুস্তকের যে দিকটি বিশেষ সমালোচনার কারণ হল তা হল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের প্রয়াস। ওড়িশায় সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্মের মুখ্য প্রবর্তক মধুসূদন রাও এবং চতুর্ভূজ পট্টনায়ক। 'স্বাস্থ্যসাধন' মূলত স্বাস্থ্যরক্ষার উপর আধারিত হলেও হিন্দুধর্মের অনেক আচার আচরণের উপর কটাক্ষ করা হয়েছে। এক স্থানে লেখা হয়েছে প্রস্তরের বিগ্রহ অনাহারে কৃশ হয় না এবং সে কোনও কাজও করে না। অন্যত্র : এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত বলে অল্প বয়সে সন্তান হয় এবং অল্প বয়সের সন্তান দুর্বল হয়। বাল্যবিবাহ বন্ধ না হলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। সমালোচকরা এও বললেন যে পুস্তকের কোনও কোনও অংশ অশ্লীল এবং ছাত্রদের পাঠের অনুপযুক্ত। যথা, বেশ্যারা পুরুষদের ফুসলিয়ে নিজেদের শিকার বানায় এবং ফলে পুরুষদের নানা ব্যাধি হয়।

এ সকল সমালোচনায় রাধানাথ বিচলিত হলেন। বালেশ্বরে ভ্রমণে এসে তিনি বৈকুণ্ঠনাথ দেকে নিজের মানসিক অশান্তির কথা বললেন। বৈকুণ্ঠ তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি রাধানাথের সমর্থনে লেখা প্রকাশ করাবেন। বাগানে বসে তাঁরা কথা বলছিলেন এমন সময় ফকীরমোহন উপস্থিত হলেন। তিনি বালেশ্বরে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। তিনি রাধানাথকে দেখে খুশী হলেন। রাধানাথ কিন্তু বেশীক্ষণ বসলেন না, শরীর খারাপ লাগছে বলে চলে গেলেন।

এখন ফকীরমোহন পাললহড়ার দিওয়ান। দাশপল্লার রাজার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হল না। অতএব কমিশনার তাঁকে পাললহড়ায় পাঠালেন। এখানে রাজার সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিলেন। কাজের চাপও বেশী নয়। পাশা খেলে এবং মহাভারতের অনুবাদ করে সময় কাটান। কাজ যখন খুব কমে যায় তখন ছুটি নিয়ে বালেশ্বর চলে আসেন।

রাধানাথ ফকীরমোহনকে খুব পছন্দ করেন না। নিজে স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। অন্যদিকে ফকীরমোহন খুশ মেজাজী, সব সময় ঠাট্টা পরিহাস উপভোগ করেন। কিছুদিন আগে তিনি রাধানাথের হয়রানির কথা বালেশ্বরে রটিয়ে দিয়েছেন এবং লোকে বেশ মজা পেয়েছে। ফকীরমোহন যা প্রচার করেছেন তার সত্য বটে তবে তিনি তাতে অনেক রঙ চড়িয়েছেন। তার অনুসারে ঘটনাটি এই :

রাধানাথ ও ফকীরমোহন একসঙ্গে কটক যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যার পরে স্টীমার মাতাই নদী পার হয়ে ধামরা নদীতে পড়ল তখন ভীষণ ঝড় তুফান আরম্ভ হল। ছোট স্টীমার ডুবুডুবু। রাধানাথ প্রাণের আশা ছেড়ে দিলেন। ঠাণ্ডা লাগছিল বলে ধুতিখানি গায়ে জড়িয়ে নিলেন। বাঁচার আশা ছেড়ে নির্জীবের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনও রকম শব্দ হলেই চমকে সেদিকে তাকাচ্ছিলেন। দেখলে মনে হবে কাপড় জড়িয়ে আফিম হাতে নিয়ে তিনি ভবসাগর পার হবার জন্য প্রস্তুত।

কটকে ফিরেও রাধানাথ মনস্তাপে ভুগতে লাগলেন। একমাত্র সান্ত্বনা যে 'কেদার গৌরী' প্রকাশ হবার একবছরের মধ্যে তার 'চন্দ্রভাগা' দে প্রেস থেকে প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

বামণ্ডা : অক্টোবর ১৮৮৬

আঠারো বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন বাসুদেব। এখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর বেশ যশ। সারা ওড়িশা বাসুদেব সুঢল দেব নামের সঙ্গে পরিচিত। আজকাল দীপিকায় বামণ্ডা বিজ্ঞাপন বলে একটি কলাম থাকে। তাঁর 'অলঙ্কার বোধোধয়' তাঁকে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বামণ্ডার শাসনের ভূয়সী প্রশংসা থাকে সরকারের বার্ষিক রিপোর্টে। এসবের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।

সুঢল দেব রাজগদি পাবার কিছুদিনের মধ্যে প্রথম সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ব্রজসুন্দরের নিজের পুত্র বৃন্দাবন দাসী গর্ভজাত বলে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুদেবকে পোষ্য নিয়েছিলেন। বাসুদেব রাজা হলে বৃন্দাবন প্রতিবাদ করল। বাসুদেবের কাকা দেবদুর্লভ বৃন্দাবনকে সমর্থন করলেন। তিনি বৃন্দাবনকে সঙ্গে নিয়ে সম্বলপুর গেলেন এবং পলিটিকাল এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সৌভাগ্যক্রমে এজেন্ট পোষ্যপুত্র নেবার কথা জানতেন। তিনি একবার বাসুদেবকে দেখেছেন। তিনি বৃন্দাবনের দাবী অগ্রাহ্য করলেন।

এবার অন্য জটিলতার সৃষ্টি হল। পলিটিকাল এজেন্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যতদিন বাসুদেব সাবালক না হচ্ছেন ততদিন অভিভাবক হবেন তার জন্মদাতা পিতা বড়কুমার হরিহর দেব। বাসুদেব কিন্তু হরিহর অপেক্ষা ব্রজসুন্দরকে অধিক শ্রদ্ধা করত। সে জন্য হরিহর তার উপরে বিরক্ত ছিলেন। যখন তার বিবাহের প্রসঙ্গ উঠল তখন তিনি জিদ করলেন তিনি কালাহাণ্ডির রাজকুমারীকে বিবাহ করবেন কারণ ব্রজসুন্দর তাকে পছন্দ করেছিলেন। হরিহরের এতে মত নেই। বাসুদেব তার কথায় কর্ণপাত করলেন না, কালাহাণ্ডির রাজকুমারী গিরিজাকুমারীকে বিবাহ করলেন।

পিতা পুত্রের মনোমালিন্য বেড়ে গেল। হরিহর স্বেচ্ছাচারী, প্রজাপীড়ন করেন। এ নিয়ে বাসুদেবের সঙ্গে মতভেদ শুরু হল। অবস্থা চরমে উঠল যখন হরিহর রাজার পেয়াদাদের হুকুম দিলেন একটি প্রজার ঘর লুট করতে। সে খাজনা দিতে পারেনি। প্রজাটি এসে বাসুদেবের শরণ নিল। তিনি হরিহরের আদেশ রদ করলেন না বটে তবে ভরসা দিলেন যে সত্যই যদি তার ঘর লুট হয় তবে তিনি তার যত ক্ষতি হবে তার চারগুণ দেবেন। খবর পেয়ে হরিহর মন্তব্য করলেন, বামণ্ডায় আর থাকতে পারব না। সত্যই তার পরের দিন তাকে আর দেখা গেল না।

বিবাহের দুই বছর পরে গিরিজাকুমারী একটি পুত্র প্রসব করে মারা গেলেন। স্ত্রী বিয়োগে শোকার্ত বাসুদেব দীর্ঘদিনের তীর্থযাত্রা করতে মনস্থ করলেন। শিশুপুত্রকে মায়ের কাছে রেখে অল্প কয়েকজন সাথি সঙ্গে নিয়ে তিনি সম্বলপুর গেলেন এবং পলিটিকাল এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মহানদী পার হয়ে সোনপুরের রাস্তায় তিনি কটক পৌঁছলেন। তার জন্য সকল বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন গৌরীশংকর। জোব্রাতে তাঁর জন্য বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। গৌরীশংকর রাজাকে কটকের দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখালেন। প্রিণ্টিং প্রেস এবং মিশন প্রেসও দেখলেন তিনি। রাজা গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করলেন, কাঠযোড়ীর পাথরের বাঁধ দেখলেন, রেসকোর্স ঘুরে এলেন। ষ্টেশন ক্লাবে গেলেন গড়গড়িয়া ঘাট দেখলেন এবং বক্সীবাজারে কেনাকাটা করলেন।

বাসুদেব কটক থেকে কেনাল ধরে চাঁদবালি গেলেন এবং সেখান থেকে ষ্টীমারে কলকাতা। এক মাসে কলকাতায় অনেক কিছু দেখলেন, কালীঘাটে দেবী দর্শন করলেন। এশিয়াটিক সোসাইটীর সভাগৃহ দেখলেন, যাদুঘর ও বোটানিকাল গার্ডেন ঘুরলেন। শ্রীরামপুর গিয়ে কাগজের মিল দেখে এলেন। ফ্লাইং শাটল তাঁত বোনা দেখলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

কলকাতা থেকে রাজা বারানসী গেলেন। সেখানে তিনি মানমন্দির দেখলেন, জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা অনুধ্যান করলেন এবং মণিকর্ণিকায় স্নান করলেন। বিশ্বেশ্বর এবং অন্যপূর্ণার দর্শন করে তীর্থশ্রাদ্ধ করে ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন। লক্ষ্ণৌ গিয়ে ইমামবাড়া, নবাবের প্রাসাদ ও ক্যানিং কলেজ দেখে এলেন। কানপুর গিয়ে কলকারখানা দেখলেন। তারপরে দিল্লি গেলেন। এখানে কুতব মিনার, লাল কেল্লা ও যন্তর মন্তর দেখলেন। আগ্রা গিয়ে তাজমহল দেখে এলেন এবং মথুরা বৃন্দাবন ভ্রমণ করলেন। প্রয়াগ ত্রিবেণী তীর্থে স্নান দানপূজা করলেন, আলবার্ট পার্ক ও মেয়ো কলেজ দেখলেন। তারপরে বাসুদেব গয়া গেলেন এবং বিষ্ণুপাদে পিণ্ডদান করলেন এবং বুদ্ধগয়া দেখলেন। বৈদ্যনাথ গিয়ে রাজা ধর্মালোচনায় অংশ নিলেন। শেষে সিংহভূমের রাস্তায় বামণ্ডায় ফিরে এলেন।

ভ্রমণকালে সর্বত্র পিতার খোঁজ করেছিলেন কিন্তু কোনও হদিশ পাননি। নিজের

রাজ্যে ফিরে খবর পেলেন হরিহর সম্বলপুরে আছেন এবং তিনি অসুস্থ। সঙ্গে সঙ্গে সম্বলপুর গিয়ে সযত্নে হরিহরকে বামণ্ডায় নিয়ে এলেন।

পত্নী বিয়োগের পরে সংসারে বিমুখহয়ে তীর্থযাত্রা করেছিলেন বাসুদেব। এখন আবার সংসারী হবার বাসনা হল। পাত্রীর সন্ধানে ঘটক ও পুরোহিত দিকে দিকে ঘুরে বেড়ান। শেষে রেরুয়ার জমিদারের পরিবারে বিবাহ করলেন। কিছুদিন পরে কলকাতা থেকে ফেরার সময় খর মুঁবার এক কন্যাকে বিবাহ করে সঙ্গে নিয়ে এলেন। কালক্রমে তাঁর তিন পত্নী এগারটি কন্যা এবং আটটি পুত্রের জন্ম দিলেন।

সংসার গড়ে তুলে এবার রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন বাসুদেব। রাজ্যটি তিনভাগে ভাগ করে তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করলেন। একক শাসনের পরিবর্তে নয় জন সদস্যের একটি কাউনসিল গঠন করলেন। দেওগড় ও কুচিন্দায় দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করলেন। বামণ্ডা থেকে দেওগড় পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শে বিজয় চন্দ্র মজুমদারকে শিক্ষক করে বামণ্ডায় নিয়ে এলেন এবং ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। কাশীতে দেখা মানমন্দিরের অনুকরণে একটি বিজ্ঞানাগার স্থাপন করলেন। কাশী ও মিথিলা থেকে পণ্ডিতদের আনিয়ে প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করলেন। কটক কলেজের অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে আমন্ত্রণ করলেন বামণ্ডার বিজ্ঞানাগারের বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য। জগন্নাথ নামে একটি প্রেস স্থাপন করলেন। উন্নতিমূলক কাজের হিড়িক পড়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যায় শ্রান্ত বাসুদেব বৃদ্ধ শিক্ষক গণেশ্বর পট্টনায়কের সঙ্গে রাজ্যের ভালোমন্দের হিসাব নিকাশ করছিলেন। কি কি করা হয়েছে, আর কি কি বাকি আছে সে প্রসঙ্গ উঠতে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাষ্টার মশায়, বলুন তো আর কি করা যায়?' কিছুক্ষণ চিন্তা করে গণেশ্বর বললেন, 'একবার রাধানাথ রায়ের পদধূলি পড়লে ভালো হত।' ওড়িশার স্বনামধন্য পুত্র এখনও বামণ্ডা আসেননি কারণ এ রাজ্য তাঁর এলাকার বহির্ভূত। বাসুদেব সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। পরের দিন রাধানাথকে আমন্ত্রণ করে পত্র লিখলেন তিনি। পত্র পেয়ে রাধানাথ আনন্দিত হলেন, ভাবলেন বামণ্ডায় যাবার জন্য ছুটি নিতে হবে। যাই হোক, ১৮৮৬ সালের অক্টোবর মাসে হাতি চড়ে বামণ্ডা যাত্রা করলেন রাধানাথ। রাস্তায় মনে পড়ল রাজদর্শনের সময় ভেট দেবার রীতি আছে। অবশ্য প্রতিদানও মেলে। দেবার মত কিছু সঙ্গে আনেননি। সুতরাং হাতির পিঠে বসে একটি কবিতা রচনায় মন দিলেন। যে পাঁচ পদের কবিতা লিখলেন তার বিষয়বস্তু তোষামোদ এবং প্রথম পদটি এরকম :

ধিক তোষামোদী ধিক ধিক তোরে
ঘৃণিত হীন জীবন,
ধিক তোর জীবিকা ধিক ধিক সেই
জীবিকা জনিত ধন।

কবিতাটি বিশেষ ভালো লাগল না, কিন্তু ভাবলেন এতেই কাজ চালাতে হবে। তিনি ভাবতে পারেননি তাঁর অভ্যর্থনার জন্য কি বিপুল আয়োজন হয়েছে। তাঁর হাতি দেওগড় পৌঁছাতেই এগার বার তোপধ্বনি করা হল। স্বয়ং রাজা অগ্রগমন করে তাকে স্বাগত করলেন। রাজা তাঁকে বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখালেন। দলবল পিছনে রেখে মাত্র একজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে রাজা একটি পুরো দিন তাঁর সৃজিত উদ্যানে ঘুরিয়ে দেখালেন রাধানাথকে। এখানে হরেকরকম দেশী বিদেশী গাছ লাগানো হয়েছে। একদিন দুজনে প্রধানপাট জলপ্রপাত দেখতে গেলেন। তার পর পূর্ব রাজধানী পুরাতনগড়, হাসপাতাল, সংস্কৃত পুস্তকালয়, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি দেখালেন। তিনদিনের জন্য এসেছিলেন কিন্তু দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। একদিন সাহিত্য সভার আয়োজন হল, রাধানাথ তাঁর পাঁচপদী কবিতা আবৃত্তি করে পাঁচশ টাকা পুরস্কার পেলেন।

এই পাঁচশ টাকা নিয়ে রাধানাথ কটক ফিরে এলেন। ভ্রমণকারী ছদ্মনামে বামণ্ডা ভ্রমণের কাহিনী লিখে নবসংবাদ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বাসুদেব সুঢলদেবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রবন্ধে। রাধানাথ আশা করেছিলেন রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এক না একদিন কাজে লাগবে।

এবার 'নন্দকিশোরী' কাব্য লেখার জন্য সকল সময় ও মনোযোগ দিলেন।



দশ

পুরী : ডিসেম্বর ১৮৮৬

দু বছর আগে যখন মুকুন্দদেবকে রাজা উপাধি সনদটি দরবার করে দেবার প্রস্তাব এসেছিল তখন সূর্যমণি জানিয়েছিলেন যে এত ছোট বালক দরবারের আদবকায়দা বুঝবে না, সুতরাং তাকে পুরীতে সনদটি দেয়ো হোক। ১৮৮৫ সালে ছোটলাট স্যার রিভার্স টমসনের কটক আগমন উপলক্ষে দরবারের আয়োজন করা হল এবং পুরীর রাজাকে আমন্ত্রণ করা হল। এবার সূর্যমণি স্থির করলেন মুকুন্দ দরবারে যোগ দেবে। আট বছরের মুকুন্দদেব রাজপোশাকে সজ্জিত হয়ে দরবারে এলে সকলে তাকেই দেখল। দরবারে আসার সময় এবং সেখান থেকে ফেরার সময় অনেক লোক তার পাল্কির পিছন পিছন চলল। এমন সম্মান অন্য কোনও রাজার ভাগ্যে জুটল না। এমনকি ছোটলাটেরও না।

পুরীর রাজাকে মর্যাদা দিলে জনসাধারণ খুশি হল। সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কেমন করে মন্দিরের ক্রিয়া কর্ম সুচারুরূপে পালিত হবে তা নিয়ে সরকার চিন্তিত রইল। কলকাতার সরকারী উকিলদের মতে সিভিল কোড অনুসারে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ধর্মীয় ট্রাষ্টের ক্ষেত্রে আইনটি প্রযোজ্য নয়। সুতরাং ভারত সরকার সিভিল কোডের ৫৩৯ ধারা সংশোধন করে ধর্মীয় ট্রাষ্টগুলি এর আওতায় নিয়ে এল। এই সময়ে ১৮৪০ স্যালের দশ নম্বর আইনটিও সংশোধন করা হল। ফলে মন্দিরের ট্রাষ্টীর সংখ্যা বাড়াবার ব্যবস্থা হল। কালেক্টরের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার মন্দির পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করল, যার প্রেসিডেন্ট হবেন পুরীর রাজা। এতে স্থির হল যে মন্দিরের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করবেন একজন বেতন ভোগী ম্যানেজার। এ ব্যবস্থা চালু করবার অনুমোদন চেয়ে জেলা জজের কোর্টে আবেদন করল সরকার।

মন্দির পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেবার জন্য কমিশনার নির্দেশ দিলেন সেরিস্তাদার রামপ্রসাদ সিংহকে। মন্দিরে গিয়ে রামপ্রসাদ কেরাণীকে মন্দিরের অলঙ্কার ইত্যাদির হিসাব দেখাতে বললেন। সূর্যমণির নির্দেশে তারা কোনও হিসাব অথবা কাগজপত্র দেখাতে অস্বীকার করল। তখন তিনি দেওয়ান আনন্দচন্দ্র মুখার্জী এবং বিষোই দীনবন্ধু রাউতরাকে হিসাব দেখাতে বললেন। তারা উল্টা প্রশ্ন করল, 'কাগজপত্র দেখার অধিকার যে আপনার আছে তার প্রমাণ কি?' রামপ্রসাদের কাছে এমন কোনও আদেশনামা ছিল না; অগত্যা তিনি চুপ হয়ে গেলেন। কটকে ফিরে পুরীতে কি হয়েছে তার উপর একটি রিপোর্ট দিলেন।

রিপোর্ট পেয়ে কমিশনার মেটকাফ সরকারী উকিল হরিবল্লভ বসুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। স্থির হল এ ব্যাপারে সরকার জেলাজজের কাছে আবেদন করবে। তদনুসারে ১৮৮৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর অস্থায়ী কালেক্টর স্যাভেজ জেলা আদালতে একখানি আবেদন পেশ করলেন। মামলায় রাজা মুকুন্দদেব, রাণী সূর্যমণি পাটমহাদেবী, রাণী নীলাদ্রী, মন্দিরের কেরাণী রামচন্দ্র সামন্তরা, ভাণ্ডারের দায়িত্বাসীন যোগী মেকাপ ইত্যাদি হলেন প্রতিবাদী। সরকারী পক্ষের দাবী :

দরখাস্তে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাছাড়া মন্দিরের অন্যান্য অলঙ্কার, সোনা রূপা ইত্যাদি যা প্রতিদিন ব্যবহার হয় না সেগুলি কোর্টে জমা করা হোক। আবশ্যক হলে একজন রিসিভার নিযুক্ত করা হোক অথবা কোর্টের নির্দেশে অন্যত্র সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হোক। মন্দিরের যে সকল মূল্যবান সম্পত্তি আছে প্রতিবাদীগণ তার একটি তালিকা আদালতে দাখিল করুন। প্রতিবাদী সূর্যমণি মন্দিরের যে জমিজমা তদারক করেন তার হিসাব দিন। মন্দিরের জমিজমা অথবা অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে যে আয় হয় তার মাসিক হিসাব দিন। সূর্যমণি মন্দিরের দায়িত্ব নেবার পর থেকে মন্দিরের আয় ব্যয়ের বিবরণী আদালতে পেশ করুন।

আরও আবেদন করা হল যে ১৮৪০ সালের দশ নম্বর আইনের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে কোর্ট নতুন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করুন এবং তাদের উপর মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক। এ নতুন ট্রাষ্টীকে মন্দিরের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হোক এবং মন্দির পরিচালনার জন্য উপযুক্ত নিয়ম কানুন প্রণয়ন করা হোক।

সরকার পক্ষের উকিল হরিবল্লভ বোস ও লাল বিহারী ঘোষ। প্রতিবাদীদের তরফে রামশংকর রায় ও মধুসূদন দাস। কোর্টে মামলা চলা কালে যাতে মন্দিরের সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকে তার জন্য একজন রিসিভারকে স্থাবর সম্পত্তির এবং একজন তহশীলদারকে জমিজমার দায়িত্ব দেওয়া হল। কোর্ট এমার মঠের রঘুনন্দন রামানন্দ দাসকে রিসিভার নিযুক্ত করলেন এর তার সহযোগী হলেন সাব ডেপুটী কালেক্টর নদীয়া চাঁদ দত্ত। মাসিক একশ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন রামপ্রসাদ সিংহ। জেলা আদালতের নাজিরকে পুরী পাঠানো হল মন্দিরে গচ্ছিত অলঙ্কার ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করতে।

এই মামলা নিয়ে পুরীতে হুলস্থূল পড়ে গেল। কোর্টের অফিসার এসে মন্দিরের কাগজপত্র ও মালখানায় তালা লাগিয়ে সিল করে দিল। মন্দিরের চার দ্বারে পুলিশ পাহারা বসল। রাণীর প্রাসাদের সাতাশ হাজারী মাহালের কাছারীর বাইরেও পাহারা বসানো হল।

সূর্যমণি কোর্টের আদেশ পাননি বলে কাগজ বা চাবি নাজিরকে দিলেন না। সেবকদের রিসিভারের অধীনে কাজ করতে মানা করে দিলেন তিনি। প্রাসাদের বাইরে পুলিশ পাহারার প্রতিবাদ করে কালেক্টরকে পত্র লিখলেন, জানালেন যে এ

পদক্ষেপ তাঁকে অপমানিত করেছে। প্রাসাদের সামনের পুলিশদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

এবার নাজির ক্রোকের আদেশ নিয়ে এল। সে ভাণ্ডার ঘর খুলিয়ে তসর ও সুতীর কাপড়গুলির হিসাব নিল। রাজার প্রাসাদের এবং মন্দিরের করণদের ঘর ক্রোক করে মন্দির সংক্রান্ত যা কাগজপত্র পাওয়া গেল এনে রিসিভারের অফিসে জমা দিল। মন্দিরের ভবিষ্যৎ এখন কাছারীর হাতে।

কটক : জানুয়ারি ১৮৮৭

জগন্নাথ মন্দিরের পরিচালনার সমস্যা সাধারণ লোককেও নাড়া দিল। ১৫ই ডিসেম্বর সরকার মকদ্দমা দায়ের করল। তার আগে ৫ই ডিসেম্বর গৌরীশংকর উৎকল সভার এক বিশেষ সভা আহ্বান করলেন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য। সভার নোটিশ দিয়েছিলেন মাত্র একদিন আগে, তবুও শতাধিক লোক উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে ছিলেন বৈদ্যনাথ পণ্ডিত, রামশংকর রায়, গোলক চন্দ্র বসু, গোবিন্দ রথ, কপিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র প্রমুখ। সভা তিনটি প্রস্তাব পাশ করল :

প্রথম, মন্দিরের পরিচালনায় কোনও বিশৃঙ্খলার কথা সভার অজানা যার জন্য সরকারের আনীত মামলা সঙ্গত বলা যায়;

দ্বিতীয়ত, পুরীর ঠাকুর রাজাকে মন্দির পরিচালনা থেকে অপসারিত করলে হিন্দুদের অপমান করা হবে;

এবং তৃতীয়ত, জিনিসপত্রের এমন মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে যে মন্দিরের খরচ চালানোর জন্য যে জমি জাগীর দেওয়া হয়েছে তার আদায় থেকে সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ হয় না, রাজাকে দিতে হয়। রাজা অপসারিত হলে মন্দিরের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সরকারকে দিতে হবে। অন্যথা সেবা পূজায় ব্যাঘাত ঘটবে।

প্রস্তাবগুলি বঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারকে পাঠানো হল। গৌরীশংকর দীপিকায় লিখলেন : আমরা সরকারকে অনুরোধ করছি, রাজাকে মন্দিরের সুপারিণ্টেডেণ্টের পদ থেকে অপসারিত না করে বাঞ্ছিত পরিবর্তন তাঁর সম্পত্তি নিয়েই করুন।

মকদ্দমা দায়ের হবার পরে ২৬শে ডিসেম্বর ভাগবত ভক্তি প্রদয়িনী সভা গোপালজিউ মন্দিরে একটি বিরাট সভা আহ্বান করল। কটকে এত বড় সভা আগে হয়নি। সভাপতি হলেন উকিল যজ্ঞেশর চন্দ্র। রিসিভার নিযুক্ত হবার পর মন্দিরে যে বিশৃঙ্খলা চলছে তার বর্ণনা দিলেন অনেকে। উদাহরণ, মন্দিরের বাইরে মুসলমান সিপাহীরা রান্না করে খাচ্ছে আর গরুর চামড়ার বেল্ট পরে হিন্দু সিপাহীরা মন্দিরের পরিসরে চলাফেরা করছে। নীলাদ্রী মহোদয় ইত্যাদি শাস্ত্র থেকে শ্লোক পড়ে সরকারের

সমালোচনা করা হল। হরিবোল ধ্বনির মধ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হল। যথা :

পুরীর রাজাকে বাদ দিয়ে জগন্নাথের পূজার বিধি নেই; তাছাড়া মন্দির পরিচালনায় এমন কোনও ত্রুটি হয়নি যার জন্য সরকার মামলা করতে বাধ্য হয়েছেন বলা যেতে পারে। ঠাকুর রাজাকে নোটিশ না দিয়ে মন্দিরের সম্পত্তি ক্রোক করা অতি গর্হিত কার্য। তার দুরবস্থার জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সরকারকে প্রস্তাবগুলি পাঠিয়ে মামলা প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা হল। সারা ভারতের সকল হিন্দুদের কাছে আবেদন করা হল যে এই মহৎ কার্যে সকলে মহাযোগ করুন এবং ধর্মরক্ষার জন্য তৎপর হন। গৌরীশংকর দীপিকায় লিখলেন : ভারতেশ্বরীর নামে আমরা সরকারকে প্রশ্ন করছি এই কি তাদের ন্যায় ?

এই ঘটনাবলী দ্বীপান্তরিত রাজার কথা মনে পড়িয়ে দিল। ১৮৮৭ সালের ৫ই জানুয়ারি ওড়িশার পনেরোশ রাজা জমিদার মহাজন মিলে একখানি দরখাস্ত করলেন যে মহারাণীর জুবিলি উপলক্ষে দিব্যসিংহকে মুক্তি দেওয়া হোক। তার কিছুদিন পর বামণ্ডার রাজা বড়লাটকে একখানি দরখাস্তে লিখলেন :

মহানুভব শ্রীযুক্ত গভর্নর জেনারেলকে প্রার্থনা,

ভারতের সম্রাট ও রাজাদের মধ্যে একটি পরম্পরা প্রচলিত আছে যে কোনও মঙ্গলসূচক উৎসব হলে কিছু কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এবং যাদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়। মহারাণী যখন ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন তখন বহুসংখ্যক কয়েদীর দণ্ড মকুব করা হয়েছিল। এবং অনেকের নির্বাসনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন সেই মহারাণীর রাজত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালিত হচ্ছে। এতে সমস্ত ভারতবাসী নিঃসন্দেহে খুশি। অতএব এমন সময় বড়লাট মহোদয় যদি সদয়হয়ে পুরীর দ্বীপান্তরিত ভূতপূর্ব রাজাকে মুক্তি দিতে নির্দেশ দেন তবে ভারতবাসীর আনন্দের সীমা থাকবে না।

১৫.১.৮৭ শ্রীযুক্ত রাজা সুঢলদেব, বামড়া কেল্লা।

সরকারের কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

পুরী : জানুয়ারি ১৮৮৭

প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দিরের আশপাশ থেকে মুসলমান পুলিশ সরিয়ে হিন্দু পুলিশ মোতায়েন করা হল। আগে হিন্দু পুলিশ বেল্ট ও জুতা পরে মন্দিরে যেত। এখন তা বন্ধ হল। ৫ই জানুয়ারি রিসিভারের এক চাপরাশী পিণ্ডিকা নিতে এলে রত্নসিংহাসনের গায়ে ময়লা রুমাল রেখে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। এতে মন্দির অপবিত্র হয়েছে মনে করে মহাস্নান শুদ্ধি করা হল।

মন্দির সংক্রান্ত বাদবিসম্বাদের মধ্যে পুরীর বড় আখড়া মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ধর্মরক্ষিণী নামে একটি সভা স্থাপিত হল। সরকার যদি মন্দির পরিচালনার অধিকার রাজার হাত থেকে নিয়ে নেয় তবে সনাতন ধর্মের ক্ষতি হবে কিনা বিচার করার জন্য ১৬ই জানুয়ারি একটি সভা ডাকা হল। প্রায় তিন হাজার লোক সভায় যোগ দিল। সন্ধ্যা ৬টায় সভা শুরু হয়ে পাঁচ ঘণ্টা চলল।

প্রথমে বাবু হারাধন রায় বললেন, জগন্নাথ মহাপ্রভুর নিত্য সেবা পূজার অঙ্গ হিসাবে এমন কয়েকটি অনুষ্ঠান হয় যা রাজা বা তাঁর অনুপস্থিত বা তাঁর মনোনীত অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ মুদিরথ ব্যতীত আর কেউ করতে পারে না। সরকার বাহাদুর যদি রাজাকে মন্দিরের কাজ থেকে নিষ্কাশিত করেন তবে সে অনুষ্ঠানগুলি হতে পারবে না। অতএব এগুলি বাদ দিতে হবে। প্রমাণ হিসাবে নীলাদ্রী মহোদয় থেকে উদ্ধৃত করলেন :

তেতো বন্দপনান্তে রাজা পুষ্পাঞ্জলি ত্রয়ং
প্রক্ষিপেদতি উক্ত্যাচ ততঃ কর্পূর বর্ত্তিভি : ইত্যাদি

পরবর্তী বক্তারা রিসিভার নিযুক্ত হবার পরে মন্দিরের সেবাপূজায় কিভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তার বিবরণ দিলেন। কিভাবে সনাতন হিন্দুধর্মের অনাদর হচ্ছে তার উদাহরণ তুলে ধরা হল, যথা,

আজকাল হিন্দু কনষ্টেবলরা বেল্ট ও জুতা পরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ায় না সত্য কিন্তু তাদের ময়লা ও না কাচা কাপড়চোপড় ভিতরে থাকে। ভাঁড়ার ঘরের সামনে বারান্দার উপরে লোকনাথ প্রভু বিরাজ করেন বলে সাধারণের সেখানে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু তার উপরে চড়ে সিপাহী পাহারা দেয়। উপরে শূদ্র আদি নিম্নশ্রেণীর লোক যেতে পারে না কিন্তু এসিষ্ট্যাণ্ট রিসিভার সেখানে আসনপিঁড়ি করে বসলেন। প্রথম যেদিন ক্রোক হল সেদিন সরকারী কর্মচারী মোজা পরে ভাঁড়ারে ঢুকেছিল।

সভার প্রস্তাবগুলি নানা ভাষায় অনুবাদ করে সকল হিন্দু রাজা মহারাজা, সাংবাদিক ও সম্ভ্রান্ত লোকদের পাঠান হল। ভারত সরকার ও বঙ্গ সরকারকে পাঠিয়ে অনুরোধ করা হল মকদ্দমা উঠিয়ে নিয়ে রাজার হাতে মন্দিরের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক।

২৩শে ও ৩০শে জানুয়ারি শ্রীশ্রীজগন্নাথ ধর্মরক্ষিণী সভার আরও দুটি অধিবেশন করে বলা হল যে মন্দিরের পরিস্থিতি নিয়ে ওড়িশাবাসী এত বিচলিত যে ভারতেশ্বরীর জুবিলী সানন্দে পালন করতে পারেনি। ভারত সরকার যদি পুরীর বন্দী রাজাকে মুক্তি দেন তবে তাদের আনন্দের সীমা থাকবে না এবং তারা জুবিলী উৎসব সানন্দে স্মরণ করবে।

ইতিমধ্যে একজন ব্রাহ্ম ডেপুটী কালেক্টর মন্দিরে এলে একজন পাণ্ডা তাকে প্রসাদ দিতে চাইল কিন্তু তিনি নিলেন না। এ কথা জানা গেলে লোকে প্রতিবাদ করল। তাদের বক্তব্য যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে না সে হিন্দু নয়। এমন লোক মন্দিরে প্রবেশ করেছে বলে শুদ্ধি ও মহাস্নান হওয়া উচিত। এমন কথাও বলা হল যে মারাঠাদের আমলে পুরী

শহরে কেউ জুতা পরত না। কার্য উপলক্ষে কোন মুসলমান এলে সে শহরের বাইরে জেলখানার কাছে থাকত। আজকাল ইংরেজদের আমলে হিন্দুরাও জুতা পরে ও পান খায়। তারা সিপাহীদের দেখাদেখি বেদীর উপরেও জুতা পরে যেতে সাহস করে। এমনকি রাধাবল্লভ মঠের মহান্ত দুজন পাঠানকে থাকতে দিয়েছেন, তারা তার জন্য খাজনা উসুল করে। এই সময়ে এই গানটি রচনা করে সবদিকে বিলি করা হল :

গেলরে গেল হিন্দু ধরম — বড় দেউলে একি করম। (ঘোষ)
চারদ্বারে দেয় পাঠান পাহারা — সাক্ষাৎ যেন যমদূত তারা ॥
সিংহদুয়ারে বানায় খাবার — গোচর্ম কোমরে বাঁধা যে তাহার।
মন্দিরে তার গন্ধ ছড়ায় — ধর্ম রাখা বড় হল দায় ॥
রিসিভার আর তহশীলদার — হুকুম তাদের অতি ক্ষুরধার।
ক্ষণে ক্ষণে তারা রিপোর্ট পাঠায় — এমন বিপদে কি করি উপায় ॥
ফিরিঙ্গী সেবক জগন্নাথের — একি অবিচার হায় একি ফের।
মহাপ্রসাদ চাহিয়া বল — হয়েছে ঠিক না হয়নি ভাল ॥
হোটেল হল যে শ্রীমন্দির — এসেছে নামিয়া কলিকাল ঘোর।
দেবতার মহিমা হইল বিখাল — ধর্ম কর্ম যে সবই শেষ হল ॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে যত হিন্দুগণ — মহারাণীরে করহ নমন।
ক্ষেত্র মাহাত্ম্য রক্ষা হবে — প্রার্থনা যদি শোনেন তবে ॥

কটক : ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি পালন করার জন্য বন্দোবস্ত শুরু হল। উৎসবের খুঁটিনাটি যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন জনসাধারণ বলল যে মন্দিরের ব্যাপারে সকলে এমন ব্যথিত যে অতিশয় রাজভক্তি থাকলেও সর্বান্তঃকরণে উৎসবে যোগ দেবার মতো মানসিক অবস্থা তাদের নেই। তবুও পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা জুবিলি পালন করার জন্য একটি সভা ডেকে স্থির করল যে রাণী সূর্যমণি যে অর্থ দিয়েছেন তা ছাড়া আরও কিছু অর্থ তারা এ কাজে ব্যয় করবে।

উৎকল সভা একখানি অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত করল যাতে লেখা হল যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ যে সম্রাজ্ঞীর রাজত্বকাল পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল চলছে। আমরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত প্রার্থনা করছি সম্রাজ্ঞীর রাজত্ব আরও বহুকাল চলুক। সম্রাজ্ঞীর অধীনস্থ অন্যান্য দেশের প্রজাদের মতো আমরাও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করি যে এর থেকে সদয় ও হিতৈষী সরকার হতে পারে না। এই শুভক্ষণে আমরা সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ রাজত্বের নিরপেক্ষ ও দক্ষ শাসন

প্রতি সামান্য উপহার স্বরূপ আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন প্রতি চরম রাজভক্তি প্রকট করছি।

১৬ই ফেব্রুয়ারি উৎসব আরম্ভ হবে। ১৪ই তার যোগে একটি সুসংবাদ এল কলকাতা থেকে। হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছে যে অন্য আদেশ পর্যন্ত রিসিভার বা তার অধীনস্থ কর্মচারী মন্দির পরিচালনায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। এই আদেশ রাণী সূর্যমণির উকিল মধুবাবুর প্রয়াসের ফল।

১৬ই জুবিলি উৎসব আরম্ভ হল কালেক্টরের অফিসে একুশবার তোপধ্বনি করে। কিন্তু সেখানে বা প্যারেড দেখতে বেশি লোক এল না। জেল ফটকের সামনে অবশ্য ভীড় হয়েছিল। জেল থেকে মুক্তি পেল ১৩২ জন পুরুষ ও ১১ জন নারী কয়েদী। মারাত্মক অপরাধে শাস্তি হয়েছে এমন ৬৯ জন মাত্র জেলে রয়ে গেল। যারা ছাড়া পেল জুবিলি কমিটি তাদের একখানি করে কাপড়, দু আনা পয়সা ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একখানি করে ফটো দিল।

সকালে কটকের মঠ, মসজিদ ও গীর্জাঘরে ভারতেশ্বরীর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা হল। এগারটায় কাছারীর সামনে কাঙালদের ভীড় হল। যারা অকর্মণ্য তাদের দেওয়া হল একখানি করে বস্ত্র এবং দু আনা পয়সা। দুপুরে ৬৫টি কীর্তনের দল নগর পরিক্রমা করল এবং পাঁচটায় কাছারীর সামনে মিলিত হয়ে গান বাজনা করল। সন্ধ্যায় আলোকমালা হল। জুবিলি কমিটি রাস্তায় রাস্তায় দীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছিল এবং সরকারী বাড়িগুলি আলোয় আলোয় ঝলমল করল। মিয়া মস্তান ও বালু বাজারে দুটি বড় বড় তোরণ নির্মাণ করে তার উপরে 'গড সেভ্ দি কুইন' লেখা হয়েছিল। কটক প্রিন্টিং কোম্পানির অফিস মনোরমভাবে সাজানো হয়েছিল।

রাত্রি আটটায় কাছারীর সামনে বাঈজীর নাচ হল। কটকের চারটি ও বাঁকুড়ায় একটি দল প্রায় ভোর পর্যন্ত নৃত্য দেখাল। সাহেবরা রাত্রি দশটায় চলে গেল কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সারা রাত নাচ দেখে সকালে বাড়ি গেল। এদিকে চাঁদনী চক, বক্সি বাজার, রাণীহাট ও তেলেঙ্গা বাজারে সারা রাত কৃষ্ণলীলা চলল।

১৭ই কটকের সকল কলেজ ও স্কুল ছাত্র রেভেনশা কলেজে একত্র হয়ে শহর পরিক্রমা করল। রাস্তায় যেতে যেতে একটি জুবিলি সংগীত গাইল, যেটি লিখেছেন রাধানাথ। নন্দিকেশ্বরীর কাজ বন্ধ রেখে অত্যন্ত বিরক্তিভরে এটি রচনা করেছেন তিনি :

জুবিলি সংগীত।
রাগ-খাম্বাজ-তাল-ঝুলা।

আনন্দে আজ গাও সকলে সরবে
ভরে যাক সবদিক আনন্দ রবে।
মাতৃক্রোড় সম কি রাজা কি প্রজা

বাস করে সবে এথা নিরুপদ্রবে ॥
সে মাতা ভিক্টোরিয়া ভারত পূজনীয়া
পঞ্চাশ বছর রাজ করলেন ভবে।
আমাদের তিনি জননী প্রিয়তর
নাই বা করেছেন গর্ভে ধারণ ॥ ইত্যাদি

সেদিন অপরাহ্নে বিভিন্ন আখড়ার পালোয়ানরা কাছারীর সামনের মাঠে কুস্তির দাঁও প্যাচ দেখাল। সাহেবদের জন্য রাত্রে কেল্লার ভিতরে নাটক অভিনীত হল আর বাবুদের জন্য কালীপদ ব্যানার্জীর বাড়ি। এভাবে কটকের দুদিন ব্যাপী জুবিলি উৎসব সম্পন্ন হল।

লোকে আশা করেছিল এবার অন্য কয়েদীদের মতো পুরীর রাজাও মুক্তি পাবেন। যদিও আন্দামান থেকে ৩৩০ জন এবং সারা ভারতে ২৩০৫ কয়েদী মুক্তি পেল পুরীর রাজাকে মুক্তির যোগ্য বিচার করা হল না দুটি কারণে, এক তার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর এবং দ্বিতীয় তিনি দশ বছর সাজা কাটাননি।

পুরী : জুন ১৮৮৭

জুবিলি উৎসবের আগে কলকাতা হাইকোর্ট মন্দির পরিচালনা সংক্রান্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে নির্দেশ দিয়েছিল যে মন্দির পরিচালনার জন্য নিযুক্ত রিসিভার কিম্বা তার অধস্তন কর্মচারী অন্য আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত মন্দির পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করবে না। অন্তিম রায় দেওয়া হল মার্চ মাসে। হাইকোর্ট রিসিভার নিযুক্ত করে কটকের জেলাজজ যে আদেশ দিয়েছিলেন তা রদ করে দিল। কোর্টের যুক্তি জনসাধারণের তরফে কালেক্টর যে আবেদন করেছিলেন তাতে প্রার্থনা করা হয়েছিল মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব একটি কমিটির উপর ন্যস্ত করা হোক কিন্তু কোর্টে যে কাগজপত্র পেশকরা হয়েছিল তার থেকে প্রমাণ হয় না যে মন্দিরের ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ অথবা অপব্যয় করা হয়েছে। সে কারণে মূল মকদ্দমার যাই যথার্থতা থাকুক, রিসিভার নিযুক্ত করার যৌক্তিকতা নেই।

এ সংবাদ পেয়ে সকলে খুশি হল, বিশেষ করে পুরীর জনসাধারণ। মহান্ত রঘুনাথ দাস রিসিভার রইলেন না। শ্রীশ্রীজগন্নাথ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা ২৭শে মার্চ এক সভায় বিষয়টি আলোচনা করে মন্তব্য করল, মহান্ত রঘুনাথ রিসিভার হয়ে অনেক ঝক্কি সয়েছেন, এখন তার থেকে মুক্তি পেলেন; কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এবার তিনি জগন্নাথকে প্রসাদ উৎসর্গ করে ব্রাহ্মণ ভোজন করালে ভাল করবেন।

এই অভিজ্ঞতার একই নির্যাস : সরকার জনহিতে কাজ করতে চাইলেও অনেক

সময় বুঝতে পারে না জনসাধারণের মনের ইচ্ছা কি! পুরীর রাজা যত অপারগ হোন না কেন লোকে চায়নি যে তাঁকে মন্দির পরিচালনা থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। 'এক পাগল' ছদ্মনামে মধুবাবু দীপিকাতে লিখলেন :

পুরাতন কাগজের টুকরো সংগ্রহ করা আমার অভ্যাস। এরকম যত কাগজ জমা করেছি তার মধ্যে একখানিতে এমন একটি ছবি আছে : রাজা শ্রদ্ধার সহিত ঠাকুরের সামনে উপবিষ্ট, তাঁর এক হাত ধরে আছে একজন পুলিশ এবং ক্ষিপ্ত জনতা রাজাকে রক্ষা করার জন্য তেড়ে আসছে!

কলকাতার ষ্টেটসম্যান পত্রিকা আদেশের প্রশংসা করে এই ঘটনাবলীর জন্য ছোটলাট স্যার রিভর্স টমসনকে দোষী সাব্যস্ত করল কারণ তিনি গভীরভাবে চিন্তা না করে এই মকদ্দমা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এপ্রিল মাসে টমসন বিদায় নিলেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন স্যার ষ্টুয়ার্ট বেইলী। কার্যভার গ্রহণ করেই তিনি পুরীর মন্দিরের ব্যাপারে মন দিলেন এবং আলোচনার জন্য মধুসূদন দাস ও কমিশনার সি. মেটকাফকে কলকাতায় ডাকালেন।

১৬ই এপ্রিল সরকারের সেক্রেটারী নোলানের অফিসে বিষয়টি আলোচিত হল। অন্যদের সঙ্গে মধুবাবু এবং মেটকাফ এতে যোগ দিলেন। প্রথমেই নোলান জানিয়ে দিলেন যে রাণীর হাত থেকে মন্দিরের দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া অথবা আর্থিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সরকারের উদ্দেশ্য নয়। তিনি প্রকাশ করলেন যে রাণী হাইকোর্টে আপীল করার আগে মন্দিরের সম্পত্তি ক্রোক করা অথবা রিসিভার নিযুক্তের কথা সরকারের অজানা ছিল। তিনি বললেন বঙ্গ সরকার ব্যাপারটির আপোষ মীমাংসা চান। অবশ্য ভারত সরকার অনুমোদন করলেই তা সম্ভব হবে।

নোলানের অফিস থেকে ফিরে মধুবাবু ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় একখানি পত্র লিখে জনসাধারণকে জানালেন যে সরকার মন্দির সংক্রান্ত বিবাদের আপোষের রফা চান। পত্রখানি পড়ে ছোট লাট বিচলিত হলেন। তিনি বুঝলেন মধুবাবুর উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু ব্যাপারটা আপাতত গোপন রাখলে ভাল হত।

সফল আলোচনা শেষ করে মধুবাবু ওড়িশা ফিরে এসে সূর্যমণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিস্থিতি অবগত করালেন। এ মকদ্দমা নিয়ে রাণী বিশেষ চিন্তিত ছিলেন, এখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন। তিনি ভোলেননি যে তাঁকে এফিডেবিটে দস্তখত করতে কাছারী যেতে বাধ্য করা হয়েছিল কেবল মাত্র তাঁকে অসম্মান করার জন্য। লোকে বলাবলি করল সত্যই বলে বিপদে মধুসূদন! পুরীর রাজার সম্মান রক্ষা করে মধুসূদন এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে দিলেন।

পুরীর মন্দিরের মকদ্দমা রফা করতে রাজী হল ভারত সরকার। তাদের কয়েকটি শর্ত অবশ্য থাকল। জুন মাসে ছোট লাট কমিশনারের মাধ্যমে শর্তের একটি তালিকা সূর্যমণিকে পাঠালেন। বিশেষ শর্ত :

পুরী মন্দিরের দায়িত্ব রাজা মুকুন্দদেবের উপর ন্যস্ত হবে। যতদিন সে সাবালক না হচ্ছে, তার অভিভাবক হিসাবে রাণী সূর্যমণি কার্য নির্বাহ করবেন। এ কাজের জন্য তিনি একজন ম্যানেজার রাখবেন। রাণী ম্যানেজার নিযুক্ত করবেন বটে কিন্তু যদি তাকে বরখাস্ত করতে চান তবে সাতদিন পূর্বে সরকারকে জানাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করবেন।

শ্রীমন্দিরের মকদ্দমা উপলক্ষে শ্রীশ্রী জগন্নাথ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা স্থাপিত হয়েছিল। সে সমস্যার সমাধান নিকটে কিন্তু সভা বিলুপ্ত না হয়ে এটি একটি স্থায়ী অনুষ্ঠানে পরিণত হল। আজকাল প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় বড় আখড়া মঠে সভার অধিবেশন বসে। পুরাণ পাঠ সংকীর্তন আদি হয় এবং বিভিন্ন সাময়িক বিষয় আলোচিত হয়। মন্দির ব্যতিত যে সকল বিষয় আলোচনার আওতায় আসে তা হল, বলপূর্বক ইংরাজী টীকা লাগানো, পায়খানা সাফাই, ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কার্যদক্ষতা ইত্যাদি। এটি এখন পুরী শহরের জাগ্রত অনুষ্ঠান।

এই আনন্দময় বাতাবরণে একটি খবর অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। সে হল দ্বীপান্তরিত রাজা মানসিক ভারসাম্য হারালেন এবং এখন তাঁকে পাগলাগারদে আটকে রাখা হয়েছে।

কটক : অক্টোবর ১৮৮৭

১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল উৎকল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল। প্রতি বছর এই সময়ে কটকের ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব হয়। কটকের ব্রাহ্মরা স্থির করল ১৮৮৭ সালের বার্ষিক উৎসব একটু বিশেষভাবে পালিত হবে। স্থির হল ২৬শে জুন থেকে শুরু হয়ে উৎসব আটদিন চলবে। উৎসবের পুরোধা হবেন মধুসূদন রাও এবং তাঁকে সহায়তা করবেন একাডেমী স্কুলের শিক্ষক সাধুচরণ রায়। প্রতিদিন ব্রাহ্মমন্দিরে প্রার্থনা সভায় পৌরোহিত্য করলেন মধুসূদন রাও। ২রা জুলাই নগর সংকীর্তন হল। সংকীর্তনের দল গঙ্গা মন্দির, দরগা বাজার, চৌধুরী বাজার, বাংকা বাজার, বালুবাজার ঘুরে সমাপ্ত হল মধুসূদন রাও-এর বাড়ীতে। চৌধুরী বাজারে মধুসূদন হিন্দি ও ওড়িয়াতে ভাষণ দিলেন। উৎসবের শেষ দিন ৩রা জুলাই প্রিন্টিং কোম্পানির দোতলায় বক্তারা রামমোহন রায়ের উপর নিজেদের বিচার রাখলেন এবং এর সঙ্গে উৎসব শেষ হল।

তিনটি হিন্দু ছেলে—যারা ব্রাহ্ম নয়—এই উৎসবে যোগ দিয়েছিল। তারা মূলবসন্তের তিনভাই, বিশ্বনাথ, লোকনাথ ও ভোলানাথ কর। লোকনাথ মেডিকাল স্কুলে পড়ে এবং অন্য দুজন একাডেমী স্কুলে। তিনজনে মাঝে মাঝে সাধুবাবুর বাড়ি

যেত এবং কখনও কখনও ব্রাহ্মমন্দিরে মধুসূদন রাও-এর বক্তৃতা শুনত। লোকনাথ প্রতি শনিবার সাধুবাবুর বাড়ি যেত এবং সোমবারে স্কুলে ফিরে আসত।

বলা বাহুল্য, তিনভাই ক্রমে ব্রাহ্মমতের দিকে আকৃষ্ট হল। তারা ব্রাহ্মণদের কোনও কোনও নিত্যকর্ম ত্যাগ করেছিল এবং পৈতা কাঁধের থেকে খুলে গলায় মালার মত পরত। কয়েক মাস পরে তারা গ্রামে গেলে মাতা পিতা তাদের হাবভাব দেখে আশ্চর্য হলেন। তিনজনই বিবাহিত। তাদের শ্বশুরকুলও তাদের আচার ব্যবহারে বিচলিত হলেন। কটকে ফেরার সময় সকলে বোঝাল ব্রাহ্মদের সংসর্গে না আসাই ভাল।

বার্ষিক উৎসব শেষ হবার কিছুদিন পরে নবসংবাদ পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হল :

> কটক মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র শ্রীমান লোকনাথ কর ও শ্রীমান রঘুনাথ সিংহ এবং বিরোল নিবাসী গৃহস্থ শ্রীমান হরেকৃষ্ণ মহান্তি প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতে চেয়েছেন। আগামী ১০ই জুলাই প্রাতঃকাল আট ঘটিকায় উক্ত তিনব্যক্তি গঙ্গামন্দিরের উপাসনালয়ে দীক্ষা নেবেন।
>
> শ্রী মধুসূদন রাও।
> উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

১০ই লোকনাথ দীক্ষা নিল এবং কিছুদিন পরে তার দুই ভাই পৈতা ছেড়ে দিল। এই ঘটনা সারা ওড়িশায় আলোড়ন সৃষ্টি করল। লোকনাথের অপুত্রক কাকা ভোলানাথকে পোষ্য নিয়েছিলেন। তিনি সম্বলপুর জেলার বরগড়ে শিক্ষকতা করেন। লোকনাথের দীক্ষা নেবার খবর পেয়ে তিনি দীপিকায় একখানি দীর্ঘ পত্র পাঠালেন। তিনি ওড়িশার মহান সন্তানদের সম্বোধন করে নিজের মনস্তাপ এভাবে ব্যক্ত করলেন :

আমি এখানে মাসে ২৫ টাকা বেতন পাই। আমার স্ত্রী পুত্র গ্রামে থাকে। ছেলেটি ভালভাবে মানুষ হবে ভেবে সব টাকা তাদের পাঠাই। এখন এই দুর্দশায় পড়ে চিন্তায় ডুবে আছি। এর কোনও উপায় থাকে তো আপনারা বলুন, আপনাদের উপদেশ শিরোধার্য করে নেব। চারদিক তমসাচ্ছন্ন লাগছে, কিছু বোঝার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। সরকারী চাকরির উপযুক্ত একটি ছেলেকে ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত করে চোদ্দটি প্রাণীকে দুঃখার্ণবে ভাসিয়েছে। এই চোদ্দ জনের মধ্যে আছেন, তার মাতা পিতা, মাতামহী, ভার্যা, শ্বশুর শাশুড়ি এবং আমরা দুজন। শ্বশুর শাশুড়ির আঘাত লেগেছে সত্য কিন্তু আমাদের আটজনের দুঃখের অন্ত দেখছি না। এর প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করা হোক।

গৌরীশংকর নিজে ব্রাহ্ম হয়েও দীপিকায় এই দীক্ষা দেওয়ায় সমালোচনা করলেন। সাধুচরণ রায় সম্পাদিত নবসংবাদে দীপিকার মন্তব্যের প্রতিবাদ হল। দীপিকা তাদের যুক্তি খণ্ডন করল।

২০শে জুলাই গোপালজিউ মন্দিরে ভগবদ প্রদায়িনী সভার অধিবেশন হল। সেদিন নন্দোৎসবের দিন। সেই উপলক্ষে প্রথমে সংকীর্তন হল পরে শ্রীমদ ভাগবত থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কাহিনী পাঠ করা হল। কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত না থাকলেও লোকনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা আলোচনা করে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল :

প্রথম, অত্রস্থ মেডিক্যাল কলেজের একটি অপরিণত বয়স্ক ব্রাহ্মণ ছেলেকে ব্রাহ্মমতে দীক্ষা দেওয়া এবং একাডেমী স্কুলের দুজন অপরিণত বয়স্ক ব্রাহ্মণ বালকের সেই ধর্মগ্রহণের প্রস্তুতি স্বরূপ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করায় এ সভা অত্যন্ত দুঃখিত এবং চিন্তিত হয়েছে। এ সভা বিশ্বাস করে যে স্কুলের ছাত্রদের ধর্মান্তর নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা উচিত। তা না হলে এই অনুন্নত প্রদেশে শিক্ষার ব্যাঘাত হবে।

দ্বিতীয়, জেলা স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর এখানকার ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হয়ে উল্লিখিত বালকদের একজনকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন এবং একাডেমী স্কুলের দুজন ছাত্রকে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করতে প্ররোচনা দিয়েছেন বলে জনসাধারণের বিশ্বাস। অতএব, এ সভা বিশ্বাস করে যে সরকারের উদার নীতির সঠিক প্রতিপালন হয়নি। এর প্রতিকার আবশ্যক।

তৃতীয়, এই বিষয়গুলির বিহিত প্রতিকারের জন্য জনসাধারণের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদন পত্র কমিশনারের মাধ্যমে সরকারকে পাঠানো হোক। তার প্রতিলিপি স্কুলবিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় কটকের কালেক্টর এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে দেওয়া হোক।

প্রস্তাবগুলি পাশ করাতে মুখ্য ভূমিকা নিলেন রামশংকর রায়, গোবিন্দ রথ ও কপিলেশ্বর নন্দশর্মা প্রমুখ। পুরীর পণ্ডিত মার্কণ্ডেয় মহাপাত্র আপত্তি তুলেছিলেন যে কার্যক্রমের বহির্ভূত বিষয়ে প্রস্তাব পাশ করা ঠিক নয় কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কান দিল না।

ব্যাপারটির তাৎপর্য কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেওয়া নয় তার অধিক। প্রশ্ন উঠল শিক্ষা বিভাগে কার্যরত থেকে সক্রিয়ভাবে ধর্মপ্রচারে যুক্ত থাকা কতটুকু সঙ্গত। ললিতমোহন চক্রবর্তী পিতামাতার মানা না শুনে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেছেন। তিনিও মধুসূদন রাও এবং সাধুচরণের কঠোর সমালোচনা করলেন।

শিক্ষা বিভাগ ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের প্রশ্ন নিয়ে যখন বাদবিসম্বাদ চরমে তখন আর একটি ঘটনা লোকের আলোচনার ইন্ধন জোগাল। পুরী জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না দিয়ে রাধানাথ বিজয় চন্দ্র মজুমদারকে সেই পদে নিযুক্ত করলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক এবং কিছুদিন বামণ্ডায় কাজ করেছেন। এই নিযুক্তি নিয়ে সকলে রাধানাথের সমালোচনা করল। সমালোচনার একটি অনিশ্চিত কারণও ছিল। গুজব যে বিজয়চন্দ্র অনতিকালের মধ্যে মধুসূদন রাও-এর জামাতা হবেন।

পুরী : ডিসেম্বর ১৮৮৭

মন্দির পরিচালনার জন্য নিযুক্ত রিসিভার সরে গেল এবং পূর্বাবস্থা ফিরে এল। মন্দিরের পরিচালনা জন্য একটি কমিটি নিযুক্তির ব্যাপার নিয়ে যে মকদ্দমা চলছিল তার আপোষ রফার প্রয়াস শিথিল হয়ে গেল। শ্রীশ্রী জগন্নাথ সনাতন ধর্মরক্ষিনী সভা মন্দির পরিচালনায় সমস্যা ভুলে এখন অন্য বিষয়ে মন দিল যথা মন্দিরে টিনের ঘি ব্যবহার করা ঠিক কি না, মন্দিরের ভিতরে চুরির সমস্যা, লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

১৮৮৭ সালের ২৫ আগষ্ট আন্দামানে যক্ষারোগে দিব্যসিংহের মৃত্যু হল। খবরটি পুরী আসতে অনেক সময় লাগল, জানা গেল যখন তার ওয়ারেণ্ট পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পুরী ফিরে এল। ২১শে নভেম্বর পর্ণদাহ করিয়ে তিনদিনে শ্রাদ্ধ শান্তি করালেন সূর্যমণি। দ্বাদশ দিনে এক হাজার জন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে এক আনা করে দক্ষিণা দিলেন। তার পরের দিন পুরীর সকল মঠের সন্ত মহান্তদের ভোজন করালেন।

যদিও কয়েক বছর আগে মুকুন্দর নামে অংক কাটা হয়েছিল, দিব্যসিংহ বেঁচে ছিলেন বসে সে অংক কেউ মানত না। দিব্যসিংহের মৃত্যুর খব পেয়ে সে অংক সকলে মেনে নিল। জগন্নাথের দর্শনার্থী তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে অধুনা প্রকাশিত 'ওড়িয়ার' প্রথম সংখ্যায় দিব্যসিংহের ৩৫তম অংক লেখা হয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যায় মুকুন্দদেবের নয় অংকের উল্লেখ হল।

দিব্যসিংহের শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেলে মধুবাবু পুরী এলেন মকদ্দমা রক্ষার ব্যাপারটি সূর্যমণির সঙ্গে আলোচনা করতে। দরজার আড়ালে বসে সূর্যমণি শলা পরামর্শ করলেন। তারপরে মধুবাবু সরকারকে পাঠাবার জন্য একটি আপোষ নামার মুসাবিদা প্রস্তুত করলেন। তাতে ছিল :

কটকের জজকোর্টের সেরিস্তাদার বাবু হরেকৃষ্ণ দাসকে রাণী ম্যানেজার নিযুক্ত করবেন। মন্দির পরিচালনার জন্য যে বন্দোবস্ত এখন হবে তা মুকুন্দ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। ম্যানেজার মন্দির পরিচালনা ও জমিজমা দেখাশুনা করবেন। ১৮৮০ সালের দশ আইন অনুসারে মন্দির পরিচালনার অধিকার থাকবে মুকুন্দর। সে যতদিন না সাবালক হচ্ছে ততদিন তার তরফে সূর্যমণি কার্য নির্বাহ করবেন। মন্দিরের জমির খাজনা বাড়াতে হবে। ইত্যাদি।

রাজবাড়ি থেকে যাবার আগে মধুবাবু একবার মুকুন্দকে দেখতে চাইলেন। মুকুন্দ এখন দশ বছরের বালক। সেও বাবার মতো পড়াশুনা না করে চাকরদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। পশুপাখির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। একদল শূয়োর তার সর্বাধিক প্রিয়। এখন সে শূয়োরের খাঁচার কাছে ছিল এবং হাজার ডাকলেও সেখান থেকে নড়ল না। যার জন্য এত পরিশ্রম করছেন মধুবাবু তাকে না দেখেই কটকে

ফিরে গেলেন। রাণীর তরফ থেকে কমিশনারের অফিসে আপোষনামা পেশ হল ৫ই ডিসেম্বর।

দরখাস্তটি দাখিল করার কিছুদিন পরে গৌরীশংকরের সঙ্গে মধুবাবু উৎকল সভার প্রতিনিধি হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগ দিতে গেলেন।

কটক : জুন ১৮৮৮

রাধানাথের 'চন্দ্রভাগা' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। পরের বছর নভেম্বর মাসে প্রকাশ পেল তাঁর 'নন্দিকেশ্বরী'। কাব্যটি উৎসর্গ করলেন বামণ্ডার রাজা বাসুদেব সুঢলদেবকে। রাধানাথ তাঁকে লিখলেন এই কাব্যের নায়ক আপনার পূর্বপুরুষ। উক্তিটি অতিরঞ্জিত কারণ এর নায়ক চোরবাঙ্গদেবের সঙ্গে ঐতিহাসিক রাজা চোলগঙ্গদেবের কোনও সম্পর্ক নেই। সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনা বিদেশী সাহিত্যের কিছু চরিত্র এবং নিজের কল্পনার মিশ্রণ এ কাব্য। পুস্তক রচনায় অনেক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করেছিলেন রাধানাথ। আশা করেছিলেন পুস্তকখানি জনপ্রিয় হবে। কিন্তু নন্দিকেশ্বরীর নায়িকা রাজকন্যা, দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী এবং পিতৃদ্রোহী। তাঁর শত্রুর কাছে প্রেম ভিক্ষা লোকের মনঃপূত হল না। উৎকল ভারতী অবশ্য মন্তব্য করল কাব্যটি কণ্ঠহারের উত্তম মণি কিন্তু অনেকের মতে এতে প্রণয়ের যে চিত্রণ হয়েছে তা অসংযত বেপরোয়া স্বার্থ সর্বস্ব এবং কামান্ধ। এমন কুরুচিপূর্ণ কলুষিত প্রণয়লীলা উৎকল সাহিত্য জগতে বাঞ্ছনীয় নয়। সমালোচনা পড়ে রাধানাথ দুঃখ পেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন ওড়িয়াতে ভবিষ্যতে আর কিছু লিখবেন কিনা।

এদিকে শিক্ষাবিভাগের কার্যকলাপও সমালোচনার বিষয় হয়ে রইল। বিজয় চন্দ্রের নিযুক্তি নিয়ে বাদানুবাদের মধ্যে বালেশ্বরের বারবাটী স্কুলের এক গোলমালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন রাধানাথ। এই স্কুলের পরিচালনা নিয়ে বৈকুণ্ঠনাথ দে ও ভগবান চন্দ্র দাসের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। রাধানাথ বৈকুণ্ঠনাথ দের পক্ষ নিলেন। বৈকুণ্ঠনাথের স্বত্ব প্রমাণ করার জন্য রাধানাথ 'ওড়িয়া' পত্রিকায় ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখলেন। এবং অনেককে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দেখালেন। শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে এ কাজ করা অত্যন্ত গর্হিত। রাধানাথের নিরপেক্ষতার উপরে কটাক্ষ করে দীপিকা মন্তব্য করল, কতকাল আর বিড়াল চোখ বুঁজে দুধ খেয়ে যাবে!

এবার অভিযোগ হল তিনি নিযুক্তিতে প্রিয়াপ্রীতি তোষণ করছেন। অন্য যোগ্য লোককে উপেক্ষা করে তিনি পরীক্ষকের কাজের জন্য নিজের সমর্থক সাধুচরণ রায়, বিশ্বনাথ কর, নিজের কেরাণী জগন্নাথ রাও (যে মধু রাও-এর ভাই) এবং মধুরাও-এর ভাবী জামাতা বিজয় চন্দ্র মজুমদারকে নিযুক্ত করছেন। রাধানাথ ও মধুসূদনের যোগ

সাজশে দুর্নীতি ভরে গেছে শিক্ষাবিভাগে। লোকে বিদ্রূপ করে বলে এ দুজন শিক্ষাবিভাগের বড়লাট ও ছোট লাট!

মধুরাও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। রাধানাথ তাঁকে নিরস্ত করার প্রয়াস করেননি। এজন্য তার সমালোচনা হল। লোকনাথ কর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলে ভগবদ ভক্তি প্রদায়িনী সভা যে প্রস্তাব পাশ করেছিল তার প্রতিলিপি পেয়ে কালেক্টর আদেশ দিলেন যে সরকারের উচ্চপদে থেকে ধর্মপ্রচারে লিপ্ত থাকা অনুচিত এবং মধুসূদন এ কাজ বন্ধ করবেন। ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার থেকে আদেশ এল :

বাবু মধুসূদন রাও চাকরিতে থেকে ব্রাহ্মধর্মের আচার্য বা পুরোহিতের কাজ করতে পারবেন না বলে কালেক্টর যে আদেশ দিয়েছেন সরকার তা অনুমোদন করছে।

মে মাসের সংবাদবাহিকা লিখল :

জয়েণ্ট ইনস্পেক্টর রাধানাথ রায় কোথায়ও একটি খালি পদ থাকলে খাঁটি ওড়িয়াদের উপেক্ষা করে চুপিসারে নিজের জ্ঞাতি ভাইদের একজনকে অথবা মুষ্টিমেয় আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কাউকে নিযুক্ত করে দেন। এমনকি ইনস্পেক্টিং পণ্ডিতের পদ যা এতদিন খাঁটি ওড়িয়াদের একচেটিয়া ছিল তাতে আজকাল শালা ভগ্নিপতিদের সুযোগ দিচ্ছেন।

জুন মাসে মধুরাও বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তীর বিবাহ দিলেন। প্রমাণ হল যে বিজয়চন্দ্রের নিযুক্তির সময় লোকে যে মন্তব্য করেছিল তা অমূলক নয়।

এই উদবেলিত মানসিক অবস্থায় শেখবাজারের বাড়িতে মেঝের উপরে বীরাসনে বসে রাধানাথ 'উষা' কাব্য রচনায় মন দিলেন। নানা অশান্তির মধ্যে সাহিত্য রচনাই তাঁকে সামান্য সান্ত্বনা জোগায়।

পুরী : ডিসেম্বর ১৮৮৮

২৬শে জুলাই সরকার কটকের কমিশনারকে জানাল যে এবার কালেক্টর এবং রাণী সূর্যমণি জেলা আদালতে একটি রাজী নামা পেশ করুন। এ খবর পাঠাবার আগে মধুবাবু রাণীর কাছ থেকে একখানি পত্র পেলেন। রাণী লিখেছেন, রথ যাত্রার দিন ৩১শে জুলাই কোথা থেকে একটি কাক উড়ে এসে জগন্নাথের ডান হাতের উপরে বসল। এটা কি ভাবী অমঙ্গলের সংকেত? এখন কি করা বিধেয়? মন্দিরের মামলায় মধুবাবু অনেক সময় দিয়েছেন। এখন চিঠিটি পেয়ে একটু বিরক্ত হলেন। জবাবে লিখলেন অনিষ্ট এড়াতে হলে তাড়াতাড়ি রাজীনামায় স্বাক্ষর করতে হবে।

কমিশনারের নির্দেশ পেয়ে কালেক্টর আপোষনামা প্রস্তুত করালেন। পুরীতে

এখন নতুন কালেক্টর। মামলাটি যখন দায়ের হয় তখন এক্টিং কালেক্টর ছিলেন স্যাভেজ। তার পরে এলেন জোনস যিনি গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন। এবার খুর্দার এস. ডি. ও. টেলর এলেন কালেক্টর হয়ে।

যে আপোষনামা প্রস্তুত হল তার মর্ম :

বাদী কালেক্টর পুরী এবং প্রতিবাদী সূর্যমণি পাটমহাদেবী এবং প্রতিবাদী দুই ও তিন মুকুন্দ দেব ও নীলাদ্রী মহাদেবীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে তাঁরা উপরোক্ত মামলার আপোষ মীমাংসা করে নিম্নলিখিত রাজীনামা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের প্রার্থনা কোর্ট এই রাজীনামা মঞ্জুর করুন। পুরীর মন্দিরের পরিচালনার দায়িত্ব রাজা মুকুন্দ দেবের হাতে থাকবে। কিন্তু তাঁর নাবালক অবস্থায় তাঁর পিতামহী সূর্যমণি পাট মহাদেবী মন্দিরের কাজ তদারক করবেন। তিনি একজন দক্ষ ম্যানেজার রাখবেন। সেবকরা যাতে ঠিকভাবে কাজ করে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া, যাত্রীরা যাতে স্বচ্ছন্দে মন্দিরে যেতে আসতে পারে তা দেখা, স্বাস্থ্যকর মহাপ্রসাদ তৈরী হচ্ছে কিনা তা দেখা ইত্যাদি ম্যানেজারের কর্তব্যভুক্ত হবে। রাণী যদি ম্যানেজারকে বরখাস্ত করেন তবে অল্প দিনের মধ্যে অন্য একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করবেন। এমন না করলে কোর্ট ম্যানেজার নিযুক্ত করবে। মুকুন্দ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবত থাকবে।

কালেক্টর ও রাণীর হস্তাক্ষরযুক্ত দরখাস্তটি ৩রা অক্টোবর জেলা আদালতে পেশ হল। ডিসেম্বরে মামলা আদালতে উঠল। বাদীর তরফে হরিবল্লভ বসু ও লালবিহারী ঘোষ উপস্থিত হলেন। প্রতিবাদীর তরফে মধুসূদন দাস এবং রামশংকর রায়। জেলা জজ আবেদন স্বীকার করে ডিক্রি দিলেন। এতদিনে মন্দিরের মামলার অবসান হল।



এগার

কেন্দুঝর : জুন ১৮৯১

চল্লিশ বছর আগে রেভেনশা ধনুর্জয় নারায়ণ ভঞ্জকে কেন্দুঝরের গদিতে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এত বছরেও রাজা ভূঁইয়াদের বশে আনতে পারেননি। রাজা হয়ে ধনুর্জয় অত্যাচার শুরু করেছিলেন। সেজন্য পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

ভূঁইয়াদের অসন্তোষের মূল কারণ তাদের বেগার খাটতে হয়। রাজা অথবা রাজার লোক ভূঁইয়াপীড় পেলে তাদের বেগার খাটতে হয় এবং বিনামূল্যে রসদ জোগাতে হয়। মাঝে মাঝে রাজার মালপত্র বয়ে নিয়ে রাজ্যের বাইরেও যেতে হয়। রাজার ঘরবাড়ি মেরামত করে তারা পারিশ্রমিক পায় না। পূজা পার্বণের সময় মাগনা ছাগল দিতে হয়। বেগার খাটার জন্য শয়তানী করে রাজার লোক দূর গ্রাম থেকে লোক ডাকে যদিও নিকটের গ্রামে লোক পাওয়া যায়। এজন্য তাদের অনেকদিন বাড়ি ছেড়ে থাকতে হত, চাষবাসের ক্ষতি হয়। চার বছর আগে রাজার বিবাহের সময় মালপত্র বয়ে পাটনায় যেতে হয়েছিল এবং মাসাধিককাল তারা বাড়ি থেকে দূরে থেকেছিল। তার উপরে এক বছর আগে রাজা ঘর ও লাঙ্গল পিছু কর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে উৎপীড়িত হয়ে ভূঁইয়াদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছিল।

১৮৯১ সালে রাজা মাছকাঁদনা জোর থেকে পাহাড় কেটে নিজের জমি সেচনের জন্য একটি খাল বানালেন। এর জন্য লোকদের শুধু যে বেগার খাটতে হল তাই নয়, তাদের খেতেও দেওয়া হল না। তারা বাড়ি থেকে চাল এনে রান্না করে খায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শাবল দিয়ে পাথর কাটার মধ্যে দু ঘণ্টার বিরাম, রান্না করে খাবার জন্য। গরীব যারা চাল নিয়ে আসে না তারা অনাহারে কাজ করে। একটু শিথিলতা দেখালে মার খায়।

অত্যাচার অসহনীয় হলে ভূঁইয়ারা একটি পঞ্চায়েত ডাকল। খবর পেয়ে ধনুর্জয় তার এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজারকে সদলবলে সেখানে পাঠাল। সে গিয়ে প্রায় সত্তর জন ভূঁইয়াকে ধরে আনল। তাদরে দশজনকে ফাঁসি দেওয়া হল। ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম গোপাল নায়ক। তার ছোট ভাই ধরণীধর সিংহভূমে জরীপের কাজ করে। ভূঁইয়াদের মধ্যে সেই সব থেকে শিক্ষিত। সে কটকে তালিম পেয়ে এখন চাকরি করছে। ধনুর্জয় দেড় বছর তাকে দিয়ে বিনা বেতনে কাজ করিয়ে নিয়েছেন। তার পরে ধরণীধর ময়ূরভঞ্জে পালিয়ে যায় এবং সেখানে কাজ আরম্ভ করে। কেন্দুঝর এবং সিংহভূমের মধ্যে সীমা বিবাদ শুরু হলে ধনুর্জয় তাকে ডেকে সীমান্তে কাজ করতে পাঠালেন। বড়ভাইকে রাজার লোক ধরে এনেছে শুনে সে কেন্দুঝরে ফিরে

পরিস্থিতি সমীক্ষা করে ভূঁইয়াদের নেতৃত্ব নিল। সে কমিশনার ও বাংলা সরকারকে ধনুর্জয়ের উৎপীড়নের কথা লিখে জানাল কিন্তু কোনও ফল হল না। তখন সে একটি পঞ্চায়েত ডাকল। তাতে ভূঁইয়া জুয়াঙ্গ এবং অন্যান্য উৎপীড়িত লোক যোগ দিল। এবারও এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার গিয়ে অনেককে বেঁধে নিয়ে এল কিন্তু ধরণী ফেরার হল।

প্রজারা ঠিক করল এবার তারা খোলাখুলি বিদ্রোহ করবে। প্রায় এক হাজার ভূঁইয়া ও কন্ধ চমকপুরে হানা দিয়ে সেখানকার কনষ্টেবল এবং পাইকদের বেঁধে গ্রাম লুট করল। তার পরে একে একে কালিকাপ্রসাদ নয়াপাট ইত্যাদি গ্রাম লুট করে পাইক ও সর্দারদের ধরণীধরের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করল। কেন্দুঝর গড়ের রাস্তা বন্ধ করে পাহারা বসিয়ে দিল। ভীত রাজা ৭ই মে কেন্দুঝর ছেড়ে পঞ্চাশ মাইল দূরে আনন্দপুর চলে গেলেন।

কেন্দুঝরের ম্যানেজার ফকীরমোহন সেনাপতি আনন্দপুরে বাস করেন। অনেকদিন আগে তিনি পাললহড়ার চাকরি ছেড়ে এসেছিলেন। সেখানে কাজের বিশেষ চাপ ছিল না। মহাভারত অনুবাদ করে আর পাশা খেলে কত সময়ই কাটানো যায়! তাছাড়া তিনি পান খেতে ভালবাসেন যা পাললহড়ায় পাওয়া যায় না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে বালেশ্বরে চলে এসেছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে অর্থাভাব হলে আবার গেলেন নন্দকিশোর দাসের কাছে। কিন্তু কেন্দুঝরের ম্যানেজারের পদটি পাইয়ে দিয়েছিলেন। আনন্দপুরে থেকে তিনি কাজ চালান।

ধনুর্জয় আনন্দপুর চলে আসবার আগেই ফকীরমোহন পত্রবাহকের হাতে রাজার একখানি পত্র পেয়ে পরিস্থিতির বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। চিঠি আসার দুদিন পরে রাজা স্বয়ং এসে হাজির হলেন রাত্রি নটায়। তার বসবাসের ব্যবস্থা করে ফকীরমোহন কমিশনারকে ঘটনার বিবরণ দিতে কটক যাত্রা করলেন। সেদিন রাত্রি যাপন করলেন কাঁটাঝরিতে। পরের দিন ব্রাহ্মণী নদী তীরে হাতি ছেড়ে ষ্টীমার ধরলেন এবং তৃতীয় দিন কটকে এলেন।

এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট নন্দকিশোর দাসের সঙ্গে দেখা করে ফকীরমোহন কমিশনার জি. টয়েনবীর কাছে গেলেন। টয়েনবী ধনুর্জয়ের অত্যাচারের কথা জানতেন। তিনি ফকীরমোহনকে দু কথা শুনিয়ে দিলেন। অনেক বুঝিয়ে, অনুনয় বিনয় করে শেষ পর্যন্ত ফকীরমোহন কমিশনারকে রাজী করালেন যে একশ সিপাহী নিয়ে বালেশ্বরের এস. পি. যাবেন ধনুর্জয়কে সাহায্য করতে।

এ খবর নিয়ে ফকীরমোহন ফিরে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় টাঙ্গীতে দেখলেন অন্যদিক থেকে ধনুর্জয় আসছেন। ঠিক হল এতদূর যখন এসেছেন ধনুর্জয় কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই ফিরবেন। ধনুর্জয় এক বস্ত্রে বেরিয়ে পড়েছিলেন সঙ্গে এমন কাপড়জামা নেই যা পরে কমিশনারের কাছে যাওয়া চলে। দর্জি ডেকে রাতারাতি কাপড় সেলাই

করা হল এবং পরের দিন ধনুর্জয় কমিশনারে কাছে গেলেন। টয়েনবী বিরক্ত হয়ে বললেন তিনি আর কিছু করতে পারবেন না। ধনুর্জয় বললেন তাঁর পরিবার অসুরক্ষিত সুতরাং সাহায্য না করলে তাঁর আর উপায় কি? সরকার তাঁর জন্য যা করবেন তার খরচ তিনি বহন করবেন।. অবশেষে টয়েনবী সহায়তা করতে রাজী হলেন। স্থির হল চাঁইবাসার ডেপুটী কমিশনার ডসন সেনা এবং পুলিশ সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করবেন। টয়েনবী এই মর্মে একটি তারবার্তা কলকাতায় পাঠালেন। আশ্বস্ত হয়ে ধনুর্জয় এবং ফকীরমোহন আনন্দপুর ফিরে গেলেন।

এদিকে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল প্রায় কুড়ি হাজার. অনেক গ্রাম লুটপাট করে তারা ১২ই মে গড় আক্রমণ করল। পাইকদের প্রতিরোধের জন্য গড়ে ঢুকতে পারল না বটে কিন্তু গড়ে যাবার সব রাস্তা বন্ধ করে দিল। ইন্দ্রছত্র এবং রাইসুঁয়া পাহাড়ে অনেক পাইকদের বন্দী করে রাখল। ক্রমে অনেক জমিদার ও পাইক রাজার পক্ষ ছেড়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল।

ধনুর্জয় এবং ফকীরমোহন আনন্দপুর অঞ্চল থেকে পাইক সংগ্রহে লেগে গেলেন। অতি কষ্টে তিনশ বৃদ্ধ নির্জীব আধ কানা পাইক জোগাড় হল। তাদের বন্দুকে জঙ্গ লেগেছে, তরোয়ালগুলি ঝাঁজরা। স্থির হল ধনুর্জয় আনন্দপুরে থাকবেন এবং ফকীরমোহন সদ্য একত্রিত অর্ধমৃত পাইক বাহিনী নিয়ে গড়ের অবরোধ ভাঙতে যাবেন। তদনুসারে আড়াইশ পাইক, চারজন কনষ্টেবল এবং তিনটি হাতি নিয়ে ১৩ই মে অভিযান শুরু করলেন।

পরের দিন বসন্তপুর ঘাঁটির কাছে বিদ্রোহীরা ফকীরমোহন ও তাঁর বাহিনীকে ঘিরে ফেলে তাঁর পাইক ও কনষ্টেবলদের বন্দুক খালি করে ফকীরমোহনকে নিয়ে হাজির করল ধরণীধরের কাছে। সে এখন বিদ্রোহীদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। গুজব যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাকে পোষ্যপুত্র করে রাজা হবার জন্য কেন্দুঝর পাঠিয়েছেন। রাজার অত্যাচারী কর্মচারীদের উপর বিদ্রোহীর এমন ক্রোধ যে তারা ফকীরমোহনকে মেরে ফেলতে পারত কিন্তু ফকীরমোহনের উপস্থিত বুদ্ধি তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। তিনি বললেন তিনি ধনুর্জয়কে মানেন না এবং তার চাকরি ছেড়ে ধরণীধরের কাছে এসেছেন তাকে রাজা মানেন বলে এবং তার চাকরি করার আশায়। তিনি কত বেতন পাবেন তাও জানতে চাইলেন। ধরণীধর ঘোষণা করল ফকীরমোহন সাত মাণ নিষ্কর জমি পাবেন।

ফকীরমোহন ভাবতে লাগলেন কেমন করে ধরণীকে ধরিয়ে দেওয়া যায়। তিনি ধনুর্জয়কে গড়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ধরণীধর এখন এ অঞ্চলের সর্বেসর্বা। সে নিজেকে কেন্দুঝরের টিকায়েত বলে দাবী করে চতুর্দিকে পরোয়ানা পাঠাল। এবং রসদ আদায় শুরু করল। তার লোকেরা জেল থেকে সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দিল এবং ট্রেজারী লুট করল।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে চাইবাসার ডি.সি. ডসন কলকাতা থেকে সৈন্য সাহায্য চাইলেন। ২১শে মে ডসন মিলিটারী এবং পুলিশ বাহিনী নিয়ে চক্রধরপুর থেকে রওনা হলেন। পরের দিন তিনি জয়ন্তীগড়ে পৌঁছলেন। অন্যদিক থেকে বালেশ্বরের এস. পি. গাইজ ধনুর্জয়কে নিয়ে এসে গেলেন। ডসন খবর পেয়েছিলেন যে বিদ্রোহীরা রাজার অস্ত্রাগার কব্জা করে গড়ে ঢোকার জন্য তোপ বসিয়েছে। সঠিক অবস্থা জানবার জন্য তিনি সাব ইনস্পেক্টর শশীভূষণ রায়কে পাঠালেন। তিনি কিন্তু বিদ্রোহীর হাতে বন্দী হলেন। তারা তাঁকে ধরণীর কাছে নিয়ে গেল।

ফকীরমোহন ও শশীভূষণ চক্রান্ত করে ধরণীধরকে বোঝালেন যে সে যদি সাহেব অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবে তাঁরা তাকে রাজগদিতে বসিয়ে দেবেন। খবর এল যে ইংরেজ বাহিনী রাইসুঁঘার দিকে এগিয়ে আসছে। ফকীরমোহন ধরণীধরকে আজব পোশাকে সাজিয়ে, সামান্য কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে পাঠালেন ডসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আধা রাস্তায় ধরণী ডসনের মুখোমুখি হল। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য হাতি থেকে নামতেই ডসনের ফৌজ তাকে ঘিরে বন্দী করে ফেলল। তারা রাইসুঁয়াতে ধরণীধরের ঘর পুড়িয়ে দিল এবং ফকীরমোহন ও অন্যান্যদের মুক্ত করল। ডসনের ফৌজ বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করল এবং সকলকে বন্দী করল। ডসন এবার গড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেদিন গাইজের সঙ্গে ধনুর্জয়ও গড়ে এসে পৌঁছালেন। বিনা বাধায় ধনুর্জয় গড়ে প্রবেশ করলেন।

লোকের অভাব অসুবিধা জানার জন্য ১৬ই জুন টয়েনবী কেন্দুঝরে এলেন। খোঁজ খবর নিয়ে তাঁর উপলব্ধি হল যে ধনুর্জয় কেন্দুঝরে থাকলে গোলমাল হতে পারে। টয়েনবী স্থির করলেন, ধনুর্জয় কটকে থাকবেন এবং কেন্দুঝরের ম্যানেজার হবেন একজন সাহেব এইচ. পি. ওয়ালী।

কটকে ধরণীধরের বিচার হল। তাকে পেনাল কোডের ১২৪, ১২৭ এবং ৩৪০ দফা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

আনন্দপুর : মার্চ ১৮৯২

কেন্দুঝরের সমস্যার কিন্তু ইতি হল না। রাজগদি ফিরে পাবার জন্য ধনুর্জয় কমিশনারের কাছে আবেদন করলেন। মধুসূদন দাস তাঁর পক্ষে যুক্তি দেখালেন কিন্তু টয়েনবী আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। এবার মধুসূদন ছোটলাটের কাছে আর্জি দিলেন। তাঁর বক্তব্য ধনুর্জয় অত্যাচারী ছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই। ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট স্থির করলেন তিনি স্বয়ং সরেজমিনে তদন্ত করে সমুচিত পদক্ষেপ নেবেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে ছোট লাট যখন কটক যাচ্ছিলেন তখন কেন্দুঝরের প্রায় দুশ

লোক ভদ্রকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের অসুবিধার কথা জানাল। কটকে পৌঁছে ছোটলাট টয়েনবী, ওয়াইলী এবং ধনুর্জয়ের সঙ্গে কেন্দুঝরের পরিস্থিতি সমীক্ষা করলেন। টয়েনবী এবং ওয়াইলী এই মত ব্যক্ত করলেন যে ধনুর্জয়কে কেন্দুঝরে ফিরতে দেওয়া ঠিক হবে না। সকলের মত শুনে ছোটলাট স্থির করলেন ধনুর্জয় কেন্দুঝরে ফিরে যাবেন কিন্তু সঙ্গে যাবে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট যার হাতে অনেক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। নন্দকিশোর দাসকে পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত করা হল। স্থির হল ওয়াইলী কেন্দুঝর থেকে চলে যাবেন। ফকীরমোহন প্রজাদের মধ্যে অপ্রিয়; সুতরাং তিনি পদ ছেড়ে দেবেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন বাবু দুর্গাদাস ব্যানার্জী।

কলকাতা ফেরার পথে ছোটলাট ভদ্রকে পৌঁছালে ফকীরমোহন ডাকবাংলোতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁকে দেখে ছোটলাট মামুলী লৌকিকতা করে বললেন, 'তুমি কখন এলে, ভাল আছ?' ব্যস আর কিছু না। তিনি জেলখানা পরিদর্শনে বেরিয়ে গেলেন। ফকীরমোহন বুঝলেন এমন ব্যবহারের একই অর্থ, তাঁর চাকরি গেছে।

ছোটলাট কলকাতা ফিরে গেলেন। ওয়াইলী আর কেন্দুঝরে ফিরলেন না, ময়ূরভঞ্জ চলে গেলেন। যাবার আগে উনিশটি হাতি ফকীরমোহনের জিম্মায় দিয়ে গেলেন।

ফকীরমোহন শেষবারের মত আনন্দপুর গেলেন হাতি ও নিজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে। তাঁর মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কারণ আর একবার বেকার হতে চলেছেন। সঙ্গে কাগজ পেন্সিল আছে। হাতির পিঠে বসে আনন্দপুর যেতে যেতে তিনি এ দুটির সদ্ব্যবহার করলেন। ভাবলেন ওড়িশায় যত সাহিত্যিক এবং প্রখ্যাত ব্যক্তি আছেন তাঁদের তালিকা প্রস্তুত করবেন। এও ভাবলেন যে কেবল মাত্র নামের তালিকা পড়ে লোকে আনন্দ পাবে না। সকলের গুণাবলীর উপরে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলে তালিকাটি সুপাঠ্য হবে। কাগজে 'ওঁ' লিখে শারলা বন্দনা থেকে এভাবে শুরু করলেন :

বন্দি গো শারলা মাতা ঝাঁকড় বাসিনী।
বিনা করে তুমি দেবী সুবুদ্ধি দায়িনী। ইত্যাদি।

আনন্দপুর আসতে লেখা অর্ধেক শেষ হল। হাতি থেকে নেমে যেটুকু লেখা হয়েছে তাই ছাপাতে পাঠালেন। লেখাটির নাম দিলেন 'উৎকল ভ্রমণং' কারণ এতে ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলের কথা আছে। ছাপার কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখাও চলতে লাগল। রাত্রি দশটায় শেষ হল 'উৎকল ভ্রমণং'। পরের দিন সন্ধ্যায় লেখাটি পুস্তকাকারে প্রেস থেকে এসে গেল।

ইতিমধ্যে, মধুসূদন দাস ও নন্দকিশোর দাস এসে পৌঁছলেন। তাঁদের দেখলে মনে হয়ে দিগ্বিজয় করে এসেছেন। ফকীরমোহনের কিন্তু মন ভারাক্রান্ত। চাকরি যাবার থেকে যেটি তাঁর কাছে অধিক বেদনাদায়ক লাগল সেটি তার পোষা কুকুরের মৃত্যু সংবাদ। নন্দকিশোরের উপস্থিতিতে তিনি অফিস, খাজনাখানা ও তহবিলের দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর সকলকে 'উৎকল ভ্রমণং'-এর একখানি করে কপি উপহার

দিলেন। সবকিছু ভুলে মধুবাবু বইখানি পড়তে শুরু করলেন। এতে তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে :

এস হে মিষ্টার এম. এস্. কর শেকহ্যাণ্ড,
তোমার লাগি উৎকল, হল মাদারল্যাণ্ড। ইত্যাদি।

নন্দকিশোর নিজের বিষয়ে পড়ে প্রীত হলেন :

হে নন্দকিশোর সর্বগুণে নিপুণ,
গাইব তোমার যশ নাই এত গুণ। ইত্যাদি।

বইটি আদ্যোপান্ত খুঁজেও ধনুর্জয় কেন্দুঝরের উল্লেখ দেখলেন না যদিও, দাশপাল্লা, আঠগড়, তালবের, বামণ্ডা, ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদি অনেক রাজ্যের রাজার নাম আছে। সেদিন অর্ধরাত্রে হাতি চড়ে আনন্দপুর ছেড়ে এলেন ফকীরমোহন। সঙ্গে আছে বাণ্ডিল বাঁধা পাঁচশ কপি 'উৎকল ভ্রমণং'। ভেবেছেন বালেশ্বরে এগুলি বিতরণ করবেন। এখন আর দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন না, কেমন করে বালেশ্বর পৌঁছবেন সেই চিন্তা। রাত্রি শেষে তিনি কেন্দুঝরের সীমান্তে বসন্তিয়া পৌঁছবেন। ধনুর্জয়ের নির্দেশ, হাতি এখান থেকে ফিরে যাবে।

কটক : জুন ১৮৯২

'উৎকল ভ্রমণং'-এর কপি ডাকযোগে পেলেন রাধানাথ। পুস্তকটি এখন শিক্ষিত মহলের চর্চার বিষয়ে। ফকীরমোহনের তালিকা থেকে কোনও জানাশুনা লোক বাদ যাননি। এমন কি যাঁরা ওড়িশা ছেড়ে গেছেন, যেমন, রেভেনশা এবং বীমস্‌ও এর পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছেন। নিজের বিষয়ে পড়ে রাধানাথ অত্যন্ত খুশি হলেন। তাঁর বিষয়ে প্রথম দুই লাইন :

ধন্য রাধানাথ তব জনম সফল
তব কীর্তি ছেয়ে আছে উৎকল মণ্ডল।

গত কটি বছর ভাল কাটেনি রাধানাথের। ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে পণ্ডিত গোবিন্দ রথ সদর বোর্ডের কাছে রাধানাথের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পত্র পাঠালেন। এর বক্তব্য রাধানাথ শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে থেকে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তিনি পুস্তকের গুণাগুণ অথবা উচ্চমূল্য বিচার না করে নিজের মিত্র ও আত্মীয়দের লেখা পুস্তকগুলি পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত করে দেন। বোর্ড অভিযোগটি ডাইরেক্টরকে পাঠাল। বিষয়টি অনুসন্ধান করতে এলেন ইনস্পেক্টর ব্রজমোহন মল্লিক। তিনি রিপোর্ট দিলেন যে অভিযোগে সত্যতা নেই। পণ্ডিত রথ এতে সন্তুষ্ট হলেন না, দাবী করলেন পুনর্বার তদন্ত হোক। অবশ্য কোনও ফল হল না।

চাকরি ক্ষেত্রে এ সকল ঝামেলা চলছিল। অন্যদিকে তাঁর কাব্যগুলিও সমালোচনার লক্ষ্য হল। 'কেদার গৌরী'র বিষয়ে একজন লিখেছেন : 'রাধানাথের কুটিলতা ভেদ করা ভাষ্যকারের পিতামহের সাধ্যাতীত। মৃত্যুর এতকাল পরে শেকস্‌পিয়ার ওড়িশায় পুনর্জন্ম নিয়েছেন রাধানাথরূপে।' নন্দিকেশ্বরী সম্পর্কে লেখা হল রাধানাথের কল্পনাশক্তি অশ্রাব্য, অপাঠ্য, জঘন্য, নীচ ও কদর্য আখ্যায়িকা সৃষ্টি করেছে।

১৮৯০ সালে তাঁর পনেরো বছরের ছেলে মধু মৃগী রোগে আক্রান্ত হল। ক্রমে তার অবস্থার অবনতি হল এবং সে পড়াশুনা ছেড়ে বাড়ি বসে রইল। এটিও রাধানাথকে পীড়া দিল।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও 'পার্বতী' কাব্য লিখে বাসুদেব সুঢলদেবকে পাঠিয়ে দিলেন 'সম্বলপুর হিতৈষীতে' প্রকাশ করার জন্য। কাব্যটি রচনার সময় মধু অর্থাৎ শশীভূষণ রোগশয্যায়। সেজন্য কাব্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। বাসুদেব কয়েকস্থানে সামান্য পরিবর্তন করে সেই অসম্পূর্ণ অবস্থায় জগন্নাথ বল্লভ প্রেস থেকে 'পার্বতী' কাব্য প্রকাশ করলেন ১৮৯১ সালে। পুস্তকটির বিষয়ে দীপিকার মন্তব্য :

কি উদ্দেশ্যে রাধানাথবাবু বীরপ্রসূ ওড়িশার দীর্ঘ ইতিহাস থেকে এই জঘন্য পালপঙ্কিল বিষয় উদ্ধার করে কবিতাময়ী পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন আমরা তা অনুমান করতে অক্ষম। এটুকু মাত্র বলব যে এমন কদর্য বিষয় লিখে তাঁর লেখনী কলঙ্কিত হয়েছে।

ময়ূরভঞ্জের শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জের কাছ থেকে পার্বতী কাব্যের উপর একমাত্র সান্ত্বনামূলক পত্র পেলেন রাধানাথ। তিনি লিখেছেন :

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পার্বতী কাব্যের এক কপি উপহার পেয়ে আপনাকে এরজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটি আমার খুব ভলো লেগেছে। একমাস আগে গোবিন্দ বাবু বলেছিলেন আপনি ময়ূরভঞ্জ আসবেন। এ বছর শেষ হবার আগে যদি সফরে আসেন তবে আমরা আনন্দিত হব।

রাজা সংক্রান্ত কাজে এবং পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আমার কার্য পদ্ধতিতে একটি লয় এসে গেছে। আমার অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

আপনার বশম্বদ,
শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও।

বারিপদা, ৩০.৯.৯১

পুনশ্চঃ আশা করি আপনার পুত্র কুশলে আছে।

পত্রখানি পড়ে রাধানাথ বিশেষ উৎসাহিত বোধ করলেন না। তিনি নিঃসন্দেহ যে শ্রীরামচন্দ্র পুস্তকখানি পড়েন নি, পত্রখানি নেহাত সৌজন্য রক্ষার জন্য লেখা। শ্রীরামচন্দ্র ইংরাজীতে পড়াশুনা করেছেন, ওড়িয়াতে তাঁর রুচি নেই। তাঁর অন্যান্য পত্রের মত এখানিও ইংরাজীতে লেখা। রাধানাথ অবশ্য আশা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভবিষ্যতের আর্থিক লাভের কারণ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বাসুদেব সুঢলদেবের কথা মনে পড়ল। তিনি 'পার্বতী' প্রকাশ করেছেন বটে কিন্তু অর্থ সাহায্য করেননি। তাছাড়া বইটির মাত্র দশ-বার কপি তাঁকে পাঠিয়েছেন যা রাধানাথ বিতরণ করে ফেলেছেন। তাঁর কাছে এখন একটি কপিও নেই। রাধানাথের মনস্তাপ হল যে তাঁর বন্ধুস্থানীয় এই দুজন রাজা তাঁকে আর্থিক সাহায্য করলেন না।

শ্রীরামচন্দ্র অবশ্য তাঁকে বারিপদা থেকে প্রকাশিত 'উৎকল প্রভায়' লিখতে অনুরোধ করেছিলেন. এই পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা ও প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। গোবিন্দ চন্দ্র মহাপাত্র, গঙ্গাধর মেহের ও বিশ্বনাথ কর একাধিকবার এই পুরস্কার পেয়েছেন। রাধানাথ উৎকল প্রভায় লিখতে রাজী হননি কারণ সরকারী কর্মচারী হয়ে তিনি পুরস্কার নিতে পারবেন না। তাঁর চিল্কা অবশ্য এতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে তিনি একশ টাকা পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন।

রাধানাথ মনস্থ করলেন এবার মহাভারতের মহাযাত্রাকে ভিত্তি করে একখানি কাব্য লিখবেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। লোকে বলে তাঁর কবিতায় বিদেশী ও বাংলা সাহিত্যের প্রভাব থাকে। সুতরাং তিনি শারলা বন্দনা দিয়ে শুরু করলেন :

পঙ্কজ বাসিনী দেবী উৎকল ভারতী শারলে,
কহ কি করিল কুরু চূড়ামণি। ইত্যাদি।

তিনি আশা করেছিলেন যে কাব্যটির জন্য ময়ূরভঞ্জ ও বামণ্ডার রাজা আর্থিক সাহায্য করবেন। সুতরাং কাব্যের বিষয়বস্তুর অপ্রাসঙ্গিক হলেও তিনি পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা করলেন :

প্রতিশ্রুতি ভরা তুমি উৎকলের কিশোর পাদপ
গুণাকর রামচন্দ্র ভলু কলু রবি ইত্যাদি।

একটু পরে লিখলেন :

তোমার আদেশে বীর এ মহাগীতিকা
গাইবার আশা নিয়ে ধরেছি যে করে,
চিরমূক বীণা মোর সিক্ত অশ্রুজলে
আসুক আদিষ্ট গীত দিব্য অবধানে।

পঞ্চম সর্গের কিছু অংশ 'উৎকল প্রভাতে' প্রকাশিত হলে তিনি পুরস্কার পেলেন কিন্তু গুণাকর বীর শ্রীরামচন্দ্র আর কোনও আর্থিক সাহায্য করলেন না।

রাধানাথ ভাবলেন পরের সর্গে বাসুদেবের স্তুতি করবেন। যুধিষ্ঠির দিব্যচক্ষু পাবার কাহিনী বর্ণনা করার আগে রাধানাথ বাসুদেবের উদ্দেশ্যে লিখলেন :

দিব্য অবধানে আসুক এ গীত তোমার
হে রাজেন্দ্র মন্দ্রনাদি প্রপাতের পতি
বামণ্ডা মণ্ডলেশ্বর উৎকল মণ্ডল,

তব শুভ আবির্ভাব হয়েছে উৎকলে
দেব দুর্গ দেব আজ তীর্থ সারস্তত, ইত্যাদি।

এ বন্দনারও কোনও সুফল দেখা গেল না। বামণ্ডা থেকে কোন অর্থাগম হল না।

১৮৯২ সালের এপ্রিল মাসে রাধানাথ বালেশ্বরে সফরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গোরুর গাড়ি করে সপরিবারে কটক ফিরছিলেন। গ্রীষ্মকালে ভদ্রক থেকে কটকের ষ্টীমার বন্ধ হয়ে যায়। গোরুর গাড়ির ঝাঁকানি এবং গরমের ক্লেশ উপেক্ষা করে, বামণ্ডা ও ময়ূরভঞ্জের রাজাদ্বয়কে মনে মনে গালি দিয়ে তিনি মহাযাত্রার সপ্তম সর্গ লিখতে মন দিলেন। বালেশ্বরে ফেরার সাতদিনের মধ্যে এ সর্গ পূর্ণ হল। তারপরে কিন্তু আর লিখলেন না। যতটুকু লিখেছিলেন তা গুছিয়ে এক জায়গায় রেখে দিলেন।

ঠিক এই সময় এক অপ্রত্যাশিত সূত্রে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেন রাধানাথ। ছোট রাজ্য আঠ মল্লিকের রাজার কাছ্ থেকে এই পত্রখানি পেলেন :

শ্রদ্ধাস্পদ, পূণ্যকীর্তি শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় মহোদয়েষু,

মহাশয়,

আপনার মধুক্ষরা লেখনী ওড়িশার কত উপকার করেছে তা বলে শেষ করা যায় না। উপেন্দ্রভঞ্জ ও অভিমন্যু আদি কবিগণের তিরোধানের পর থেকে অনেকদিন উৎকল গগন ঘোর অমাবস্যার তিমিরে আবৃত ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আপনি শুক্লপক্ষের শশধরের মতো উক্ত তিমির ক্রমে অপসারিত করে আমাদের গৌরবের পাত্র হয়েছেন।

আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন আমাদের ম্যানেজার দামোদর ঠাকুর। আপনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে একখানি কাব্য রচনা করছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। সেটি শীঘ্র সম্পূর্ণ করার জন্য আপনাকে তিনশত টাকা পুরস্কার দেব। আপনার মহৎ প্রয়াসের তুলনায় এ অর্থ অবশ্য নগণ্য। কেবল আরব্ধ কার্য শেষ করার জন্য এই উপহার গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করবেন।

বশম্বদ,
শ্রী মহেন্দ্র দেব
মহারাজা, আঠমল্লিক কেল্লা।

আঠমল্লিক, ১৬.৫.১৮৯২

রাধানাথ ভেবে খুশি হলেন যে তাঁর প্রতিভার কদর করার জন্য এবং সেটি সাহিত্যিক সুলভ ভাষায় প্রকাশ করার মতো অন্তত একজন রাজা আছেন ওড়িশায়।

এর কিছুদিন পরে আর একটি শুভ সংবাদ পেলেন। খবর যে ওড়িশার জন্য একজন স্বতন্ত্র ইনস্পেক্টরের পদ সৃষ্টি হচ্ছে। এবং সত্বর এ খবর সত্য হল। ১৮৯২ সালের জুন মাসে রাধানাথ এই পদে যোগ দিলেন। রাধানাথের চির নিরানন্দ জীবনে এটি একটি সুখকর ঘটনা।

পুরী : আগষ্ট ১৮৯৩

কোনার্ক মন্দিরের নবগ্রহ প্রস্তরটি কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব অনেকদিন ধামাচাপা পড়েছিল। এখন এশিয়াটিক সোসাইটী পুনরায় এ ব্যাপারে উদ্যোগী হল। পি. ডব্লু. ডি. কে লিখলে তারা তিনটি বিকল্প প্রস্তাব সরকারের কাছে রাখল।

প্রথম, লোহার লাইন বসিয়ে প্রস্তরটি সমুদ্রকূলে নিয়ে জাহাজ যোগে কলকাতা নেবার খরচ ২৪৯৫২ টাকা। দ্বিতীয়, লোহার লাইনের উপরে তেলিবুদ পর্যন্ত নিয়ে সেখান থেকে এক বিশেষ ভেলায় নেবার খরচ ৫২০০ টাকা। তৃতীয়, মোটা পাথরের পিছনদিক থেকে কিছু অংশ কেটে বাদ দিয়ে তেলীকুদ থেকে নৌকায় নেবার খরচ ৭৫০ টাকা। বহু বাহুল্য খরচের দিকটি বিচার করে তৃতীয় বিকল্প গৃহীত হল। তদনুসারে চার ফুট মোটা পাথরের পিছন থেকে আড়াই ফুট কেটে বাদ দেওয়া হল।

আগষ্ট মাসে পুরীর লোকে এ কথা জানতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা এক বিশেষ বৈঠক ডাকল। আলোচনায় স্থির হল নবগ্রহকে স্থানান্তর করা হিন্দুদের ধর্মহানিকর পদক্ষেপ হবে। সরকারকে নিবেদন করা হল যে বিষয়টি গভীরভাবে বিচার করে প্রস্তরটি কলকাতায় নেবার প্রস্তাব বাতিল করা হোক। দীপিকা কিন্তু লিখল :

আমাদের খবর এই যে এই অমূল্য শিল্পকর্মের সুরক্ষা ব্যতীত সরকারের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। এই মূর্তিগুলির সত্যই যদি পূজা হত এবং কোনার্কে এর সুরক্ষার সুবন্দোবস্ত হত তবে স্থানান্তর উচিত হত না। কিন্তু সেটি যেভাবে অবহেলিত পড়ে আছে সে অবস্থা চলতে দিলে কালক্রমে প্রাচীন হিন্দুদের এই অপূর্ব কলাকৃতি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সরকার তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করলে তার বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই।

দীপিকায় পত্র লিখে এক ব্যক্তি প্রস্তাব করল :

কোনার্কের নবগ্রহ মূর্তিকে সেখানেই সুরক্ষিত রাখার খরচ যখন লোকে বহন করল না তখন এটিকে শ্রীক্ষেত্রে এনে জগন্নাথ মন্দিরের কোনও অংশে গ্রথিত করে দিলে প্রস্তরটি সুরক্ষিত থাকবে। এখন মন্দিরের সংস্কার চলছে, এ কাজ এখন সহজে করা যাবে। কোনার্ক থেকে প্রস্তরটি শ্রীক্ষেত্রে আনা ব্যয়সাধ্য বটে, সে খরচ যদি জনসাধারণ না দেয় তবে হিন্দুদের কাছে এটির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে মন্দির সংস্কারের তহবিল থেকে সে অর্থ দিলে অনুচিত হবে না।

এই সময় আর একটি ঘটনা সকলকে বিচলিত করল। কটকের এস.পি. ক্যামেরায় মন্দিরের ফটো নিলেন এবং কোনার্ক গিয়ে নবগ্রহের। লোকে এ কাজ হিন্দুবিরোধী মনে করল।

এবার পুরাতত্ত্ব বিভাগের ফোটোগ্রাফার এল মন্দিরের ফটো তুলতে। ইতিপূর্বে

মন্দিরের ফোটো নেওয়া হত মঙ্গু মঠ অথবা সিংহদ্বারের কাছ থেকে। কিন্তু এই ফোটোগ্রাফার মন্দিরে ঢুকে কাকরাহাট দ্বার এমনকি রত্নবেদীর কাছে গিয়ে ঠাকুরদের ফোটো তুলল। শ্রীশ্রীজগন্নাথ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা এবার আন্দোলন চালাল এবং সরকারের কাছে লিখিত প্রতিবাদ জানাল।

ধর্মরক্ষিণী সভার আবেদন পেয়ে ছোটলাট এশিয়াটিক সোসাইটির হিন্দু এবং খৃশ্চানদের মত জানতে চাইলেন। এই সময়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার বেগলার কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে পত্র লিখে মন্তব্য করলেন যে নবগ্রহকে কলকাতার জাদুঘরে এনে রাখলে পুরাতত্ত্বের লাভ হবে না, বরং হিন্দুদের কাছে এই পবিত্র প্রস্তরটি স্থানান্তর করলে হিন্দুরা ভাববে সরকার তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। তিনি পরামর্শ দিলেন নবগ্রহ কোনার্ক থেকে না সরিয়ে সেখানকার মন্দিরে প্রথিত করে দিলে এই প্রাচীন শিল্প গৌরবের মর্যাদা রক্ষা হবে। মন্দিরের সংস্কারের সঙ্গে এ কাজ করা যেতে পারে।

ছোটলাটের চিঠি পেয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি বিষয়টি অনুধ্যান করার জন্য তিনজন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করল। এর সদস্য হলেন মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কমিটি স্থির করল মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন স্বয়ং কোনার্ক যাবেন এবং পরিস্থিতি সমীক্ষা করবেন। ফেব্রুয়ারি মাসে ন্যায়রত্ন সপরিবারে কোনার্ক গিয়ে মন্দির দেখলেন। সেখান থেকে পুরী গিয়ে পণ্ডিতদের এক সভা ডেকে বিষয়টি আলোচনা করলেন। জানা গেল আগে যাই হয়ে থাকুক না কেন এখন লোকে নবগ্রহকে পূজা করে এবং এটিকে নিয়ে গেলে মনে হবে সরকার হিন্দুধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করেছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি এই মর্মে সরকারকে জানাল। তাদের পত্র পেয়ে সরকার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করল যে নবগ্রহ কলকাতায় আনা হবে না এবং ভবিষ্যতে পূর্ত বিভাগ এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেবে না। পূর্ত বিভাগ স্থানীয় অফিসারদের নির্দেশ দিল যে প্রস্তরটি যে অবস্থায় যেখানে ছিল সেখানে সেইভাবে রেখে দেবে।

পূর্তবিভাগ মূর্তি যথাস্থানে রেখে তার উপরে একটি ছাদ নির্মাণ করে দিল। পুরীর পণ্ডিতরা সন্তুষ্ট হল। তার কিছুদিন পরে সরকার স্থির করল কোনার্ক মন্দিরের অন্য কয়েকটি মূর্তি কলকাতা নিয়ে গিয়ে জাদুঘরে রাখা হবে। এবারও পণ্ডিতগণ প্রতিবাদ করল কিন্তু কোনও ফল হল না। কোনার্ক মন্দিরের তেরটি মূর্তি কলকাতা চালান হয়ে গেল।

কটক : মার্চ ১৮৯৪

কটকের কালীমন্দিরের পাশের রাস্তা মহলগলি নামে পরিচিত ছিল। এর পাশে নীলমণি হালদারের বিরাট বাড়ি অর্থাৎ মহল ছিল। তার থেকে এই নাম। মহল যখন ভেঙ্গে গেল তখন সে খোলা জায়গার নাম হল নীলমণির মাঠ। এর একদিকে মধুসূদন রাও বাড়ি করেছিলেন এবং অন্য দিকে ছিল টাউন স্কুলের কাঁচা বাড়ি। সেটি ভেঙ্গে গেলে স্কুলটি অন্যত্র চলে গেল। এবার মধুসূদন রাধানাথকে সেখানে জমি কিনে বাড়ি করতে পরামর্শ দিলেন। তিনি তাই করলেন। ১৮৯২ সালের ডিসেম্বরে তাঁর স্কুল ইনস্পেক্টরের পদ পাকা হল। এর কিছুদিন পরে শেখবাজারের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে এলেন রাধানাথ। অধুনা অঞ্চলটি কালীগলি নামে পরিচিত।

১৮৯২ সালের গোড়ার দিকে রাধানাথকে ঘিরে আর একটি বিবাদের সূত্রপাত হল। এই বিবাদে তাঁর প্রতিপক্ষ স্বয়ং উপেন্দ্র ভঞ্জ। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পুরস্কার দেবার জন্য স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর প্যারীমোহন ভঞ্জও কবির কয়েকখানি কবিতার পুস্তক নির্বাচন করেছিলেন। কটক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক লালা রামনারায়ণ রায় এই চয়নের তীব্র সমালোচনা করে বারিপদার উৎকল প্রভায় লিখলেন। তাঁর মতে কবিতাগুলি আদি রসাত্মক এবং স্কুলের ছাত্রদের দেবার অনুপযুক্ত। তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে দীপিকা লিখল, ভঞ্জসাহিত্যের উপাদেয়তা বিচার করে এটি পুরস্কার হিসাবে দেবার যোগ্য বিবেচনা করা ঠিক। এই মতের সঙ্গে গৌরীশংকরের স্বার্থ জড়িত। কটক প্রিণ্টিং প্রেস ভলুকবির কয়েকখানি কবিতার বই টীকাসহ প্রকাশ করেছিল। সেগুলির বিশেষ চাহিদা ছিল না। সুতরাং বই বিক্রি করার জন্য নানা উপায় খুঁজতে হত।

ভঞ্জসাহিত্য নিয়ে শুরু হয়ে ক্রমে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের এবং শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্র ভঞ্জ এবং রাধানাথের মধ্যে বিবাদে পরিণত হল। দুই পক্ষের সমর্থকও জুটে গেল। উৎকল প্রভা বেশিদিন এই বিবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইল না। অগত্যা ভঞ্জ সমালোচক এবং রাধানাথের সমর্থকরা সুঢল দেবের সম্বলপুর হিতৈষিণীর আশ্রয় নিল। এতদিনে লোকের ধারণা হয়ে গেল যে রাধানাথের উসকানিতে রামনারায়ণ এ বিবাদ শুরু করেছেন। কারণ তিনি রাধানাথের অধীনস্থ কর্মচারী।

দীপিকাও অধিককাল ভঞ্জ সমর্থকদের পৃষ্টপোষকতা করতে রাজী হল না। অগত্যা ভঞ্জসমর্থক এবং রাধানাথের বিরোধীপক্ষ ১৮৯৩ সালে কটক প্রিণ্টিং প্রেস থেকে একখানি নতুন অসাময়িক পত্রিকা 'ইন্দ্রধনু' প্রকাশ করল। এর পৃষ্টপোষকদের মধ্যে ছিলেন গৌরীশংকর রায়, গোপাল বল্লভ দাস প্রমুখ। এর একমাস পরে দেওগড় থেকে রাধানাথের সমর্থনে আত্মপ্রকাশ করল 'বিজলী' নামক পত্রিকা। রামনারায়ণ রায়, বাসুদেব সুঢলদেব বিশ্বনাথ কর প্রমুখ এর সমর্থক। ইন্দ্রধনুর মূল্য দুই পয়সা বিজলী বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

পত্রিকা দুটি ওড়িশার দূর দূরান্তরে পৌঁছে যায়। শিক্ষিত সমাজ ইন্দ্রধনু অথবা বিজলীর গ্রাহক। ইন্দ্রধনুতে একটি প্রবন্ধে ক্ষীণকায় রাধানাথের এরূপ বর্ণনা করল গোপবন্ধু দাস নামে এক ব্যক্তি :

লিকলিকে কাঠিসম পণ্ডিতং মন্য
ডোম পাড়ায় শৃগাল যথা সিংহ হয় গণ্য।

রাধানাথ জানতে পারলেন যে লেখক পুরী জেলা স্কুলের এক ছাত্র। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুরী জেলা স্কুল পরিদর্শনে গেলেন। তিনি একখানি বেনামী পত্র পেলেন যাতে বলা হয়েছে লেখাটি স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার মার্জিত করে দিয়েছিলেন।

স্কুলে খোঁজখবর নিয়ে রাধানাথ জানলেন যে প্রধান শিক্ষক অন্য শিক্ষক এবং ছাত্রদের থেকে নারকোল ডাব আচার ইত্যাদি নিয়মিত পান। এবং এডিশনাল মাষ্টার মাগুনি দাস পুরীর নেটিভ ডাক্তারের বিরুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য করেছিলেন। রাধানাথ হেডমাষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষকদের কমনরুমে গিয়ে জানতে চাইলেন কে কে ইন্দ্রধনু পড়েন, এতে লেখেন বা এর জন্য চাঁদা দেন। সকলেই বললেন তাঁরা এমন কিছুই করেন না। গোপবন্ধুর ক্লাসে গিয়ে রাধানাথ একই প্রশ্ন করলেন। ছাত্ররা সকলে বলল তারা এসব তো করেই না, এমনকি ইন্দ্রধনুর নাম শোনেনি। এবার রাধানাথ সরাসরি গোপবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্রধনুতে লেখাটি তার কিনা। সে অস্বীকার করল। হেডমাষ্টারকে বিষয়টি তদন্ত করতে বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন হেডমাষ্টার তদন্ত করলেন। তিনি রাধানাথের মন জেনে গিয়েছিলেন। গোপবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অন্য ছাত্রদের বয়ান নিয়ে তিনি স্থির করলেন যে গোপবন্ধুই প্রবন্ধটির লেখক। তিনি সুপারিশ করলেন যে গোপবন্ধুকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হোক। খবর পেয়ে পুরীর অনেক ভদ্রলোক রাধানাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। শেষে স্থির হল যে মিথ্যা বলার অপরাধে গোপবন্ধুকে সাতদিনের বৃত্তি জরিমানা করা হবে। এবং গত বছরের পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য তাকে যে পারিতোষিক দেবার কথা সেটি সে পাবে না।

২রা ফেব্রুয়ারি রাধানাথ কটকে ফিরে এলেন। সারা রাস্তা তিনি এই দীর্ঘস্থায়ী বিবাদের কথা ভাবলেন। বাড়ি পৌঁছে ভাবলেন ইন্দ্রধনুতে একখানি পত্র লিখে ব্যাপারটির ইতি করে দেবেন। দুই দিন ভেবে এই পত্রখানি লিখলেন :

মাননীয় শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,
মহাশয়,

১) শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ রায় ভঞ্জীয় কবিতার সমালোচনা করার জন্য কেউ কেউ সম্ভবত এমন অনুমান করেছেন যে রামনারায়ণ বাবুর সমালোচনা আমার মতের উপরে আধারিত। এ ধারণা ভুল।

২) রামনারায়ণবাবু অল্প বয়স থেকে সাহিত্যের বিশেষ করে ভঞ্জ সাহিত্যের আলোচনা করে আসছেন। প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যচর্চার ব্যাপারে তিনি কোনও অংশে আমার থেকে কম যোগ্য নন। আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই তাঁর।

৩) বন্ধু হিসাবে তাঁর কোনও কোনও লেখা আমি দেখেছি কিন্তু তাঁর মতের উপরে আমার কোনও প্রভাব নেই। আমার মতে এভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা অনধিকারচর্চা। তাছাড়া রামনারায়ণবাবু বা অন্য কোনও লেখক এরকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতেন কিনা সন্দেহ। আমার স্পষ্ট মনে আছে রচনা কালে তাঁর লেখার কোনও কোনও অংশের সঙ্গে আমার মতের মিল না হলে সেই অংশ বাদ দিতে বলে অকৃতকার্য হয়েছি। তাঁর মত ভ্রান্ত বা সঠিক যাই হোক সে নিছক তার ব্যক্তিগত মত অন্যের থেকে ধার করা নয়। আমার মত নিয়ে যদি লিখতেন তবে এ বিতর্ক শুরু হত না।

৪) রামনারায়ণবাবু অথবা অন্য কারো মতের জন্য আমাকে দায়ী করা অনুচিত। আমাকে আমার লেখার জন্য দায়ী করা যায়—অন্যের লেখার জন্য নয়।

৫) আমার সাহিত্যজ্ঞান সীমিত, অবসরও কম। এমন অবস্থায় কোনও বিবাদে প্রবৃত্ত হবার যোগ্যতা বা অধিকার আমার নেই।

৬) রামনারায়ণবাবুর বা অন্য কারো প্রতিকূল সমালোচনা দ্বারা ভঞ্জকবির অথবা কবি পদবাচ্য কোন প্রণেতার খ্যাতি নষ্ট হবে কোনও সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তির মনে এমন আশংকা জাত হবার সম্ভাবনা নেই। সমালোচনা অমরত্ব দিতে অথবা ছিনিয়ে নিতে পারে না। রামনারায়ণবাবুও তাঁর সমালোচনায় এমন অহমিকা দেখিয়েছেন বলে আমার মনে পড়ে না।

৭) সমালোচনার জন্য ভঞ্জের মতো সুপ্রসিদ্ধ কবির আসন টলে যাবে এমন যে ভাবে সে নির্বোধ অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক। ইন্দ্রধনুতে লেখা পড়ে মনে হয়েছে পত্র লেখকদের কেউ কেউ আমাকে তেমন একজন নির্বোধ অথবা পাগল মনে করেন। এমন লেখকদের প্রতিবাদ করা নিষ্ফল প্রয়াস হবে।

৮) ভঞ্জকবিকে আমি শিক্ষাগুরু জ্ঞান করি। বাল্যকাল থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে এসেছি। আমি তাঁকে কেবল মাত্র মৌখিক ভক্তি করি তা নয় এর নজীর আমার লেখায় ছড়িয়ে আছে। তার একটি তালিকা সংকলন করা যায়। আমার মতো ভঞ্জের অনুসরণকারী কবিতা লেখক হয়তো ওড়িশায় আর নেই।

৯) ভঞ্জের লেখার যে যে অংশ আমি পড়েছি তার থেকে আমার উপলব্ধি হয়েছে যে তিনি একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। আধুনিক লেখকদের কথা দূরে থাক তাঁর মতো বিভিন্ন বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী প্রাচীন ওড়িশাতে অন্য কেউ আবির্ভূত হননি। কোনও কোনও কবি কোনও বিশেষ বিষয়ে তাঁর থেকে পারদর্শী হতে পারেন কিন্তু সমষ্টিগতভাবে কেউ তাঁর সমকক্ষ নন।

১০) আমার মতে রামনারায়ণবাবু এক এক জায়গায় ভঞ্জের রচনার প্রতি অযথা আক্ষেপ করেছেন। বিশেষ করে আদিরস সম্পর্কে যে আক্ষেপ তিনি করেছেন তা উচিত সীমা অতিক্রম করেছে বলে আমার মনে হয়েছে। নিজে যে কবিতাগুলি পড়েছি তার মধ্যে ২০-৩০টি পংক্তি ছেড়ে দিলে অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে আপত্তিকর হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি জানি যে উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় সমালোচকগণ এরকম রচনার পক্ষপাতী নন। তাঁদের অনুসরণ করে অনেক বঙ্গীয় সমালোচকগণও আদিরসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ. সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণও রস নাম দ্বারা বর্ণনীয় নয় কেবল ব্যঞ্জনা দ্বারা সূচনীয় এই নিয়ম

করে গেছেন। পক্ষান্তরে প্রধান প্রধান সংস্কৃত কবি, ইউরোপীয় কবি এবং বঙ্গীয় কবিদের লেখা থেকে অনেক আদিরসাশ্রিত কবিতা পাওয়া যাবে যার থেকে ভঞ্জের অধিকাংশ লেখার সমর্থন পাওয়া যাবে। এরূপ বিপরীত মতের সংকটে পড়ে আমি এখনও কোনও দৃঢ় মতে পৌঁছাতে পারিনি। যাই হোক ভঞ্জের বিপুল গুণরাশি বিচার করে তাঁর রচনায় উৎকট আদিরসাশ্রিত পংক্তিগুলি আর্ষপ্রয়োগরূপে গ্রহণ অর্থাৎ উপেক্ষা করা আমার মতে অনুচিত নয়।

১১) অমূলক অভিযোগের প্রতিবাদে আমি অভ্যস্ত নই। আমার সম্বন্ধে অনেক বার অনেক অমূলক অভিযোগ হয়েছে এবং কালক্রমে তার অসারতা আপনিই প্রতিপন্ন হয়েছে। সেজন্য চলতি বিবাদে এতদিন আমি নীরব ছিলাম। কেবল মাত্র কয়েকজন মিত্রজনের সদভিপ্রায়ের সম্মান করে এই পত্র লিখছি।

বশম্বদ

কটক, ৫.২.৯৪ শ্রীরাধানাথ রায়

পত্রখানি লিখে মনে দ্বিধা হল এটি ইন্দ্রধনুকে পাঠাবেন কিনা। ইন্দ্রধনু এটি প্রকাশ না করতে পারে। তাছাড়া পত্রিকাটি অনিয়মিত, পরের সংখ্যা কবে প্রকাশ পাবে বলা যায় না। মার্চ মাসে বালেশ্বর যাবার সময় এটি সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং চিঠির উপরে ওড়িয়া ও নবসংবাদ লিখে পাঠিয়ে দিলেন। ১৪ই মার্চ ওড়িয়া ও নবসংবাদ এটি প্রকাশ করল। এ বিবাদের সমাপ্তি পর্ব এভাবে শুরু হল।

ময়ূরভঞ্জ : এপ্রিল ১৮৯৪

ওড়িয়া ও নবসংবাদে পত্রখানি প্রকাশিত হলে রাধানাথ পুনরায় সাহিত্যজীবন শুরু করতে চাইলেন। মহাযাত্রার অষ্টম সর্গ লেখার কথা অনেকবার ভেবেছেন কিন্তু হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে সপ্তম সর্গের শেষ কয়েক পংক্তি আবৃত্তি করেন যদি ভাব এবং প্রেরণা এসে যায়। 'পলকে এ মহাদৃশ্য হল অন্তর্হিত যুধিষ্ঠিরের নেত্র হত সহ্য গিরিতটে, নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন যথা মিলায় অতলে।' কিন্তু সে ভাষা সে ভাব ফিরে পান না। শেষে বিরক্ত হয়ে অষ্টম সর্গ লেখা খাতাটি সরিয়ে রাখলেন। ভাবলেন মহাযাত্রা পুনরায় শুরু করার আগে কিছু অনুবাদ করবেন। অনেকদিন আগে রামচরিতমানস পড়ার সময় কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ডে তুলসীদাস যে ঋতু বর্ণনা করেছেন তা তাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি আর একখানি খাতা নিয়ে তার উপরে 'তুলসী স্তবক' লিখলেন এবং রামচরিতমানসখানি খুঁজে বার করলেন।

রাধানাথ নিজের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করার কথাও চিন্তা করলেন। ১৮৯৩ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় বার বামণ্ডা গিয়েছিলেন তিনি। ফেরার পথে সম্বলপুরে বরপালির কবি গঙ্গাধর মেহেরকে পেলেন। সেই থেকে তাঁরা পরস্পরের প্রশংসক। তাঁদের

মধ্যে নিয়মিত পত্রালাপ চলে। গঙ্গাধরের মত রাধানাথের অনেক কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। এখন গ্রন্থাবলী প্রকাশ করার সময় এসেছে। এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দুজনে একমত হলেন যে এ কাজের জন্য অর্থ দিতে পারেন মাত্র দুজন, সুঢলদেব অথবা শ্রীরামচন্দ্র। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব এবং তার পুত্র সচ্চিদানন্দ বামণ্ডায় তার খুব যত্ন করেছিলেন সত্য কিন্তু কোনও অর্থ দেবেন বলে মনে হয় না। সুতরাং রাধানাথ স্থির করলেন রাজা শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারস্থ হবেন।

১৮৯২ সালে শ্রীরামচন্দ্র ময়ূরভঞ্জের শাসনভার নিজের হাতে নিলেন। তিনি যদিও সাবালক হয়েছিলেন এতদিন পর্যন্ত ওয়াইলী শাসন চালাচ্ছিলেন। এবার অর্থাভাব দেখা দিল। যাবার আগে ওয়াইলী ট্রেজারী উজাড় করে গিয়েছিলেন। রাধানাথের মনে পড়ল একবার এ বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে লিখেছিলেন।

তবুও গঙ্গাধর মেহেরের পরামর্শে গ্রন্থাবলীর ব্যাপারে পত্র লিখতে যাচ্ছিলেন এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল ৭ই এপ্রিলের দীপিকায় শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহীর এই পত্রটি :

মান্যবর শ্রীযুক্ত উৎকল দীপিকার সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু,

মহাশয়,

সর্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনার জগতবিখ্যাত পত্রিকায় স্থান দিলে চিরবাধিত হব।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়ূরভঞ্জের ভূতপূর্ব মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জের মৃত্যুর পরে সরকার এই রাজ্যকে খাস করে তার নাবালক পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জকে কটকে পাঠাল তখন আমরা নাবালক রাজার অভিভাবকগণ আপত্তি করেছিলাম। তখন ভূতপূর্ব কমিশনার কমিশনার লামিনি সাহেব আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন সরকার তাকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য কটকে পাঠাচ্ছে এবং তার জাতি বা ধর্মনষ্ট করার কোন উদ্দেশ্য সরকারের নেই এবং সরকার এ রকম হতে দেবে না।

শ্রীবাবু গোবিন্দচন্দ্র মহাপাত্রকে রাজার শিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত করে যখন রাজাকে কটক নিয়ে যাওয়া হল তখনও আমরা প্রতিবাদ জানালে সরকার পুনরায় অনুরূপ আশ্বাস দিয়েছিলেন। কালক্রমে একজন ইতর প্রকৃতির সাহেব মিষ্টার কিডেলী রাজার শিক্ষক নিযুক্ত হলেন এবং এমন একজন নীচ প্রকৃতির লোকের সঙ্গে থাকলে রাজার জাতি ও ধর্মের উপরে আঁচ আসবে বলে আমরা বার বার আপত্তি করেছিলাম।

পাঠকগণ, আমাদের আপত্তির কারণ গুরুমহাশয়ের কাণ্ড কারখানা দেখলে বুঝতে পারবেন। ধর্মনাশী এই মাষ্টার আমার নাতিকে নিয়ে দার্জিলিং এবং সিংহল ভ্রমণ করে এল। সে এখন এক কুমারী মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ধর্মান্তরিত করার ফন্দি করছে।

পাঠকগণ, জানেন এই কন্যাটি কে? এ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী মহাত্মা কেশব সেনের কন্যা। দুজন শিক্ষক মিষ্টার কিডেলী ও বাবু গোবিন্দ রথ এ কন্যার সহিত আমার নাতির বিবাহ দেবে বলে কুচবিহারের রাজার সহিত বাজী ধরেছে। এও শুনেছি যে তারা যদি তাদের

মতলবে কার্যকারী হয় তবে কুচবিহারের রাজা তাদের একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন। ছোটলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অজুহাতে গত ১৩ই আমার নাতিকে কলকাতায় নিয়ে গেছে কিডেল সাহেব। এও দেখুন আমার প্রাণাধিক নাতিকে কলকাতায় নিয়ে রাজভবন থেকে দুই কোয়ার্টার দূরে বেলগড়িয়া নামে এক কুঠিতে রেখে হুকুম জারী করেছে যে সাহেবের বিনা অনুমতিতে কেউ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। এভাবে নিঃসঙ্গ রেখে নানা রকম ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ম, জাতি ও নীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে উস্‌কানি দিচ্ছে। কেউ ভাবতে পারেন এসব করে তাদের কি লাভ? আমার উত্তর হবে আমার নাতির মনে আমাদের প্রতি অভক্তি ও অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই তাদের উদ্দেশ্য। এ সব লক্ষ্য করে যারা রাজাকে সুবুদ্ধি দেবার চেষ্টা করেছেন এই দুই ব্যক্তি তাদের নানা প্রকারে শায়েস্তা করার চেষ্টা করে। হতে পারে যে সরকার এ ব্যাপারে অবহিত নন। কেমন করে বা জানবেন? এই অত্যাচারেব বিষয়ে লিখে জানাবার মতো সাহস নেই এখানকার লোকের। এমন কি এই পত্রখানি লিখে দেবার লোক পাওয়া গেল না।

পাঠকগণ, এরা শিক্ষক না শয়তান? আমার বংশ নাশ করতে কি সরকার এই দুই কালসাপ লাগিয়েছেন? যদি সরকারের একান্তই এমন ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে আমার বৃদ্ধাবস্থায় এমন কষ্ট না দিয়ে আগে আমাকে মেরে ফেলে তার পরে এসব করলে ভাল হত।

আমার পুত্রের মৃত্যুর পরে আশা করেছিলাম নাতির সুখ শান্তি দেখে হয়তো পুত্রশোক ভুলতে পারব। সে আশার কি এই পরিণাম? ধিক আমার জন্ম, ধিক আমার জীবনধারণ।

পাঠক সহজে অনুমান করতে পারবেন আমি সরকারকে কেন বলছি। সরকারের কাছে আমার প্রার্থনা আমার নাতিকে সদুপদেশ দিয়ে উপরোক্ত খল ব্যক্তিদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করে আমার রাজভবনে স্বধর্মে থেকে রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শে রাজকার্য নির্বাহ করবার আদেশ দিন। এতে আমাদের সনাতন ধর্ম রক্ষা হবে এবং সরকারের যশ যুগ যুগ স্থায়ী হবে।

শ্রীরমা দেবী

বারিপদা, ২.৪.৯৪ রাজঠাকুরমা, সামন্তরাজা ময়ূরভঞ্জ।

রাধানাথ মধুকে ডেকে দীপিকাটি পড়তে দিলেন। বললেন বারিপদায় চিঠি লিখে এ বিষয়ে আরও সংবাদ সংগ্রহ করুক। মধু বা শশীভূষণ রোগের জন্য লেখাপড়া ছেড়ে বাড়িতে থাকে সর্বক্ষণ। বিখ্যাত পিতার সেবাই এখন তার জীবনের ব্রত। সে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল।

খণ্ডপাড়া : আগষ্ট ১৮৯৪

এখন সামন্ত চন্দ্রশেখরের বয়স উনষাট বছর। তাঁর বিশ্বাস আর বেশি দিন বাঁচবেন না। দুঃখ যে মরার আগে সিদ্ধান্ত দর্পণ প্রকাশিত হবে না। তেইশ বছর বয়স থেকে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করে এসেছেন এবং যা দেখেছেন নোট করে রেখেছেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে সিদ্ধান্ত দর্পণ লিখতে আরম্ভ করে একটানা আট বছর অনেক পরিশ্রম করে

যখন শেষ করেন তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ। সে পাণ্ডুলিপি এখনও তেমনি পড়ে আছে।

এখন তাঁর সময় অশান্তিময়। অগ্নিমান্দ্য ও অম্লশূলে ভুগছেন। তার উপর অর্থাভাব। পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যার সংসার চালাতে আয় মাত্র পাঁচশ টাকা এবং সাত ভরণ ধান। একবার মঞ্জুষা গিয়ে সেখানকার পাহাড়ের উচ্চতা নিরূপণ করে রাজার কাছ থেকে বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। রাজার মৃত্যুর পরে নতুন রাজা বৃত্তি কমিয়ে পঁচিশ টাকা করে দিয়েছিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্র নটবর সিংহ খণ্ডপাড়ার রাজা। তিনি চন্দ্রশেখরের অশান্তির অন্যতম কারণ। কাকার হাতে সব সময় এক গোছা তালপত্র। লোকে ব্যঙ্গ করে তাঁকে রাজজ্যোতিষী বলে। এসব নটবরের পছন্দ নয়। জ্যোতিষ হিসাবে তাঁর খ্যাতি হলে নটবরের ঈর্ষা হল এবং তিনি শত্রুতা শুরু করলেন।

যদিও সিদ্ধান্ত দর্পণ প্রকাশিত হয়নি, লোক মুখে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৭৬ সালে পুরীর পণ্ডিতেরা একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন, উদ্দেশ্য কোন পঞ্জিকা অনুসারে জগন্নাথ মন্দিরের ক্রিয়াকর্ম হবে তা নিশ্চিত করা। স্থির হল সিদ্ধান্ত দর্পণ অনুসারে গণনাই নির্ভুল। ১৮৮৮ সালে মুক্তিমণ্ডপের পণ্ডিত সভা চন্দ্রশেখরকে একখানি সূক্ষ্ম পঞ্চাঙ্গ পঞ্জিকা প্রকাশ করার অনুমতি দিল। তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সঠিক সময় নির্ণয় করে নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ভারতের সকল অঞ্চলের জ্যোতিষীদের সঙ্গে পত্রযোগে সম্পর্ক রেখেছিলেন। কোনও বিষয়ে কারো মনে কোনও সন্দেহ হলে চন্দ্রশেখর তা নিরসন করতেন। তিনি সংস্কৃত এবং ওড়িয়া ব্যতীত অন্য ভাষা জানতেন না। বাংলা বা দেবনাগরী লিপিতে পত্র এলে শিষ্যরা তা পড়ে শোনাত এবং তিনি সংস্কৃতে উত্তর লিখতেন।

সরকারী অফিসারদের মধ্যে পুরীর কালেক্টরই প্রথম চন্দ্রশেখরের গুণের কদর করলেন। তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ করলেন যে চন্দ্রশেখরকে একটি উপাধি দেওয়া হোক। তার অনেকদিন পরে কালেক্টরের কাছ থেকে এই পত্রখানি পেলেন :

সনন্দ

প্রাপ্তেষু পণ্ডিত চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র, খণ্ডপাড়া।

ব্যক্তিগত উৎকর্ষের জন্য এতদ্বারা আমি আপনাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রধান করছি।

ল্যান্সডাউন

শিমলা, জুন ৩, ১৮৯৩ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনেরাল।

ইতিপূর্বে কোনও অব্রাহ্মণ মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাননি। এ খবর পেয়ে সারা ওড়িশা খুশি হল। কেবল নটবর ছাড়া। তাঁর ব্যঙ্গোক্তি কাকা কাগজখানি চাটতে থাকুন। এর পর চন্দ্রশেখর কলকাতা থেকে এই পত্রখানি পেলেন :

বঙ্গসরকারের পলিটিকাল বিভাগ।
কলিকাতা, মার্চ ৮, ১৮৯৪

প্রিয় মহোদয়,

আগামী ২০শে মার্চ মঙ্গলবার বেলভেড়িয়ারের স্বাগত কক্ষে বড়লাট যে উপাধিগুলি দিয়েছেন একটি দরবারে সেগুলি প্রদান করবেন ছোট লাট। আপনাকে অনুরোধ যদি সম্ভব হয়, তবে ঐদিন দিবা ৪.২৫ মিনিটে আপনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

আপনি আসতে পারবেন কিনা শীঘ্র জানালে বাধিত হব।

আপনার বিশ্বস্ত
আণ্ডার সেক্রেটারী

পুনশ্চঃ যাঁরা উপাধি নিতে আসবেন তাঁরা আলিপুর জেলের সামনের গেট দিয়ে ঢুকে পশ্চিম দিকের পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে হলে প্রবেশ করবেন।

এই বয়সে রাস্তায় এতদূর যাওয়া কষ্টকর। স্টীমারে গেলে জাতি যাবে। সুতরাং তিনি জানিয়ে দিলেন তিনি যেতে পারবেন না।

১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারি সরকার রাধানাথের ভগ্নিপতি কাউপুরের জমিদার গোবিন্দবল্লভ রায়কে রায়বাহাদুর খেতাব দিলেন। চন্দ্রশেখর কলকাতা যেতে পারবেন না জানার পরে স্থির হল কমিশনার কটকে একটি বিশেষ দরবার করে এই দুজনকে উপাধি দেবেন। দরবার হবে বারবাটী কেল্লায় ২৯শে আগষ্ট। তদনুসারে চন্দ্রশেখরকে জানিয়ে দেওয়া হল।

পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণে পুত্র চক্রধরকে সঙ্গে নিয়ে নৌকাযোগে যাত্রা করলেন চন্দ্রশেখর। দুদিন পরে সকালবেলা কটকে মহানদীর ঘাটে এসে লাগল নৌকা। পাঁজি খুলে দেখলেন সেদিন আঠাশ তারিখ। পূজা আহ্নিক করে খেয়ে দেয়ে তিনি নিশ্চিন্তে নৌকার মধ্যে শুয়ে পড়লেন। বার বার তোপধ্বনি শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। হিসাবে কিছু ভুল হয়ে থাকবে ভেবে আবার পঞ্জিকা খুললেন। হিসাব করে দেখলেন সত্যই ২৮ তারিখ। হঠাৎ দেখলেন মিছিল করে সানাই বাজিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছে। আর পোশাক না বদলিয়ে কাঁধে একখানা গামছা ফেলে তাড়াতাড়ি গিয়ে মিছিলের পিছনের একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলেন ঘোড়সওয়ার আঠগড়ের রাজা এবং তিনি দরবারে যাচ্ছেন। চন্দ্রশেখরও তাদের পিছনে চললেন। মিছিল কেল্লায় পৌঁছালে দেখা গেল সুসজ্জিত মণ্ডপ খালি, জনপ্রাণী নেই, দরবারের শেষ সকলে চলে গেছে। রাজা ভ্রূক্ষেপ না করে কিছুক্ষণ সানাই বাজিয়ে চলে গেলেন। চন্দ্রশেখর খোঁজ নিয়ে জানলেন কমিশনার ক্লাবে আছেন।

ক্লাবের দারোয়ান এই বৃদ্ধ চাষী মজুরের মতো লোকটিকে ভিতরে ঢুকতে দিল না। চন্দ্রশেখর তাঁকে সংস্কৃতে আশীর্বাদ করে মানিয়ে নিলেন এবং ভিতরে গেলেন। দরবার থেকে ফিরে কমিশনার কুক স্ত্রীর সঙ্গে ক্লাবের বারান্দায় বসে চা পান করছিলেন। অনেক কষ্টে চন্দ্রশেখর তাঁকে বোঝাতে পারলেন যে তিনিই খণ্ডপাড়ার মহামহোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন সামন্ত মহাপাত্র এবং তাঁর দরবারে আসতে দেরী হয়েছে। কুক হিন্দিতে বললেন, 'তুম কাল সুবা কোঠিপর মুঝে মিলো।' বলে তিনি টেনিস খেলতে গেলেন।

সেখান থেকে চন্দ্রশেখর এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট সুদাম চরণ দাসের বাড়ি গেলেন। এমনিতে দরবারে না আসার জন্য চন্দ্রশেখরের উপর বিরক্ত ছিলেন সুদাম চরণ। তার উপর যখন তিনি বললেন সত্যই আজ আঠাশে তখন তিনি রেগে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের সঙ্গে কমিশনারের বাংলোতে যেতে সম্মত হলেন।

পরেরদিন সকালে দুজনে গেলেন কমিশনারের কাছে। সুদাম চন্দ্রশেখরের গুণগ্রামের ফিরিস্তি দিয়ে বললে, 'ইনি শংকু যন্ত্র, স্বয়ংবহ যন্ত্র, মান যন্ত্র ইত্যাদি স্বয়ং নির্মাণ করতে পারেন।' কুক দুজনকে নিয়ে বাংলোর পিছনে কাঠযোড়ির বাঁধের উপর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে দূরে সপ্তশয্যা পর্বতমালা দেখালেন। তিনি সুদামচরণকে প্রশ্ন করলেন তোমার জ্যোতিষ এই পাহাড়ের উচ্চতা হিসাব করে বলতে পারবে? সুদামচরণ বিষয়টি বুঝিয়ে বললে চন্দ্রশেখর বললেন, নিশ্চয়ই পারব কিন্তু যন্ত্রগুলি যে নৌকার ছেড়ে এসেছি। স্থির হল চক্র ধর গিয়ে যন্ত্রগুলি নিয়ে আসবে এবং দুপুরে সাহেব ফেরার আগে চন্দ্রশেখর হিসাব করে রাখবেন।

দুর্ভাগ্য বশত চন্দ্রধর যে জিনিসটি দরকার মানযন্ত্র সেটি ছেড়ে আর সব কিছু নিয়ে এল। চন্দ্রশেখর কিন্তু বিচলিত হলেন না। বাংলোতে ছুতোর মিস্ত্রি কাজ করছিল। তিনি সেখানে গিয়ে বসলেন। দুখানি কাঠ নিয়ে মেপে কাটালেন। তাতে পেরেক পুঁতে, দাগ দিয়ে ছত্র করে একখানি চলনসই মান যন্ত্র তৈরী করিয়ে নিলেন। এবার একটি খোলা জায়গায় গিয়ে পাহাড়টি আবার দেখলেন। খড়ি পেতে অনেক হিসাব নিকাশ করে নির্ণয় করলেন পাহাড়ের উচ্চতা ১১৭৮ হাত ১৬ আঙুল। চন্দ্রশেখরের হিসাব একদম নির্ভুল না হলেও সঠিক উচ্চতার খুব কাছাকাছি ছিল। কুক খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করলেন। বললেন, চারদিন পরে এক বিশেষ দরবারে তিনি চন্দ্রশেখরকে উপাধি দেবেন। সানন্দে সুদামচরণ তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাড়ি পৌঁছেই চন্দ্রশেখর বললেন, 'ম্লেচ্ছ ছুঁয়ে দিল, আগে স্নান করে শুদ্ধ হই।'

কটক : সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

রামচরিত মানস থেকে কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনার অনুবাদ করে আর অনুবাদ করতে ভাল লাগল না। আঠ মল্লিকের রাজা মহাযাত্রা সম্পূর্ণ করার জন্য অর্থ

দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না। সুতরাং রাধানাথ ঠিক করলেন যতটুকু অনুবাদ করেছেন ততটুকু ছাপিয়ে মহেন্দ্র দেওকে সমর্পণ করবেন। ১৮৯৪ সালের জুন মাসে ছোট পুস্তিকা 'তুলসীস্তবক' প্রকাশিত হল। রাধানাথ এটি উৎসর্গ করে লিখলেন :

নিখিল গুণবিধান অষ্টম মল্লিকাধীশ্বর
শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মহেন্দ্রদেও বাহাদুর
শ্রীকরকমলেষু
সবিনয় নিবেদনমিদং

শ্রীমান মহারাজ,

মহাযাত্রা রচনাপ্রসঙ্গে যেদিন আমি শ্রছামুর কাছ থেকে উৎসাহপ্রদ এবং সহানুভূতিপূর্ণ অনুগ্রহলিপি সেদিনটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। এতদিন আমার ধারণা ছিল যে ভাষানুরাগ সাহিত্য রসিকতা এবং গ্রাহকতা ওড়িশা ছেড়ে গঙ্গাবংশাবতংস শ্রীসূচল দেব শাসিত সুদূর বামণ্ডা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ঐদিন থেকে আমার সে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। মহাযাত্রা সমাপ্ত করে সেটি শ্রীহুজুরকে উৎসর্গ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এখন সে আশা কার্যে পরিণত হওয়া দুরাশার মত মনে হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শান্তি ও অবসর না থাকলে বাগদেবীর সাধনা বিড়ম্বনা মাত্র রয়ে যায়।

শ্রীহুজুরের প্রতি ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার কর্তব্য মনে করি। বাগদেবীর উদ্যান থেকে সুন্দর পুষ্প চয়ণ করে স্তবক তৈরী করে শ্রীহুজুরকে উপহার দিলে শ্রীহুজুরের গৌরবান্বিত নামের কথঞ্চিত উপযুক্ত হত। কিন্তু আমার সেরকম সুবিধা নাই বলে সৌন্দর্য্যরহিত কতকগুলি তুলসীদলে এই স্তবক প্রস্তুত করে শ্রীহুজুরকে অর্পণ করার সাহস করছি, গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব।

শ্রীছামুর
বিনয়াবনত ভৃত্য
শ্রীরাধানাথ রায়

কটক, ২৬.৭.৯৪

কিছুদিন পরে ভগ্নীপতি গোবিন্দবল্লভ রায় উপাধি নিতে কটকে এসে রাধানাথের বাড়িতে উঠলেন। তিনি উপাধি পাবেন বলে রাধানাথ সন্তোষ প্রকাশ করলেও রাজা ও জমিদারগণ সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা করেন না বলে তিনি তাদের উপর বিরূপ ছিলেন। ভাবলেন কেল্লার দরবার থেকে ফিরে এ বিষয়ে একটি কবিতা লিখবেন। একখানি নতুন খাতা নিয়ে শিরোনামা লিখলেন 'বৈয়াসিকী বানী' কারণ যা তিনি লিখবেন তা স্বয়ং ব্যাসদেবের মুখেই মানায়। এ কবিতার প্রথম দুটি লাইন কটক জেলা সম্পর্কে তা তিনি তৎক্ষণাৎ রচনা করে ফেললেন : উৎকলের পূর্ব-কীর্তি-স্মৃতি পূত, বারবাটি হের আজি হয়েছে সজ্জিত।

কবিতার কয়েকছত্র মাত্র লিখেছেন এমন সময় চন্দ্রশেখরের প্রতি উদ্দিষ্ট দ্বিতীয় দরবারের নিমন্ত্রণ এল। রাধানাথ চন্দ্রশেখরকে শ্রদ্ধা করতেন এবং খণ্ডপালা গেলে

তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভুলতেন না। সেজন্য ওরা সেপ্টেম্বরের বিশেষ দরবারে সকলের আগে তিনি উপস্থিত হলেন। আজকের দরবার হবে কমিশনারের বাংলোতে। কেল্লার দরবার থেকে আজকের আয়োজন ছোটখাট। ঠিক সাড়ে নটায় কুক সাহেব এসে পুলিসের সালামী নিয়ে দরবারে ঢুকলেন। সকলে উঠে দাঁড়াল। কমিশনার এবং অন্যান্যরা আসন গ্রহণ করলে সেরিস্তাদার চন্দ্রশেখরকে নিয়ে কমিশনারের সামনে গেল। চন্দ্রশেখর সাবধান ছিলেন, পাছে হ্যাণ্ডশেক করতে হয় তাই হাত পিছনে রেখেছেন। কমিশনার কিন্তু হাত বাড়ালেন না, তাঁর কুশল প্রশ্ন করে বললেন ফিলাত পরিয়ে দাও। সেরিস্তাদার তাকে নিয়ে গিয়ে খিলাত পরিয়ে নিয়ে এল। তাকে দেখতে সং-এর মত লাগছিল। রাধানাথ অসমাপ্ত কবিতার দুটি লাইন মনে মনে জুড়লেন : কি শোভা করেছ তুমি এই সভাঘর, উৎকল কেশর হে চন্দ্রশেখর! কুক সাহেব চন্দ্রশেখরের গলায় সোনার হার পরিয়ে দিলেন। মনে মনে রাধানাথ আরও এক লাইন রচনা করলেন : এ সম্মান মালা শোভে কিবা গলে। গোবিন্দবল্লভ রায় পাশে বসেছিলেন খোঁচা দিয়ে বললেন, বুধবারের দরবার এর থেকে উৎকৃষ্ট ছিল। রাধানাথ সাড়া দিলেন না, তাঁর মন কবিতার পরের লাইন খুঁজতে ব্যস্ত!

এর পরে কমিশনার ইংরাজীতে ভাষণ দিলেন। তাঁর এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু গোপাল বল্লভ দাস তার ওড়িয়া অনুবাদ করে শোনালেন :

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র সামন্ত! আপনার গুণরাশির সম্মান করে ভারতবর্ষের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ও গভর্নর জেনেরাল বাহাদুর আপনাকে যে যে সনন্দ মঞ্জুর করেছেন সেটি আজ সানন্দে আপনার হাতে তুলে দিলাম। আপনি এ দেশের একটি সম্মানিত রাজবংশে জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু আপনি অন্য রাজবংশজাত লোকদের মত বিলাসিতা এবং অন্যান্য সাংসারিক সুখে মগ্ন না থেকে বিদ্যারহণে এবং বিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতিষশাস্ত্রের সেবায় অহরহ নিমগ্ন থেকে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং জীবন সার্থক করেছেন। ভাস্করাচার্যের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশীয় পঞ্জিকার গণনাগুলিতে যে ভ্রম রয়ে গিয়েছিল অন্য কেউ সেগুলি সংশোধন করতে পারেনি। আধুনিক ইউরোপীয় যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে আপনি নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে আকাশচারী গ্রহ নক্ষত্রের গতি এমন সঠিকভাবে নিরূপণ করেছেন যে আপনার গর্ণনা ইউরোপীয় পঞ্জিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। আপনার এই কার্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। আমরা আশা করছি আজ প্রদ ও সম্মান আপনি বহুদিন উপভোগ করবেন এবং দেশবাসী আপনার আদর্শ অনুসরণ করতে তৎপর হবে।

দরবার শেষ হলে সকলে চন্দ্রশেখরকে ঘিরে ধরল এবং অভিনন্দন জানাল। গৌরীশংকর তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন সন্ধ্যায় কটক প্রিণ্টিং প্রেসে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। রাধানাথ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'বিশুদ্ধ স্বর্ণে কি মুদ্রা হয় ভাল!'

অনেকক্ষণ ধরে 'এ সম্মান মালা কিবা শোভে গলের' পরের লাইন খুঁজছিলেন, এখন আপনিই এসে গেল।

প্রিণ্টিং প্রেসের দোতলায় তোরণ নির্মিত হয়েছে। হলটিকে পাতায় ফুলে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। রাত্রি আটটায় সভা আরম্ভ হল। চন্দ্রশেখর উচ্চ আসনে বসেছেন। প্রথমে দুটি গীত হল। প্রথমটির রাগ ঝিঁঝিট তাল খেমটা : এস মিলে বন্ধুগণ আজ এ উৎসবের দিন। পাঠাণি সামন্তে সবে কর আলিঙ্গন। দ্বিতীয়টির রাগ সাহানা : এস এস সব মিত্রজন, এই শুভদিনে, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিই বৃদ্ধ চন্দ্রশেখরে!

পণ্ডিত মার্কণ্ডেয় মহাপাত্র চন্দ্রশেখরের গুণ কীর্তন করে সংস্কৃতে ভাষণ দিলেন। তারপরে চন্দ্রশেখরের পালা। তিনি সিদ্ধান্ত দর্পণের কিছু শ্লোক শোনালেন। সিদ্ধান্ত দর্পণের সপ্তদশ অধ্যায়ে একটি শ্লোক আছে যার মর্ম পৃথিবী স্থির নিশ্চল, সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করছে। প্রথমে কয়েকটি শ্লোক পড়ে তিনি আটচল্লিশতম শ্লোকে এলেন এবং সেটি পড়ে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন। হে চলমান পৃথিবীতে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম এবং বুদ্ধিবলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত কর। যদি তোমরা সত্যই বিশ্বাস কর যে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী চলমান তাহলে একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শোন। অনেক শ্লোক পড়ে তিনি যুক্তি দেখালেন যে পৃথিবী নিশ্চল এবং সেদিন সকালে লেখা এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে নিজের ভাষণ শেষ করলেন :

ব্রহ্মাণ্ডা খণ্ড ভাণ্ড স্থিরতর ধরণী মণ্ডল ভ্রান্তি শৌণ্ড প্রোদ্দণ্ডৈং লণ্ডদণ্ডাবলবলদলনাকুণ্ঠ কণ্ঠীবর শ্রী। ইত্যাদি।

অর্থাৎ অখণ্ড ভণ্ড স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী স্থির থাকলেও তাহার ভ্রমণ সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদগণ মত দিয়েছেন। তাঁরা হাতির মতো এবং তাঁদের বলদলনে আমার প্রবন্ধ সিংহের ন্যায়। ইত্যাদি।

বরপালি : মার্চ ১৮৯৫

সাহিত্য সেবার দ্বারা আর্থিক সুফল হচ্ছে না দেখে গঙ্গাধরও ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর 'ইন্দুমতী' কাব্য ময়ূরভঞ্জের রাজাকে উৎসর্গীকৃত। এটি উৎকল প্রভায় প্রকাশিত হলে তিনি মাত্র ২৫ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। অন্য কোনও আর্থিক সাহায্য শ্রীরামচন্দ্র করেননি। পরবর্তী রচনা উৎকললক্ষ্মী ও প্রভাকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সেটি প্রকাশ করা হল না। সুতরাং এখানি তিনি হিতৈষিণীতে পাঠালেন। সামান্য পুরস্কারও পেলেন না। মনের দুঃখ জানিয়ে প্রিয় মিত্র রাধানাথকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখলেন গঙ্গাধর। তিনি রাধানাথকে অনুরোধ করলেন ইন্দুমতীকে পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত করতে।

এই পত্রখানি যখন পেলেন তখন রাধানাথও অশান্তি ভোগ করছিলেন। নিজের গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যাপারে কোনও প্রগতি হয়নি। তুলসীস্তবক প্রকাশিত হলে নিন্দুকগণ বলল এর অনেক পংক্তি তার সমালোচকদের প্রতি উদ্দিষ্ট যথা, গিরিমালা যেমন সহে বারি বরিষণ, বলেব্য বচন তেমন সহেন সুজন। তাঁরা একটু কষ্ট করলে দেখতে পেতেন যে পংক্তি দুটি তুলসীদাসের হুবহু অনুবাদ : বুন্দ আঘাত সহ হিঁ গিরি কৈসে, খলকে বচন সন্ত সহে জৈসে! সমালোচকগণ অবশ্য যুক্তি শোনার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলেন না। রাধানাথ তাঁর সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধিত সকল অভিমান, অভিযোগ দুঃখ ঢেলে দিলেন গঙ্গাধর মেহেরকে লেখা এক দীর্ঘ পত্রে।

শ্রীহরি শরণম্

কটক, ১৮.৩.১৮৯৫

সবিনয় নিবেদনমিদং

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু, সময়ের অভাবে আপনার ২রা তারিখের পত্রের উত্তর দিতে দেরী হল। সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

প্রভা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছে বটে। সম্প্রতি অবশ্য মনে হচ্ছে এটি গোবিন্দবাবুর একক সম্পত্তি। মহারাজার অনেক সদগুণ আছে; অবশ্য তার মধ্যে ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ একটি কিনা সন্দেহ। আপনার মতো আমিও ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসেছিলাম যে মহারাজা উৎকলের ভাবী বিক্রমার্ক। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম তিনি মাতৃভাষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। একথা সত্য যে প্রভার খরচ তিনি বহন করেন কিন্তু তার প্রবর্তক অন্য কেউ। বারিপদার ভূতপূর্ব হেডমাষ্টার চৈতন্যবাবু এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আজকাল তিনি কেন্দুঝরে বাস করেন। গোবিন্দবাবু সংস্কৃত জানেন, ওড়িয়া ভাষায়ও তাঁর ভাল দখল আছে। কিন্তু তিনি চৈতন্যবাবুর মতো ভাষানুরাগী বা পরার্থপরায়ণ নন। মহারাজের বাক্যালাপের মাধ্যম সাধারণত ইংরাজী। হয়তো তিনি ইংরাজীতে চিন্তা করেন, স্বপ্ন দেখেন। সাহেবদের তোষামোদ এবং মৃগয়া তার চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায়। ইউরোপীয় রাজা এবং ধনবান ব্যক্তিরা যেমন বিদ্যানুরাগী এবং সাহিত্যরসিক তেমন দু চারজন রাজাও যদি ওড়িশায় থাকতেন তাহলে পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে ওড়িয়া পৃথিবীর একটি সমৃদ্ধ ভাষা বলে পরিগণিত হত। দুর্ভাগ্য যে তেমন রাজা ওড়িশায় পাওয়া মুস্কিল। বামণ্ডার মহারাজা অবশ্য তুলনামূলক ভাবে প্রশংসার্হ, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে যে তিনি যা করেছেন এবং করছেন তা অতি সাধারণ। আপনার মত ব্যক্তি ইউরোপে জন্ম নিলে মাসে অন্যূন ২০০ টাকা পেনশন পেতেন।

পারিবারিক কষ্ট, কর্মজীবনে ঝামেলা, দেশের লোকের অনাগ্রহ—এই সব কারণে আমি সাহিত্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছি। প্রকৃত সাহিত্যজ্ঞান অর্জন করা সময়সাপেক্ষ, বিশেষ করে ওড়িশায়। এখানে কালিদাস ও উপেন্দ্র ভঞ্জকে এক পংক্তিতে বসানো হয়। এমন জায়গায় সাহিত্যিক জ্ঞান লাভ করা সহজ নয়। বহুদিন থেকে আমার সাহিত্যে অনুরাগ। কিন্তু উচ্চ সাহিত্য কি তা হৃদয়ঙ্গম করতে অনেক দেরী হয়ে গেল। সে জ্ঞান যখন হল তখন সাহিত্য চর্চা ছাড়তে হল। আমার বয়স হয়েছে ৪৬ বছর। বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। নিজে

আর কিছু করতে পারব সে আশা স্বপ্নেও স্থান দিচ্ছি না। যাই হোক আপনার মতো মাতৃভূমির সুযোগ্য পুত্রদের উন্নতি দেখতে আমি সর্বদা উদগ্রীব।

যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় তবে একদিন কলকাতা ও সম্বলপুর হয়ে বরপালি যাব। দু চার মাস আপনার সঙ্গে থাকতে পারলে পরস্পরের শ্রেয়ঃ লাভ হত।

ইন্দুমতীর তিন কপি একখানি আবেদনপত্রের সঙ্গে যদি পাঠান তবে আমার সুপারিশসহ স্কুল বুক কমিটিকে দেব। দুঃখের বিষয় স্কুল বুক কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সাহিত্যজ্ঞানের অভাব। গুণ দেখে সদস্য নির্বাচন করা হয় না তাঁরা কি পদে আছেন তাই দেখা হয়। এজন্য মাঝে মাঝে নির্বাচন বিভ্রাট ঘটে যায়।

আপনার স্নেহক্রীত
শ্রীরাধানাথ রায়।

রাধানাথের চিঠি পেয়ে গঙ্গাধরের নৈরাশ্য বেড়ে গেল। তিনিও রাধানাথের মতো বর্তমান কালের রাজা জমিদারদের উপরে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বরপালির জমিদারের চাকরি করেছেন। আমীন ছিলেন, পরে মাল মুহরী হলেন। এবং খামারের ও বাজারের আয়ের হিসাব রাখতেন। জমিদার বেতন দিতেন কিন্তু তার অধিক কোনও সাহায্য করেননি। তাঁর কাছ থেকে সাহিত্যচর্চার জন্য উৎসাহ বা অর্থ পাননি কোনও দিন। বরপালির যুবরাজ ময়ূরভঞ্জের শ্রীরামচন্দ্রের ভগ্নীকে বিবাহ করার সময় গঙ্গাধর বারিপদা গিয়েছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দুমতীর জন্য ২৫ টাকা পুরস্কার ব্যতীত আর কোনও আর্থিক সাহায্য তিনিও করেননি। বলাঙ্গীর পাটনার নতুন রাজা মদ্দল গঞ্জন সিংহদেও একজন দক্ষ রাজা বলে পরিচিত, কিন্তু সাহিত্যর জন্য তিনিও কিছু করেননি।

রাধানাথ বৈয়াসিকী বাণীতে এই রাজাদের প্রতি আক্ষেপ করে চন্দ্রশেখর সামন্তের প্রসঙ্গে লিখলেন :

আছেন কি শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণ, বয়সে কিশোর জ্ঞানে বর্ষীয়ান।
আর আছেন বাসুদেব নৃপবর, বিদ্বান মরালকুল পদ্মাকর।
নরেশ মহেন্দ্র স্বদেশ গৌরব, গুণিবৃন্দ অনিবন্ধ বান্ধব।
তোমা সব জ্ঞানতরু ঝিমিয়ে গেল, দেখিতে ইহাই কি বিধি লিখেছেন? ইত্যাদি।

একদিন বিরক্ত হয়ে রাধানাথ শশীভূষণকে বললেন শ্রীরামচন্দ্রকে চিঠি লেখ। তিনি টাকা না দিন কিন্তু ঘর তৈরী করতে কিছু কাঠ তো দিতে পারেন। চিঠির কোনও জবাব এল না। এ সময় শ্রীরামচন্দ্র একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তিনি সারা ওড়িশার সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন কারণ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম ছিলেন। সকলের মতো তাঁর উচিত ছিল একটি হিন্দু কন্যা বিবাহ করা। সংবাদপত্রে লেখা হল তাঁর উপর লক্ষ লক্ষ লোকের শাসনভার, যিনি এত লোকের আদর্শ তাঁর মাত্র প্রেমে পড়ে দেশকালপাত্র কুলশীল

বিচার না করে বিবাহ্ করা অন্যায়। প্রেমের বশবর্তী হয়ে একজন সাধারণ প্রজা যদি একজন মেথরাণী অথবা বেশ্যাকে বিবাহ্ করে তবে রাজার কিছু বলার সৎ সাহস হবে কি? ময়ূরভঞ্জের সাঁওতাল প্রজাদের বক্তব্য : ডেঁয়ে পিঁপড়ে চলে ডেঁয়ে পিঁপড়ের সঙ্গে, পিপীলিকা পিপীলিকার সঙ্গে। ডেঁয়ে পিঁপড়ের লাইনে পিঁপড়ে যায় না। তবে রাজা কি করে লাইনের বাইরে গেলেন?



বার

খণ্ডপাড়া : মার্চ ১৮৯৫

আজকাল চন্দ্রশেখর সময় কাটান রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে এবং দিনে সনদটি দেখে। পত্র পত্রিকায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা। কিন্তু গৌরীশংকর এবং রাধানাথের মত শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রয়াস সত্ত্বেও পঁচিশ বছর আগে লেখা সিদ্ধান্ত দর্পণ আজও পাণ্ডুলিপি আকারেই পড়ে আছে। এটি প্রকাশ করার কোনও উপায় এখনও হয়নি। গৌরীশংকর দীপিকায় এরকম একটি আবেদন প্রকাশ করেছিলেন ১৮৮৭ সালে :

আমরা ওড়িশার রাজা জমিদার ও ধনবানদের অনুরোধ করছি তাঁদের কেউ এগিয়ে আসুন সিদ্ধান্ত দর্পণ ছাপানোর ব্যাপারে। এবং নিজেদের জন্য যশ এবং দেশের জন্য গৌরব অর্জন করুন। ধর্ম এবং খ্যাতি অর্জনের এমন সুযোগ সহজে মেলে না। তালচের এবং বামণ্ডার রাজাদ্বয় ধর্ম পুস্তক ছাপিয়ে এবং বিনামূল্যে বিতরণ করে ওড়িশাবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত দর্পণ প্রকাশ করতে যিনি সহায়ক হবেন তিনি সারা ভারতবর্ষের উপকার করবেন। যদি কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি এ কাজ করতে চান তবে আমাদের জানালে আমরা যতসম্ভব কম খরচে পুস্তকগুলি ছাপাতে সাহায্য করব।

যথারীতি এ আবেদনের কোনও ফল হল না। চন্দ্রশেখরের বয়স ষাট হল, শরীরও ভাল যাচ্ছে না। রোজ সিদ্ধান্ত দর্পণ খুলে পাতা উল্টে এটি আর প্রকাশ পাবে না ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। এই সময় রাধানাথ এক পত্রে জানালেন যে তিনি কটক কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। চন্দ্রশেখর এসে সিদ্ধান্ত দর্পণ ছাপার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।

ছাব্বিশ বছর বয়স্ক যোগেশচন্দ্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক কিন্তু সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁর সমান রুচি। তিনি রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের 'প্রদীপ' ও 'দাসী' পত্রিকায় বৈদিক ও পৌরাণিক বিষয়ের উপরে প্রবন্ধ লেখেন। ওড়িয়া বাংলা ইংরাজী ব্যতীত গুজরাটী ও মারাঠী ভাষায়ও তাঁর ভাল জ্ঞান আছে। বৈদিক কৃষ্টি কত পুরাতন তা জানার আগ্রহ তাকে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসন্ধিৎসু করেছে। এই জন্য তিনি চন্দ্রশেখর ও সিদ্ধান্ত দর্পণের বিষয় বিশদভাবে জানতে চান।

রাধানাথের পত্র পেয়ে চন্দ্রশেখর পুত্র চক্রধরকে সঙ্গে নিয়ে অনতিবিলম্বে কটক গেলেন। রাধানাথের বাড়ি পৌঁছে শুনলেন তিনি অফিসে গেছেন। চাঁদনী চকের এক ভাড়াবাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করল শশীভূষণ এবং সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গে করে যোগেশ চন্দ্র রায়ের বাড়ি নিয়ে গেল। যোগেশচন্দ্র তখনও ফেরেননি দেখে চন্দ্রশেখর বাড়ির

বাইরে তাঁর প্রতীক্ষা করলেন। একটু পরে কয়েকজন অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে চন্দ্রশেখরকে রাস্তায় দেখে যোগেশচন্দ্র বিব্রত হলেন এবং সঙ্গে করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। চন্দ্রশেখর চেয়ারে বসলেন না, ঘরের এককোণে মাটিতে বসে পুঁথিপত্র খুলতে লেগে গেলেন।

কতকগুলি তালপাতা সামনে নিয়ে ধূলিমলিন অপরিচ্ছন্ন বৃদ্ধ গ্রাম্য লোকটিকে দেখে যোগেশচন্দ্রের বন্ধুদের মানতে ইচ্ছা হল না যে ইনিই স্বনামধন্য জোতির্বিদ চন্দ্রশেখর সামন্ত। হতে পারে যে বৃদ্ধ সংস্কৃত জানে এবং লিখেছে জ্যোতিষের উপর শ্লোক দুই চার কিন্তু অসীম আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের সে কি জানবে। তারা চন্দ্রশেখরকে নিয়ে বাইরে গেল। তখন অন্ধকার নেমেছে, নির্মল আকাশে তারা ফুটেছে। পশ্চিম আকাশে মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের মধ্যে প্রায় ছয় ডিগ্রির ব্যবধান। যোগেশচন্দ্রের বন্ধু হেমচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—বলতে পারেন মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের দূরত্ব কত?

প্রশ্ন শুনে চন্দ্রশেখর পেট চেপে ধরে বিকট চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করে ধৃষ্টতা করে ফেলেছেন ভেবে বিব্রত হেমচন্দ্র চক্রধরের দিকে তাকালেন। সে বলল ব্যস্ত হবেন না, অম্লশূলের জন্য এরকম মাঝে মাঝে হয়। একটু পরে ঠিক হয়ে যাবেন। সত্যিই কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি উঠে বসলেন। নাকে একটিপ নস্য দিয়ে মান যন্ত্রটি বার করলেন। অনেকক্ষণ ধরে আকাশ নিরীক্ষণ করে বারান্দায় খড়ি দিয়ে অনেক হিসাব নিকাশ করে যে দূরত্ব বললেন সেটি প্রায় সঠিক।

চন্দ্রশেখরকে দেখানোর জন্য একটি দুরবীন এনে ঘরে রেখেছিলেন যোগেশচন্দ্র। চন্দ্রশেখর প্রথমে বুঝতেই পারলেন না এই অদ্ভুতদর্শন বস্তুটি কি! কিভাবে যন্ত্রটি ব্যবহার হয় বুঝিয়ে দিলে চন্দ্রশেখর সেটির মাধ্যমে জীবনে প্রথমবার নভঃমণ্ডল দেখলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে খালি চোখে যাদের দেখে এসেছেন সেই গ্রহ নক্ষত্র এখন একান্ত কাছে এসে গেল। অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপরে প্রশ্ন করলেন যন্ত্রটির আবর্দ্ধন কত? যোগেশচন্দ্র পালটা প্রশ্ন করলেন, আপনার কি মনে হয়, কত হতে পারে? চন্দ্রশেখর দুরবীন নিয়ে আর একবার চন্দ্র দেখে বললেন প্রায় একশ ব্যাসের আবর্দ্ধন। উত্তরটি একদম ঠিক।

এবার সকলে ঘরের ভিতরে গেলেন। সিদ্ধান্ত দর্পণ প্রকাশ নিয়ে আলোচনা হল। চন্দ্রশেখরের কিন্তু সেদিকে মন নেই। তিনি যে গ্রহ নক্ষত্র দুরবীন দিয়ে দেখলেন সেগুলি তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। এমন যন্ত্র যদি তাঁকে কেউ দিত! এমন একটি যন্ত্র যদি আগে পেতেন! তালপত্রগুলি দেখিয়ে যোগেশচন্দ্র মন্তব্য করলেন প্রথমে এগুলি কাগজে নকল করতে হবে। তারপরে দেবনাগরীতে লিখে ছাপাতে দিতে হবে। এমন করলে ভারতবর্ষের সকল পণ্ডিত এটি পড়তে পারবেন। স্থির হল গ্রন্থটি ওড়িয়া অক্ষরে কাগজে লিখিয়ে নেবেন চন্দ্রশেখর। এ কাজ শেষ হলেই ছাপানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়াস শুরু হবে। হিসাব করে দেখা গেল প্রাথমিক

কাজের জন্যই প্রায় এক হাজার টাকার প্রয়োজন। কোনও রাজা মহারাজার থেকে এ অর্থ আদায় করার দায়িত্ব দেওয়া হল এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট সুদাম চরণ নায়ককে।

অন্য শাস্ত্র নিয়ে সেদিন আলোচনা হতে পারল না। স্থির হল পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা আবার মিলিত হবেন। পরের দিন চন্দ্রশেখর এলে যোগেশচন্দ্র মন্তব্য করলেন আপনার মত যতই নির্ভুল হোক বাংলার পণ্ডিতগণ তাদের নির্ণিত তিথির সময়ের কোনও পরিবর্তন স্বীকার করবেন না। চন্দ্রশেখর বললেন প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলিতে চন্দ্র সম্বন্ধীয় স্থূল গণনায় তিথিতে চোদ্দ দণ্ডের পার্থক্য হয়েছে, সুতরাং সেই অনুসারে নির্ণিত তিথির সময় সঠিক হতেই পারে না। এর জন্য একখানি সূক্ষ্ম পঞ্জিকা দরকার। ইতিপূর্বে পণ্ডিতগণ তিথির পাঁচদণ্ড বৃদ্ধ এবং ছয় দণ্ড ক্ষয় বিষয়ে সম্মত হয়ে সাধারণ কাজের জন্য স্থূল পঞ্জিকা অনুসরণ করতেন। কিন্তু বিশেষ অনুষ্ঠানে যথা বিবাহ উপনয়ন যজ্ঞ ইত্যাদি মহৎ কাজের জন্য সূক্ষ্ম পঞ্জিকা প্রয়োজন। যোগেশচন্দ্র বললেন এ মত নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। শুনে চন্দ্রশেখর সিদ্ধান্ত দর্পণ থেকে আবৃত্তি করলেন : প্রত্যক্ষানুভবং ন লুম্পতি বচো যুক্তির্শতঃ অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভবকে পরাস্ত করা যায় না।

এর থেকে পৃথিবী গতিশীল কিনা সে প্রশ্ন উঠল। যোগেশচন্দ্র চন্দ্রশেখরকে তাঁর মত বদলাতে অনুরোধ করলেন। কারণ পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক নিঃসন্দেহ যে পৃথিবী চলমান। চন্দ্রশেখর বললেন পৃথিবী যে স্থির তার অনেক প্রমাণ তাঁর কাছে আছে। একজন সর্বজ্ঞ তাঁর মত আরও দৃঢ় করে দিয়েছিলেন। এই সর্বজ্ঞের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে যোগেশচন্দ্র যা জানতে পারলেন তার মর্ম :

একদিন চক্রপাণি মিশ্র নামক একজন সর্বজ্ঞ হঠাৎ চন্দ্রশেখরের বাড়ি এলেন। হাতের মুঠিতে একটি কুলের বীচি নিয়ে তিনি সর্বজ্ঞের জ্ঞানের পরীক্ষা নেবার জন্য প্রশ্ন করলেন বলুন তো আমার হাতে কি আছে? সর্বজ্ঞ প্রথমে বললেন, একটি বীজ, তারপরে বললেন বিন্দুযুক্ত বীজ এবং শেষে বললেন কুলের বীচি। চন্দ্রশেখরের সন্দেহ রইল না যে ইনি সত্যই সর্বজ্ঞ। এবার চন্দ্রশেখর বললেন, একটি গুরুত্ব বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে, আপনি যদি নিরসন করেন। তিনি বললেন না কি বিষয়ে সন্দেহ আছে। সর্বজ্ঞ ধ্যানে মগ্ন হয়ে বললেন তোমার মনে দ্বন্দ্ব দুটি বৃহৎ পদার্থ সম্বন্ধে তার একটি তেজোময় এবং অন্যটি তেজহীন। তার পরে বললেন সূর্য গতিময় এবং পৃথিবী নিশ্চল।

এরপরে পৃথিবীর স্থিরতা সম্বন্ধে চন্দ্রশেখরের মনে কোনও সন্দেহ রইল না। যোগেশচন্দ্র জানতে চাইলেন এই মহাপুরুষ এখন কোথায়। চন্দ্রশেখর বললেন খণ্ডপাড়া থেকে যাবার কিছুদিন পরে তিনি স্বর্গের বিষয়ে জানবার জন্য তারিণী পাহাড় আরোহন করছিলেন, পা পিছলে পড়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ কথা শুনে যোগেশচন্দ্র হাসবেন না কাঁদবেন ঠিক করতে পারলেন না। কিন্তু

চন্দ্রশেখরের মত বদলাবার নয়। পুঁথিগুলি কাগজে নকল করতে বলে যোগেশচন্দ্র তাঁকে বিদায় করলেন। পরের দিন রাধানাথের সঙ্গে দেখা করে তিনি খণ্ডপাড়ায় ফিরে এলেন। তালপত্রগুলি ঘনশ্যাম মিশ্রকে দিয়ে বললেন এগুলি কাগজে লিখতে হবে। এ কাজ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল।

পুরী : মে ১৮৯৫

১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পুরী মন্দিরের মামলার আপোষ রফা হল বটে, মন্দির পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা অব্যাহত রইল। একটি ছোট ঘটনা নিয়ে গোলমাল শুরু হল ১৮৮৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি। মিউনিসিপ্যালিটির একজন হিন্দু ইনস্পেক্টর মাপের ফিতা নিয়ে মন্দিরে ভিতরে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ফিতাটি একটি চামড়ার খোলে ছিল। এই অজুহাতে পাণ্ডারা ঘোষণা করল যে মন্দির অশুদ্ধ হয়েছে। রান্না জিনিস সব ফেলে দেওয়া হল এবং মহাস্নান করে মন্দির শুচি করা হল। রাঁধুনেদের ক্ষতির প্রতিবাদে তারা দুদিন ভোগ রন্ধন বন্ধ রাখল। তীর্থযাত্রীদের এর ফল ভোগ করতে হল। শ্রীশ্রীজগন্নাথ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা এক বিশেষ অধিবেশনে বিষয়টি আলোচনা করে স্থির করল :

গত বুধবার সকালে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর মঙ্গল আরতি ও অবকাশ শেষ হলে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী চামড়ার খোলে মাপের ফিতা নিয়ে শ্রীমন্দিরে ঢুকে পড়িয়ারী নিয়োগের বৈঠকখানার মাপ নিল। মন্দিরে চর্ম প্রবেশের জন্য ভাঁড়ার ঘরের সকল রান্না করা সামগ্রী মৃত্তিকা ভাণ্ড ইত্যাদি বহুমূল্য সামগ্রী নষ্ট হল। ফলে, সেদিন সন্ধ্যায় মহাপ্রভুর মহাস্নান হল। এর খরচ শ্রী রাণী মহোদয়া দিয়েছেন। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার মাত্র কোঠ ভোগ হল ছত্রভোগ বন্ধ থাকল। ভোগ বন্ধ থাকলে বাজারে চিঁড়ার দাম এত বাড়ল যে টাকায় পাঁচ সেরও গেল না। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এবং যে কাঙালরা আনন্দবাজারে খায়, তাদের বিশেষ কষ্ট হল। এটি এক ধর্মহানিকর শোচনীয় ঘটনা।

রাণী সূর্যমণি এ সিদ্ধান্তর কথা মধুবাবুকে জানালেন। মন্দিরের মামলার পর থেকে রাণী সব ব্যাপারে মধুবাবুর উপরে নির্ভর করছেন। মধুবাবুও চাইতেন মন্দির সুচারুরূপে পরিচালিত হোক। মন্দির নিয়ে রাণী বারম্বার তাঁকে ব্যস্ত করছেন দেখে মধুবাবু কমিশনার জে. এ. হপকিন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে রাজী করালেন যে জজকোর্টের সেরিস্তাদার বাবু হরেকৃষ্ণ দাস সূর্যমণির ম্যানেজার হয়ে পুরী যাবেন। তদনুসারে ডাক পালকিযোগে হরেকৃষ্ণ পুরী গেলেন।

পুরী এসে হরেকৃষ্ণ দাসের মনে হল তিনি একটি কঠিন দায়িত্ব নিয়েছেন। পর্দানশীন রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। এদিকে মন্দিরের সেবক ও পাণ্ডারা কোনও কথা গ্রাহ্য

করে না। নাবালক মুকুন্দ সূর্যমণিকে তোয়াক্কা করে না, ভৃত্য পরিবেষ্টিত হয়ে সময় কাটায়। পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র তাঁর গৃহশিক্ষক, কিন্তু মুকুন্দ তাঁর কাছে ঘেসে না। এত ঝামেলার মধ্যে হরেকৃষ্ণর এক সান্ত্বনা যে রোজ জগন্নাথের দর্শন পাবেন। অক্টোবর মাসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি জগন্নাথের ভক্ত, ঔষধ খেলেন না, মাত্র চরণামৃত পান করলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হল।

এবার ম্যানেজার হয়ে এলেন কৃষ্ণচন্দ্র মহান্তি। ১৮৯২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কালেক্টর ডি. বি. এলেন কমিশনারের কাছে এক পত্রে সুপারিশ করলেন যে মুকুন্দর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিচার করে তাকে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের অধীনে রাখা উচিত হবে। কমিশনার টয়েনবী কিন্তু রাজী হলেন না, তাঁর মতে ষোল বছরের যুবককে ঠিক পথে আনার আশা করা বৃথা।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একটি গোদামে আগুন লেগে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল এবং রাজবাড়িতে পৌঁছে গেল। সেই পরিসরে যত কাঁচা ঘর ছিল সব নিমেষে ভস্মীভূত হল। এমনকি পাকা বাড়ির দরজা জানালাও পুড়ে গেল। অনেক ক্ষতি হল। রাজবাড়ির মহিলারা মধুবনে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। মুকুন্দ একখানি গামছা পরে ছিল। সেই অবস্থায় দৌড়ে এসে বড়দাণ্ডে দাঁড়াল। লোকে ভিতরে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে মুকুন্দ তাদের মানা করল। সম্পত্তির সঙ্গে অনেক পশুপক্ষীও বিনষ্ট হল।

১৮৯৩ সালে দুটি আষাঢ় মাস পড়ল। রীতি অনুসারে নবকলেবর হবার কথা। এর আগে ১৮৫৫ এবং ১৮৭৪ সালে নবকলেবর হয়েছিল। এত বছর পরে নবকলেবর হবে, লোকের উৎসাহ স্বাভাবিক। রাণী সূর্যমণি অবশ্য নবকলেবর করাতে চান না কারণ এতে তাঁর অনেক খরচ হয়ে যাবে। তাছাড়া একটি গুজব রটেছিল যে নবকলেবর হলে এক বছরের মধ্যে একজন ছুতোর মিস্ত্রি, একজন ব্রাহ্মণ এবং রাজপরিবারে এক ব্যক্তির মৃত্যু হবে।

রাণী নবকলেবরে উদ্যোগী হলেন না দেখে পণ্ডিত, সন্ত মহান্ত দণ্ডী সন্ন্যাসী, ও সেবকরা মিলে রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে একটি সভা করল। সূর্যমণি দেওয়ানকে দিয়ে খবর পাঠালেন যে পতি মহাপাত্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, অতএব নবকলেবর হবে না। জবাবে সভা বলল পতি মহাপাত্রের অনুপস্থিতিতে নবকলেবরের বৃক্ষনির্বাচন অন্য একজন ব্রাহ্মণ করবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ের সময় পতি মহাপাত্র আরোগ্য লাভ করবেন।

তবুও রাণী কোনও নিষ্পত্তি জানালেন না। তখন ছত্রিশ নিয়োগ সেবকগণ এক লিখিত পত্রে নবকলেবরের বিধি বর্ণনা করে জানলে যে পতি মহাপাত্র আরোগ্য লাভ করেছেন, এবার রাণী নারকেল সুপারী দিয়ে দারু আনার দিন স্থির করে দিন। রাণী পত্রের জবাব দিলেন না। বিষোই এখন রাণী এবং জনসাধারণের মধ্যে একমাত্র

যোগসূত্র। সে এখন ভস্মীভূত ঘরগুলির জায়গায় পাকা বাড়ি তৈরীর ব্যবস্থায় ব্যস্ত। লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল রাণী তাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। বাধ্য হয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা রাণীর কাছে আরও একটি নির্দ্ধারণ পাঠাল :

শ্রীযুক্ত শ্রী রাণী সাহেবা সভার মত গ্রহণ করে এবং সেবকদের কাছ থেকে কার্যপ্রণালী লিখিয়ে নিয়ে এখন যদি পিছিয়ে যান তবে সারা ভারতবর্ষের হিন্দুদের মনস্তাপ হবে। অতএব হিন্দু জনসাধারণের এই মহৎ কার্য সাধনের জন্য শ্রীরাণী মহোদয়ার কাছে নিবেদন মহাপ্রভুর নতুন কলেবরের জন্য যত্নবান হন।

এত কিছুর পরে রাণী মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের অঙ্গ পরিবর্তনের অনুমতি দিলেন। তীর্থযাত্রী এ কথা জানতে পারল না। নবকলেবরে যেমন ভীড় হয় এবারও তেমন হল।

এখন থেকে সূর্যমণির জনপ্রিয়তা হ্রাস পেল। এদিকে মুকুন্দর মতিগতির কোনও পরিবর্তন হল না। মূর্খ নির্বোধ, স্নেহ সহানুভূতি রহিত বন্ধুহীন মুকুন্দ সাবালক হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করার প্রতীক্ষায় রইল।

১৮৯৫ সালের মে মাসে উপেন্দ্র দাস ও লক্ষ্মীনারায়ণ মহান্তি নামক দুই ব্যক্তি সিভিল কোডের ৫৩৯ ধারা অনুসারে মুকুন্দর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে আর্জি দিল। এ মকদ্দমা হলে মন্দির পরিচালনার অব্যবস্থার কথা জনসাধারণের গোচর হত এবং হয়ত অবস্থা শুধরাবার প্রয়াস হত। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল উপেন্দ্র দাস কোনও আর্জিতে দস্তখত করেনি এবং লক্ষ্মীনারায়ণ একজন দরিদ্র খল প্রকৃতির লোক। সুতরাং সরকার অনুমতি দিল না। এ মকদ্দমা প্রমাণ করা সহজ হত না মন্দিরের কিছু অর্থ বরবাদ হত মাত্র।

খণ্ডপাড়া : জানুয়ারি ১৮৯৬

সুদাম চরণ নায়ক আঠমল্লিকের রাজা মহেন্দ্র দেওকে সিদ্ধান্ত দর্পণ মুদ্রণের জন্য এক হাজার টাকা দিতে রাজী করালেন। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে পুঁথিকে কাগজে লিখে পরে দেবনাগরী লিপিতে রূপান্তর করার কাজ জোর শোরে শুরু হল। কলেজ পড়ানোর সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় যোগেশচন্দ্রের এই কাজে কাটে। প্রত্যেক সপ্তাহে খণ্ডপাড়া থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ আসে। যোগেশচন্দ্র সেগুলি পড়ে যেখানে সন্দেহ হয় লিখে পত্র পাঠান চন্দ্রশেখরের কাছে। পরের সপ্তাহের কাগজের সঙ্গে পত্রের জবাব আসে এবং পত্রবাহক আর একটি পত্র নিয়ে ফিরে যায়। একই সঙ্গে ছাপানোর ব্যাপারে কলকাতার প্রেসগুলির সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করলেন যোগেশচন্দ্র।

একদিকে সিদ্ধান্ত দর্পণ ছাপানোর ব্যাপারে কাজ এগোতে লাগল, অন্যদিকে পঞ্জিকা

নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। কটক প্রিণ্টিং প্রেস ১৮৬৭ সালে প্রথম ওড়িয়া পঞ্জিকা প্রকাশ করেছিল। এটি সিদ্ধান্ত দর্পণের উপরে আধারিত। একা চন্দ্রশেখর পঞ্জিকা লিখতে পারেন না, সেজন্য প্রাথমিক কাজ করতেন তাঁর শিষ্য খুর্দার হরিহর খড়িরত্ন। চন্দ্রশেখর হরিহরের পাণ্ডুলিপি পড়ে পরিমার্জিত করে ছাপাতে পাঠাতেন। এই ব্যবস্থা কয়েক বছর চলার পরে হরিহরের মৃত্যু হল এবং এ কাজের ভার নিলেন তাঁর পুত্র সদাশিব।

পঞ্জিকার কাজ করে দেওয়ার জন্য প্রিণ্টিং কোম্পানি খড়িরত্নকে একশ টাকা বেতন দিত কিন্তু চন্দ্রশেখর কিছুই পেতেন না। চন্দ্রশেখর আপত্তি করলে তাঁকে ত্রিশ টাকা দেওয়া হল। কয়েক বছর এভাবে চলার পরে চন্দ্রশেখর গৌরীশংকরের সঙ্গে দেখা করে দাবী করলেন গ্রন্থকর্তা হিসাবে তাঁকে পঞ্জিকা বিক্রির থেকে লাভের অর্ধেক দেওয়া হোক। প্রিণ্টিং কোম্পানির বোর্ড আলোচনা করে এ দাবী স্বীকার করল এবং চন্দ্রশেখর বছরে প্রায় ত্রিশ টাকা পেলেন। কয়েক বছর এভাবে চলার পরে খড়িরত্নের চোখের অসুখ হল এবং তিনি আর পঞ্জিকার কাজ করতে পারলেন না। চন্দ্রশেখর তাঁর শিষ্য খণ্ডপাড়ার স্কুল শিক্ষক রাজবল্লভ মিশ্রকে এবার এ কাজের ভার দিলেন। পঞ্জিকা সংকলনের সব থেকে কঠিন অংশ হল সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সঠিক সময় নির্ধারণ করা। এই কাজ রাজবল্লভকে শেখাননি চন্দ্রশেখর। এটি শিখে নিলে তিনি নিজেই পাঁজি লিখে বিক্রি করতে পারতেন।

সদাশিব খড়িরত্ন সব কাজ ভাল ভাবে আয়ত্ত্ব করে নিয়েছিলেন। এখন চন্দ্রশেখরের কাজ তাঁর হাতে নেই, চোখের রোগও ঠিক হয়ে গেছে। তিনি একখানি পঞ্জিকা লিখে অরুণোদয় প্রেসকে দিলেন এবং সেটি মুদ্রিত হয়ে বাজারে এল। তৃতীয় একখানি পঞ্জিকাও বাজারে দেখা গেল। এটি বালেশ্বর থেকে সীতানাথ রায়ের প্রেসে মুদ্রিত হয়েছে। এতে দাবী করা হল শ্রী নিমাই চরণ ঘোষ চন্দ্রশেখরের সিদ্ধান্ত দর্পণ অনুসরণ করে এটি লিখেছেন। নিমাই চরণ কাউপুরের স্কুলের শিক্ষক, জীবনে চন্দ্রশেখরের সংস্পর্শে আসেন নি, অপ্রকাশিত সিদ্ধান্ত দর্পণ পড়ার সুযোগ তিনি পাননি। বাস্তবে হয়েছিল এই : রাজবল্লভ মিশ্র যে সকল গণনা করতেন তাঁর ভাগ্নে হরিহর নন্দ তার অজ্ঞাতসারে সেগুলি নকল করে সীতানাথ রায়কে পাঠাত। সীতানাথের প্রেসে তিথি পূর্বে ছাপা হয়ে থাকত। প্রিণ্টিং প্রেসের পঞ্জিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে অন্য বিষয় জুড়ে দিয়ে পঞ্জিকা তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হত। এটি যে ভিন্ন তার প্রমাণ হিসাবে সময়ের হিসাবে সামান্য হেরফের করা হত।

১৮৯৬ সালে জানুয়ারি মাসে তিনখানি পঞ্জিকা বাজারে এল এবং লোকে এ নিয়ে আলোচনা করল। অরুণোদয় প্রেসের পঞ্জিকাতে ভুল দেখিয়ে একখানি পত্রপ্রকাশ করলেন চন্দ্রশেখর। তার অন্তিম ভাগে খড়িরত্নের সম্বন্ধে লিখলেন :

খড়িরত্ন সূর্যগ্রহণ গণনা আদৌ শেখেননি। চন্দ্রগ্রহণের হিসাবে খুব মুস্কিল নয়।

এটা তিনি করতে পারেন। হয়তো এক আধ দণ্ড ভুল থেকে যাবে। কিন্তু সূর্যগ্রহণ গণনা করা দুরূহ। আমার সামনে অনেকবার চেষ্টা করেছেন। যা শিখেছিলেন তাও ভুলে গেছেন। জগন্নাথ মন্দিরের ক্রিয়াকর্ম এবং লোকের ব্যবহারে জন্য একখানি শুদ্ধ পঞ্জিকার প্রয়োজন। ত্রুটিপূর্ণ পঞ্জিকার দ্বারা যে অধর্ম হতে পারে তা বলা বাহুল্য। উপসংহারে বক্তব্য এই যে গুরুর দ্বেষ করলে লব্ধ বিদ্যা পরলোকে বিফল হয়। ইহলোকে কাজে লাগলেও লাগতে পারে। কিন্তু অকৃতবিদ্যার লোক গুরু দোষ করলে ইহলোক বা পরলোক কোথায়ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

কটক প্রিন্টিং প্রেসও নিজেদের পঞ্জিকার বিষয়ে লোকদের সতর্ক করে লিখল :

কোম্পানির প্রকাশিত পঞ্জিকার জনপ্রিয়তা দেখে এই শহরের অন্য একটি প্রেস একখানি পঞ্জিকা প্রকাশ করে চার আনা মূল্যে বাজারে বিক্রি করছে। সেটি আমাদের পঞ্জিকার থেকে অনেক ছোট এবং তার আপেক্ষিক মূল্যও অধিক যদিও তার সকল গণনা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারে হয় না। সেটিকে ভুল করে যেন আমাদের পঞ্জিকা ভেবে কেউ ক্রয় না করেন। আমাদের পঞ্জিকার প্রণেতা স্বয়ং উৎকল বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত। পঞ্জিকার উপরে তাঁর নাম দেখে কিনলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

পুরী : মে ১৮৯৭

অনেকদিন রোগে ভুগছে মুকুন্দ। সূর্যমণি মধুবাবুর পরামর্শে তাকে কটক পাঠালেন চিকিৎসার জন্য। সে এক ভাড়াবাড়িতে থাকে এবং সিভিলসার্জন তার চিকিৎসা করেন। সঙ্গে চাকর ও রান্নার পূজারী আছে। মাঝে মাঝে তার জন্য পুরী থেকে মহাপ্রসাদ আসে। এমনি একদিন বল্লভ সুবুদ্ধি নামে একজন চাকর মহাপ্রসাদ ও আচার নিয়ে এল। সে পূজারীকে একটি মোড়ক দিয়ে বলল, এর গুঁড়ো পানের সাথে রাজাকে খাইয়ে দেবে। সে বলল রাজবাড়ির কেরাণী হরি সুবুদ্ধি মোড়কটি দিয়েছেন। পুজারী মুকুন্দকে সব কথা জানাল। মধুবাবু এ খবর পেলেন। এমন কি মুকুন্দকে বিষ দিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে বলে পুলিশে রিপোর্ট করা হল। ম্যাজিস্ট্রেট হরি সুবুদ্ধির নামে ওয়ারেন্ট জারী করলেন। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এনে কটকের হাজতে রাখল। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পুরিয়াটি কলকাতায় পাঠাল পুলিশ।

কলকাতা থেকে রিপোর্ট এল যে গুঁড়োতে কোন ও বিষাক্ত পদার্থ নেই। তাছাড়া মুকুন্দকে মারার কোনও অভিসন্ধি হরি সুবুদ্ধির ছিল না। সে হলফ করে বলল কোনও মোড়ক সে পাঠায়নি। হরি সুবুদ্ধি খালাস হল কিন্তু মোড়ক রহস্য শেষ হল না। এর এক ফল এই হল যে মুকুন্দ খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সাবধান হয়ে গেল। এবং

সূর্যমণির প্রতি তার বিদ্বেষ বেড়ে গেল। তার বিশ্বাস জন্মাল যে সূর্যমণি তাকে মেরে ফেলতে চান এবং মোড়কে বিষ না থাকলেও মন্ত্রপূতঃ কিছু নিশ্চয়ই ছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে মুকুন্দর একুশ বছর পূর্ণ হল। ১৮৮৮ সালের রাজীনামা অনুসারে মন্দির পরিচালনা ও জমিজমার ভার ছিল সূর্যমণির উপর। এবার তাঁকে দায়িত্বমুক্ত করা হল। আটত্রিশ বছর আগে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে অতি অল্পবয়সে তাঁকে গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। দিব্যসিংহ সাবালক হয়ে রাজার দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাত্র তিন বছর। এই তিন বছর বাদ দিলে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর সূর্যমণিই ছিলেন পুরীর প্রকৃত 'রাজা'। এবার মুকুন্দ দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে অন্তঃপুর বাসিনী করে দিল।

লোকে সর্বদা মুকুন্দর সঙ্গে পিতা দিব্যসিংহের তুলনা করে। দিব্যসিংহ ছিল হৃষ্টপুষ্ট সুস্থসবল আর মুকুন্দ খর্বকায়, ক্ষীণ এবং রুগ্ন। দিব্যসিংহ ছিল নির্বোধ ও উগ্র, মুকুন্দ তার থেকেও নির্বোধ কিন্তু নিরীহ। নাপিতের ভয়ে সে চুল নখ কাটে না, তার লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি ও বড় বড় নখ। সে লাল রেশমী কাপড় পরে, সব ধর্মানুষ্ঠান মানে এবং দুর্গাপূজার সময় ছাড়া সম্পূর্ণ নিরামিষাশী।

মুকুন্দর একমাত্র শখ পশুপাখি পালন। রাজবাড়িতে অনেক শুকসারি, পায়রা ইত্যাদি পোষা আছে। তাছাড়া আছে হরিণ, খরগোশ, জংলী ইঁদুর ইত্যাদি। কিন্তু তার সব থেকে প্রিয় জীব হল শূয়োর। একটি বড় জায়গা ঘিরে মুকুন্দ অনেক শূয়োর রেখেছে। তাদের প্রত্যেকটির নাম দেওয়া হয়েছে। তাদের শূয়োর বললে সে রেগে যায়, নিজে বলে বরাহ। তাদের ছুঁলে অশুচি হতে হবে তাই নিজের হাতে খাওয়াতে পারে না কিন্তু সে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া তদারক করে। পশুপাখির দেখাশুনা করতে অনেক সময় যায় মুকুন্দর।

লোকের সামনে যেতে মুকুন্দর কুণ্ঠা তাই সে বন্ধ ঘরে থাকে। পাল্কিতে পর্দা লাগানো থাকে যাতে বাইরে যাবার সময় কেউ তাকে দেখতে না পায়। পশুপাখির পরিচর্যায় যে সময় কাটে তাছাড়া অন্য সময় বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে জানলায় খড়খড়ি দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কোনও ভিখারী অথবা গরীব লোক দেখলে ডেকে খাইয়ে বিদায় করে। খাবার আশায় কয়েকজন ভিখারী রাস্তায় চলা ফেরা করতে থাকে যতক্ষণ না মুকুন্দর ডাক আসে।

রাজা হয়ে মুকুন্দ স্থির করল বাইরে গিয়ে ভিখারীদের দান করবে। টাকার বদলে পয়সা, আধুলি, কড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করা হল। কড়ি এখন আর মুদ্রা হিসাবে চলে না তবু অনেকে দান খয়রাত করার জন্য কড়ি ব্যবহার করে। একদিন সকালে স্নান করে দুটি বেতের ঝুড়িতে পয়সা কড়ি ইত্যাদি নিয়ে পাল্কি চড়ে মুকুন্দ বেরিয়ে পড়ল পুণ্য অর্জন করতে। মন্দিরের সামনে যেখানে কুষ্ঠ রোগীরা ভিড় করে বসে থাকে সেখান দিয়ে যাবার সময় সে পাল্কির ভিতর থেকে মুঠো মুঠো করে পয়সা ও কড়ি ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। এগুলি কুড়িয়ে নেবার জন্য রোগী ও ভিখারীর কাড়াকাড়ি মারামারি

শুরু করল। বাহকরা পাল্কি নিচে রেখে মজা দেখতে লাগল। মারামারি ধাক্কাধাক্কি শেষ হলে বাহকরা পাল্কি ওঠালো। এমন সময় এক ভিখারিনী ছুটে এসে হাতের পয়সা পাল্কির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে বলল নে, তোর পয়সা নিয়ে যে গর্ত থেকে এসেছিস সেই গর্তে ফিরে যা! শুনে ভিখারীরা হেসে কুটিপাটি হল আর বাহকরা পাল্কি নিয়ে দিল ছুট, একেবারে রাজবাড়ির ভিতরে গিয়ে থামল। মুকুন্দ হুকুম দিল সেই ভিখারিনীকে ধরে আন।

তারা যাকে ধরে আনল তার নাম খণ্ডি। অল্প কিছুদিন হল সে পুরী এসেছে। তার ঝগড়াটে স্বভাবের জন্য অন্যরা তাকে ভয় করে। তার প্রকৃত নাম সাধবী, এক কৃষক পরিবারে তার জন্ম। তার এক হাতে খুঁত আছে তাই নাম হয়েছে খণ্ডি। এ হাতখানি সে সর্ব সময় কাপড়ে ঢেকে রাখে বলে সকলে তা দেখতে পায় না। অল্প বয়সে কপিল জেনার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কপিলের মৃত্যু হলে সে জগু বড়ালকে বিয়ে করে। তার এক ছেলে মদন ও দুই মেয়ে পাটি ও রুপেই। জগু বড়ালের মৃত্যু হলে সে মদনকে এক পরিবারে চাকরের কাজে লাগিয়ে দিল আর নিজে গোবরের ঘুঁটে দিয়ে সেগুলি বিক্রি করতে রোজ পুরী শহরে আসে। এতে পেট চলে না দেখে সে ভিক্ষাবৃত্তি করেছে।

চাকরদের কাছে খণ্ডির কাহিনী শুনে মুকুন্দ খণ্ডিকে খাইয়ে দাইয়ে রাজবাড়িতে ধান কোটার কাজে লাগিয়ে দিল। শূয়োরদের বেষ্টনীর পাশে খণ্ডির জন্য ঘর তোলা হল। কয়েক দিনের মধ্যে মুখরা বলে সকলে তাকে চিনে ফেলল। তার নামে কেউ কিছু বলার, আগেই সে মুকুন্দর কাছে এসে সকলের নামে নালিশ করে। মুকুন্দ তার নালিশ শুনে কিছু না করলে তাকেও দু কথা শুনিয়ে দেয়। ধরতে গেলে আজকাল মুকুন্দও তাকে ভয় করে। রাজবাড়িতে এমনকি শহরেও সকলে খণ্ডির নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেল।

একদিন দুপুরে মুকুন্দ একাকী শূয়োরের বেষ্টনীর কাছে পায়চারি করছে এমন সময় খণ্ডি ডাকল, এই রাজার ছেলে এদিকে আয়। খণ্ডি তার ঘরে শুয়েছিল। মুকুন্দ সেই স্বল্পালোকিত ঘরে ঢুকলে সে উঠে বসল। আজ মেজাজ দেখাল না, সহজভাবে কথা বলল। মুকুন্দও খুশ মেজাজে ছিল। শেষে প্রশ্ন করল তোর কি খুঁত আছে যে লোকে তোকে খণ্ডি বলে?

শুনে খণ্ডি দপ করে জ্বলে উঠল। রাগে মুখ রক্তবর্ণ হল, একটানে কাপড় খুলে ফেলে উগ্র মূর্তিতে মুকুন্দর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, দেখ, ভাল করে দেখ কোথায় খুঁত, পোড়ার মুখো রাজা!

কটক : আগষ্ট ১৮৯২

১৮৯৫ সালে রাধানাথের 'যযাতিকেশরী' প্রকাশিত হল। রাধানাথ দ্বিতীয় বামণ্ডা যাত্রার স্মারক হিসাবে এটি বামণ্ডার যুবরাজ সচ্চিদানন্দকে উৎসর্গ করলেন। তার পরের বছর কণিকার রাণীর দয়ায় অনেকদিন আগের রচনা 'মহাযাত্রা' প্রকাশিত হল। এর মুখবন্ধ লিখলেন মধুসূদন রাও। রাধানাথ কাব্যটি কণিকার রানী কৃষ্ণপ্রিয়া পাটমহাদেবীকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশক হিসাবে রাণী এটি উৎসর্গ করলেন কটকের কমিশনার রমেশচন্দ্র দত্তকে।

প্রকাশিত হতেই সমালোচকগণ মহযাত্রার মহাসমালোচনা করলেন। তাঁদের রসদ জোগাল ময়ূরভঞ্জ ও বামণ্ডার রাজার বন্দনা। এর আগে 'চিল্কা' কাব্যেও রাধানাথ এই দুই রাজার গুণগান করেছিলেন :

ভোর হল ঘোর তামসী রজনী,
ফুটিবে উৎকল ভাষা কমলিনী।

কিন্তু মহাযাত্রার মতো বিষয়বস্তুর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র, বাসুদেব ও সচ্চিদানন্দের বন্দনা শুধু মাত্র অপ্রাসঙ্গিক নয় ধর্মদ্রোহও বটে।

এই সময় 'মহাযাত্রার সমালোচনা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হল। এ সকল ঝড় তুফানের মধ্যে রাধানাথকে সান্ত্বনা দিলেন স্বয়ং ভঞ্জকুলধ্বজ কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র। তিনি লিখলেন :

বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ
১১.৫.১৮৯৭

প্রিয় শশীবাবু,

আপনার পত্র পেলাম। কাজে ব্যস্ত থেকে উত্তর দিতে দেরী হল। সেজন্য দুঃখিত। বর্ষা আরম্ভ হলে কাঠ পাঠাবে। আপনি যদি রসিকবাবুকে বলে কাঠ কাটিয়ে রাখতেন তবে এ কাজ শীঘ্র শেষ হয়ে যেত। এখন আমার কাজের চাপ এত বেশি যে এ বিষয়ে মন দিতে পারব না। ফলে বিলম্ব হবে। রসিকবাবু এটুকু করতে পারবেন কিনা ভেবে দেখবেন।

কয়েকদিন আগে মহাযাত্রার সমালোচনা নামে একখানি পুস্তিকা দেখেছি। সংসারে যে শ্রেণীর লোক দুর্লভ সৌভাগ্যবশত সমালোচকগণ তাদের মধ্যে গণ্য। তারা স্বভাবে রোগগ্রস্ত, প্রকৃতিতে তারা কিছু উত্তম উদার ও শোভনীয় দেখতে পান না। বস্তুত তারা শয়তানের চেলা। প্রথম থেকে শেষ অবধি এই বইতে বিষ, অগ্নি ও ঈর্ষা উদ্‌গীরণ হয়েছে। আপনার পিতার প্রতি যে বিদ্বেষ সমালোচকগণ মনে পোষণ করেন এই সমালোচনা তাই পরিতৃপ্ত করেছে।

আপনি আমার সম্মান গ্রহণ করে আপনার পিতাকে জ্ঞাপন করবেন।

আপনার স্নেহাধীন,
শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও।

১৮৯৭ সালের জুন মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী হল। রাধানাথ কলকাতা থেকে খবর পেলেন যে তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধি দেওয়া হয়েছে। ছোট লাটের বেলভেডিয়ারের বাসভবনে দরবার হবে এবং তাকে খিলাত ও সনদ দেওয়া হবে। মনে পড়ল তিনি দরবারের উপর কটাক্ষ করে কবিতা লিখেছিলেন। তিনি এখন উভয় সঙ্কটে পড়লেন। শশীভূষণ পুরীতে ছিলেন। রাধানাথ তাঁকে লিখলেন :

ওঃ এ সম্মান প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা যদি আমার থাকত। কিন্তু আমি সরকারি চাকরি করি, তা করা সম্ভব নয়।

তিনি কলকাতা যাওয়া এড়িয়ে গেলেন। যে রাজসিকে আড়ম্বরের ব্যঙ্গ করেছিলেন তার সম্মুখীন না হয়ে একদিন দুপুরে চুপচাপ গিয়ে কমিশনারের কাছ থেকে সনদটি নিয়ে এলেন। এতে বড়লাট এলগিন স্বাক্ষর করেছিলেন শিমলায় ২২শে জুন। সনদে লেখা হয়েছে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের জন্য তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হল।

তিনি উপাধি পেয়েছেন জেনে ওড়িশার বিভিন্ন স্থান থেকে অভিনন্দন আসতে লাগল। কটকের ভদ্রব্যক্তিরা তাঁর বাড়ি এলেন দেখা করতে। পত্র পত্রিকাতে তাঁর সম্মানার্থে কবিতা প্রকাশ পেল। একটি নমুনা : শুভযোগে এল সুপ্রভাত, করেছে আহা কত নববর্ষ জাত। এগুলি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে যে কবিতা রাধানাথ লিখেছিলেন তার থেকেও নিকৃষ্ট। ওড়িশার স্থানে স্থানে সভা সমিতি করে রাধানাথকে অভিনন্দন জানানো হল। বামণ্ডায় সব থেকে বড় সভাটি হল। বাসুদেব অসুস্থ ছিলেন, সুতরাং সভাপতি হলেন সচ্চিদানন্দ। তিনি সভার বিবরণী দিয়ে এক দীর্ঘ পত্র রাধানাথকে পাঠালেন। রাধানাথও অনুরূপ দীর্ঘপত্রে সভায় উপস্থিত ভদ্রব্যক্তিদের, বামণ্ডা রাজ্য এবং রাজা ও রাজপুত্রকে ধন্যবাদ দিলেন। উপসংহারে লিখলেন :

আমি যদি ওড়িয়া সাহিত্যে কণামাত্র উন্নতি করে থাকি তবে তার মূলীভূত কারণ বামণ্ডা অথবা বামণ্ডার পরম মাননীয় অধীশ্বর মহারাজা সুঢল দেব। বাল্যকাল থেকে ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ। অল্প বয়সে আমি সেই সাহিত্যসেবায় রত হই। দুই তিন বৎসর আগে নানা কারণে, বিশেষ করে সাহিত্যিক সহানুভূতির অভাবে ওড়িয়া সাহিত্যচর্চা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রায় আট দশ বছর এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। বিদ্যোৎসাহীপ্রবর শ্রীযুক্ত সুঢল দেবের সঙ্গে যদি আগে পরিচয় হত তবে জীবনের এই উৎকৃষ্ট সময় বন্ধ্যা যেত না। পূর্বোক্ত আট দশ বছর পরে মহারাজ সুঢল দেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পত্রদ্বারা আমাকে উৎসাহিত করলেন এবং আমার প্রায় নির্বাপিত সাহিত্যানুরাগ পুর্নজীবিত করে দিলেন। সেই আদেশ অনুযায়ী আমি দেওগড় গিয়ে মহারাজার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম এবং সেই থেকে আমার সাহিত্যিক জীবনে যুগান্তর এল। ইত্যাদি।

এই অভিনন্দন, অভ্যর্থনা পর্ব দু মাস ধরে চলল। এই অভিনন্দনের উচ্ছ্বাসের মধ্যে গৌরীশংকর ও দীপিকা নীরব রইল।

পুরী : আগষ্ট ১৮৯৭

একদিন মুকুন্দ খেতে বসেছে, কোথা থেকে খণ্ডি ছুটে এসে বলল, খাস না, খাস না, ভাতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। মুকুন্দ কারো কথায় কান দিল না, থালা হাতে উঠে পড়ল, বারান্দায় গিয়ে থালা ছুঁড়ে ফেলল। পরের দিন দেখা গেল উঠোনে একটি দাঁড়কাক মরে পড়ে আছে। মুকুন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হল তাকে বিষ দিয়ে মারার চেষ্টা হচ্ছে এবং রাজবাড়িতে একমাত্র খণ্ডিকেই সে বিশ্বাস করতে পারে।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে চোর খণ্ডির ঘর থেকে সবকিছু নিয়ে গেল। অনেকে বিশ্বাস করল না সত্যই চুরি হয়েছে, কিন্তু মুকুন্দ পুলিশে রিপোর্ট করল এবং খণ্ডিকে নিজের পাশের ঘরে থাকতে দিল। এখন সে খণ্ডির ঘরে অনেক সময় কাটায়। তার মুখ্য কাজ এখন খণ্ডির নানা সমস্যার সমাধান করা, যথা, তার দুই মেয়ের ঝগড়া মেটানো, খণ্ডিকে কেউ কিছু বললে তাকে শাসন করা, খণ্ডির খাবারে নুন বেশিহলে জরিমানা করা ইত্যাদি। তাছাড়া খণ্ডিকে নিয়ে মাঝে মাঝে বড় সমস্যাও দেখা দেয়।

এক বৃদ্ধ একদিন রাজবাড়ির সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল। সিপাহীরা তাকে আটকে দিলে সে সেখানেই বসে পড়ল এবং ডাক ছেড়ে কান্না আরম্ভ করল। তার বক্তব্য সে খণ্ডির তৃতীয় পতি, জগু বড়ালের মৃত্যুর পরে খণ্ডি তাকে বিয়ে করেছিল। মুকুন্দর কানে এ কথা পৌঁছালে সে খণ্ডিকে জিজ্ঞাসা করল লোকটি সত্য বলছে কি? সে খেঁকিয়ে উঠল এই বুড়োটা আমার স্বামী হতে যাবে কেন? রাজার সিপাহী তাকে তাড়িয়ে দিল, শাসাল যে পুরী শহরে আবার যদি তাকে দেখা যায় তবে তাকে মেরে ফেলবে।

মুকুন্দর মনে হল খণ্ডির আবার বিয়ে হলে ভাল হয়। পাত্রও তৈরী ছিল, রাজবাড়ির চাকর দাশরথি জেনা। তার বয়স খণ্ডির থেকে অনেক কম, কিন্তু তা কেউ গ্রাহ্য করল না। জাঁকজমকের মধ্যে রাজবাড়ির মধ্যে খণ্ডি ও দাশরথীর বিয়ে হল। মুকুন্দ নিজে সব বন্দোবস্ত তদারক করল। বিয়ের পরে সে দাশরথীকে এক মাসের ছুটি দিল। কিছুদিন পরে খণ্ডি আবদার করল দাশরথীকে একটি ভালো চাকরি দিতে হবে। মুকুন্দ তাকে মন্দিরের কনষ্টেবল করে দিল।

খণ্ডি এখন পুরী শহরের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এত সুযোগ সুবিধা পেয়েও খণ্ডি খুশি নয়, রোজই কিছু না কিছু বায়নাক্কা তার। মুকুন্দও সব কিছু ছেড়ে খণ্ডিকে খুশি করার তালে থাকে। একদিন খণ্ডি এসে নাকি সুরে বলল, এইটুকু ছোকরা আমাকে খণ্ডি বলে খেপাচ্ছে। মুকুন্দ বলল, তুমি আর খণ্ডি নও আজ থেকে তুমি পরমা, কেউ আর খণ্ডি বলে ডাকবে না তোমাকে। শহরে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হল আজ থেকে খণ্ডির নাম পরমা। বখাটে ছোকরাগুলি বলতে লাগল শূয়োর শূয়োর নয় বরাহ, খণ্ডি খণ্ডি নয় পরমা। বয়স্করা অশ্লীল শ্লোক রচনা করে গাইল।

অবস্থা দেখে সূর্যমণি অস্থির হয়ে মধুবাবুকে খবর দিলেন, কিন্তু তিনি চিকিৎসার জন্য বিলাত গেছেন। সূর্যমণির লোক বৈদ্যনাথ পণ্ডিত ও গোকুলানন্দ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করল। ১৮৯১ সালে মুকুন্দ মন্দির পরিচালনার জন্য মধুবাবু, বৈদ্যনাথ ও গোকুলানন্দের নামে মোক্তারনামা লিখে দিয়েছিল। মুকুন্দ মন্দিরের ব্যাপারে মন দিচ্ছে না বলে সূর্যমণি চাইলেন তাঁরা হস্তক্ষেপ করুন। মুকুন্দ সাবালক হবার পরে এ মোক্তারনামার কোনও মূল্য আছে কিনা সে বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ ছিল। সুতরাং তাঁরা সূর্যমণিকে খবর দিলেন যে মধুবাবু ফেরার পরেই এ বিষয়ে কি করণীয় ঠিক করা সম্ভব হবে।

কটক : অক্টোবর ১৮৯৭

কেন্দুঝর থেকে এসে ফকীরমোহন কিছুদিন বালেশ্বরে বেকার বসে রইলেন। আগে তাঁকে লোকে জানত পাঠ্যপুস্তক ভারতের ইতিহাস-এর প্রণেতা, এবং রামায়ণ মহাভারত ও গীতার অনুবাদক হিসাবে। এখন তাঁর খ্যাতি 'উৎকল ভ্রমণং'-এর লেখক হিসাবে। এই পুস্তকে নাম থাকা ওড়িশার বরপুত্র হবার স্বীকৃতিপত্র বলে মানা হয়; আর যাদের নাম এতে নেই তাদের প্রয়াস আগামী সংস্করণে কিভাবে স্থান পাওয়া যায়।

লেখক হিসাবে লোকে তাঁকে জানে। তাছাড়া তাঁর অন্য পরিচয় সামন্তরাজ্যের শাসক হিসাবে। এই অবতারে তার যত সুনাম ততই দুর্নাম। রাজার পক্ষ নিয়ে প্রজাদের উপরে উৎপীড়ন, লোকের বিবাদে পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি তার অপবাদের কারণ। তার সম্বন্ধে একজন লিখেছিল :

কুচক্রী বাগী আর বিশ্বাস ঘাতকী,
এর থেকে বেশী নাই কেহই পাতকী ॥
লংকাদাহক ঘরবুড়া সবগুণে ভরা
অতিশয় ধূর্ত সে পড়ে নাক ধরা।

ফকীরমোহনের বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বছর। ভেবেছিলেন আর চাকরি করবেন না। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য পুনরায় চাকরি করতে হল। এবং দ্বিতীয়বার সেই ডমপাড়ায়। কাজে যোগ দেবার কিছুদিনের মধ্যে তার দ্বিতীয় স্ত্রী কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু হল। তখন ছেলেটির বয়স তের বছর এবং মেয়েটির এগার। তাদের নিয়ে তিনি মধুসূদন রাও-এর কাছে গেলেন। মধুসূদন তখন নর্ম্যাল স্কুলের সুপারিণ্টেডেণ্ট এবং স্কুলের সংলগ্ন বাসা বাড়িতে থকেন। তিনি বাচ্চা দুটিকে নিজের কাছে রাখতে রাজী হলেন। তাদের খরচ বাবদ মাসে ৩৫ টাকা হিসাবে তিনমাসের টাকা মধুসূদনের হাতে দিয়ে ফকীরমোহন ডমপাড়ায় ফিরে গেলেন। ছেলে মেয়ে মধুসূদনের কাছে প্রায়

একবছর থাকল। তারপরে ফকীরমোহন একটি বাড়ি ভাড়া করে তাদের সেখানে রাখলেন।

১৮৯৬ সালে ফকীরমোহন ডমপাড়া থেকে চলে এলেন। কটকের বাখরাবাদ অঞ্চলে ধূয়াঁপত্রিয়া পাড়ায় জমি কিনে বাড়ি বানালেন ফকীরমোহন। অর্থাভাব দূর করার জন্য ফকীরমোহন কাঠের ব্যবসা শুরু করলেন এবং কবাট চৌকাঠ ইত্যাদি তৈরী করিয়ে বিক্রি করতে লাগলেন।

কটকে বসবাস করার ফলে রাধানাথ মধুসূদন প্রমুখ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বৃদ্ধি পেল। এই সময়ে বিশ্বনাথ কর কটকে একটি প্রেস স্থাপন করে 'উৎকল সাহিত্য' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তিনি সাহিত্যিকদের তার পত্রিকার জন্য লিখতে অনুরোধ করলেন। ফকীরমোহনকে বললেন আপনি একটি গল্প লিখুন। তিনি বললেন একটি কবিতা লিখে দেবেন। কিন্তু বিশ্বনাথ কর জিদ করলেন একটি গল্পের জন্য; তাঁর বক্তব্য ফকীরমোহনের কর্মবহুল জীবনে উপাদানের অভাব নেই, চেষ্টা করলেই একটি গল্প লিখতে পারবেন। শেষে তিনি গঙ্গাধর মেহেরকে লেখা একখানি পত্র দেখালেন যাতে লেখা হয়েছে, দেখছি এবার আপনাকে গালি দিতে হবে, লেখা পাঠাচ্ছেন না কেন? ভদ্রতায় কাজ হবে না মনে হচ্ছে।

এভাবে প্ররোচিত হয়ে ফকীরমোহন কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। কিছুদিন হল তিনি জামাতা কেন্দ্রপাড়ার মুনসিফ গগন বিহারী চৌধুরীর বাড়ি কয়েকদিন কাটিয়ে এসেছেন। এই অঞ্চলের জমিদার এখন রাধাশ্যাম নরেন্দ্রর উত্তরাধিকারীগণ। কেন্দ্রপাড়ায় অবস্থানকালে ফকীরমোহন শুনেছিলেন যে কাছারীঘর তৈরী করার জন্য জমিদার একজন গরীব তাঁতির এক টুকরা জমি ছিনিয়ে নিয়েছেন। চাকরী জীবনে গরীব প্রজাদের উপরে জমিদারের অত্যাচার তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি একজন অত্যাচারী জমিদারের কাহিনী লিখতে মনস্থ করে কাগজের উপর ওঁ লিখে শুরু করলেন :

রামচন্দ্র মংগরাজ মফঃস্বল অঞ্চলের একজন জমিদার ও মহাজন। নগদ টাকা ঋণ দিতেন কিন্তু ধারে ঋণ দেওয়া তাঁর মুখ্য কাজ। শোনা যায় সে অঞ্চলে অন্য কেউ মহাজনী কারবার করতে পারে না। তিনি অতি ধার্মিক। বছরে চব্বিশটি একাদশি পালন করেন। চল্লিশটি হলেও করতেন তাতে সন্দেহ নেই। একাদশীর দিন মাত্র তুলসীপাতা এবং জলের উপর নির্ভর করেন।

একবার কলম চলতে শুরু করলে আর থামল না। একটানা ছয় পৃষ্ঠা লিখে ভাবলেন উৎকল সাহিত্যের প্রতি সংখ্যায় গল্পটি ক্রম হিসাবে প্রকাশ করবেন এবং চার পাঁচ সংখ্যায় সমাপ্ত করবেন। যেটুকু লেখা হয়েছিল সেটুকু মধুসূদন রাওকে দেখালেন। মধুসূদন এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করে বললেন, বাঃ চমৎকার হয়েছে। কিন্তু ফকীরমোহনের দ্বিধা ঘুচল না, জীবনে তিনি গদ্যাকারে আগে কিছু লেখেননি। স্থির

হল তিনি একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করবেন। মধুসূদন রাও সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মনামটিও ঠিক করে ফেললেন।

১৮৯৭ সালের উৎকল সাহিত্যের ১৩০৫ তম সংখ্যায় 'ধূর্জটি'-লিখিত 'ছ মাণ আট গুণ্ঠ'র প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হল।

খণ্ডপাড়া : ডিসেম্বর ১৮৯৭

সিদ্ধান্ত দর্শন সম্পাদনার কাজে অনেক বাধা এল। তালপত্র থেকে কাগজে নকল করে যে অংশগুলি রাজবল্লভ মিশ্র যোগেশচন্দ্রকে দেন তাতে অনেক ভুল থাকে। কোনও কোনও শ্লোকের অর্থ করা যায় না কোনও শ্লোক অনুসারে গণনা করা সম্ভব হয় না। যোগেশচন্দ্র এগুলি পত্রযোগে চন্দ্রশেখরের দৃষ্টিগোচর করলে তিনি শ্লোকগুলি সংশোধন অথবা পরিবর্তন করে দেন। কিন্তু যতদিন তার জবাব না আসে ততদিন কাজ বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে চন্দ্রশেখর কটকে এসে যোগেশচন্দ্রের সন্দেহ দূর করেন। অনেকবার চন্দ্রশেখরের জবাব আসতে অনেক দেরী হয়। এবং যোগেশচন্দ্র অপেক্ষা করেন। এদিকে কলকাতার ডিপোজিটরী প্রেস থেকে তাগিদ আসে। যোগেশচন্দ্র বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ হাতে নিয়েছিলেন, এখন মনে হচ্ছে বোকামি করেছেন। বার বার পত্র লিখে ও উত্তর না পেয়ে যোগেশচন্দ্র বিরক্ত হয়ে একখানি কড়া পত্র লিখলেন চন্দ্রশেখরকে। সেটি পেয়ে চন্দ্রশেখর ব্যস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখতে বসলেন :

মুকাম জেলা খণ্ডপাড়া
১২.৩.১৮৯৭

শ্রীজগন্নাথ শরণম্

শ্রীযুত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রতি বিজ্ঞাপন মিদং এই যে আপনি তিনখানি পত্রের উত্তর না পেয়ে অতি আশ্চর্য বলে যা লিখেছেন তা সত্য। আমি কটক থেকে ফেরার পরের দিন একটি নাতনীর জন্ম হল। শিশুটির মৃত্যু হল চল্লিশদিন পরে। এই প্রতিবন্ধকতা ছিল। এর মধ্যে দক্ষিণ চক্ষুতে রক্ত জমে গেলেও প্রত্যহ লোকের কাজ করে দিতেই হয়, জাতক দেখে শুভাশুভ শান্তিবিচার লিখতে হয়। জাতক দেখে শুভাশুভ শান্তিবিচার লেখা, তন্মধ্যে সময়ানুসারে গ্রহস্ফুট শোধন, তালচেরের রাণীর অত্যাবশ্যক আয়ুর্দায় সাধক, প্রজাদের কলহাদি মেটানো ইত্যাদি কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে মুহূর্তমাত্র নিরুদ্বেগে থাকতে পারিনি। বুদ্ধি চাঞ্চল্যের জন্য যে কাজ সহজ সাধ্য তাও করতে পারলাম না। কঠিন গণনাগুলি পরে হবে বলে রেখে দিলাম। দেবনাগরী অক্ষরের সহিত পরিচিত না থাকায় চিরঞ্জীব পুত্রও রাজবল্লভ মিশ্রকে গ্রন্থ সংশোধনের কাজ দিয়েছিলাম। তারা শরীরের অবস্থা উপেক্ষা করে কাজ করেছেন। কিন্তু কোন কোনও স্থানে পূর্বার্দ্ধ সমাপ্ত হয়ে উত্তরার্ধ আরম্ভ হয়েছে তা বুঝতে পারেন নি। গ্রন্থ সংশোধনের কাজ সম্পূর্ণ না হলে

শুদ্ধিপত্র দেওয়া যাবে না। ফটোগ্রাফ ছবির কি হল জানাবেন। আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর যথাশক্তি এমন যে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র ধ্রুব যে পূর্ব সিদ্ধান্তে উল্লেখ আছে। এভাবে যোগেশচন্দ্রের প্রশ্নের স্পষ্টীকরণ দিয়ে চন্দ্রশেখর এভাবে পত্র শেষ করলেন :

ক্রমে অবস্থার চাপে বুদ্ধি স্থূল হচ্ছে। নিজের লেখা গ্রন্থের অংশবিশেষে পরিবর্তন বা বিয়োজন করার ক্ষমতাও হারাচ্ছি। আমার যশের জন্য শ্রীপরমেশ্বর আপনাকে নিয়োগ করেছেন। নচেৎ অন্য কেহ আজ পর্যন্ত আপনার মতো আমাকে সাহায্য করেন নি।

চন্দ্রস্ফূটের উদাহরণ চারদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেব। রাজবল্লভ মিশ্র আটদিন পরে কটক যাবেন স্থির করেছেন। অন্য গ্রহস্ফূট সাধন তিনি নিয়ে যাবেন। কিমধিকম বিজ্ঞাপনীয়মিতি।

লিখিতং শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র সামন্ত।

কিন্তু প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে চন্দ্রশেখর উদাহরণ লিখে পাঠালেন না। রাজবল্লভ মিশ্রও কটক এলেন না। এভাবে সিদ্ধান্তদপর্ণের কাজ পিছিয়ে গেল এবং যোগেশচন্দ্রের চিন্তা ও বিরক্তি বাড়তে লাগল।

এদিকে বার্ষিক পঞ্জিকা প্রকাশ করতেও নতুন সমস্যার উদ্ভব হল। গৌরীশংকর চন্দ্রশেখরকে বলেছিলেন রাজবল্লভের কাজ খড়িরত্নের কাজের থেকে খারাপ। চন্দ্রশেখর সে কথা রাজবল্লভকে বলে দিলেন এবং সেইদিন থেকে রাজবল্লভ গৌরীশংকরের প্রতি বিমুখ হলেন। সুযোগ বুঝে রাজবল্লভ চন্দ্রশেখরকে বোঝালেন যে গৌরীশংকর পঞ্জিকার উপর লেখেন প্রিণ্টিং কোম্পানির পঞ্জিকা যদিও তাঁর লেখা উচিত চন্দ্রশেখর প্রণীত পঞ্জিকা। তিনি চন্দ্রশেখরের অসম্মান করার জন্যই এমন করেন। তিনি যেন কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারী! 'রাজবল্লভের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে চন্দ্রশেখর পঞ্জিকা বিক্রির থেকে যে লাভ হয় তার তিন চতুর্থাংশ দাবী করলেন এবং গৌরীশংকর তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

এবার রাজবল্লভ চন্দ্রশেখরকে সীতানাথ রায়ের কাছে নিয়ে গেল। আলোচনা করে স্থির হল চন্দ্রশেখর দ্বারা সংকলিত পঞ্জিকা এখন থেকে রায় প্রেস প্রকাশ করবে। প্রথম বছর চন্দ্রশেখর তিনশ টাকা পাবেন এবং পরের বছর থেকে লাভের তিন চতুর্থাংশ। চন্দ্রশেখর দুই বছরের পঞ্জিকা লিখে সীতানাথকে দিয়ে দিলেন।

অগত্যা গৌরীশংকর পুনরায় খড়িরত্নের শরণ নিলেন। তিনি এখন এক চোখে দেখতে পান না। তবুও তিনি পঞ্জিকা সংকলন করলেন এবং প্রিণ্টিং প্রেস সেটি প্রকাশ করল।

বাজারে এখন দুখানি পঞ্জিকা। লোকে বুঝতে পারল না কোনটি কিনবে। পণ্ডিতদের মধ্যে কোনটি নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে তর্ক হল। বিতর্কে অংশ নিলেন মুক্তি মণ্ডপ সভা এবং শাসন দামোদরপুরের সদ্ধর্ম প্রকাশিনী সভা। পুরীর পণ্ডিতগণ মহাষ্টমী ও প্রথমাষ্টমী পূজা চন্দ্রশেখরের রায় প্রেস থেকে প্রকাশিত পাঁজি অনুসারে না করে

প্রিণ্টিং প্রেসের পাঁজি অনুসারে করলেন। দীপিকায় প্রকাশিত এক পত্রে খড়িরত্ন রায় প্রেসের পঞ্জিকার নানা ভুলভ্রান্তির নজীর দেখালেন।

ফলে, প্রিণ্টিং কোম্পানির পঞ্জিকা রায় প্রেসের পঞ্জিকার তুলনায় অধিক সংখ্যায় বিক্রি হল।

কটক : ডিসেম্বর ১৮৯৭

১৮৯৭ সালে এপ্রিল মাসে এপেণ্ডিসাইটিস্ চিকিৎসার জন্য মধুবাবু বিলাত গেলেন। গৌরীশংকর তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন তিনি যেন রেভেনশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওড়িশায় অবস্থান কালে যত জনপ্রিয় ছিলেন রেভেনশা, ওড়িশা ছেড়ে যাবার পরে তার থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তার পরে যাঁরা কমিশনার হয়ে এসেছেন তাঁরা কেউ এতদিন থাকেন নি এবং কেউই ওড়িয়াদের সঙ্গে এত মেলামেশা করেননি। তাছাড়া নয় অংকের দুর্ভিক্ষের পরে যত উন্নতিমূলক কাজ হল যথা কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়, সার্ভে স্কুল, মেডিক্যাল স্কুল, চাঁদবালির বন্দর—সবকিছু রেভেনশার অবদান বলে ভাবত ওড়িশার লোক। রেভেনশার ব্যাপারে গৌরীশংকরের এত আগ্রহের অন্য কারণ তাঁর অপরাধ বোধ। তিনি দুই দুই বার রেভেনশার মৃত্যু সংবাদ ছাপিয়েছিলেন দীপিকায়।

রেভেনশা বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার হয়ে চলে যান ১৮৭৮ সালে এপ্রিল মাসে। এর প্রায় ছমাস পরে কলকাতার খবর দিল যে রেভেনশার মৃত্যু হয়েছে। দীপিকাও এ খবর প্রকাশ করল। কলকাতার অন্য কয়েকটি সংবাদপত্রে লেখা হল মৃত রেভেনশা একজন সরকারী কর্মচারী এবং তাঁর পুরো নাম এইচ. ই. রেভেনশা, টি. ই. রেভেনশা নয়। সুতরাং অনেকে ধরে নিল ইনি অন্য কোনও ব্যক্তি, কটকের ভূতপূর্ব কমিশনার নন।

১৮৮৯ সালে আগষ্ট মাসে কাল বর্ডার দিয়ে একটি পুরা স্তম্ভে রেভেনশার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করল দীপিকা। সাহেবের কীর্তিকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করা হল। এ খবর প্রকাশিত হলে কলকাতা থেকে রেভেনশার কন্যা জানালেন টি. ই. রেভেনশা জীবিত আছেন। ভুল সংবাদ প্রকাশ করার জন্য গৌরীশংকর ক্ষমা চাইলেন এবং লিখলেন, লোকে বলে জীবিত লোকের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হলে তাঁর আয়ু বেড়ে যায়, সাহেবের ক্ষেত্রে যেন কথা সত্য হয়।

মধুবাবু ব্যক্তিগতভাবে রেভেনশাকে চিনতেন না। তবুও তিনি গৌরীশংকরের অনুরোধ রক্ষা করে রেভেনশার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি এখন সাসেক্সে বাস করেন। মধুবাবু যখন থ্রি ব্রিজেজ ষ্টেশনে নামলেন তখন রেভেনশা সোজা তাঁর কাছে

এসে নিজের পরিচয় দিলেন। ট্রেন থেকে যাঁরা নামলেন তাদের মধ্যে একমাত্র অশ্বেত ব্যক্তি তিনি, সুতরাং চিনতে অসুবিধা হল না। তিনি সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি এনেছিলেন। তাতে বসে দুজনে রেভেনশার বাড়ি এলেন। গাড়িতে মধুবাবুকে পাশে বসিয়ে রেভেনশা পকেট থেকে বিড়ি বার করে মধুবাবুকে দিলেন এবং নিজেও একটি ধরালেন, বললেন ওড়িয়া পিকা খান, এ অভ্যাস আমি এখনও ছাড়তে পারিনি। কুড়ি বছর আগে ওড়িশা ছেড়েছেন তিনি কিন্তু এখনও ভাঙাভাঙা ওড়িয়া বলতে পারেন। মধুবাবুকে তিনি বাড়ি ঘুরিয়ে দেখালেন। ওড়িশা থেকে আনা নানা জিনিস সাজানো রয়েছে যথা রূপোর ফিলিগ্রী, হুঁকো, ঢেঙ্কানলের রাজার দেওয়া ছুরি কাঁচি, দুটি হাতির দাঁত, কেন্দুঝর থেকে আনা আদিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। তার পরে তিনি মধুবাবুকে নিজের যন্ত্রপাতির ঘর দেখালেন। এখানে এত প্রকারের কলকব্জা আছে যে তিনি দাবী করলেন ঘড়ি মেরামত থেকে চেয়ার তৈরী পর্যন্ত সব করার সরঞ্জাম এখানে পাওয়া যাবে।

রেভেনশা তাঁকে ওড়িশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন এবং কেন্দুঝর ও নয়াগড় রাজ্যের কথা জানতে চাইলেন। মধুবাবু উভয় রাজ্যের উকিল, সেজন্য তিনি সব কিছু সবিস্তার বলতে পারলেন। ওড়িশায় আবার দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে শুনে তিনি ভারত সরকারকে লিখেছিলেন যে তিনি ওড়িশায় যেয়ে কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ভারত সরকার বাইরের লোকের সাহায্য চান না। শেষ জীবনে রেভেনশা আর একবার ওড়িশা দেখতে চেয়েছিলেন। সেটি সম্ভব হয়নি। মধুবাবু বিদায় নেবার সময় তিনি বললেন, আমার সব বন্ধুকে আমার সম্ভাষণ জানাবেন।

মধুবাবু দেশে ফিরে রেভেনশার সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণী দিয়ে দীপিকাতে লিখলেন। দীপিকা রাজা জমিদারদের কাছে আবেদন করল তাঁরা যেন দেড় দুই হাজার টাকা খরচ করে রেভেনশাকে ওড়িশায় আনার চেষ্টা করেন। এই আবেদন পড়ে বালেশ্বরের বাবু রাধানাথ এক তারবার্তায় প্রস্তাব করলেন এজন্য চাঁদা আদায় করা হোক এবং তিনি নিজে চাঁদা দেবেন। কেন্দুঝরের রাজা এই তহবিলে চারশ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর দেখাদেখি ময়ূরভঞ্জের রাজাও পাঁচশ টাকা দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কটকে অর্থসংগ্রহের অন্যান্য প্রয়াসের মত এবারও এ উদ্যম এখানেই শেষ হল এবং রেভেনশাকে ওড়িশায় আসার জন্য আমন্ত্রণ করা সম্ভব হল না।

নভেম্বর মাসে মধুবাবু ফিরে এলে তাঁর জন্য অভ্যর্থনা সভা হল। প্রথম বিলাত ফেরত ওড়িয়া হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। চিকিৎসার জন্য বিলাত গিয়েছিলেন আইন পড়তে নয় কিন্তু লোকে তাঁকে মধু ব্যারিষ্টার বলতে লাগল।

আদর অভ্যর্থনা শেষ হলে মধুবাবু অসমাপ্ত কাজে মন দিলেন। পুরীর মন্দিরের ব্যাপার তার মধ্যে একটি। তার অনুপস্থিতিতে বৈদ্যনাথ পণ্ডিত এবং গোকুলানন্দর মধ্যে মতভেদ হল এবং দুজনেই। মন্দিরের কাজে আর আগ্রহ দেখালেন না। উপরন্তু অভিযোগ হল বৈদ্যনাথ পণ্ডিত মন্দিরের চার হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই

সব কারণে মন্দির চালানোর-না চালানোর বললেই ভাল হয়—ভার মুকুন্দর হাতে রইল।

পুরী গিয়ে মধুবাবু দেখলেন মন্দির পরিচালনা এবং জমিজমার কাজ সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। তিনি খণ্ডি সম্বন্ধে সব কথা শুনলেন। মুকুন্দকে কিছু উপদেশ তিনি দিতে পারতেন কিন্তু তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভাল নয়। সূর্যমণির সঙ্গে পরামর্শ করে মধুবাবু মুকুন্দকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যেতে মনস্থ করলেন।

পুরী : অক্টোবর ১৮৯৮

কলকাতায় চিকিৎসা করিয়ে মুকুন্দর কোনও কাজ হচ্ছে না দেখে মধুবাবু তাকে নিয়ে পুরী ফিরে এলেন। ফিরেই মুকুন্দ খণ্ডির সেবায় লেগে গেল। খণ্ডির চতুর্থ স্বামী দাশরথী জেনাকে মুকুন্দ মন্দিরের কনষ্টেবল নিযুক্ত করেছিল; কিন্তু সে কোনও কাজ করে না কেবল বেতন নিতে আসে প্রতি মাসের ১লা তারিখ. সেজন্য তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল। সে যখন শুনল বরখাস্তের নোটিশ আসছে তখন ইস্তফা দিল। খণ্ডি এসে মুকুন্দর উপর হম্বি তম্বি করলে মুকুন্দ দাশরথীকে মন্দিরের সুয়াঁসিয়া নিযুক্ত করল। মন্দিরের সেবায় যোগ দিতে হলে একটি রীতি প্রথমে পালন করতে হয় সেটি হল মাথায় শাড়ি বাঁধা। মুকুন্দ শাড়ি বাঁধতে এলে অন্য সেবকরা তাকে মারপিট করে তাড়িয়ে দিল। তাদের আপত্তির কারণ একজন ভিখারিণীকে বিবাহ করে সে জাতিচ্যুত হয়েছে, এমন লোক মন্দিরের কাজ করতে পারে না। এ খবর পেয়ে মুকুন্দ খণ্ডিকে বলল, মন্দিরে না হয় ঢুকতে দিল না তাতে কি হয়েছে, আমি দাশরথীকে সান্তরা বানিয়ে দেব। কিছুদিন পরে এক আদেশ বলে মুকুন্দ দাশরথীকে দাশরথী সিংহ সামন্তরায় বানিয়ে দিল। এতেও খণ্ডি সন্তুষ্ট হল না তখন তার ছেলে মদনকে করা হল মদন ছোটরায় অথবা মদন সিংহ।

এবার মুকুন্দ খণ্ডির দুই মেয়ের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বড় মেয়ের জন্য পাত্র ঠিক হল মন্দিরে কলাই ডাল বাটার কাজে নিযুক্ত কালু সমর্থার ছেলে। বড় ধুমধাম করে পটের বিয়ে হল রাজবাড়ির ভিতরে। এবার মালিরা কালুকে এক ঘরে করে দিল। সে কাজ করতে এলে অন্যরা বাধা দিল, শেষ পর্যন্ত বচসা থেকে মারপিট এবং পুলিশ রিপোর্ট পর্যন্ত গড়লে। খণ্ডির ছোট মেয়ে রূপেই-এর বিয়ে হল গাড়োয়ান যোগী রাউতের সঙ্গে। তাকে মন্দিরের সেবক করে দিলে গোলমাল হতে পারে ভেবে মুকুন্দ অন্য পথ ধরল। যোগী হয়ে গেল যোগেশচন্দ্র রাউতরায় এবং সে তেলঙ্গের তহশীলদার নিযুক্ত হল।

এবার খণ্ডির দৃষ্টি পড়ল মন্দিরের টাকা পয়সার দিকে। তীর্থযাত্রীরা যে টাকা

পয়সা সোনাদানা মন্দিরে দেয় তার একভাগ রাজার প্রাপ্য। তাছাড়া সরাসরি রাজাকে ভেট দেবার প্রথাও ছিল। এসব এখন খণ্ডি নিতে লাগল। তাছাড়া ঠাকুরের সাজের জন্য এবং মেরামতের অছিলায় বহুমূল্য অলংকার নেওয়া হয় এবং সেগুলি রেখে খণ্ডি নকল জিনিস ফেরত দেয়।

এই সব দুরাচার ও অন্যায়ের জন্য লোকে মধুবাবুকে দায়ী করল কারণ তিনি রাজার উকিল ও অভিভাবক। ব্যস্ত হয়ে মধুবাবু ঠিক করলেন মন্দিরের বিষয় আলোচনার জন্য উৎকল সভার অধিবেশন ডাকবেন। সেই অনুসারে ৩০শে এপ্রিল দীপিকাতে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হল :

> পুরীতে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরের কাজ নিতান্ত অসন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে, কি করে তার উন্নতি করা যায় বিচার করার জন্য আগামী ২রা মে সোমবার সন্ধ্যা ছটায় কটক প্রিন্টিং কোম্পানির সভাকক্ষে উৎকল সভার সাধারণ অধিবেশন হবে। সকলে এই সভায় যোগ দিন, এই অনুরোধ।
>
> শ্রীমধুসূদন দাস, সভাপাত
>
> ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৮ — শ্রীগৌরীশংকর রায়, সম্পাদক।

দুর্ভাগ্যবশত সেদিন অফিস বন্ধ। সুতরাং অনেক লোক শহরের বাইরে গিয়েছিল। সভায় মাত্র কুড়ি পঁচিশ লোক উপস্থিত হল। সভার শুরুতেই মধুবাবুকে এক দীর্ঘ স্পষ্টীকরণ দিতে হল তিনি খৃষ্টান হয়ে কেন মন্দিরের ব্যাপারে জড়িত আছেন। তিনি বললেন মন্দিরে জাত বিচার হয় না। তিনি দর্শালেন কেমন করে পুরীর রাজারা এই সংস্কার রক্ষার জন্য পরিশ্রম ও যত্ন করে এসেছেন। তারপরে তিনি মন্দিরের সম্পত্তির অপব্যবহার হচ্ছে তার উদাহরণ দিলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে দপর্ণের রাজা বৈদ্যনাথ পণ্ডিত বললেন যে পুরী মন্দিরের সুরক্ষা ও উন্নতির সঙ্গে সকলের সম্পর্ক আছ। এও বললেন যে তিনি কিছুদিন মন্দিরের দায়িত্বে থেকে নিজের অর্থ মন্দিরের কাজে খরচ করেছিলেন।

অনেক তর্কবিতর্কের পরে ঠিক হল এখন মন্দির কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার তদন্ত হবে। পুরীর প্রমুখ নাগরিকগণ সেবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে মন্দির পরিচালনার জন্য একটি নিয়মাবলী স্থির করবেন। এ কাজ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। এর সদস্য হবেন রাজা বৈদ্যনাথ পণ্ডিত বাহাদুর বাবু বিহারীলাল পণ্ডিত, বাবু মধুসূদন দাস, বাবু গৌরীশংকর রায় এবং বাবু রামশংকর রায়। এঁরা যা স্থির করবেন তার রিপোর্ট যথাশীঘ্র সম্ভব সভাকে দেবেন। তার উপর বিচার করে সভা যেমন স্থির করবেন তেমনিভাবে কাজ হবে।

এ সভা হবার কিছুদিন পরে চন্দন যাত্রা হল। এই সময়ে মন্দিরে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা গেল। অধিকাংশ দিন বড়সিংহার ভোগ হল না। সুতরাং পুরীর মহান্ত জমিদার,

আমলা ও সেবকরা মিলে রাজার সভাপতিত্বে মন্দির প্রাঙ্গনে এক সভায় অবস্থার পর্যালোচনা করল। স্থির হল স্থানীয় ভদ্রব্যক্তিদের নিয়ে এক কমিটি গঠন করা হোক যার নেতৃত্ব করবেন রাজা স্বয়ং। কমিটি মন্দির সুচারুভাবে পরিচালনা করার উপায় নির্দ্ধারণ করবে।

কোনও কমিটিই মন্দির পরিচালনার বিধান প্রস্তুত করল না এবং অব্যবস্থা বেড়ে চলল। অবস্থার উন্নতির জন্য সকলে এখন মধুবাবুর দিকে চেয়ে রইল। বিচক্ষণ আইনবিদ হিসাবে তিনি এখন বিখ্যাত, পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি হয়েছেন গ্রাণ্ড ওল্ডম্যান। লোকের বিশ্বাস সার্থক করার কোনও উপায় না দেখে তিনি একটি ওকালতি চাল চললেন। দুর্গাপূজার ছুটির চারদিন আগে তিনি মুকুন্দর চিকিৎসা ও শিক্ষার খরচ বাবদ এক হাজার টাকা উসুল করার জন্য সাবজজের কাছে মামলা দরজ করলেন। সাবজজ এ আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং অগ্রিম ক্রোকের ডিক্রি দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মধুবাবু দুইজন পেয়াদা নিয়ে পুরী গিয়ে রাজবাড়ি ক্রোক করলেন। পেয়াদারা মুকুন্দর ঘরের তলাশী না করে খণ্ডির ঘর তলাশকরল। তার ঘরের মেঝের নিচে পুঁতে রাখা দশ হাজার টাকা পাওয়া গেল এবং বিভিন্নস্থানে লুকিয়ে রাখা বহুমূল্য অলংকার।

ক্রোকের পরে ছুটির জন্য কাছারী ও কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল। মুকুন্দ ও খণ্ডি গিয়ে মধুবাবুর সঙ্গে দেখা করলে তিনি দুজনকে তিরস্কার করলেন এবং মুকুন্দকে ধমক দিলেন যে তার কথা না শুনলে তার ঘরও তলাশ করা হবে। কোর্ট খুললে মুকুন্দ আর্জি দিয়ে মেনে নিল যে মধুবাবুর দাবী যথার্থ এবং ক্রোক করা জিনিস সব তাকে ফেরত দেওয়া হোক। সে মধুবাবুর পরামর্শ অনুসারে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক হলফনামাও দাখিল করল। ঠিক হল একজন সাহেব অফিসার প্রাইস মাসে আটশ টাকা বেতনে ম্যানেজার হবেন এবং রাজার ও মন্দিরের জমিজমা দেখাশুনা করবেন। রাজা তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। ম্যানেজারের কাজ ও হিসাব কিতাব মধুবাবু তদারক করবেন। এক বছর এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান হল কিন্তু লোক এতে নির্লিপ্ত থাকল। তারা এখন অন্য এক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। পুরীতে বাঁদরের উপদ্রব এত বেড়ে গেছেযে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল। মিউনিসিপ্যালিটি ঠিক করল গুলির আওয়াজ করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু লোক এ প্রস্তাবের বিরোধিতা কল; তাদের মতে এমন পদক্ষেপ ধর্মবিরুদ্ধ হবে। ২৯শে সেপ্টেম্বর বিষয়টি বিচার করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি এক সভা ডাকল। এতে পণ্ডিতদের মত নিয়ে ঠিক হল যে বাঁদরের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদের বধ করা যেতে পারে। লোকে এখন মিউনিসিপ্যালিটি কি করে দেখার অপেক্ষা করছে।

কটক : নভেম্বর ১৮৯৮

ভরদুপুরে তিনজন গাঁয়ের লোক কোর্টের দরজার কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারছে, ঢুকতে সাহস হচ্ছে না। এক উকিলের মুহুরী তাদের দেখে ভাবল সহজে কিছু আয় হয়ে যাবে, তাদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কি চাও, কাকে খুঁজছ?' তারা জানাল তারা গ্রাম থেকে এসেছে, ভোর হবার আগেই রওনা হয়ে হেঁটে হেঁটে এতদূর এসেছে একটি মকদ্দমা দেখবার জন্য। ফতেপুর গোবিন্দপুরের জমিদার রামচন্দ্র মঙ্গরাজ একজন তাঁতীর বাড়ি হানা দিয়ে তার একটি গোরু ও অন্যান্য জিনিস লুট করে এনেছে। সেই অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এনে হাজতে রেখেছে, আজ তার বিচার হবে। লোকগুলি মজা দেখতে এসেছে।

মুহুরী খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলে তাদের মধ্যে একটু চালাক চতুর লোকটি বোচকার থেকে কয়েকখানি কাগজ বার করে তার হাতে দিল। এগুলি উৎকল সাহিত্যের পৃষ্ঠা। চালাক চতুর লোকটি গ্রামের মাষ্টারের ছেলে এবং সামান্য লেখাপড়া জানে। সেই উৎকল সাহিত্য পড়ে সাথীদের এই কেসের বিষয়ে বলেছে। মুহুরী কাগজ খুলে পুলিসের তদারক শীর্ষক খবরটি পড়তে লাগল। লেখাটি ভাল, সুতরাং সে মাটিতে বসে মন দিয়ে সম্পূর্ণ গল্পটি পড়ল। ঘটনা অবশ্যই সাংঘাতিক। সাক্ষীদের বয়ান থেকে জানা গেছে যে রামচন্দ্র মঙ্গরাজ একজন নামী বদমাস ও খুনী। এই পর্যন্ত পড়ে সে উঠে দাড়িয়ে হো হো করে হাসতে লাগল। কাগজগুলি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'দূর বোকা, এতদূর এসেছিস রামচন্দ্র মঙ্গরাজের মকদ্দমা দেখতে। আরে এমন কোন লোক নেই।'

লোকগুলি নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। লেখা পড়া জানা লোকটিও নেতাতই সরল, সে বলল, 'কাগজে ছাপানো কথা মিথ্যে হয়? এই যে চম্পা, সারিয়া, ভোগিয়া—এরা সত্যিই নেই?' মুহুরী বলল, আরে হাঁদা, এটা একটা বানানো গল্প, কোনও এক ধূর্জটি কল্পনা করে এ সব লিখেছে।' তার কথা শুনে লোকগুলি হতাশ হল দেখে সে বলল, 'চিন্তার কি, এত রাস্তা যখন এসেছ মকদ্দমা একটা দেখেই ফিরবে, এস আমার সঙ্গে। এই কোর্টে এক পুরাতন দাগীর কেস আছে আজ, সেটা দেখ, সেও কম মজার জিনিস হবে না।'

সত্যই আদালতে ভীষণ ভীড়। প্রভুদয়াল ভগত কুড়ি বছর ফেরার থাকার পরে ধরা পড়েছে এবং হাজতে আছে। বাবাজীর বেশে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখলে মনে হবে না যে সে একজন চোর ডাকাত হতে পারে। কিন্তু পুলিশ রিপোর্ট বলে :

১৮৭৯ সালে ২২শে মে মফঃস্বল থেকে আদার রোড মেস বাবদ ৪৭৯৮ টাকা আট আনা নাজীর নটবর দাসের বাড়িতে রাখা হল কারণ ট্রেজারী বন্ধ হবার পরে টাকা পৌঁছেছিল। রাত্রে টাকা চুরি হলে পুলিশ নটবরকে গ্রেপ্তার করল। তদন্ত করে

জা গেল যে তিনজন মিলে ষড়যন্ত্র করে চুরি করেছিল, নটবরের শালা রাঘব মহান্তি একজন দাগী আসামী প্রভুদয়াল ভগত এবং নটবরের রক্ষিতা চিত্রকলা। সদর থানার দারোগা রাঘব ও চিত্রকলাকে ধরে আনল কিন্তু প্রভুদয়াল ফেরার হল। তার হুলিয়া জারী করেও ফল হল না, কুড়ি বছর সে বেপাত্তা রইল। মকদ্দমায় বিচার হলে নটবর খালাস হল, রাঘব মহান্তির এক বছর এবং চিত্রকলার পাঁচ বছর জেল দণ্ড হল। এও আদেশ হল যে অপহৃত অর্থ নটবরের কাছ থেকে আদায় করা হবে। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে পুলিশ খবর পেল যে প্রভুদয়াল ভগত ললিতা দাস বাবাজীর আশ্রমে বাবাজী হয়ে বাস করছে। পুলিশ সেখান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে আনল। আজ তার বিচার আরম্ভ হবে। রামচন্দ্র মঙ্গরাজকে দেখতে না পেলেও গ্রামের চার ব্যক্তির কৌতূহল সন্তোষজনকভবে পরিতৃপ্ত হল। কোর্ট বন্ধ হলে তারা বাড়ির পথ ধরল।

খণ্ডপাড়া : আগষ্ট ১৮৯৯

গৌরীশংকরের কাছ থেকে সীতানাথের কাছে গিয়ে চন্দ্রশেখর নদীর থেকে সমুদ্রে পড়লেন। সীতানাথ রায় প্রতিশ্রুত টাকা দিলেন না। চন্দ্রশেখর যোগেশচন্দ্র রায়কে সব কিছু জানালেন। যোগেশচন্দ্র রাধানাথকে অনুরোধ করলেন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। তিনি বললেন ভাই-এর সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। কিন্তু নিষ্কর্ষ এই হল যে চন্দ্রশেখর টাকা পেলেন না।

এদিকে সিদ্ধান্ত দর্পণের কাজ চলছে চার বছর হল। সব থেকে বড় বাধা স্বয়ং চন্দ্রশেখর। তিনি শ্লোকগুলি বার বার সংশোধন করেন এবং দীর্ঘ শুদ্ধিপত্রগুলি পাঠান। যোগেশচন্দ্রের ধৈর্য শেষ হচ্ছে, ব্যাকুল হয়ে ভাবছেন কবে এ কাজ শেষ হবে এবং তিনি মুক্তি পাবেন। তিনি পুস্তকের মুখবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন অপেক্ষা মাত্র চন্দ্রশেখরের ফটো এবং একটি সম্পূর্ণ শুদ্ধিপত্রের।

চন্দ্রশেখর তাঁর পিছনে লেগে আছন সিদ্ধান্ত দর্পণ এবং এবং তার সংকলিত পঞ্জিকা রেজিষ্ট্রী করানোর জন্য। তিনি চান যে ভবিষ্যতে এগুলির নকল করে অন্য কেউ পঞ্জিকা প্রকাশ করতে না পারে। চন্দ্রশেখর এও চাইছিলেন যে যোগেশচন্দ্র মধ্যস্থতা করে গৌরীশংকরের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য দূর করে দিন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন :

> আমার দুর্ভাগ্য যে এক চক্ষু হয়েও খড়িরত্ন একখানি পঞ্জিকা লিখে গৌরীশংকরকে দিলেন এবং বাজারে দুখানি পঞ্জিকা চলল। প্রিণ্টিং কোম্পানির কাজ উত্তম এবং রায় প্রেস সে তুলনায় নিম্নস্তরের। প্রিণ্টিং কোম্পানি বার হাজার পঞ্জিকা ছাপাতে পারে আর রায় প্রেস ছয় হাজারও ছাপাতে পারল না।

গৌরীশংকর আমন্ত্রণ না করলে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে আমার আত্মসম্মানে লাগবে। আপনি মধ্যস্থ হয়ে গৌরীশংকরবাবুকে বোঝাতে পারেন যে দুটি পঞ্জিকা থাকায় লোকের অসুবিধা হচ্ছে, সেজন্যে তিনি মহামহোপাধ্যায়কে ডেকে বাজারে একখানি পঞ্জিকা ছাড়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হবে। বিক্রয় থেকে দশপণ লাভের একপণ খড়িরত্নকে পেনশন হিসাবে দেবেন এবং আমার প্রতিষ্ঠার সম্মান করে নয় পণ দেবেন। এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করে একখানি পত্র আপনার হাতে দিতে পারেন। এতটা যদি তিনি করেন তবে আমার পঞ্জিকা আমি তাঁকেই দেব। আমার অংশের লাভের থেকে তিনপণ আমি শিষ্যদের দেব এবং যে ছয় পণ থাকবে তাতে আমার ব্যয় নির্বাহ হবে। এ প্রসঙ্গ আপাতত গোপন রাখবেন। রায় প্রেস থেকে টাকা পেলে খবর আপনিই প্রকাশ হবে।

আপনি গতবর্ষ লিখেছিলেন যে সিদ্ধান্ত দর্পণ এবং তার উপর আধারিত পঞ্জিকা একবার রেজিস্ট্রী হয়ে গেলে আমার ছাত্র ব্যতীত অন্য কেহই পঞ্জিকা ছাপাতে পারবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পঞ্জিকা সীতানাথ বাবুকে দিয়েছিলাম। পরে বুঝতে পারলাম যে তাঁর ছাপানোর ক্ষমতা সীমিত।

সে যাই হোক আমার প্রস্তাব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করবেন। যুক্তি তর্কে আপনার জুড়ি নেই। আমি আপনাকে কি লিখব। ব্যাসঃ কেনোপদিশ্যতে। কিমধিকম বিজ্ঞবরেষু সহৃদয় শিরোমণিষু।

আপনার শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত।

পুনশ্চঃ মনে রাখবেন শ্রাবণ পূর্ণিমার পূর্বে এ কার্য সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। যদি সিদ্ধান্ত দর্পণ ও সূক্ষ্ম পঞ্জিকা রেজিস্ট্রী হয় তবে এ কথা স্পষ্ট করে দেবেন যে আমার অথবা আমার পুত্রের অনুমতি না নিয়ে কোনও ইতর লোক এর কোনও অংশ ছাপাতে না পারে। খড়িরত্ন আমার শিষ্য কিন্তু আমার বিনা অনুমতিতে পঞ্জিকা ছাপিয়ে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। তিনি এখানে এলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। সেই হেতু তিনি শিষ্য হয়েও এখন আমার শত্রু।

ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর কটকে এলেন এবং ভাগীরথী সাঠিয়া নিজের বাড়িতে তাঁর ফোটো তুললেন। ফটোতে চন্দ্রশেখরের গায়ে চাদর জড়ানো এবং হাতে তালপাতার পুঁথি। এর দুই মাস পরে সামন্ত শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহেন বিরচিতঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ে সম্পাদিত : আটমল্লিক মহারাজা শ্রীমহেন্দ্র দেবকে উসর্গীকৃত সিদ্ধান্ত দর্পণ : ছাপা হয়ে কটকে এল। ছাপা বই দেখে চন্দ্রশেখর খুশিতে নেচে ফেললেন। যোগেশচন্দ্র ভাবলেন, বাঁচা গেল, এতদিনে মুক্তি।

যোগেশচন্দ্র চন্দ্রশেখরের আরও কোনও কাজ হাতে নিতে চান না। তিনি এক পত্রে জানালেন যে খড়িরত্নের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ সম্ভব নয় কারণ আইনজ্ঞদের মতে শিষ্যকে দেওয়া জ্ঞান প্রত্যাহার করা যায় না। চন্দ্রশেখর কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাঁর বিশ্বাস যোগেশচন্দ্রের জন্ম হয়েছে তাঁকে সাহায্য করার জন্য। তিনি হাল ছাড়লেন না। যোগেশচন্দ্র এক পত্রে গুরু শিষ্য সম্পর্কের উদাহরণ দিলেন :

পুরাকালে যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি কিছু অপরাধ

করলে সূর্য বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার থেকে যা শিখেছ তা আমাকে ফেরত দাও। যাজ্ঞবল্ক্য বমি করে দিলেন এবং মূর্তিমান বেদমন্ত্র বেরিয়ে এল। অন্য ঋষিরা ভাবলেন বমি খাওয়া উচিত হবে না। সুতরাং তাঁরা তিতির পক্ষীর রূপ ধরে তা ভক্ষণ করলেন। সেদিন থেকে তৈত্তিরীয় শাখা প্রসিদ্ধ হল। মুরারী কবি নিজের নাটকে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশংসা করে জনক মহারাজার প্রতি বিশ্বামিত্রের সংবাদ লিখেছেন।

এর পরে চন্দ্রশেখর অনর্ঘ রাঘব নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই পর্যন্ত পড়ে যোগেশচন্দ্র বিরক্ত হলেন, আর পড়লেন না, পত্রখানি সরিয়ে রাখলেন।



তের

কটক : জানুয়ারি ১৯০০

রায় বাহাদুর উপাধি পেলেন কিন্তু শরীর ও মন ভালো নেই রাধানাথের। দ্বিতীয়বার বামণ্ডা গিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন সুঢলদেব কিছু আর্থিক সাহায্য করবেন কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি অবশ্য সুঢলদেবকে তোষামোদ করে যুবরাজ সচ্চিদানন্দকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। নিজের মনস্তাপ প্রকাশকরে তিনি মিত্র গঙ্গাধর মেহেরকে একখানি পত্র লিখলেন।

২১.১১.১৮৯৮

শ্রীহরিঃশরণম্

গোপনীয়

সবিনয় নিবেদনমিদং

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহোদয়,

আমি সাহিত্যের প্রতি ঝুঁকে নিজের অনেক ক্ষতি করেছি। প্রথম থেকে যদি পাঠ্যপুস্তক রচনায় মন দিতাম তাহলে আজ এমন জায়গায় পৌঁছে যেতাম যে সমস্ত অবসর সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত করতে পারতাম। ওড়িশায় সাহিত্যানুরাগী রাজা থাকলে বহুপূর্বে পেনশন নিয়ে তাঁর ছত্রছায়ায় সাহিত্য সেবায় সর্বক্ষণ ব্যয় করতাম। ওড়িয়া সাহিত্যের জন্য যা করতে চেয়েছিলাম তার শতাংশ করার সুযোগ পেলাম না। প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী রাজা ওড়িশায় একজনও নেই। বামণ্ডা অবশ্য প্রশংসার্হ, কিন্তু অমাবস্যার আকাশে একটি মাত্র তারার মতো, তার বেশি কিছু নয়। বামণ্ডার রাজার বন্ধুত্ব আমার লাভের কারণ না হয়ে ক্ষতির কারণ হয়েছে। আপনি আমার পরম মিত্র, তাই মনের কথা জানালাম।

আমার যে দশা আপনারও তাই। ওড়িশায় সাহিত্যচর্চা বিড়ম্বনা মাত্র। ওড়িশায় যে কয়েকটি সংবাদপত্র আছে তার মধ্যে হিতৈষিণী বাদে অন্য সকলে সাহিত্য সম্পর্কশূন্য। এদের সাহিত্যে রুচি নেই। অভিনিবেশ হবার সম্ভাবনাও নেই। সাহিত্যচর্চা একটি আমরণ ব্রত। তাছাড়া সাহিত্যানুরাগ একটি ঈশ্বর দত্ত সম্পদ। লক্ষ লোকের মধ্যে এক দুইজনই সাহিত্যানুরাগী হয়।

সম্পাদকগণ এমন গুণের অধিকারী নন। তাছাড়া এঁদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত। এরা সাহিত্যোন্নতি বিষয়ে উপদেশ দিতে কতটুকু যোগ্য তা আপনার অবিদিত নয়।

আপনার

শ্রীরাধানাথ রায়

কিছুদিন পরে রাধানাথ এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হলেন। তিন বছর আগে লেখা মহাযাত্রা কাব্যের পঞ্চম সর্গে ভবিষ্যৎবাণী অংশের কয়েকটি পদ ইংরেজ বিরোধী বলে সরকারকে জানালেন তার কয়েকজন শত্রু। যথা :

দূর হতে এসে
শুষিছে ভারতদেহের শোণিত নিয়ত
যবন জোঁকগুলি শোষণ কৌশলে। ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত সেই শত্রুদের মতে যবন বলে ইংরেজদের উপর কটাক্ষ করে রাধানাথের কবিতাবলীভুক্ত 'শিবাজীর উৎসাহবাণী'তে লেখা হয়েছে :

দুরন্ত যবন হল একেশ্বর
ক্ষত্রিয় প্রভাব হইল অলীক।
মোদের স্বদেশ রইল না আর
ধিক্ আমাদের বাহুকে ধিক্।

১৮৯৯-র জুলাই মাসে রাধানাথ সরকার থেকে গোপনীয় চিঠি পেলেন যে তিনি আপত্তিজনক অংশ বাদ দিয়ে মহাযাত্রার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করুন। রাধানাথ কেবল মাত্র যে রাজী হলেন তাই নয়, সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখলেন। সরকারের চিঠিতে শিবাজীর উৎসাহবাণীর উল্লেখ না থাকলেও তিনি কবিতাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পুরো কবিতাটি বাদ দিলেন।

এরকম মানসিক চাপে রাধানাথ সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় বাড়িতে যখন সকলে আগুন পোয়াচ্ছে, রাধানাথ কতকগুলি কাগজ এনে আগুনে ফেলেছিলেন। এগুলি ছিল মহাযাত্রার পরবর্তী সর্গগুলির কাঠামো।

তার চোখে জল দেখে শশীভূষণ কাছে এলে বললেন, 'এ কিছু নয় চোখে ধুঁয়া লেগেছে।'

কিছুদিন পরে শিক্ষাবিভাগের এক সভায় যোগ দিয়ে সস্ত্রীক রাধানাথ কলকাতায় গেলেন। সেখানেই তিনি বর্ধমান ডিভিশনে বদলির আদেশ পেলেন। তাঁকে বলা হল তিনি কটকে না ফিরে কলকাতার কটক ডিভিশনের চার্জ দিয়ে হুগলিতে কাজে যোগ দিন। তদনুসারে রাধানাথ হুগলি গেলেন। তাঁর মনে হল মহাযাত্রার জন্যই এমন আদেশ হয়েছে। অনেক বন্ধু পরামর্শ দিলেন তিনি এই আদেশের প্রতিবাদ করুন কিন্তু তিনি রাজী হলেন না।

রাধানাথ শশীভূষণকে লিখলেন :

মধু,

হঠাৎ এমন বদলীর আদেশ আসবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তিনজনের বদলি হয়েছে একটি আদেশে। সুতরাং কোনও রকম আপত্তি সঙ্গত বা শোভনীয় হবে না।

তোমার মা সঙ্গে থাকার জন্য বিব্রত বোধ করছি। তাঁর কোনও দোষ নাই, তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নন।

ব্রজবাবুকে লিখেছি পার্মানেণ্ট এডভান্স রঘুবাবুকে দিয়ে দিতে। সে পত্রের সঙ্গে ডাইরেক্টরের টেলিগ্রামও পাঠিয়েছি।

এই পত্র পেয়ে অফিসের যত ছাপা রিপোর্ট বাড়িতে আছে সেগুলি এবং আমার পুরাতন ডাইরিগুলি রঘুবাবুকে ডেকে দিয়ে দেবে।

বালেশ্বর ও পুরীর জেলাস্কুল এবং কটক নর্ম্যাল থেকে আনা বইগুলি কোনও বিশ্বস্ত লোকের হাতে অথবা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবে। ডাকে পাঠালে একনলেজমেণ্ট কার্ড জুড়ে দেবে। তা করলে প্রাপ্তিস্বীকার ফিরে আসবে।

অফিসের একটি কল-বেল বাড়িতে আছে, সেটি রঘুবাবুকে দেবে। আমার কাছে যে রিপোর্টগুলি আছে, ব্যাগ কম্বল ইত্যাদি তোমার মায়ের সঙ্গে অথবা লোকনাথের সঙ্গে পাঠাব।

তোমার মাকে হরনাথের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। অথবা হুগলিতে যোগ দিয়ে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে নিজে কটকে ছেড়ে আসব।

অফিসারদের আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাবে। সকলের আমার প্রতি আস্থা ছিল এবং অসময়ে সকলে সহানুভূতি দেখিয়েছেন। সকলকে আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাবে। চাপরাশী ভগবান জেনাকে বলবে তার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারব না। আমাদের বিদায় দেবার সময় জেনা কেঁদে ফেলেছিল। তাকে বলবে অশ্রুসিক্ত নয়নে এই পত্র লিখছি।

কাল কনফারেন্স আরম্ভ হবে। বড় ব্যস্ত আছি। পরে অবসর পেলে আবার লিখব। আমি কটক ছাড়ার আগে সকল ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে বিদায় নিয়ে আসব ভেবেছিলাম। হঠাৎ এই আদেশ আসার ফলে তা আর সম্ভব হল না।

শ্রীরাধানাথ রায়।

পুরী : ডিসেম্বর ১৯০০

১৮৯৮-র নভেম্বর মাসে জে. সি. প্রাইস পুরী রাজার ম্যানেজারের পদে যোগ দিয়ে রাজার এবং মন্দিরের সম্পত্তির দায়িত্ব নিলেন। তিনটি গ্রাম মুকুন্দ নিজের হাতে রাখল। প্রাইসকে ক্ষমতা দিয়ে যে দলিলটি প্রস্তুত হল তাতে লেখা হল মন্দিরের তিনটে গ্রাম কুদিয়ারী, কুসুমটি ও ছণগিরি মুকুন্দর অধীনে থাকবে। কিছুদিন পরে মুকুন্দ এই তিন গ্রামের অধিকার খণ্ডিকে দিল এবং সেখান থেকে সে খাজনা ও চাল আদায় করতে শুরু করল।

খণ্ডির প্রতিপত্তি এত বেড়ে গেল যে সে এখন শহরের প্রধান আলোচ্য ব্যক্তি এবং কালেক্টরের অফিসে তার নামের মাইনের কলেবর বৃদ্ধি হতে লাগল। ফাইলের শীর্ষক 'বিকলাঙ্গ মহিলা খণ্ডি'। খণ্ডির সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে এতে যথা :

খণ্ডি ও তার পরিবারবর্গকে অনেক জমি দিয়েছে মুকুন্দ। ৯৯০ টাকায় কুণ্ঠাইবেন্ট পাড়ার খণ্ডির ছেলে মদনকে ৬ মানের বড় একটি বাগিচা; ১৫০০ টাকায় খণ্ডিকে দোলমণ্ডপ পাড়ায় সাতমাণের ভিটে বাড়ি; মদন সিংহকে ১০৪৬ টাকায় বরগাঁ মৌজায়

বোলপনি আদায় দশবছরের জন্য পাট্টা; ৩৫০ টাকার মদন সিংহকে সান্তরাপুর মৌজার সরবরাকারীর পাট্টা আজীবনের জন্য। মুকুন্দ আদৌ কোনও টাকা পেয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল।

জমিজমা হাতিয়ে নেওয়া ছাড়া অনেক ফৌজদারী মামলায় জড়িত ছিল খণ্ডি।

১) পুলিশ কেস নম্বর ১১৭৩, দফা ৩৫২ রঘুনিসাহু বনাম খণ্ডি ও অন্য একজন। বাড়ি করার জন্য খণ্ডি রঘুনির থেকে চুন নিয়েছিল। টাকা চাইলে খণ্ডির লোক তাকে বেদম প্রহার করল। আদালতে কেস উঠলে রঘুনি হাজির হল না। কেস খারিজ হয়ে গেল।

২) কেস নম্বর ১২৬৫ দফা ৩৪২ ও ৩৫২; পঙ্কজ বনাম খণ্ডি ও অন্যান্য। খণ্ডি পঙ্কজকে মার দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। কেস আপোষ রফা হল।

৩) কেস নম্বর ১২৬৮, দফা ৩৫২, নটবর জেনা বনাম খণ্ডি ও অন্যান্য। নটবরের ছোট ভাই খণ্ডির ছোট মেয়েকে বিয়ে করেছিল। খণ্ডি তাকে ৫০০ টাকা ও দশমাণ জমি যৌতুক দেবে বলেছিল। সে মাত্র ১৮০ টাকা পেল। বাকি টাকা চাইলে খণ্ডির লোক তাকে পেটাল এবং বেঁধে রাখল। প্রমাণের অভাবে কেস খারিজ হয়ে গেল।

রাজার ম্যানেজার খৃষ্টান। তা নিয়ে বাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হল। কিছু লোকের বক্তব্য এই ব্যবস্থা হিন্দুধর্মবিরোধী। কিন্তু প্রাইস দক্ষ লোক। তার তত্ত্বাবধানে মন্দির পরিচালনায় উন্নতি হল। ফলে অনেক লোক তাকে সমর্থন করল। বাঁদর বধ্ হলে যেমন গণ্ডগোল হয়েছিল তেমন কিছু হল না।

বছর শেষ হবার আগে সংবাদ এল যে পুরীর মন্দির ও ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির দেখতে আসবেন বড়লাট লর্ড কার্জন। অফিসাররা এর জন্য প্রস্তুতিতে লেগে গেল। বন্দোবস্ত তদারক করতে আগেই এসে গেলেন ছোট লাট। বড় লাট মন্দির দেখতে আসবেন। সুতরাং বন্দোবস্তের ভার রাজার উপর ন্যস্ত হবার কথা। কিন্তু মুকুন্দর অবস্থা দেখে সকলে মধুবাবুকে এ দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করল। মধুবাবু কয়েকবার পুরী এলেন কাজের তত্ত্বাবধান করার জন্য।

আজকাল পুরী আসা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। ১৮৯৭ সালে খুর্দা রোডের সঙ্গে পুরীর রেল যোগাযোগ স্থাপিত হল। ততদিনে ওয়ালটেয়ারের সঙ্গে কটক পর্যন্ত রেল লাইন বিছানো হয়েছে। তার দুই বছর আগে খড়গপুর থেকে কটক পর্যন্ত ট্রেন চলেছে। এখন জগন্নাথ দর্শনার্থীদের যাত্রা অনেক সুগম হয়ে গেছে।

১৬ই ডিসেম্বর বড়লাটকে নিয়ে বিশেষ ট্রেনটি যখন পুরী ষ্টেশনে পৌঁছাল তখন পুরী শহরের চেহারা বদলে গেছে। বড়লাট কার্জনের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনের কাছে একটি মনোরম মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। সেখান থেকে সমুদ্রতট এবং কাছারী পর্যন্ত এবং অন্যদিকে গুণ্ডিচা মন্দির হয়ে বড়দাণ্ড পর্যন্ত রাস্তা ফুলপাতায় সুসজ্জিত হয়েছে।

তোরণ নির্মিত হয়েছে, পতাকা ঝোলানো হয়েছে। মন্দিরের সামনে শামিয়ানা টানিয়ে অতিথিদের বসার ও অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়েছে। মধুবাবুর ফ্যাক্টরীতে তৈরী তারকসির কাজে স্থানটি সাজানো হয়েছে। বড়লাট এলে পড়ার জন্য তালপত্রে লেখা অভিনন্দন পত্র একটি 'রুপোর বাক্সে' রাখা হয়েছে।

লর্ড কার্জন ট্রেন থেকে নেমেই ঘোড়াগাড়িতে বসে মন্দির দেখতে গেলেন। অরুন স্তম্ভ ও সিংহদ্বার দেখে রাধাবল্লভ মঠের উপর থেকে যতটা সম্ভব মন্দির দেখলেন। তার পরে ঘোড়াগাড়িতে বসে মন্দির পরিক্রমা করলেন। সবশেষে কার্জন সভামণ্ডপে এলেন। সেখানে তাকে অভ্যর্থনা করতে উপস্থিত ছিলেন, ছোট লাট, মুকুন্দ, মধুবাবু, রাজা মহারাজা ও অফিসারগণ। একজন পুরোহিত একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করলেন :

সর্বসদ্‌গুণাধার সম্মানভাজনাগ্রগণ্য ব্যারন কার্জন অফ কিডেলষ্টোন, পি. সি. জি. এম্. এস. আই. জি, এম্. আই. ই. শ্রীশ্রীশ্রী ভারতাধীশ্বর শ্রীচরণকমলেষু,

যথাবিহিত শ্রদ্ধাভক্তি পুরঃসর নিবেদনমেতত্
দ্বারসুৎকল দেশস্য জগন্নাথস্য মন্দিরং
ঐতিহাসিক তত্ত্বস্য জ্ঞাপক বিশেষতঃ।

জগন্নাথের প্রতিষ্ঠা বর্ণনা করে এ কথা উল্লেখ করা হল যে একজন মুকুন্দর আমলে ইংরেজদের আবির্ভাব হয়েছিল। এখন যখন বড়লাট পুরী এলেন তখন পুরীর রাজা আর একজন মুকুন্দ। ১৮০৩ সালে মন্দির রক্ষা করার জন্য পাণ্ডারা ইংরেজদের আমন্ত্রণ করে এনেছিল। সে কথা উল্লেখ করা হল :

খ্রেষ্টে গুণ ব্যোম গজেন্দু সংখ্যে
হারকোর্ট কর্ণেল সবলোরদাব্দে
প্রায়াদ বিজেতুং নিহিতঃস্তদা সঃ
মহাবিভোমন্দির রক্ষণাদৌ। ইত্যাদি।

অভিনন্দন শেষে 'বয়ং হি শ্রীমতঃ রাজভক্তাঃ আজ্ঞানুবর্তিনঃ শ্রীমদগুণগ্রাম বিসুদ্ধাঃ প্রজাঃ' বলে পুরোহিত বসলেন। সেদিন রবিবার। সুতরাং কার্জন অভ্যর্থনার উত্তর না দিয়ে মাত্র ধন্যবাদ বলে গুণ্ডিচা মন্দির দেখে সার্কিট হাউজে গেলেন। অপরাহ্ন সাড়ে তিনটায় ট্রেনযোগে বড়লাট ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

হুগলি : জানুয়ারি ১৯০১

হুগলিতে যোগ দিয়ে কাজে আটকে গেলেন রাধানাথ। শিক্ষা বিভাগের বর্ধমান ডিভিশনে ছয়টি জেলা। বছরে ১৬২টি স্কুল পরিদর্শন করতে হয়। সুতরাং অনেক সময় দিতে

হয় সফরে। মহাযাত্রা নিয়ে ঝামেলা হলে রাধানাথ ঠিক করেছিলেন সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করবেন। কিন্তু সাহিত্য তাঁকে ছাড়ল না। ওড়িশার পত্রপত্রিকা তাঁর লেখা চায়, লেখকরা তাঁদের লেখা পাঠিয়ে তাঁর মন্তব্য চায়। হঠাৎ একদিন ফকীরমোহনের চিঠি ও একটি কবিতা পেলেন।

প্রিয় ভাই রাধানাথবাবু,

এই কবিতাটি দেখবেন। এটি আমার মনঃপূত হয়নি। যেমন ভাষায় যেমন সুন্দর করে লেখা উচিত তা নিশ্চয়ই হয়নি। আপনি এটি নিজের ভাষায় ঢেলে দিলে আমার একটি সম্পদ হয়ে থাকবে।

আপনার,
ফকীরমোহন সেনাপতি

সঙ্গের কবিতাটির শিরোনামা 'বিরহী হলদী বসন্ত'। কবিতাটি পড়ে ঘটনাটি মনে পড়ল রাধানাথের। রাধানাথ যখন কটকে ছুটি কাটাচ্ছিলেন তখন একদিন ফকীরমোহনের সঙ্গে তাঁর রাঘরাবাদের বাড়িতে দেখা করতে গেলেন। ফকীরমোহনের বয়স হয়েছে ৫৭ বছর। কেন্দ্র পাড়ায় নয় মাস ম্যানেজারের চাকরি করে কটকে ফিরে এসেছেন এবং স্থির করেছেন আর চাকরি করবেন না। 'অবসর বাসরে' নাম দিয়ে একটি কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করার ইচ্ছা এবং ইতিমধ্যে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন তার জন্য। রাধানাথ এলে ফকীরমোহন তাঁকে বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলেন একটি হলদী বসন্ত পাখি মরে পড়ে আছে। ফকীরমোহন বললেন রোজ সকাল ন'টা নাগাদ এক জোড়া হলদী বসন্ত তাঁর বাগানে এসে খেলত। তার একটি মরে গেলে অন্যটি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল। যেটি তাঁরা দেখছেন সেটি তারই মৃতদেহ। 'দেখিল বন্ধু আমার প্রত্যক্ষ' এই লাইনটির পাশে একটি তারকা চিহ্ন এবং পাদটীকায় লেখা আছে আমার বাল্য বন্ধু রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

সব কাজ ছেড়ে রাধানাথ কবিতাটি মার্জনা করতে বসে গেলেন। শেষপদটি ভাল লাগল না, কেটে দিলেন। এবং দুটি নতুন পদ যোগ করলেন। অন্য কয়েকটি লাইনেও সামান্য পরিবর্তন করে পুরো কবিতাটি নিজের হাতে লিখে ফকীরমোহনকে পাঠিয়ে দিলেন। এর এক ফল এই হল যে রাধানাথ তাঁর মন বদলালেন, এবং পুনরায় কবিতা লিখতে চাইলেন।

কিন্তু কবিতা লেখা আর হল না। হাজার চেষ্টা করেও একটি লাইনও রচনা করতে পারলেন না। মহাযাত্রা নিয়ে দুই বছরের লম্বা ঝামেলা, হঠাৎ বদলী, কাজের চাপ, অসুস্থতা—সব মিলিয়ে জীবনের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করেছে। হুগলির জলবায়ু সহ্য হচ্ছে না। মাঝে মাঝে ভেবেছেন চাকরি ছেড়ে দেবেন, বাড়িতে বসে সাহিত্যসেবায় মন দেবেন। অনেকদিন আগে 'চিল্কা' লেখার সময় ভেবেছিলেন, 'করেছিনু আশা

করিব যাপন তোমার পশ্চিম তীরে পশ্চিম জীবন।' এখন মনে হচ্ছে সে আশা পূর্ণ হবে না। ময়ূরভঞ্জ অথবা বামণ্ডা থেকে সাহায্যের আশা ছেড়েই দিয়েছেন তিনি।

আজ সকাল থেকে শরীর ভাল লাগছে না। কাল বসন্তের টীকা নিয়েছেন, জ্বরভাব আছে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। নিঃশ্বাস ছোটো হয়েছে। কিন্তু অফিসে না গেলে চলবে না। হেঁটে অফিসে যেতে ভাল লাগে, আজ কিন্তু ঘোড়াগাড়ি নিলেন।

তার অফিসে কাজ করার পদ্ধতি অদ্ভুত। এসেই জুতা, শার্ট খুলে ফেলে, অফিসের চেয়ার টেবিল ছেড়ে পাশের কামরায় শপ বিছিয়ে মেঝেতে বসে কাজ করেন। হাঁটুর উপর কাগজ রেখে লেখালেখি করেন। কোনও সাহেব এলে জামা পরে চেয়ারে বসেন। তা না হলে, কিছু আলোচনা করার থাকলে বা অন্য কিছু কাজে কেউ কামরায় এলে তাকেও অন্য একটি শপে বসতে হয়। অফিসের লোক প্রথম দিকে এই আধা ওড়িয়া ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে হাসত। ক্রমে তাঁর সরলতা ও অমায়িক ব্যবহার তাদের আপন করে নিল।

ছোটোবেলা থেকে রোগে ভুগে ভুগে একটু আফিমের নেশা হয়ে গিয়েছিল। একটি রুপোর কৌটোতে আফিম থাকে সঙ্গে। আরও একটি বদ অভ্যাস আছে। তিনি নস্য নেন। যদিও সকালে একমাত্রা আফিম খেয়েছেন অফিসে এসে আর একটি বড়ি তৈরী করলেন। আজ কাজে মন নেই। ভাবলেন আজ যদি অফিসে না এলে চলত তাহলে বাড়িতে শুয়ে কবিতার লাইন মনে করার চেষ্টা করতেন।

চাপরাশী আনন্দ এসে দাঁড়াল। রাধানাথ তার আপাদ মস্তক দেখলেন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে সামনে দাঁড়ানো এই নাদুসনুদুস প্রৌঢ় সেই কঙ্কালসার বালক যাকে দুর্ভিক্ষের সময় সুন্দরনারায়ণ রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। আনন্দ বলল এক ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান। রাধানাথ পট করে একদানা আফিম মুখে পুরে সিধা হয়ে বসলেন, বললেন নিয়ে এস। ভাগ্য ভাল আজ একটু ঠাণ্ডা, তাছাড়া শরীরটাও ম্যাজম্যাজ করছে, তাই জামা গায়ে ছিল। জ্বর এবং আফিমের নেশায় সবকিছু অবাস্তব লাগছে।

ভদ্রমহিলা এসে নমস্কার করে সামনের শপে বসলেন। বাইশ তেইশ বছর বয়স্কা এই তরুণীর নাম নগেন্দ্রবালা সরস্বতী। সুখাড়িয়া গ্রামে থাকেন তিনি, স্বামী জামালপুরের সাবরেজিষ্ট্রার। মেয়েটি অসাধারণ বিদুষী। এই কচি বয়সে তাঁর দুখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে, 'মর্মগাথা' ও 'প্রেমগাথা'। তাছাড়া 'নারীধর্ম' নামক একখানি প্রবন্ধ সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছে। রক্ষণশীল বাঙালি পরিবারে পুস্তকখানি জনপ্রিয় হয়েছে। এতে নারীদের অনেক সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে, রমনী পরপুরুষের সঙ্গে অধিক অথবা নির্জনে কথা বলবে না ইত্যাদি। এখন তিনি তৃতীয় কবিতার বই প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। নিজের মেয়ের নাম অনুসারে এটির নাম দিয়েছেন 'অমিয় গাথা'। তাঁর অনুরোধ রাধানাথ এর ভূমিকা লিখে দিন।

নগেন্দ্রবালা রাধানাথকে পাণ্ডুলিপিখানি দিলেন। সব কিছু ভুলে রাধানাথ কবিতাগুলি পড়তে লাগলেন। কবিতাগুলি মর্মস্পর্শী কিন্তু শোক, বিষাদ ও ক্ষোভে ভরা। মনে হল রাধানাথের মানসিক স্থিতিকে সাকার করেছে কবিতাগুলি। রাধানাথের মন ভুলে যাওয়া অতীতের নিভৃততম অলিগলিতে ফিরে গেল। বই বন্ধ করে প্রকৃতিস্থ হবার পর দেখলেন সামনে বসে এক রহস্যময়ী নারী।

রাধানাথ বললেন, 'সুন্দর, অতি সুন্দর'। নগেন্দ্রবালা বললেন, 'আপনি আমাকে চেনেন না কিন্তু আমি আপনাকে চিনি কারণ আপনার সব লেখা আমি পড়েছি।' রাধানাথ বললেন, 'তা কি করে হয়, সে সব তো ওড়িয়াতে লেখা।' নগেন্দ্রবালা বললেন, 'আপনার লেখা পড়ার জন্যই আমি ওড়িয়া শিখেছি। আপনিই আমার কাব্যগুরু।' এই বলে কাছে এসে রাধানাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। রাধানাথ বললেন, 'আচ্ছা মেনে নিলাম তুমি আমার শিষ্যা। তুমি কিন্তু একটা ভুল করলে। তোমার কবিতা পড়ে মনে হল তোমাকে আমি চিনি, অনেকদিন থেকে চিনি।' শুনে নগেন্দ্রবালা হাসলেন, বললেন, 'তাও আমি জানি, আমাদের সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের। আমার জন্মের আগেই আপনি লিখেছিলেন : 'নগেন্দ্রবালা পদ্মপদযুগল, ছুঁয়ে দেহ ধারণ হবে সফল।'

রাধানাথ অতীতে ফিরে গেলেন। এই দুটি লাইন তাঁর মেঘদূতে আছে। যখন লিখেছিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর। এখন বয়স হয়েছে ৫২ বছর। কত বছর, কত অনুভূতির মিছিল তিনি দেখেছেন। আজকের মতো দিন আসেনি আগে। মনে হল তাঁর কবিত্ব, জীবন অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একসঙ্গে সার্থক হয়ে গেল। মন উড়ে চলেছে এক কল্পনাতীত, অমূর্ত আনন্দলোকে। সব কিছু স্বপ্নময়। হঠাৎ একটি বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ল, সামনে অযাচিত উপস্থিত হয়েছেন সুন্দরনারায়ণ।

চোখ খুলে দেখলেন ঘর শূন্য, নগেন্দ্রবালা কখন চলে গেছেন তিনি জানতে পারেননি।

পুরী : সেপ্টেম্বর ১৯০১

কালেক্টরের অফিসে খণ্ডির উপরে ফাইল মোটা হয়েছে। আরও অনেক সম্পত্তি খণ্ডি ও তার পরিবারের নামে হস্তান্তর করে দিয়েছে মুকুন্দ। এই ফাইলে সে সব দরজ হয়েছে। যথা : মন্দির থেকে রাজার দৈনিক প্রাপ্য তিন টাকা দশ আনা মদন সিংহকে দান, রামচন্দ্রপুর, কপিলেশ্বর, বালিবারুণির ৫৮ একর দেবোত্তর জমি মদন সিংহকে চিরস্থায়ী পাট্টা; খণ্ডির জামাই যোগী রাউতকে ২৫০০ টাকায় তেলাঙ্গের হস্তবুদি মাহালের স্থায়ী মুস্তগিরি পাট্টা; যোগী রাউতের পুত্র নারণ রাউতকে ৭০ টাকায়

লেম্বাই পরগণার ৩৩ একর হস্তবুদি জমির স্থায়ী পাট্টা; মাছপাড়ার ৩৩ একর হস্তবুদি জমি ৭০ টাকায় মদন সিংহকে স্থায়ী লীজ; ২৯৮ টাকায় তেলাঙ্গে পাঁচটি মৌজার সরবরাকারী নারণ রাউতকে মুস্তগিরি স্থায়ী লীজ; ৩৩৩৬ টাকায় তেলাঙ্গের আরও ষোলটি সরবরাকারী নারণ রাউতকে স্থায়ী পাট্টা; ইত্যাদি।

খণ্ডির ফৌজদারী মামলায় তালিকায়ও নতুন মামলা যুক্ত হয়েছে। সব থেকে বড় মামলাটি খণ্ডির চতুর্থ স্বামী দাশরথীকে নিয়ে। কনষ্টেবলের চাকরি বিফল হলে সে বেকার বসে আছে। খণ্ডির আবদার তাকে অন্য কোনও চাকরি দেওয়া হোক। পুরীর মন্দিরের সংস্কার চলছিল। এই কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য মুকুন্দ দাশরথীকে হেড ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করল। পাণ্ডারা কিন্তু তাকে মন্দিরে ঢুকতে দিল না। দাশরথী জোর করলে মারপিট হল এবং পুলিশে রিপোর্ট হল।

মুকুন্দ এবার খণ্ডিকে জাতে উঠানোর উপায় খুঁজল। এর জন্য অনেক চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করে কপিলেশ্বর মমাগর ও বাটগাঁর চাষাদের দ্বারা খণ্ডিকে জাতে নেওয়া স্বীকার করিয়ে নিল মুকুন্দ। ফলে আশে পাশের ৫৬ টি গ্রামের চাষারা এই তিন গ্রামের চাষাদের বহিষ্কার করল। বাটগাঁর চাষারা প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় জাতে উঠল।

মুকুন্দ অনেকের থেকে টাকা ধার নিয়ে শোধ করতে পারল না। ফলে পাওনাদাররা তার নামে কেস করল। তারা জানত টাকা আদায় করতে হলে কি করতে হবে। দেবার মত কিছু মুকুন্দর কাছে নেই; সুতরাং তারা খণ্ডির সম্পত্তি ক্রোক করল।

সে বছর রথযাত্রা নিয়ে একটি বড় সমস্যা হল। ওড়িয়া পঞ্জিকা অনুসারে রথযাত্রা হবার কথা ১৮ই জুন। কিন্তু বাংলা পঞ্জিকার মতে ১৭ই জুলাই। রাজা নিষ্পত্তি জানালে পাণ্ডারা সেই অনুসারে যাত্রী আনার ব্যবস্থা করত। মুকুন্দ কিছু জানাল না; সুতরাং পাণ্ডারা যে যার সুবিধামত যাত্রী আনার বন্দোবস্ত করল। মাত্র পনেরো দিন আগে মুকুন্দ জানাল যে রথযাত্রা ওড়িয়া পঞ্জিকা অনুসারে হবে। কিন্তু ততদিনে পাণ্ডাদের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে।

রথযাত্রার একদিন আগে মন্দিরের মধ্যে একটি গোলমাল হল। মধুবাবুর মেয়ে শৈলবালা মাঝে মাঝে এসে পুরীর বাড়িতে থাকেন। সেদিন সকালে তিনি পুরীর সিভিল সার্জনের স্ত্রী শ্রীমতী সেন এবং অন্য দুজন মহিলার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সিংহদ্বারের সামনে এলেন। একজন পাণ্ডা তাদের ভিতরে ডাকল। শৈলবালা ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি জান আমি কে?' সে বলল, 'মধুবাবুর মেয়েকে কে না জানে, চিনি বলেই তো ডাকছি।' নেত্রোৎসবের জন্য সেদিন মন্দিরে ভীড় ছিল। কয়েকজন পাণ্ডা শৈলবালা ও অন্য তিনজনকে হাত ধরে চন্দন অর্গল পর্যন্ত নিয়ে গেল। সেখানে চরণামৃত দিলে দুজন নিল না, একজন শৈলবালা যে খৃষ্টান এবং অন্যজন ব্রাহ্ম। এই দুজন বাইরে এসে মুক্তি মণ্ডপের কাছে দাঁড়াল।

একজন বৈষ্ণব শৈলবালাকে দেখে চিৎকার করে উঠল, 'আরে, মধুবাবুর মেয়ে

মন্দিরে ঢুকেছে, মন্দির অপবিত্র হয়ে গেল।' যে পাণ্ডা তাকে ভিতরে এনেছিল এ কথা শুনে সে দৌড়ে এল এবং বৈষ্ণব তাকে এক থাপ্পড় মারল। দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেল এবং সকলে মিলে পাণ্ডাকে পিটতে লাগল। একজন পাণ্ডা এসে শৈলবালার কানে কানে বলল, 'বলে দিন আপনি মধুবাবুর মেয়ে নন, সিভিল সার্জনের আত্মীয়া।' শৈলবালা মিথ্যা বলতে রাজী হলেন না।

মন্দিরের ভিতরে তুমুল হট্টগোল শুরু হল। কালেক্টর ও এস্.পি. কে. খবর দেওয়া হল। তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে সিংহদ্বারে এসে দেখলেন সেখানে ভীষণ ভীড় এবং তুমুল হট্টগোল চলছে। কালেক্টর ব্যারেট ভাবলেন শৈলবালার প্রাণ সংশয়। তিনি হিন্দু পুলিশ ভিতরে পাঠিয়ে কোনওক্রমে তাকে বাইরে নিয়ে এলেন।

মধুবাবুর কাছে টেলিগ্রাম গেল। পরের দিন তিনি পুরী এলেন। সঙ্গে এলেন কমিশনার। কলকাতার সংবাদপত্র খবরটি বেশ রং চড়িয়ে প্রকাশ করল। বেঙ্গলী মিরর লিখল খৃষ্টান মহিলারা হিন্দুদের বিদ্রূপ করতেই মন্দিরে ঢুকেছিল। বিধর্মী মন্দিরে ঢুকে হিন্দুদের ধর্মাচরণে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, ইত্যাদি।

মন্দির অশুদ্ধ হয়েছে বলে মহাস্নান হল, ভোগ ফেলে দেওয়া হল এবং নীতি নিয়মে বিলম্ব হল। মধুবাবু শৈলবালাকে তিরস্কার করলেন এবং রাজবাড়ি গিয়ে ক্ষমা চাইলেন। যে পাণ্ডারা শৈলবালাকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের জরিমানা করা হল। উৎকল দীপিকায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ পেল কিন্তু সৌজন্য রক্ষা করে মধুবাবু অথবা শৈলবালার নাম উল্লেখ করা হল না।

রথযাত্রা ভালভাবে হয়ে গেল। কিন্তু তার একমাস পরেও যাত্রী আসতে লাগল কারণ তাদের ধারণা রথযাত্রা হবে।

মুকুন্দ প্রাইসকে বার করে দিয়ে মাসিক দুশ টাকা বেতনে রাসবিহারী নায়ককে ম্যানেজার নিযুক্ত করল। কিছুদিন আগে পাগল বলে তাকে সরকারী চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে মুকুন্দর অবস্থা আরও খারাপ হল। বাইরের লোকের সঙ্গে সে স্বাভাবিক ব্যবহার করে। রাজবাড়ির ভিতরে সে একেবারে অন্য লোক। তার একমাত্র লক্ষ্য কি করে খণ্ডিকে খুশি রাখবে। ক্রমে সে রাজবাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিল। সব সময় বন্ধ ঘরে বসে থাকে। মন্দির ও জমিজমার ব্যাপারে মন নেই। কেরাণি গোপীনাথ পট্টনায়ক এবং বীরভদ্র কানুনগো তার নামে স্বেচ্ছাচার চালালো। তারা মুকুন্দকে বোঝাল যে সে মন্দির আর জমিজমার ঝক্কি না নিয়ে এসব অধিকার তাদের পাট্টা দিয়ে দিক। ১৯০১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তিনজনের নামে মুকুন্দ দুটি ইজারা পাট্টা লিখে দিল। তারা তিনজন হল জগবন্ধু পট্টনায়ক, চিন্তামণি পট্টনায়ক ও বীরভদ্র কানুনগো। একটি পাট্টায় লেখা হল যে মন্দির পরিচালনায় গাফিলতি হচ্ছে সুতরাং তার উন্নতি করার জন্য মন্দিরের যে অমৃত মণোহি কাজ হয় তার অধিকার এই

তিনজনকে দেওয়া হল। তারা পিণ্ডিক, ধ্বজা ও অন্য বাবদে বছরে প্রায় ২২০০০ টাকা পাবে। তার থেকে খরচের জন্য ২২০০ টাকা রেখে ভোগের খরচ করে যা উদ্বৃত্ত হবে তা মুকুন্দকে দেবে। যদি খরচ বেশি হয় তবে ঘাটতি মুকুন্দ পূরণ করবে। দ্বিতীয় পাট্টাটিতে লেখা হল যে মন্দিরের আয় হয় যে সাতাশ হাজার মাহলে থেকে সে সবের খাজনা ইজারাদাররা আদায় করবে। আয়ের থেকে শতকরা দশ টাকা নিজেদের খরচের জন্য রেখে এবং দৈনিক ভোগের খরচ করে যা বাঁচবে তা মুকুন্দ দেবে। এ কাজ করার জন্য পুরীর রাজার সকল ক্ষমতা ইজারাদাররা প্রয়োগ করবে। রাজা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। এই বন্দোবস্ত দুই বছর চলবে।

পাট্টাতে সকলের দস্তখত হতেই সাবরেজিষ্ট্রার জগবন্ধু নায়ক যে নিজে একজন ইজারাদার দলিল দুটি রেজিষ্ট্রী করিয়ে নিল। এইভাবে মুকুন্দ পুরীর রাজাকে তিনজনের কাছে নীলাম করে দিল।

হুগলি : মার্চ ১৯০২

১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনমাসের ছুটি নিয়ে রাধানাথ কটকে এলেন এবং মার্চ মাসে শশীভূষণের বিবাহ দিলেন। তার বয়স হয়েছে পঁচিশ বছর। ষোল বছর বয়সে তার মৃগী রোগ শুরু হয় এবং সে পড়াশুনা ছেড়ে পিতার সেবায় নিজেকে নিয়োগ করে। সে রাধানাথের সঙ্গে সর্বত্র যায়। নিজেও সামান্য লেখালেখি করে এবং তার 'দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ' প্রকাশিত হয়েছে। লোকে অবশ্য তাকে রাধানাথের পুত্র এবং সহচর হিসাবেই জানে।

মে মাসে দ্বিতীয় পুত্র রজনীভূষণের বিবাহ দিয়ে রাধানাথ হুগলি ফিরে গেলেন। তিনি নগেন্দ্রবালার কবিতার বই 'অমিয়গাথা'র মুখবন্ধ লিখতে মন দিলেন। কবিতাগুলি মনোগ্রাহী। রাধানাথ নগেন্দ্রবালার সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ একটি সুন্দর মুখবন্ধ লিখে দিলেন। বইখানি ছাপানোর জন্য প্রেসে পাঠানো হল।

আজকাল নগেন্দ্রবালা মাঝে মাঝে রাধানাথের অফিসে এবং কখন কখনও বাড়িতেও আসেন। মিষ্টভাষী, ভদ্র এবং মিশুক নগেন্দ্রবালা অতি সহজে পরশমণির মন জয় করে নিলেন। রাধানাথ ও নগেন্দ্রবালার বয়সের যে অন্তর তা তাদের অজান্তেই ঘুচে গেছে। নগেন্দ্রবালা রাধানাথকে চেয়ারে বসে কাজ করতে বলেন, নিজে শপ বিছানো কামরায় না গিয়ে অফিস ঘরে চেয়ারে বসে থাকেন যাতে রাধানাথ এসে চেয়ারে বসতে বাধ্য হন। তিনি রাধানাথকে অফিসে খালি গায়ে বসতে দেন না। শুধু তাই নয় নগেন্দ্রবালা আজকাল রাধানাথের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করেন যথা, গোঁফ কতটা ছাঁটা হবে, মাথায় চুল কতটা কাটা হবে ইত্যাদি।

নগেন্দ্রবালার ব্যবহারে রাধানাথ যুগপৎ খুশি ও শঙ্কিত হন। নগেন্দ্রবালা তাঁর জীবনে এক বিশেষ স্থান দখল করেছেন। বাড়িতে ও অফিসে তাঁর অবাধ গতি। রাধানাথ অন্যদের কাছে নগেন্দ্রবালার পরিচয় দেন বঙ্গীয় নারী কবিশিরোমণি এবং আমার প্রিয় শিষ্যা বলে। নগেন্দ্রবালা রাধানাথের প্রকৃত ভক্ত। তিনি রাধানাথের সব বই সব কবিতা পড়েছেন। তাঁর ঘরে রাধানাথের একখানি ফোটো আছে যাতে রোজ মালা পরানো হয়। ফটোখানি কটক থেকে আনিয়েছেন। কবিবর রায় রাধানাথ রায়বাহাদুরের ছবি কটক প্রিন্টিং কোম্পানি দুই আনা মূল্যে বিক্রি করে। ফোটোটির পাশে রাধানাথের বইগুলি সাজানো আছে। রাধানাথ একবার নগেন্দ্রবালার ঘরে গিয়ে নিজের ফোটো দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

একবার দুজনে রাধানাথের ঘরে বসে একটি কবিতা আলোচনা করছেন হঠাৎ নগেন্দ্রবালা উঠে রাধানাথের অতি কাছে এসে বসলেন। রাধানাথ সঙ্কুচিত হয়ে একটু সরে বসলেন। নগেন্দ্রবালা বললেন, 'আপনি নারীদের সম্বন্ধে এত লিখেছেন কিন্তু তাদের বিষয়ে জানেন সামান্যই। কজন নারীকে আপনি কাছের থেকে জেনেছেন?' এ নিয়ে আর কোনও কথা হল না সেদিন। প্রশ্নটি অনেকদিন রাধানাথকে আচ্ছন্ন করে রাখল। আর একদিন নগেন্দ্রবালা বললেন, 'এখন থেকে আমি আপনাকে তুমি বলব, আপত্তি নেই তো?' বিব্রত হয়ে রাধানাথ বললেন, 'তুমি আমার শিষ্যা, কন্যাতুল্য।' এক রহস্যময়ী হাসি হেসে নগেন্দ্রবালা বললেন, 'সে কথা ঠিক।' তখন থেকে নিভৃতে নগেন্দ্রবালা তাঁকে তুমি বলেন অবশ্য সর্বসমক্ষে 'আপনি' বজায় রইল।

'অমিয়গাথা' ছাপা শুরু হলে নগেন্দ্রবালা সময়ে অসময়ে আসতে আরম্ভ করলেন। প্রুফ দেখা, শেষ মুহূর্তে কোনও শব্দ বদলানো ইত্যাদি নানা বিষয়ে রাধানাথের পরামর্শ দরকার। পরশমণি এখন কটকে এবং রাধানাথ একা থাকেন। 'অমিয়গাথা' ছাপা শুরু হলে রাধানাথ সফরে যাওয়া কমিয়ে দিলেন এবং নগেন্দ্রবালাকে সর্বপ্রকার সহায়তা করলেন। কবিতা আলোচনা ও নগেন্দ্রবালার সাহচর্য হৃদয়গ্রাহী যদিও নগেন্দ্রবালার হাবভাবে তিনি সন্ত্রস্ত ও বিব্রত বোধ করেন।

এক রবিবার দুপুরে ছাপা 'অমিয়গাথা' হাতে নিয়ে নগেন্দ্রবালা রাধানাথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন এবং বইখানি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। রাধানাথ মনোযোগ দিয়ে আর একবার কবিতাগুলি পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'খুব সুন্দর।' তাঁর হাত থেকে বইখানি নিয়ে নগেন্দ্রবালা বললেন, 'আমার সৌভাগ্য যে তোমার ভালো লেগেছে।' রাধানাথ বললেন, 'বাড়িয়ে বলছি না, সত্যই কবিতাগুলি রোচক। এবার আর একখানি লেখ।' নগেন্দ্রবালা বললেন, 'আমি তো লিখব, কিন্তু কতদিন কিছু লেখনি মনে আছে? তুমিও কিছু লেখ এবার।' রাধানাথ বললেন, 'লেখার মত মানসিক স্থিতি আমার নেই। 'মহাযাত্রা' শেষ করার প্রশ্ন ওঠে না ভেবেছিলাম অন্তত 'পার্বতী' শেষ করব। কিন্তু আমি নিরুপায় নতুন কিছুই আমার মাথায় আসছে না।'

নগেন্দ্রবালা বললেন, 'তোমাকে লিখতেই হবে। পার্বতী ছাড়, অন্য কিছু লেখ। যদি উষা বা নন্দিকেশ্বরী না মেলে এবং নতুন কিছু ভাবতে পারছ না তবে আমার দিকে দেখ। আমি তো তোমার চোখের সামনে। তুমি নগেন্দ্রবালাকে নিয়ে কাব্য লেখ।' রাধানাথ চুপ করে আছেন দেখে নগেন্দ্রবালা রেগে গেলেন, বললেন, 'এতদিন নারীদের বিষয়ে যা কিছু লিখেছ সে তোমার কল্পনা, তুমি নারীদের বিষয়ে জান কি? কোন স্ত্রীলোকের মন জেনেছ তুমি?'

রাধানাথ কিছু বললেন না। নগেন্দ্রবালা বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি স্ত্রীর মন কি জিনিস। সে কি চায়।' তিনি রাধানাথের গা ঘেসে বসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, 'তুমি স্বীকার করেছ তুমি আমার গুরু আমি তোমার শিষ্য। আজ গুরু দক্ষিণা চুকিয়ে দিই।'

রাধানাথ সরে গেলেন, বললেন, 'গুরুদক্ষিণা আমার চাই না।' নগেন্দ্রবালা উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন, 'আমি ঋণী থাকতে চাই না, গুরুদক্ষিণা আমি দেবই।'

হাত মুখ ধুয়ে নগেন্দ্রবালা ঘরে এসে দেখলেন রাধানাথ হেঁটমাথা হয়ে বিষণ্নবদনে বসে আছেন। নগেন্দ্রবালা বললেন, 'হল কি তোমার?' রাধানাথ জবাব দিলেন না। নগেন্দ্রবালা কাছে এলে রাধানাথ তাকে ঠেলে দিলেন। নগেন্দ্রবালা চপ্পল পরে বাইরে যেতে যেতে বললেন, ব্যস্ আমি যাচ্ছি, আর আসব না। সত্যই তিনি আর এলেন না। চারদিন কেটে গেল, নগেন্দ্রবালার দেখা নেই। বিফল হয়ে পঞ্চম দিনে রাধানাথ চিঠি লিখে তাকে ডাকালেন।

কটক : জুলাই ১৯০৭

১৯০৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চান্ন বছর বয়স পূর্ণ হলে রাধানাথ অবসর গ্রহণ করে কটকে চলে এলেন। হুগলিতে চার বছরের কার্যকাল সন্তোষজনক হয়নি। একটি বড় দুঃখ রয়ে গেল যে এই কটি বছর সাহিত্যচর্চা হল না। কেবল আগে লেখা 'লেখাবলী' প্রকাশিত হল। কালিদাসের কবিতা থেকে চয়ণ করা 'কালিদাস সুক্তয়ঃ' যা অনেকদিন আগে লিখেছিলেন সেটি প্রকাশিত হল। বহুদিন আগে পরিকল্পিত 'গ্রন্থাবলী' খড়িয়ালের রাজার সাহায্যে প্রকাশিত হল। এর প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হল নগেন্দ্রবালা লিখিত 'ভূতলে স্বর্গ'। এর কয়েকটি পঙক্তি :

আমি যা দেখেছি তাহা অতুল ধরায়
স্বার্থ ধরা মাঝে
পবিত্র দেবতা সাজে

ভূতলে স্বর্গের চিত্র রাধানাথ রায়
ললিত কলার স্বামী
তুমি গুরু শিষ্য আমি
পরশে পরশে লোহা সোনা হয়ে যায়
এ মহা সরগ তোরা কে দেখবি আয়।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী
নগেন্দ্রবালা।

হুগলিতে অবস্থান কালে আর যা তার মনস্তাপের কারণ হয়েছে সে হল নগেন্দ্রবালার সঙ্গে তার সম্পর্ক। তিনি নগেন্দ্রবালাকে ছাড়তে পারলেন না, নিজের করে নিতেও পারলেন না। মাঝে একবার পরশমণির নিমন্ত্রণে নগেন্দ্রবালা কটকে এসেছিলেন। তখন তিনি ধবলেশ্বর দেখেছিলেন এবং ধবলেশ্বরের উপরে একটি কবিতা লিখেছিলেন। রাধানাথের চেষ্টায় কলকাতা থেকে নগেন্দ্রবালার 'ধবলেশ্বর' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। এটি উৎসর্গীকৃত হল শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় মহোদয়ের অশেষ সদগুণান্বিতা সহকর্মিণী পরমপূজ্যতমা মাতৃস্থানীয় শ্রীযুক্তা পরশমণি দাসী মহোদয়ার প্রতি। রাধানাথ কাব্যটি তাঁর সকল বন্ধুদের উপহার দিয়েছিলেন।

ওড়িশায় ফিরে কিছুদিন রাধানাথ সভাসমিতি নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। ১৯শে ডিসেম্বর কটকের টাউন ভিক্টোরিয়া স্কুলে উৎকল সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশন হল। এর জন্য রাধানাথ একটি অভিভাষণ লিখলেন কিন্তু তার কণ্ঠস্বর জোরালো নয় বলে সেটি পাঠ করলেন মৃত্যুঞ্জয় বাণীভূষণ। এর পরেরদিন ইদগা ময়দানে উৎকল সম্মিলনী হল। এর জন্য রাধানাথ একটি গীত রচনা করলেন : দাও হে সরবে উৎকলি, দেশহিতে আত্মবলি, ইত্যাদি। এই সভায় তঁরা ভারতগীতিকা, 'সর্বেষাং নো জননী ভারতধরণী কল্পলতেয়ং' টিও গাওয়া হল।

কিছুদিন পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর দুশ্চিন্তাও শুরু হল। তাঁর বিশ্বাস হল কোনও পাপের শাস্তি ভোগ করছেন তিনি। এই ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলার জন্য তিনি সেতার শিখতে আরম্ভ করলেন। এবং বেতন দিয়ে একজন সংস্কৃত পণ্ডিত নিযুক্ত করলেন তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করার জন্য। প্রতি সকালে উঠে তিনি এক হাজার বার মধুসূদন লেখেন, বার বার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঠঘোড়ীতে স্নান করেন। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হল না। এখন তাঁর একমাত্র সহায় শশীভূষণ যে সব সময় ছায়ার মতো তাঁর কাছে থাকেন।

রাধানাথের এই ধারণা দৃঢ় হল যে তাঁর দুর্গতির কারণ নগেন্দ্রবালার সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক। পরশমণির উদ্দেশ্যে তিনি 'সতীর প্রতি সতীদ্রোহী পতির উক্তি' শীর্ষক কবিতা লিখলেন :

চরিত্রপ্রতি সদা ছিলাম সজাগ,
যুবা বা প্রৌঢ়কালে কিবা বার্ধক্যে,
একভার্য রব আমি ভেবেছিনু মনে,
এটাই আমার লক্ষ্য ছিল সব দিনে।

কিন্তু কি কুক্ষণে বিদেশে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে রাক্ষসীর কবলে পড়লেন তার বিবরণী দিলেন। তিনি নগেন্দ্রবালাকে পাপীয়সী মায়াবিনী আখ্যা দিয়ে কিভাবে মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতার জন্য তার মায়াচক্রে আটকে গেলেন তা বর্ণনা করলেন।

এবার তিনি অনুতাপদগ্ধ অনুভূতিকে একটি আত্মকথা আকারে লিখতে আরম্ভ করলেন :

আমার শরীরে যে কি কষ্ট তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মধ্যাহ্নের শারদাতপ তরলিত হয়ে আমার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয়। পাঁজরের বাঁদিকে এবং বাম উরুতে একটি বেদনা সর্বদা কষ্ট দেয়। অনেকবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। পাপের এই তো দণ্ড। আজকাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্রোহ করছে। উদর বক্ষস্থল, হস্তপাদ, চক্ষু সর্বত্র কষ্ট। সর্ব অঙ্গ যেন নীরব তিরস্কার করে, তুমি পাপী, তোমার বাঁচার অধিকার নেই, তোমার সেবা করতে রাজী নই আমরা।

ঘড়ি বাজলে কষ্ট হয়, সেতার বাজলে কষ্ট হয়, রাম সীতা সাবিত্রী সত্যবান প্রভৃতির একখানি ভাল ছবি দেখলে কষ্ট হয়। হায়। কি ছিলাম আর কি হয়ে গেলাম। জীবনের সায়ং কালে একি দুর্মতি হল আমার।

হায়, এখন লোকে আমাকে ঋষিতুল্য বলে। যেখানেই যাই লোকে আমার এই রূপ দেখে। বাস্তবিক দৈনন্দিন জীবনের আমার আচরণও তদ্রূপ হয়। হুগলিতে কয়েক বছর অবস্থানকালে আমার চরিত্র কলুষিত হয়ে গেল। হায় শেষ জীবনে কজনের এমন অধঃপতন হয়?

এভাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে চললেন রাধানাথ। কিন্তু শান্তি পেলেন না। দিন মাস বছর চলে গেল কিন্তু মন শান্ত হল না। ১৯০৬ সালে মাত্র আঠাশ বছর বয়সে নগেন্দ্রবালার মৃত্যু হল। এ সংবাদেও মনস্তাপের উপশম হল না।

শেষে রাধানাথ শশীভূষণকে বললেন স্বীকারোক্তি লিখে সর্বসাধারণকে জানালেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। শশীভূষণ তাকে এমন কাজ করতে মানা করলেন। রাধানাথ মধুসূদনের পরামর্শ নিলেন, উৎকল সাহিত্য প্রেসে গিয়ে বিশ্বনাথ করকে বললেন। বৈকুণ্ঠনাথ দে কটকে এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করলেন, এমনকি গৌরীশংকরের মত চাইলেন। সকলেই তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন।

তবুও রাধানাথ স্বীকারোক্তি লেখা শেষ করলেন :

এই আত্মবিবৃতি যাঁর হস্তগত হবে তাকে সবিনয় অনুরোধ এটি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে দেখাবেন। সর্বসাধারণের কাছে এই মহাপাপীর অতি করুণ ও বিনীত নিবেদন : আমি

মহাপাপী কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা চাইছি, আপনারা আমার পাপকে ঘৃণা করবেন, কিন্তু পাপীর প্রতি নির্দয় হবেন না। আমার অন্য অভিযোক্তা নেই। স্বয়ং অন্তর্যামী আত্মপুরুষ আমার অভিযোক্তা।

জীবনের প্রথম ৫২ বছর আমার চরিত্রে কোনও দাগ লাগেনি। ৫৩ বছর বয়সে বিদেশে এক বিদুষী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হল। তার অসাধারণ সাহিত্য উৎকর্ষ এবং রচনার পরিপাট্য আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করল। এবং ক্রমে তা সৌহার্দে পরিণত হল। এত সদগুণ থাকলেও তার চরিত্র অত্যন্ত বিকৃত ছিল যা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। তার বিকৃত চরিত্র আমার আজন্ম সংযম নষ্ট করল। বিবেকের সাবধান বাণী মাঝে মাঝে কানে এসেছে কিন্তু এ কুহকিণীর জাল মুক্ত হতে পারিনি।

চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে ভদ্রসমাজে ভদ্র সেজে চলাফেরা করছি এ আমি আর সহন করতে পারছি না। আমি বার্দ্ধক্যের কলঙ্ক। পাপের এমন জঘন্য দৃষ্টান্ত বিরল। আমার জীবনের সন্ধ্যা দ্বারপ্রান্তে। সারা জীবন সৎপথে থাকার চেষ্টা করে জীবনের সায়ংকালে একি নিদারুণ স্খলন হল আমার।

এইভবে অনেক লিখে উপসংহরে লিখলেন, সকলকে পুনরায় কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করছি আশীর্বাদ করুন যেন আপনাদের পদধূলির যোগ্য হতে পারি।

সংবাদপত্রের মাননীয় সম্পাদকগণকে প্রার্থনা আমার প্রতি কৃপা করে আমার এই আত্মবিবৃতি নিজ নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। আমার পাপের কাহিনী খোলাখুলি লোকের গোচরে আনলাম বলে অনেকে ভাববেন আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। কিন্তু আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা এই স্বীকারোক্তি। আমার অন্য উপায় নাই। এরকম ঘটনা সংসারে অনেক ঘটে জেনেও আত্মসম্বরণের ক্ষমতা আমার নেই।

কটক, ২৫.৭.০৭ শ্রীরাধানাথ রায়।

পিতার আদেশে শশীভূষণ কটক প্রিণ্টিং প্রেসে গিয়ে বাংলায় ও ওড়িয়াতে এক হাজার করে কপি ছাপালেন। এগুলি ওড়িয়া ও বাংলা পত্রপত্রিকায় এবং সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিকে পাঠালেন। কাজ শেষ করে শশীভূষণ এসে রাধানাথের কাছে বসলেন, বললেন, 'কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রাধানাথ তার হাত থেকে কাগজটি নিয়ে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ নগেন্দ্রবালাকে মনে পড়ল এবং তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

□□

Laser typeset at Ess Ess Enterprises, New Delhi
and printed at Tarang Printers, Delhi-110 092

আধুনিক ওড়িয়া গদ্যসাহিত্যের এক দিগদর্শক শৈলীতে লেখা উপন্যাস 'দেশ কাল পাত্র'। ওড়িশা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালের পুরোধা পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে রচিত এই উপন্যাস কবি, গবেষক, কলাসমালোচক, সফল প্রশাসক জগন্নাথ প্রসাদ দাসকে (জন্ম : ১৯৩৬) প্রতিষ্ঠা দিয়েছে ওড়িশার প্রথম সারির ঔপন্যাসিক হিসেবে। সাহিত্যে নিজেকে নিবেদিত করতে যে সফল আই.এ.এস. অফিসার স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন, তাঁরই হাতে ওড়িশার এক কালখণ্ডের ইতিহাস যে বিধৃত হবে, তা বিস্ময়ের নয়।

এই ঐতিহ্যের, এক অর্থে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটির বঙ্গানুবাদ করেছেন আর এক আই.এ.এস.—সুবোধ কুমার বসু। তাঁর স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদে মূল উপন্যাসের রূপরসগন্ধবর্ণ সমুজ্বল হয়ে উঠেছে।



95.00 টাকা

ISBN 81-237-3966-4

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া